বর্তমান বিশ্বের অন্যতম আধ্যাত্মিক রাহবার
পীরে কামেল মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশ্‌বন্দী-এর বয়ান

খুতুবাতে যুলফিকার



খুতুবাতে যুলফিকার

[প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড]



টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক



https://t.me/islaMic_fdf



খুতুবাতে যুলফিকার

[প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড]



মূল

মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী

অনুবাদ

মুফতী মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহ

শিক্ষাসচিব, আরাবিয়া আনওয়ারুল উলূম
সাইজ উদ্দীন, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।

সম্পাদনা

মাওলানা মোহাম্মদ মুহিউদ্দীন

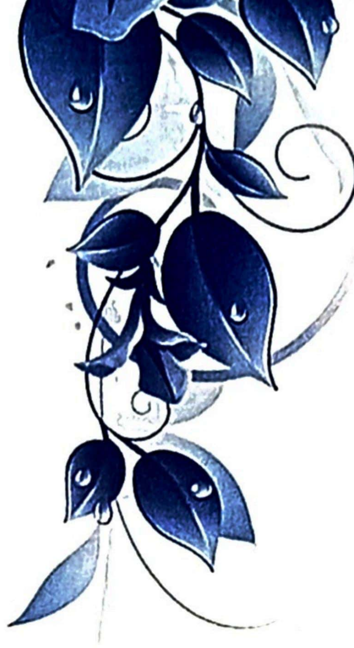
দাওরায়ে হাদীছ (১৯৯০)
মাদরাসা-ই নূরিয়া, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা
সাবেক ওস্তাদ, জামেয়া রশীদিয়া ঢাকা
প্রাক্তন সহ-সম্পাদক, মাসিক রহমত



দারুল উলূম লাইব্রেরী

[অভিজাত ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]

ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০



পরিমার্জিত সংস্করণ	:	সেপ্টেম্বর ২০২০
প্রথম প্রকাশ	:	ফেব্রুয়ারি ২০১৫

প্রকাশক	:	**মাওলানা শহীদুল ইসলাম** দারুল উলূম লাইব্রেরী ইসলামী টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড) ১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ মোবাইল : ০১৯১৮১৮৮০৮৫, ০১৭১২৫০৭৮৭৭
স্বত্ব	:	প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
বর্ণবিন্যাস	:	পরশ কম্পিউটার, রায়েরবাগ, ঢাকা
প্রচ্ছদ	:	দি ব্রাইট, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মূল্য 500 মাত্র

ISBN : 978-984-94571-3-8

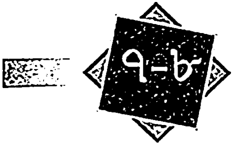


এক নজরে খুতুবাতে যুলফিকার-১-৩২

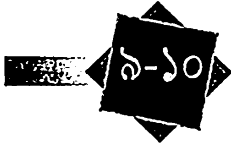
১-২

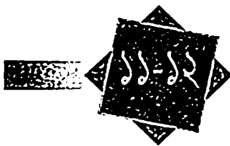
৩-৪

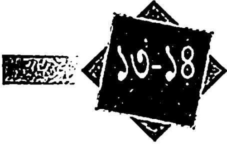




৭-৮


৯-১০


১১-১২


১৩-১৪

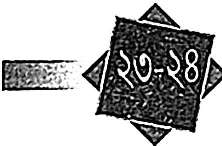

১৫-১৬

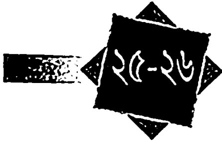

১৭-১৮

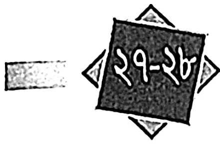


১৯-২০

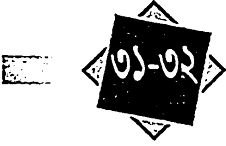

২১-২২


২৩-২৪


২৫-২৬


২৭-২৮


২৯-৩০


৩১-৩২

সূচি নির্দেশিকা

খুতুবাতে যুলফিকার-১

ইসলাম ও দাম্পত্যজীবন

সাধনা উন্নতির সোপান

তাকওয়ার কল্যাণ

জবানের হেফাজত

আত্মার সংশোধন

বিজ্ঞান ও মানুষ

আল্লাহওয়ালাদের সোহবত

রমজান মোবারকের বরকতসমূহ

রোযা কেন ফরজ করা হলো?

নামাযের গুরুত্ব

জীবনের উদ্দেশ্য

ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব ও কর্তব্য

নবীজির সুন্নাত ও আধুনিক বিজ্ঞান

সূচিনির্দেশিকা

খুতুবাতে যুলফিকার-২

ইসলাম আমার প্রিয় ধর্ম কেন?

ইসলাম ও বিজ্ঞান

আমাদের প্রতিপালক

নবীপ্রেম

প্রেমের জ্বালা ও জ্ঞানের নেশা

ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভাবনা

সুফিয়ায়ে কেরামের দৃষ্টিতে জিহাদ

পূর্বসূরীদের কতগুলো শিক্ষণীয় ঘটনা

ইসলামে নারীর মর্যাদা

খুতুবাতে যুলফিকার

[প্রথম খণ্ড]

ইসলাম ও দাম্পত্যজীবন

'একথা শতভাগ সঠিক ও বাস্তব যে, যেখানে বিবাহ থাকবে না, সেখানে ব্যভিচার থাকবে। তাই শরীয়ত বিবাহের গুরুত্ব পরিষ্কার করে দিয়েছে। আজ যে সমাজ বিবাহকে উপেক্ষা করে, দেখুন, সেখানে যৌনপ্রশান্তির নামে বেহায়াপনা-বেলেল্লাপনার পর্দা উন্মোচিত। মানুষের জীবন গুনাহ দ্বারা অপবিত্র হোক ইসলাম তা কখনোই পছন্দ করে না। তাই ইসলাম বলে দিয়েছে, তোমরা বিবাহ করো; তাহলে নিজেদের পবিত্র রাখা সহজ হবে। বিবাহের বিধান না দিলে পুরুষ নারীকে খেলনা মনে করত। নারীর কোনো অবস্থান থাকত না। থাকত না কেউ তার দায়িত্বভার গ্রহণের। শরীয়ত বলেছে, তোমরা যদি সমষ্টিগতভাবে জীবন যাপন করতে চাও, তাহলে নারীর দায়িত্বের বোঝাও তোমাদের বহন করতে হবে।'



ইসলাম ও দাম্পত্যজীবন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ:

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ -

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

বিভিন্ন সমাজে নারীর মর্যাদা

'দাম্পত্যজীবন' শিরোনামে আলোচনা করতে গেলে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতা ও বিভিন্ন সমাজে নারীর অবস্থান কী। ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামের পূর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নারীরা তাদের মৌলিক অধিকার থেকে একেবারেই বঞ্চিত ছিল। ফ্রান্সে নারীদের ব্যাপারে ধারণা ছিল, তারা আধা মানুষ। ফলে তারাই সমাজের সকল দুঃখ-দুর্দশার কারণ। চীনে মনে করা হতো, নারীদের মাঝে শয়তানী আত্মা রয়েছে, যদ্দরুন তারা মানুষকে অন্যায় ও অপকর্মের প্রতি আহ্বান জানায়। জাপানে ধারণা করা হতো, নারীদের অপবিত্র করে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই তাদের উপাসনালয় থেকে দূরে রাখা হতো।

হিন্দুধর্মে কোনো নারীর স্বামী মারা গেলে তাকে আর সমাজে বসবাসের উপযুক্ত জ্ঞান করা হতো না। এজন্য স্বামীর লাশের সাথে স্ত্রীকে (একই চিতায়) জীবন্ত পুড়ে মরা আবশ্যক ছিল। কেউ এমন না করলে সমাজে তাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো না। খ্রিষ্টজগতে নারীকে আল্লাহর পরিচয়ের পথে অন্তরায় বলে ভাবা হতো এবং নারীদের কুমারী (nuns) জীবনযাপনের শিক্ষা দেওয়া হতো। কেননা, পুরুষেরা বৈরাগ্যের জীবনকে সম্মানিত মনে করত। আরব ভূখণ্ডে কন্যা সন্তানের জন্মকেই লজ্জাজনক ব্যাপার বলে গণ্য করা হতো। ফলে পিতামাতা-ই নিজহাতে কন্যাকে জীবিত কবর দিত। নারীর

অধিকার এতই পদদলিত করা হতো যে, কেউ মারা গেলে তার অন্যান্য ত্যাজ্য সম্পত্তির মতো স্ত্রীদেরও তার সন্তানদের মাঝে স্ত্রী হিসেবে বণ্টন করে দেওয়া হতো।

কারও স্বামী মারা গেলে তাকে মক্কার বাইরে একটা অন্ধকার কুঠুরিতে দু-বছরের জন্য রেখে দেওয়া হতো। পবিত্রতার জন্য পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদিও ঠিকভাবে দেয়া হতো না। দু-বছর এ যাতনা ভোগ করে বেঁচে থাকলে মুখ কৃষ্ণ বর্ণ করে মক্কায় ফিরিয়ে আনা হতো। তারপর তাকে ঘরে থাকার অনুমতি দেয়া হতো। এখন ভাবুন, স্বামী মারা গেল স্বীয় ভাগ্যের ফলে, তাতে স্ত্রীর অপরাধ কোথায়? কিন্তু এ নির্যাতিতারা এতই অসহায় ছিল যে, নিজের ব্যাপারে কোনো টু-শব্দটি করতে পারত না।

যখন চতুর্দিকে এভাবে নারীর অধিকার পদদলিত হচ্ছিল, ঠিক এমনি এক পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাঁর হাবীব মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়াতে পাঠালেন। নবীজি দুনিয়ায় তাশরীফ এনে নারীর অবস্থান পরিষ্কার করে দিলেন। ঘোষণা দিলেন, হে মানুষেরা! যদি সে কন্যা হয়, তাহলে তোমার সম্মান, যদি বোন হয়, তাহলে তোমার ইজ্জত, যদি স্ত্রী হয় তাহলে তোমার জীবনসাথী আর মা হলে তার পদতলে রয়েছে তোমার জান্নাত।[১]

ইসলামে নারীর অবস্থান

সম্মানিত শ্রোতৃমণ্ডলী!

সেই মানুষগুলো কতইনা পাষাণ ছিল, যারা তাদের আপন কন্যাকে জীবিত দাফন করতে গিয়ে কন্যাদের আর্তধ্বনি কানে পৌঁছা সত্ত্বেও মন গলাতে পারেনি! এমনি পরিস্থিতিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে বললেন, যে ঘরে দুটি কন্যা থাকে আর তাদের ভালোভাবে লালনপালন করে বিবাহ দেয়, তারা আমার সাথে জান্নাতে হাতের এই দুই আঙ্গুলের মতো কাছাকাছি অবস্থান করবে।[২]

দাম্পত্যজীবনের গুরুত্ব

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীর খোয়ানো সম্মান ফিরিয়ে দিলেন এবং বলে দিলেন :

---

১. ছহীহ বোখারি : হাদীছ নং ৩২০৪

২. তিরমিযি : হাদীছ নং ১৯১৪

لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ

'ইসলামে কোনো বৈরাগ্য নেই।'[১]

বরং দুটি শব্দে পরিষ্কার করে দিলেন, যদি তোমরা নারীর সাথে বৈবাহিক জীবন যাপন কর, তাহলে তারা আল্লাহর পরিচয়ের পথে তোমাদের সহযোগী হবে। ইসলাম স্পষ্ট করে দিয়েছে, বৈরাগী সেজে বন-জঙ্গল আর গুহায় যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহর দিকে যাওয়া পথটি বন-জঙ্গল আর গুহা হয়ে যায়নি; বরং এসব অলিগলি, পাড়া-মহল্লা ও হাট-বাজার হয়েই তা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছেছে। অর্থাৎ– তোমরা এ সমাজেই থাকবে এবং তোমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালন করবে; তাহলেই আল্লাহর পরিচয় পেয়ে যাবে। ইসলাম বৈরাগ্যের পরিবর্তে সামাজিক জীবনের সবক দিল। নবীজি ইরশাদ করেছেন :

اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ

'বিবাহ আমার সুন্নাতের অংশ।'[২]

তারপর বললেন :

فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

'যে আমার সুন্নতের ওপর আমল করবে না, সে আমার উম্মত নয়।'[৩]

বলুন, বিবাহের গুরুত্ব পরিষ্কার করতে এর চেয়ে বেশি ও জোরালো ভূমিকা আর কী হতে পারে?

নবীগণের সুন্নাতসমূহ

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে, চারটি জিনিস নবীগণের সুন্নাত–

১. الحياء লজ্জা। অর্থাৎ– সকল নবীই লজ্জাশীল ছিলেন।

২. التعطر, আতর/সুগন্ধি ব্যবহার। অর্থাৎ– সকল নবীই সুগন্ধি ব্যবহার করতেন।

---

১. কাশফুল খাফা : হাদীছ নং ৩১৫৪

২. ইবনে মাজা : হাদীছ নং ১৮৩৬

৩. ইবনে মাজা : হাদীছ নং ১৮৩৬

৩. السواك, মিসওয়াক। সকল নবীই মিসওয়াক করতেন।

৪. النكاح, বিবাহ। সকল নবীই বৈবাহিক জীবন যাপন করেছেন।[১]

কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

'হে নবী! আমি আপনার পূর্বে যত নবী প্রেরণ করেছি, তাদের সকলের জন্যই স্ত্রী ও সন্তানসন্ততির ব্যবস্থা করেছি।'[২]

এ কথা সূর্যের চেয়েও স্পষ্ট যে, নবীগণ দীনি দাওয়াতের মহা পবিত্র দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে প্রেরিত হয়েছেন। তাঁরা সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে মিলিয়ে দিতেন। কিন্তু সন্তানসন্ততি ও স্ত্রী সে পথে বাধা হতো না। যেন একথাই পাকাপোক্ত (Establish) করে দেয়া হলো যে, বৈবাহিক জীবন থেকে সরে দাঁড়ানো মূলত সামাজিক দায়িত্ব পালন হতে পলায়ন।

বিবাহ ঈমানের অর্ধেক

হাদীছে আছে, নবীজি বলেছেন :

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيْمَانِ . فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِيْ

'যেলোক বিবাহ করল, সে ঈমানের অর্ধেক পূরণ করে নিল। এবার যেন সে বাকি অর্ধেকে আল্লাহকে ভয় করে চলে।'[৩]

একজন কুমার যতই নেককার হোক-না কেন, সে ঈমানের পূর্ণতার স্তরে পৌছতে পারে না। বৈবাহিক জীবনে পদার্পণ করে দায়িত্ব পালন না করা পর্যন্ত ঈমান পরিপূর্ণ হয় না। এজন্যই যে যুবকের বিবাহ হয়নি, হাদীছের ভাষায় তাকে মিসকিন বলা হয়েছে। আর যে যুবতীর বিবাহ হয়নি, তাকে বলা হয়েছে মিসকীনাহ, যেন এরা অনুগ্রহের পাত্র। কারণ, এরা জীবনের এ অংশে বৈবাহিক জীবন যাপন থেকে বঞ্চিত রয়েছে।

---

১. তিরমিযি : হাদীছ নং ১০৮০

২. সূরা রা'দ : আয়াত ৩৮

৩. আল-মু'জামুল আওসাত : হাদীছ নং ৭৮৬২

পাঁচটি ওসিয়ত বা অন্তিম উপদেশ

হযরত আলী (রাযি..) বলতেন, আমাকে আমার মাহবুব খাতামুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচটি কাজ দ্রুত সম্পাদনের উপদেশ দিয়েছেন।

১. عَجِّلُوا بِالصَّلٰوةِ قَبْلَ الْفَوْتِ

সময় চলে যাওয়ার আগেই নামায আদায় করে নাও

২. عَجِّلُوا بِالتَّوْبَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ

মৃত্যুর আগেই দ্রুত তাওবা করে নাও।

৩. কোনো মানুষ মারা গেলে তার কাফন-দাফন দ্রুত সেরে নাও।

৪. মাথার ওপর ঋণের বোঝা থাকলে তা দ্রুত পরিশোধ করে দাও।

৫. ছেলেমেয়ের উপযুক্ত আত্মীয়তা মিলে গেলে দ্রুত তাদের বিবাহ সম্পাদন করো।[১]

ভাগ্যবান মানুষ

কারো ভালো জীবনসাথী মিলে গেলে সে ভাগ্যবান। কথাটি নিঃসন্দেহে সঠিক। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলতেন, কেউ পাঁচটি জিনিস পেয়ে গেলে সে যেন নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে। জিনিসগুলো এই–

১. কৃতজ্ঞ জবান। এটি আল্লাহর বিরাট এক নেয়ামত। বর্তমানে বেশিরভাগ মানুষের অবস্থা হলো, আল্লাহর নেয়ামত খেতে-খেতে দাঁত পড়ে যায়; তবুও শুকরিয়া আদায়ের জন্য জিহ্বা নড়ে না। প্রবাদ আছে 'যার খাও, তার গাও'।

আমাদের উচিৎ সর্বদা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা।

২. যিকিরকারী অন্তর। অর্থাৎ– যে অন্তরে আল্লাহর স্মরণ থাকে, সেই অন্তর বড় একটি নেয়ামত।

৩. পরিশ্রমী শরীর। কথায় বলে 'সুস্থ দেহেই সুস্থ বিবেক থাকে'।

৪. স্বদেশের রুজি। প্রবাদ আছে :

---

১. সিলসিলাতুল আহাদীছিশ শরীফ : ৭৪; নাসিরুদ্দীন আলবানির মতে সনদের দিক থেকে হাদীছটি মওজু হলেও মর্ম সঠিক

وطن کی آدھی پردیس کی ساری پھر بھی برابر نہیں ہوتی

'নিজদেশের আধা, ভিন দেশের পুরা। তবুও সমান হয় না।'

৫. নেককার স্ত্রী -বন্ধু। স্ত্রী -বন্ধু যদি নেককার হয়, তাহলে জীবনের মজা দ্বিগুণ হয়ে যায়। কারো এ পাঁচটি জিনিস নসীব হলে সে যেন মনে করে, আল্লাহ আমাকে পৃথিবীর সব নেয়ামতই দান করেছেন।[১]

বিবাহের গুরুত্ব

একথা শতভাগ সঠিক ও বাস্তব যে, যেখানে বিবাহ থাকবে না, সেখানে ব্যভিচার থাকবে। তাই শরীয়ত বিবাহের গুরুত্ব পরিষ্কার করে দিয়েছে। আজ যে সমাজ বিবাহকে উপেক্ষা করে, দেখুন, সেখানে যৌনপ্রশান্তির নামে বেহায়াপনা-বেলেল্লাপনার পর্দা উন্মোচিত। মানুষের জীবন গুনাহ দ্বারা অপবিত্র হোক ইসলাম তা কখনোই পছন্দ করে না। তাই ইসলাম বলে দিয়েছে, তোমরা বিবাহ করো; তাহলে নিজেদের পবিত্র রাখা সহজ হবে। বিবাহের বিধান না দিলে পুরুষ নারীকে খেলনা মনে করত। নারীর কোনো অবস্থান থাকত না। থাকতো না কেউ তার দায়িত্বভার গ্রহণের। শরীয়ত বলেছে, তোমরা যদি সমষ্টিগতভাবে জীবন যাপন করতে চাও, তাহলে নারীর দায়িত্বের বোঝাও তোমাদের বহন করতে হবে।

মহরের গুরুত্ব

বিবাহ একটি সন্ধি, যা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্পাদিত হয়। এ সন্ধিতে নারী কোনো শর্ত আরোপ করতে চাইলে শরীয়ত তাকে সেই সুযোগ দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সে বলবে, থাকার জন্য আমাকে ভালো ঘর দিতে হবে, মাসিক খরচ এত দিতে হবে। সে বলবে, আমাকে তালাকের ক্ষমতা প্রদান করলেই কেবল আমি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হব। বিবাহের পূর্বে শর্ত আরোপ করার সম্পূর্ণ অধিকার শরীয়ত তাকে দিয়েছে। কিন্তু বিবাহ যখন হয়ে গেল আর তালাকের ক্ষমতা স্বামীর হাতেই থেকে গেল অথবা স্বামী নিজ ইচ্ছানুযায়ী ভরণপোষণ দিল, এখন আল্লাহর বান্দীর কান্নাকাটি করেইবা আর লাভ কী? শরীয়ত তো বিবাহকে একটি চুক্তি বলে আখ্যায়িত করেছে; অথচ এর গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের খবরই নেই।

---

১. বায়হাকি : হাদীছ নং ৭১৭

বর্তমানে মেয়েপক্ষ তাদের সাধুতার দরুন ধ্বংস হচ্ছে। মহর লেখানোর সময় হলে কেউ ৫০০ আবার কেউ তো ৫০ (পঞ্চাশ) হলে যথেষ্ট বলে দিচ্ছে। হে আল্লাহর বান্দারা! ৫০ (পঞ্চাশ) যথেষ্ট নয়। কারণ, এটি একটি মেয়ের জীবনের লেনদেন। একে দোষ মনে করো না। যদি তোমরা মনে কর, কোনো বিষয় বিবাহের পূর্বেই নিষ্পত্তি করা ভালো, তাহলে শরীয়ত তো তোমাদের তার অনুমতি দিয়েই রেখেছে। ছেলেপক্ষ তো মনে করবে, মেয়েপক্ষ মহর না লেখালেই ভালো। কেন? এ ক্ষেত্রে দায়িত্ব হলো– ভালো করে শুনুন, অন্তরের কান দিয়ে শুনুন। মহরের ব্যাপারে তিনটি সুন্নাত রয়েছে। প্রত্যেকে আপন-আপন অবস্থান অনুপাতে এ তিনটির যেকোনো একটির ওপর আমল করা চাই।

১. مهر فاطمی হযরত ফাতেমা (রাযি.)-এর মহর। তারপর হযরত আয়েশা (রাযি.)কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মহর পরিশোধ করেছেন, তা নির্ধারণ করাও সুন্নাত।

২. مهر مثل (ন্যায্য মহর) মেয়ের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া মেয়েদের সাধারণত যে মহর ধার্য করা হয়, সেই পরিমাণ মহর নির্ধারণ করাও সুন্নাত।

৩. মেয়ের জ্ঞান, বুদ্ধি ও মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি রেখে মহর নির্ধারণ করা। এটিও সুন্নাত।

শরীয়ত তিনটি অপশন দিয়েছে। এর যেকোনো একটি বেছে নিলেই সুন্নতের ছাওয়াব পাওয়া যাবে। বিবাহের সময় মহর নির্ধারণ করতে গিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়, মহর معجل (নগদ) হবে, না مؤجل (বাকি)? معجل শব্দটি عجلت থেকে নির্গত, যার অর্থ দ্রুততা, তীব্রতা। معجل এর অর্থ হলো নগদ বা দ্রুত আদায় করা, যা স্বামী-স্ত্রী একত্র হওয়ার আগেই আদায় করা জরুরি। অনাদায়ে স্বামী গোনাহগার (পাপী) হবে।

মহরের দ্বিতীয় প্রকার হলো মহরে مؤجل (বাকি)। অর্থাৎ– স্ত্রীর যখন ইচ্ছা স্বামীর কাছ থেকে চেয়ে নিতে পারে। মহর মাফ করে দিতে স্ত্রীর ওপর চাপ প্রয়োগ করা স্বামীর জন্য শোভনীয় নয়। হ্যাঁ, স্ত্রী স্বেচ্ছায় মহর ফেরত দিলে কুরআনে কারীমের ভাষায় সে অর্থে বরকত হয়। আল্লাহ বলছেন :

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ○

'যদি তারা খুশিমনে মহরের কিয়দংশ ছেড়ে দেয়, তাহলে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করো।'[১]

হযরত আলী (রাযি.) এমন অর্থ দিয়ে মধু কিনে পানিতে মিশিয়ে রোগীদের পান করাতেন।

বিবাহের প্রচার

শরীয়ত বিবাহকে প্রচার ও প্রসার করার নির্দেশ দিয়েছে।

أَفْشُوا النِّكَاحَ

'তোমরা বিবাহকে প্রচার করো।'[২]

সুন্নাত হলো জুমার দিন জুমার নামাযের সমাগমে বিবাহ করা এবং আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের আমন্ত্রণ জানানো, যেন সকলেই জেনে যায়, আজকের পর থেকে এই ছেলে এবং মেয়ে তাদের নতুন ঘরের ভিত্তি স্থাপন করছে:

বিবাহিত ব্যক্তির বিনিময় বেশি

মানুষ যখন বিবাহিত হয়, তখন আল্লাহ তার ইবাদতের বিনিময় বাড়িয়ে দেন। সুবহানাল্লাহ! ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, মানুষ যখন বিবাহ করে ফেলে, দাম্পত্যজীবনে পদার্পণ করে, তখন সে এক ওয়াক্ত নামায আদায় করলে আল্লাহ তাকে ২১ (একুশ) ওয়াক্ত নামাযের ছাওয়াব দান করেন।

এমনটি কেন হলো? এজন্য যে, মানুষ তো আগে থেকেই حقوق الله (আল্লাহর হক) আদায় করে আসছিল। এখন সে বান্দার হক আদায় করার পাশাপাশি আল্লাহর হক আদায় করবে। বোঝা গেল, বিবাহের পর ইবাদতের ছাওয়াব বেড়ে যায়। মানুষ যখন বিবাহ করে, তখন ছেলেপক্ষ মেয়ের কতিপয় গুণের প্রতি লক্ষ করে। আবার মেয়েপক্ষও ছেলের কতিপয় গুণের প্রতি নজর দেয়। আসুন, এবার আমরা সে সম্পর্কে আলোচনা করি।

---

১. সূরা নিসা : আয়াত ৪

২. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ৪৫৬২৬

ভালো স্ত্রী কে?

হাদীছে এসেছে, ইমাম বোখারী (রহ.) হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন-

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

'নারীকে চারটি বিষয় বিবেচনায় রেখে বিবাহ করা হয়। প্রথমত সম্পদের কারণে। অর্থাৎ- কোনো ধনাঢ্য পরিবার হলে মানুষ বিবাহের প্রস্তাব পাঠায়। দ্বিতীয়ত তার বংশমর্যাদার কারণে। মানে উচুঁ বংশের কারণে বিবাহ করে। তৃতীয় কারণ তার সৌন্দর্য। চতুর্থ কারণ তার দীনদারি। দীনদারির ভিত্তিতে মেয়েদের বিবাহ করা হয়। নবীজি বলেন, আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা দীনদারির ভিত্তিতে আত্মীয়তা তালাশ করো।'[১]

ভিত্তি নড়বড়ে হলে জীবন চলবে কীভাবে? কেবল সৌন্দর্য দেখল! বলুন তো চেহারার রূপ-লাবণ্য কদিন থাকে? এটা তো মাত্র কয়েক বছরের সম্পদ। যৌবন চিরকাল থাকে না। ভিত্তি যদি দুর্বল হয়, তার ওপর নির্মিত ঘরও দুর্বল হবে।

কবির ভাষায়-

جو شاخ نازک پر آشیانہ بنے گا ناپائدار ہوگا

'দুর্বল ডালে তৈরী বাসা অস্থায়ীই হবে।'

পক্ষান্তরে দীনদারি ও ভদ্রতা এমন জিনিস, যা সময়ের সাথে-সাথে বাড়তে থাকে। কাজেই এই ভিত্তির ওপর যে ঘর নির্মিত হবে, তা দিন-দিন মজবুত ও দৃঢ় হতে থাকবে। কাজেই দীনদারির ভিত্তিতে স্ত্রী অনুসন্ধান করো। কেননা, সুন্দরী নারীর স্বামী যখন তার প্রতি তাকায়, তখন তার চোখ জুড়ায়। সচ্চরিত্রবান নারীর স্বামী যখনই তার প্রতি নজর করে, তখন তার মন জুড়িয়ে যায়। সুতরাং চোখকে সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে মনকে সন্তুষ্ট করো।

মুসলিম শরীফের হাদীছ-

اَلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

'দুনিয়াটা হলো সম্পদ। আর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ নেককার নারী।'[২]

---

১. ছহীহ বোখারি : হাদীছ নং ৪৭০০

২. ছহীহ মুসলিম : হাদীছ নং ২৬৬৮

আল্লাহ যাকে নেককার স্ত্রী দান করেছেন, সে যেন মনে করে, আল্লাহ আমাকে দুনিয়ার অনেক বড় নেয়ামত দান করেছেন। নবীজি বলেছেন :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

'আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।'[১]

নিয়ত যদি ভালো হয়, তাহলে ঝগড়া সৃষ্টি হবে না। সৌন্দর্য মুখ্য হলে বিবাদ দেখা দিবে। শুধু বংশমর্যাদার কারণে বিবাহ করলে তাতেও কলহ দেখা দিবে। তাই শরীয়ত শিক্ষা দিয়েছে, বিবাহের উদ্দেশ্য হবে শুধুই পবিত্র জীবন যাপন করা। আর এ উদ্দেশ্যটি যখন সামনে থাকবে, তখন পরিবার সুখময় হবে, সমৃদ্ধ হবে।

ইবনে মাজাহ শরীফের বর্ণনা–

مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللّٰهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

'আল্লাহর তাকওয়ার পর মানুষ যে জিনিস দ্বারা সর্বাধিক উপকৃত হয়, তাহলো নেককার স্ত্রী। যদি সে তাকে কোনো আদেশ করে, তাহলে তার আনুগত্য করে। যখন তার পানে তাকায়, তার মন জুড়িয়ে যায়। যদি এমন কোনো পরিস্থিতি হয় যে স্বামী তার ব্যাপারে শপথ করে যে তার স্ত্রী তা পূর্ণ করবে, তাহলে সে তা পূর্ণ করে। যদি কোনো প্রয়োজনে সাময়িক সময়ের জন্য স্বামী তার স্ত্রী হতে দূরে চলে যায়, তাহলে সে তার ইজ্জত, সম্ভ্রম ও স্বামীর মালে কোনো খেয়ানত করে না।'[২]

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারী

একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারী কে এ নিয়ে আলোচনা উঠল। অনেকেই অনেক গুণের কথা বলতে লাগলেন। আলোচনা চলছে। ইত্যবসরে হযরত আলী (রাযি.) ঘরে এসে হাজির হলেন। ফাতেমা (রাযি.)কে বললেন, মজলিসে আলোচনা চলছে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারী কে? তবে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। হযরত ফাতেমা (রাযি.) বললেন, আমি কি বলব, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারী কে? তিনি বললেন,

---

১. ছহীহ বোখারি : হাদীছ নং ১

২. ইবনে মাজা : হাদীছ নং ১৮৪৭

বলো, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারী কে? তিনি বললেন, যে নারী না নিজে কোনো পরপুরুষের দিকে তাকায়, না কোনো পরপুরুষ তাকে দেখতে পায়, সে-ই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারী। হযরত আলী (রাযি.) মজলিসে ফিরে এসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্ত্রী শ্রেষ্ঠ নারীর সংজ্ঞা দিয়েছে, যে নারী না নিজে কোনো পরপুরুষের দিকে তাকায়, না কোনো পরপুরুষ তাকে দেখতে পায়। নবীজি বললেন :

فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِّنِّي

'ফাতেমা আমারই একটি টুকরা।'[১]

ভালো স্ত্রীর গুণাবলি

আল্লাহওয়ালাগণ লিখেছেন, স্ত্রীর মধ্যে চারটি গুণ থাকা অপরিহার্য। প্রথমটি হলো, তার চেহারায় লজ্জা থাকা। তাহলে তার অন্তরও লজ্জায় ভরপুর থাকবে। প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে, 'চেহারা হলো মানুষের অন্তরের আয়না।' (Face is the index of mind) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর বাণী 'পুরুষদের জন্যও লজ্জা ভালো। তবে মহিলাদের জন্য বেশি ভালো।'

দ্বিতীয় গুণটি হলো ভাষা মিষ্টি হওয়া। অর্থাৎ– যখন কথা বলে, তখন কানে তার ভাষার মধুরতা বর্ষিত হয়। এমন না হলে তো সর্বদা স্বামীকে হিংসাত্মক কথা-বার্তা শোনাতে থাকবে অথবা বাচ্চাদের কথায়-কথায় ধমক দিতে থাকবে।

তৃতীয় গুণটি হলো তার মনোভাব ভালো হবে।

চতুর্থ গুণটি হলো তার হাত সর্বদা কাজে ব্যাপৃত থাকবে। যে নারীর মাঝে এই গুণগুলো বিদ্যমান থাকবে, নিঃসন্দেহে সে শ্রেষ্ঠ স্ত্রী হিসেবে জীবন যাপন করতে সক্ষম হবে।

ভালো স্বামীর গুণাবলি

আসুন, এবার কুরআন-হাদীছের আলোকে স্বামীর গুণাবলি অনুসন্ধান করি। একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, কেউ যদি তার মেয়ের জন্য পাত্র অনুসন্ধান করে, তাহলে তার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন থেকে পাওয়া দুটি উপমাই যথেষ্ট। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় কন্যার জন্য কেমন জামাই নির্বাচন

---

১. ছহীহ বোখারি : হাদীছ নং ৩৪৩৭

করেছেন। একটি উপমা হলেন হযরত আলী (রাযি.), যিনি নবীজির নিকটাত্মীয় ছিলেন। সৌর্যে-বীর্যে ছিলেন অদ্বিতীয়। মহান আল্লাহ তাঁকে সিংহের মতো সাহসী আত্মা দান করেছিলেন। কঠোর পরিশ্রমী ও দায়িত্ববোধসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন জ্ঞানের কূলহীন অতল সাগর। বোঝা গেল, আপন কন্যার জন্য আত্মীয়তা তালাশের ক্ষেত্রে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো উপমা হতে পারে না। দ্বিতীয় উপমা হলেন হযরত ওসমান (রাযি.), যাঁর বড়মাপের ব্যাবসা ছিল। সমাজে সম্মানজনক অবস্থান ছিল। ইসলাম গ্রহণের আগ থেকেই সমাজের সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত ছিলেন। অত্যন্ত নম্র স্বভাবের ছিলেন। এতই লজ্জাশীল ছিলেন যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, ওসমান গনীকে তো আল্লাহর ফেরেশতারাও লজ্জা করেন। মেয়ের জন্য পাত্র অনুসন্ধান বিষয়ে আল্লাহর নবী আমাদের সামনে এমন দুটি উপমা পেশ করেছেন, যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো উপমা পৃথিবীতে আর কোথাও মিলতে পারে না। স্বামীর গুণাবলির মধ্যে বড় একটি গুণ হলো সহনশীলতা। কেননা, সেই হলো পরিবারের মহাপরিচালক। কোনো প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক যদি কথায়-কথায় বিগড়ে যায়, তাহলে সেই প্রতিষ্ঠান তো একটা গোলযোগকেন্দ্রে পরিণত হবে।

এজন্যই বলা হয়েছে :

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

'পুরুষদের জন্য নারীদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।'[১]

অর্থাৎ– আল্লাহ তাদের পরিবারের মহাপরিচালক বানিয়েছেন। পুরুষ হলো রাজা আর মহিলা হলো রানী। তাই সহনশীলতা পুরুষের জন্য একান্ত অপরিহার্য। আপনারা হয়ত দেখে থাকবেন, সহনশীলতা না থাকলে সাধারণ ব্যাপারেও ভর্ৎসনা করা হয়। ছোট-খাট ব্যাপারে – যেমন খাবারে লবণ কম হলো কেন? রুটি গরম না হয়ে ঠান্ডা হলো কেন? অমুক কাজ এমন হলো কেন? স্ত্রী বেচারী সংসারের কাজ-কর্ম করতে-করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেও কখনো মুখ থেকে প্রশংসাবাক্য বের হয় না, সমালোচনার বিষয় এসে গেলে সেখানে স্ত্রীর কোনো গুণের কথা থাকে না। যেসব পুরুষের মাঝে সহনশীলতা নেই, তাদের জীবনতরি কোথাও না কোথাও গিয়ে থেমে যায়। যেনতেন ব্যাপার নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মনকষাকষি হলে স্বামী তখন ঝটপট করে তালাক, তালাক বুলি ছুড়ে মারে।

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ২২৮

গত বছরের কথা। আমি তখন সুইডেনে। সেখানে এক পরিবারে তালাকের ঘটনা ঘটল। তার কারণ ছিল, স্বামী রান্নাঘরের বেসিনে এসে ব্রাশ করত আর স্ত্রী তাকে এই বলে বারণ করত যে, বাথরুমে যখন বেসিন আছে, সেখানেই ব্রাশ করুন। স্বামী বলল, না আমি এখানেই করব। একে কেন্দ্র করেই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে তালাক হয়ে গেল! যে কেউ শুনে অবাক হলো। খুবই হাস্যকর বিষয় হয়ে দাঁড়াল। হায়! যদি তারা দুজনে জ্ঞান খরচ করে কাজ করত! কবির ভাষায়-

پار اترنے کے لئے تو خیر بالکل چاہئے ☆ بیچ دریا ڈوبنا ہو تو بھی ایک پل چاہئے

কূলে নামতে হলে তো কোনো কথা-ই নেই
মাঝদরিয়ায় ডুবতে হলেও সাঁকোর অপরিহার্য তাই।

সহনশীলতা না থাকলে মানুষের জীবনযাত্রা কখনোই সফল হতে পারে না। পরিবারের সকলে একত্রে থাকায় আপসে ঝগড়াঝাঁটি হতেই পারে। ছেলেমেয়েরা কখনো মায়ের অবাধ্য হতে পারে। আবার মা-ও কখনো পাগলামী করে বসতে পারে। সমস্যা তো দেখা দিবেই। একজন সহনশীল পুরুষই কেবল এসব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারে।

পুরুষের দ্বিতীয় বৃহৎ গুণ

পরিবারের দায়িত্ব পালনে অলস ও ফাঁকিবাজ না হওয়া। আমাদের জন্য এর চেয়ে বড় আর কী দৃষ্টান্ত হতে পারে যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী হয়েও ঘরের কাজ করতেন। হযরত মূসা (আ.) নবী থাকাকালে সফরে স্ত্রীর প্রসববেদনা শুরু হলে স্ত্রীকে বললেন :

বসো; আমি এক্ষুনি তোমার জন্য আগুন খুঁজে আনছি।

قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ۝٢٩

‘সে তার পরিজনকে বলল, তোমরা থাকো; আশা করি, ওখান থেকে আমি কোনো খবর নিয়ে আসব; নাহয় এক খণ্ড জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে আসব, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।’[১]

---

১. সূরা কাসাস : আয়াত ২৯

দেখুন, নবী হয়েও স্ত্রীর জন্য আগুনের অঙ্গার খুঁজে ফিরছেন। এই কাজ করা কত বড় ইবাদত যে, আল্লাহর নবীও কাজ করতেন। তাই ঘরের কোনো কাজ পুরুষের করার প্রয়োজন দেখা দিলে এড়িয়ে না যাওয়া চাই। ছোট-ছোট পাথর মিলে যেমন পাহাড় জন্ম নেয়, তেমনি ছোট-ছোট সমস্যা একত্রিত হয়েও দ্বন্দ্বের পাহাড় গড়ে ওঠে। দুটি অন্তরের মাঝে বাধার প্রাচীর দাঁড়িয়ে যায়। ফলে পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। কখনো তো ৩৫ বছরের দাম্পত্যজীবনেও তালাকের থাবা আক্রমণ করে বসে। পুরুষ যদি চায়, স্ত্রী আমাদের সেবা-যত্নে মনোনিবেশ করুক, তাহলে পুরুষকেও স্ত্রীর প্রয়োজনাদি পূরণ করতে হবে। এই সমতার ভারসাম্য তখনই বজায় থাকবে, স্বামী-স্ত্রী যখন আপন-আপন দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে। শরীয়ত উভয়ের মাঝে একটি মানদণ্ড স্থাপন করে দিয়েছে। স্বামীর কর্তব্য হলো, স্ত্রীর হক আদায় করা আর স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীর হক আদায় করা। এভাবেই তারা শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারবে। আর এটাই হলো দাম্পত্যজীবনের লক্ষ্য। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

وَ مِنْ اٰیٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَیْهَا وَ جَعَلَ بَیْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۲۱﴾

'আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য স্ত্রীর ব্যবস্থা করেছেন, যেন তোমরা তাদের কাছে গিয়ে প্রশান্তি লাভ করতে পার।' এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য রয়েছে অনেক নিদর্শন।'[১]

কুরআন মজীদ দ্বারাই একথা প্রমাণিত হলো, দাম্পত্যজীবনের মূল লক্ষ্যই হলো প্রীতি-ভালোবাসার সাথে থাকা এবং শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করা। ভেবে দেখুন, আমরাই যখন শান্তির পালক উড়িয়ে দেব, তখন দাম্পত্যজীবন সফল কীভাবে হবে? যে জীবনে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের শান্তি থাকে, সেই জীবনই ভালো ও সফল জীবন। যদি দুজনের কারুরই শান্তি ভাগ্যে না জোটে, তাহলে বলা যায়, জীবন সফল নয়। আল্লাহর কী অপার মাহাত্ম্য যে, আজ এমন প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে যে, এমন স্বামী হয়ত পাওয়া যাবে না, যে দিনে একবারও স্ত্রীর ব্যাপারে দুর্ভাগ্যের অভিযোগ করে না। এমন স্ত্রী হয়ত মিলানো যাবে না, যে দিনে একবারও স্বামীকে অভিশাপ দেয় না। এসব আমাদের মূর্খতা ও আমলহীনতার ফল। আমরা আসল

১. সূরা রূম : আয়াত ২১

উদ্দেশ্য ভুলে বসেছি। আমরা ছোট-ছোট বিষয় নিয়ে আপসে ঝগড়া-বিবাদে লেগে যাই। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বিষয়কে আমরা জটিল সমস্যায় পরিণত করি। এটা ভুল। আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ।

দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে চমৎকার ধারণা

পবিত্র কুরআন স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে যে চমৎকার ধারণা দিয়েছে, পৃথিবীর অন্য কোনো সমাজব্যবস্থা আজও পর্যন্ত তা পেশ করতে পারেনি। পবিত্র কুরআন স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে বলেছে :

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

'তারা তোমাদের পোশাক আর তোমরা তাদের পোশাক।'[১]

পোশাকের সাথে তুলনা করার মাঝে দুটি রহস্য আছে। একটি হলো, পোশাক দ্বারা মানুষের সৌন্দর্য লাভ হয় এবং দোষ-ত্রুটি ঢেকে যায়। দ্বিতীয়টি হলো, পোশাক মানুষের শরীরের সবচেয়ে বেশি নিকটে থাকে। এখানে স্ত্রীকে স্বামীর পোশাক আর স্বামীকে স্ত্রীর পোশাক আখ্যায়িত করা হয়েছে যে, তোমরা দুজন একে অপরের এতটা কাছের, যতটা নিকটে হয় মানুষের পোশাক।

এবার বলুন, নৈকট্য বোঝাতে এর চেয়ে চমৎকার ধারণা আর অন্য কেউ দিতে পারে? আল্লাহু আকবার! আল্লাহ মা হাওয়া (আ.) কে হযরত আদম (আ.)-এর পাঁজড়ের হাড় দ্বারা সৃষ্টি করেছেন কেন? মাথার অংশ দ্বারা এজন্য সৃষ্টি করেননি, যেন মাথার ওপর না বসাও। পায়ের অংশ দ্বারাও সৃষ্টি করেননি, যাতে একেবারে পায়ের জুতা না বানিয়ে ফেল। বরং পাঁজড়ের হাড় দ্বারা এজন্য বানিয়েছেন, যাতে জীবনসাথী জ্ঞান করে মনের অতি নিকটে স্থান দাও। পবিত্র কুরআন শুধু একথা বলেনি যে, তোমরা জীবন যাপন করো; বরং বলেছে :

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

'তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো।'[২]

মুফাসসিরগণ লিখেছেন, এটি স্ত্রীদের প্রতি আল্লাহর বড় অনুগ্রহ যে, তিনি তাদের পক্ষ থেকে পুরুষদের কাছে সুপারিশ করে দিয়েছেন, হে

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৭

২. সূরা নিসা : আয়াত ১৯

স্বামীরা! তোমাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে তোমাদের প্রতিপালকের সুপারিশের প্রতি লক্ষ্য করো। তাহলে কিয়ামত দিবসে তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন।

শ্রেষ্ঠ স্বামী কে?

হাদীছে পাকে এসেছে-

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيْ

'তোমাদের মধ্যে সে শ্রেষ্ঠ, যে তার পরিবারের কাছে শ্রেষ্ঠ। আমি আমার পরিবারের কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ।'[১]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জীবনকেই দৃষ্টান্ত বানিয়ে পেশ করেছেন যে, কারো ভালো-মন্দ অনুমান করতে হলে বন্ধুদের নিকট জিজ্ঞাসা করো না, কায়কারবার দেখো না। জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হলে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করো, সে কেমন মানুষ? যদি স্ত্রী বলে, তার আচার-আচরণ ভালো, তাহলে সে ভালো মানুষ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

'যার চরিত্র যত ভালো, মুমিনদের মাঝে সে তত বেশি পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী।'[২]

একবার নবীজির দরবারে জনৈক মহিলা এসে বলল, আমার স্বামী কথায়-কথায় রাগ করে। এমনকি আমাকে মারধরও করে। (পুরুষদের খেদমতে আরজ, এ কথাগুলো উভয় কান খুলে গভীর মনোযোগসহকারে শুনুন) স্ত্রী এসে নবীজির মজলিসে বলল, হে আল্লাহর নবী! আমার স্বামী আমাকে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ব্যাপারে ধমক দেয়। এমনকি আমাকে মারধরও করে। তখন আল্লাহর নবী ইরশাদ করলেন :

يَظِلُّ أَحَدُكُمْ يَضْرِبُ اِمْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْعَبْدِ ثُمَّ يَظِلُّ يُعَانِقُهَا وَلَا يَسْتَحْيِيْ

'তোমাদের চেহারা মলিন হোক; স্ত্রীদের তোমরা দাসের মতো মারপিট করছ আবার তারই সাথে আলিঙ্গন করছ! তোমাদের কি লজ্জা হয় না?'[৩]

---

১. আল-আহাদ ওয়াল-মাছানী : হাদীছ নং ২২২৩

২. তিরমিযি : হাদীছ নং ১০৮২

৩. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ৪৪৯৮১

এক সময় তাকে এত কাছে নিয়ে যাও আবার অন্য সময় তাকে দাসীর মতো প্রহার কর।

এ শব্দগুলো আমাদেরকে এই পয়গাম দিচ্ছে যে, স্ত্রী ঘরের চাকরানী নয়; বরং জীবনের অংশীদার। হ্যাঁ, যদি স্ত্রী কোনো কবিরা গুনাহ করে বসে আর বোঝালেও না বুঝে, তাহলে শরীয়ত শিক্ষামূলক সীমিত মারধর করার অনুমতি দিয়েছে। প্রবাদ আছে :

لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے

'লাথির ভুত কথায় মানে না।'

দুটি কথা সকলেই জানে। একটি হলো 'মহিলার মুখ নিয়ন্ত্রণে থাকে না।' অপরটি হলো 'পুরুষের হাত নিয়ন্ত্রণে থাকে না।'

নারীর ভাষা

আমার বন্ধুরা! মনে রাখবেন, মন্দভাষী নারী আপন স্বামীকে কবর পর্যন্ত পৌঁছাতে ঘোড়ার ডাকের মতো (দ্রুত) কাজ করে। যার স্ত্রী মন্দভাষী, তার জীবনে শান্তি মিলতে পারে না। নারীদের বলা হয়েছে, যেন তারা তাদের ভাষায় নম্রতা ও মধুরতা সৃষ্টি করে এবং ভালোভাবে কথা বলে। এ ব্যাপারটি এমনিতেই মীমাংসিত যে, নারী যতই মিষ্টভাষী হোক-না কেন, তার ভাষায় অল্প হলেও তিক্ততা অবশ্যই রয়েছে। কেননা, তাদের বাচনভঙ্গিই এমন। তথাপিও মহিলাদের ভাষা নম্র হওয়া উচিৎ। শরীয়ত বলে দিয়েছে, আপন স্বামীর সাথে নম্রস্বরে কথা বলবে আর যখন পরপুরুষের সাথে কথা বলার প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন কর্কশ ভাষায় বলবে, যেন অন্য কথা জিজ্ঞাসা করার সাহসই না হয়।

আধুনিক কালের আধুনিক নারীদের ব্যাপারটা একেবারেই এর ব্যতিক্রম। স্বামীর সাথে কথা বলতে গেলে যেন সারা দুনিয়ার সব তিক্ততা একত্র হয়। আর অন্য কারো সাথে কথা বলতে গেলে যেন সারা পৃথিবীর সব মিষ্টতা জড়ো হয়।

মোটকথা, এটি চূড়ান্ত বিষয় যে, তরবারি যেসব বন্ধন ছিন্ন করতে পারে না, মুখের ভাষা তা ছিন্ন করে দেয়। একথাও মনে রাখবেন, নারীর ভাষা এমন তরবারি, যা কখনও মরিচা ধরে না। কোনো-কোনো নারীর মুখের ভাষা এতই মন্দ যে, নারী না হলে তা অসহনীয় হতো। কিছু নারী তো মন্দ ভাষা

আর কুধারণার দরুন গোটা পরিবার ধ্বংস করে দেয়। শরীয়ত নির্দেশ দিয়েছে, মাহরাম পুরুষের সাথে কথা বললে নম্র ভাষায় আর গাইরে মাহরাম পুরুষের সাথে কথা বললে শক্ত ভাষায় বলো। পাশ্চাত্যের কোনো এক পণ্ডিত বলেছেন :

'নারী যদি স্বামীর সাথে সারা দিনে একবার এমন নম্র ভাষায় কথা বলে, যেমন নম্র ভাষায় বলে প্রতিবেশী পুরুষের সাথে, তাহলে পরিবার সুখময় থাকে। এমনিভাবে পুরুষ যদি সারা দিনে একবার স্ত্রীর দিকে এমন ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকায়, যেমন দৃষ্টিতে সে প্রতিবেশী নারীর দিকে তাকায়, তাহলেও পরিবার সুখময় থাকে।'

আমাদের পূর্বসূরীদের স্বভাব

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের 'নিসা' নামক একটি সূরায় নারী-পুরুষের দাম্পত্যজীবনের বিধিবিধান বর্ণনা করেছেন। সালাফে সালেহীনদের অভ্যাস ছিল, তারা বিবাহের পূর্বেই আপন কন্যাদের সূরা নিসা ও সূরা নূর-এর অনুবাদ পড়িয়ে দিতেন। আমাদের যাদের কন্যা আছে, তাদেরও উচিৎ পূর্ণ কুরআন শরীফ অনুবাদসহ পড়াতে না পারলেও কমপক্ষে সূরা নিসা ও সূরা নূর অনুবাদসহ পড়িয়ে দেওয়া, যাতে কন্যা ভালোভাবে তার দাম্পত্যজীবন যাপন করতে পারে। সালাফে সালেহীনদের কারো-কারো তো বিস্ময়কর অভ্যাস ছিল যে, কন্যার লেখাপড়া শেখার পরও বিবাহের কোনো ব্যবস্থা না হলে কন্যাকে নিজহাতে একখানা কুরআন শরীফ লিখে নেওয়ার দায়িত্ব দিতেন। (সে সময় ছাপাখানা ছিল না) ফলে মেয়েটি দৈনিক ওজুসহকারে সুন্দর হস্তাক্ষরে কুরআন শরীফ লিখতে থাকত। লেখা সম্পন্ন হয়ে গেলে সোনালি চামড়ায় বাঁধাই করে পিতা মেয়েকে তা বিবাহের উপঢৌকন হিসেবে দিতেন। পূর্বেকার যুগে এ হতো উপঢৌকন। এ যেন তার স্বামীকে পয়গাম দিত যে, আমার বাড়িতে আমার মেয়ের জীবনের যে অবসর সময়টুকু অতিবাহিত হয়েছে, তা পবিত্র কুরআন লেখার কাজে কেটেছে।

স্বামীর অধিকারসমূহ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বামীর অধিকার আলোচনা করতে গিয়ে নারীদের বলেছেন :

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

'যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সেজদা করা বৈধ হতো, তাহলে আমি নারীদের আদেশ দিতাম, তারা যেন তাদের স্বামীকে সেজদা করে।'[১]

হাদীছে এসেছে, যে নারী ফরজগুলো পূর্ণ করে এবং স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে মারা যায়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেন, যেন সে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে।[২]

পাশাপাশি একথাও বলে দিয়েছে যে, কোনো নারীর স্বামী যদি বৈধ কোনো কারণে তার ওপর অসন্তুষ্ট হয় আর সেই মহিলাও জিদ ধরে চুপচাপ বসে থাকে এবং এমতাবস্থায় স্বামীও ঘুমিয়ে যায়, তাহলে রাতভর ফেরেশতারা তার জন্য অভিশাপ করতে থাকে। কেমন যেন আল্লাহর সন্তুষ্টিকে স্বামীর সন্তুষ্টির অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়েছে।[৩]

স্বামীর আনুগত্যের ক্ষেত্রে মহিলা সাহাবিদের ঘটনাবলি বড়ই আশ্চর্যজনক

এক মহিলা সাহাবির ছেলে জন্মাল। স্বামী জিহাদে ছিলেন। যেদিন তাঁর বাড়ি আসার কথা, সেদিন ঘণ্টাকয়েক আগে ছেলেটি মারা গেল। এখন তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন, এত দিন পর স্বামী বাড়ি এসে যখন জানতে পারবেন, ছেলে মারা গেছে, তখন তিনি কতই-না দুঃখ পাবেন এবং মনে কত আক্ষেপ যে হবে হায়! যদি জীবিতাবস্থায় ছেলেকে একটু আদর দিতে পারতাম! চিন্তিত অবস্থায় তিনি বাচ্চাটিকে গোসল করিয়ে চৌকির ওপর কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখে দিলেন। কাউকে কিছু জানাননি। স্বামী বাড়ি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, সন্তান কী হয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা পুত্রসন্তান দান করেছেন। স্বামী বললেন, কোথায় ও? বললেন, সে শান্তিতে আছে।

স্বামী ভাবলেন, সে ঘুমিয়ে আছে। তাই তিনি খাওয়া-দাওয়া করলেন। রাত হয়ে গেল। দুজনে মেলামেশাও হলো। সফরের নানা কথা আলাপসালাপও হলো। কিন্তু দেখুন, এ মহিলা মা ছিলেন। তার অন্তরে কেমন একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছিল, যার নিষ্পাপ ছেলের লাশ সামনে চৌকিতে পড়ে রয়েছে! কেবল স্বামীর সন্তুষ্টির খাতিরে বুকের ওপর পাথর চেপে এ রহস্যটি লুকিয়ে রেখেছেন, যেন আমার স্বামীর অন্তর দুঃখিত না হয়। সে

---

১. তিরমিযি : হাদীছ নং ১০৭৯

২. মেশকাত : হাদীছ নং ৩২৫৪

৩. ছহীহ বোখারি : হাদীছ নং ৩২৩৭

তার সাথে খানাপিনাও করছে, হাসি-ঠাট্টাও চলছে, উভয়ে মেলামেশাও করেছে। এমনকি এভাবেই সকাল হয়ে গেল।

সকালবেলা স্বামীকে বললেন, একটি কথা বলুন তো। স্বামী বললেন, বলো কী কথা? তিনি বললেন, যদি কেউ কারো নিকট কোনো আমানত রাখে আর কিছুদিন পর তা ফেরৎ চায়, তাহলে কি তা খুশি মনে ফেরত দেওয়া উচিৎ, নাকি ভগ্নহৃদয়ে? স্বামী উত্তর দিলেন, খুশি মনে। স্ত্রী বললেন, বেশ; মহান আল্লাহ আপনাকে একটি আমানত দিয়েছিলেন এবং আপনি আসার একটু আগে আবার ফেরৎ নিয়ে গেছেন। এখন যান; সন্তুষ্টচিত্তে তাকে আল্লাহর হাওলা করে দিন। আল্লাহু আকবার!

এই মহিলা সাহাবি সদাচরণের হক আদায় করে দিয়েছেন। ভোরবেলা স্বামী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে বললেন, ওগো আল্লাহর নবী! আমার ঘরে এ ঘটনা ঘটেছে যে, আমার স্ত্রী আমার সন্তুষ্টির খাতিরে এত ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছে। নবীজি তাঁর জন্য দোআ করলেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা ওই রাতটিতে বরকত দিলেন আর মহিলা তার স্বামীর সাথে মেলামেশার দরুন গর্ভবতী হলেন। আল্লাহ তাদের আরেকটি পুত্রসন্তান দান করলেন, যে কালের হাফেযে কুরআনও হয়েছে, আবার হাফেযে হাদীছও হয়েছে।

স্ত্রীর অধিকার

আসুন এবার অনুসন্ধান করি, স্বামীর ওপর স্ত্রীর কী-কী অধিকার রয়েছে? প্রথম অধিকার হলো ভাত-কাপড়। অর্থাৎ তার খরচাদি বহন করা। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা নারীর ওপর তার নিজের ভাত-কাপড় উপার্জনের বোঝা চাপাননি। নারীর ওপর তার নিজের খরচাদির জন্য আয়-রোজগারের কোনো দায়িত্ব নেই। যদি সে কন্যা হয়, তাহলে পিতার কর্তব্য কন্যাদের খরচ বহন করা। স্ত্রী হলে স্বামীর দায়িত্ব স্ত্রীর খরচ চালিয়ে যাওয়া। মা হলে সন্তানদের কর্তব্য মায়ের যাবতীয় খরচ বহন করা। কন্যা থেকে নিয়ে মা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা নারীর ওপর কোনো প্রকার উপার্জনের দায়িত্ব অর্পণ করেননি। তাহলে স্বামীর কর্তব্য হলো স্ত্রীর ভাত-কাপড়ের দায় বহন করা। এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম মাসআলা লিখেছেন যে, স্বামীর উচিৎ স্বীয় সাধ্য মোতাবেক স্ত্রীর ব্যক্তিগত খরচ নির্ধারণ করা। তা কারো ক্ষেত্রে মাসিক পঞ্চাশ ডলার হতে পারে আবার কারো বেলায় ১০০ (একশত) ডলারও হতে পারে। আবার কেউ দশ ডলারও দিতে পারে। নির্দিষ্ট

কোনো পরিমাণ নেই। ঘরের খাবার ইত্যাদির জন্য খরচ দেওয়া তো ভিন্ন ব্যাপার। শরীয়ত বলে, তারা তোমাদের স্ত্রী। আপন ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে তোমাদের ঘর আবাদ করতে এখানে এসেছে। কাজেই তোমরা তাকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনাদির জন্য কিছু টাকা দিয়ে দাও। দেওয়ার পর জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই, সে তা কোথায় খরচ করেছে। এতেও হেকমত নিহিত রয়েছে। হতে পারে, সে ভাববে, আমার বোন গরীব; আমি তাকে দিয়ে দেব বা আমার ভাইকে কিছু সাহায্য করব। এ-ও হতে পারে, সে কোনো গরিব মহিলার দুঃখ ভাগাভাগি করে নিয়ে তৃপ্তি পাবে। অতএব, হাতখরচ দিয়ে আর জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই। সে যেখানে ইচ্ছা সেখানে খরচ করতে পারে।

স্ত্রীর অধিকারসংক্রান্ত দ্বিতীয় বিষয়টি শুনুন! ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, পুরুষ যখন কোনো মহিলাকে বিবাহ করে, তখন তার দায়িত্ব হলো স্বীয় সাধ্য মোতাবেক তাকে মাথা গোঁজার ঠাই করে দেওয়া। কথায় বলে, 'থাকার ঘর নিজেরই চাই তা কাঁচা হোক বা পাকা।' যদি অপারগ হয় আর পরিবার একান্নভুক্ত হয়–সকল সদস্য একত্রে থাকে, তাহলে তাকে একটি কামরা দিয়ে দিবে, যেখানে সে তার প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র রাখতে পারে। এমন যেন না হয়, তার কামরায় মাতাপিতা বা অন্য কারো আসবাবপত্র পড়ে থাকে। একথা বাস্তব যে, সকলেই ঘর তৈরি করার সামর্থ্য রাখে না। তারপরও যারা সক্ষম, তারা যেন বানিয়ে দেয়।

স্বামীর তৃতীয় দায়িত্বটি হলো, যেহেতু স্বামী পরিবারের কর্তা, তাই তার উচিৎ তার অধীন পরিবারের সকল সদস্যের সাথে নম্র আচরণ করা। আল্লাহর রাসূল বলেছেন :

ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

'তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া করো; তাহলে আসমানবাসীও তোমাদের ওপর দয়া করবেন।'[১]

এজন্য নবীজি বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্যের সাথে নম্র আচরণ করে, কেয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তার সাথে নম্র আচরণ করবেন। যে অন্যের অপরাধ দ্রুত ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামত দিবসে তাকেও দ্রুত ক্ষমা করে দিবেন। যে অন্যের দোষ আড়াল করে রাখবে, কেয়ামত দিবসে আল্লাহ তার দোষও পর্দাবৃত রাখবেন। ইসলামে স্ত্রীর মর্যাদা

---

১. তিরমিযি : হাদীছ নং ১৮৪

হলো জীবনসাথী বা অন্তরঙ্গ বন্ধুর– দাসী-বাঁদীর নয়। পবিত্র কুরআনে যেখানে-যেখানে স্বামী-স্ত্রীর অধিকারের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তার কোথাও-কোথাও বলা হয়েছে :

وَاتَّقُوا اللّٰهَ

'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।'[১]

এজন্য যে–

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ

'তোমরা জেনে রাখো, আল্লাহর সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ করতে হবে।'[২]

কারণ, কিছু বিষয় এমনও রয়েছে, যা লজ্জাবশত স্বামী-স্ত্রী কেউ প্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু নীরবে একে অন্যকে কষ্ট দিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলে দিলেন, এভাবে যদি একজন অপরজনকে কষ্ট দাও, তাহলে মনে রাখবে, একদিন আল্লাহর সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ করতে হবে। একজন অপরজনকে শান্তি না দিলে বিচার-দিবসে তাঁর কাছে কীভাবে জবাব দিবে?

একটি ভালো নিয়ম হলো, স্ত্রীর কোনো ভুল হয়ে গেলে ক্ষমা চেয়ে নিবে। আর স্বামীর কোনো ত্রুটি হয়ে গেলেও ক্ষমা প্রার্থনা করবে। ভুলভ্রান্তিতে ক্ষমাপ্রার্থনার মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রয়েছে। এ মুহূর্তে আমার পীর ও মুর্শিদের একটি কথা মনে পড়ে গেল। এই ব্যক্তিরা কতই-না মুখলিস (নিষ্ঠাবান) ছিলেন যে, নিজের জীবনের ঘটনাবলিকে নমুনা বানিয়ে মানুষের সামনে পেশ করতেন। তিনি বলেন, একদিন আমি অজু করছিলাম। আমার সম্মানিতা স্ত্রী অজু করানোর সময় ঠিকভাবে পানি ঢালছিলেন না। আমি তাকে একটু শক্ত ভাষায় বললাম, ঠিকভাবে অজু করাচ্ছ না কেন? আমার রাগের দরুন সে চুপ হয়ে আমার চাহিদামতোই অজু করাতে লাগল। কিন্তু আমি অজু করে রাস্তায় বের হলে মনে হলো, এইমাত্র তো আমি আল্লাহর সৃষ্টির সাথে এমন আচরণ করছি আবার এক্ষুনি গিয়ে নামায পড়াব। তাহলে আমার নামায কীভাবে কবুল হবে? অমনিই মাঝপথ থেকে ঘরে ফিরে এসে স্ত্রীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। সে আমাকে ক্ষমা করে দিল। তারপর আমি মসজিদে গিয়ে নামায পড়ালাম।

১. সূরা বাকারা : আয়াত ২২৩

২. সূরা বাকারা : আয়াত ২২৩

কবি কী চমৎকার বলেছেন!

مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھندا

پر کسے دا دل نہ ڈھادے رب ولاں وچ دہندا

'মসজিদগুলো ভেঙে দাও। মন্দিরগুলো ভেঙে দাও। ভেঙে দাও যা কিছু ভাঙার আছে। তবে কারো অন্তর ভেঙো না। কেননা, সেটি প্রভুর থাকার ঘর।'

দাম্পত্যজীবন ও প্রাচ্য সমাজ

সম্মানিত শ্রোতৃমণ্ডলী! দাম্পত্যজীবনের ব্যাপারে আমাদের প্রাচ্য সমাজ এখনও আলহামদুলিল্লাহ অনেক শান্তিময়। আমার অভিজ্ঞতা হলো, শতকরা নিরানব্বইজন মেয়ে পিত্রালয় থেকে শশুরালয়ে যাওয়ার সময় মনে ঘর বাঁধার নিয়তই থাকে। এ গৌরব কেবল প্রাচ্যের মেয়েদেরই রয়েছে। পিত্রালয় থেকে যাওয়ার সময় যেহেতু ঘর বাঁধার মানসিকতা থাকে, তাই এবার স্বামী যদি সঠিকভাবে পরিচালনা করে, তাহলে পরিবার সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। আর পরিচালনায় ভুল করলে পরিবার ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হবে। প্রাচ্যের কোনো-কোনো মেয়ে তো এমনও আছে, যাদের মাঝে জান্নাতী হুরদের গুণাবলির প্রভা পরিলক্ষিত হয়। যেমন– তারা عربا স্বামীভক্ত এবং قاصرات الطرف পরপুরুষের প্রতি আকর্ষণহীন।

এটি ইসলামের বরকত যে, আজও প্রাচ্যে এমন কতিপয় নিষ্পাপ যুবতী রয়েছে, যারা আপন ঘর হতে পা বাড়ানোর সময় তাদের অন্তরে পরপুরুষের কোনো দখল থাকে না! আবার কেউ তো এমনও আছে, যারা স্বামীর ইন্তেকালের পরও সন্তানের ভালোবাসার খাতিরে জীবন কাটিয়ে দেয়। হাদীছে পাকে এসেছে, কোনো বিধবা নারী যদি একথা ভাবে যে, আমাকে আমার সন্তানের লালন-পালনের খাতিরে বিবাহ থেকে দূরে থাকতে হবে এবং সে তা পছন্দও করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে জিহাদের ছাওয়াব দান করেন।[১]

যে নারীর স্বামী পরলোকগমন করল, তার তো বসন্তের দিন বদলে গেল। তবুও সে হৈমন্তি ফলের মৌসুমে আপন ডানাতলে ছোট-ছোট নিষ্পাপ বাচ্চাদের লুকিয়ে রেখে জীবন অতিক্রম করছে। আল্লাহু আকবার!

---

১. ছহীহ বোখারি : হাদীছ নং ৫৩৫৩

چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اسے خزاں بدلا

نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیانہ بدلا

'হে হেমন্ত! বাগানের রং যেন তুমি একেবারেই বদলে দিয়েছ। আমরা তো ফুলের ডালও ছাড়িনি, বাসাও বদলাইনি!'

মনোরম দাম্পত্যজীবন

দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখবেন যে, ভালোবাসা যেখানে হালকা হয়, দোষত্রুটি সেখানে ভারী হয়ে যায় এবং ছোটখাট পাহাড়ের সমান হয়ে যায়। এজন্য শরীয়ত নির্দেশ দিয়েছে, ভালোবাসা ও আন্তরিকতাপূর্ণ জীবন যাপন করো। সাহস বড় রাখতে হবে। ইংরেজীতে প্রবাদ আছে To Ran a bag show one Should have a big hart মানে– একটি বড় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে হলে পরিচালকের মনও বড় হতে হবে। পারিবারিক বিষয়াদি ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে। কতই-না আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে বিবাদ করে, যে তার জীবনটা স্বামীর জন্য ওয়াক্ফ করে দিয়েছে। আবার স্ত্রীও তার স্বামীর সাথে বাদানুবাদে লিপ্ত হয়। অথচ সে তার জীবনের কত বড় আসনে সমাসীন!

شنیدم کہ مردان راہ خدا دل دشمناں ہم نہ کردند تنگ

ترا کے میسر شود ایں مقام کہ با دوستاں ہست پیکار جنگ

'আমরা তো শুনেছি, আল্লাহওয়ালাগণ শত্রুর মনেও আঘাত দেননি। তোমরা এই অবস্থান কোথায় পেলে যে আপন বন্ধুদের সাথেও বাদানুবাদে লিপ্ত হচ্ছ?'

কখনো দীনি জ্ঞানের অভাবে বা অহংকারের দরুন শিক্ষিত পরিবারেও লড়াই চলতে থাকে। স্বামী-স্ত্রী একজন অপরজনের এতই বিরোধী যে, স্বামী সর্বদাই স্ত্রীর ভুল খোঁজার তালে থাকে। আবার স্ত্রীও স্বামীর ভুল ভ্রান্তি অনুসন্ধানের চেষ্টা করে। তাদের একজনের শরীর অন্যজনের কত কাছে; কিন্তু মন কত দূরে! কখনো এ ঝগড়া কোনো তৃতীয় পক্ষের কারণে হয়। আমার এ কথাটি মনে রাখবেন যে, স্বামী-স্ত্রী একজন অন্যজনের কারণে ঝগড়া করে না বরং কোনো তৃতীয় পক্ষের কারণেই ঝগড়া করে। হয়ত শ্বশুর শাশুড়ির কারণে, নয়ত বধূর পিত্রালয়ের কারো কারণে।

তাই শরীয়ত মেয়েকে বলেছে, বিবাহের পূর্বে তোমার মা ছিল একজন; এখন তোমার মাও দুজন, বাবাও দুজন। ছেলেকেও বলে দিয়েছে, তোমারও পিতা দুজন, মাতাও দুজন।

আল্লাহ তা'আলা শ্বশুর-শাশুড়িকে মাতাপিতার মর্যাদা দান করেছেন। এক্ষেত্রে একটি সেরা মূলনীতি মনে রাখবেন যে, বিবাহের পর মেয়ের উচিৎ স্বামীর পরিবারকে খুশি রাখা আর ছেলের উচিৎ মেয়ের পরিবারকে খুশি রাখা। যেখানে স্বামী-স্ত্রী এ মূলনীতিটি আপন করে নিবে, সেখানে দেখবেন, কখনো বিরোধ হবে না। কখনও একজন রাগ করলে অন্যজন ধৈর্যের মনোভাব নিয়ে কাজ করা উচিৎ। দুজন একসাথে রেগে গেলে তো অবস্থা ভীষণ বেগতিক হয়ে দাঁড়ায়। হাদীছে পাকে এসেছে, যদি কোনো স্ত্রী স্বামীর রাগের মুহূর্তে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে আইয়ূব (আ.)-এর ধৈর্যের ছাওয়াব দান করবেন। অনুরূপ কোনো পুরুষও যদি স্ত্রীর ক্রোধের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকেও হযরত আইয়ূব (আ.)-এর ধৈর্যের ফল দান করবেন। ধৈর্য ধারণ করলে যখন এত বড় বিনিময় মিলে, তাহলে তখন একটু চুপ হয়ে যান।

নেতিবাচক চিন্তা পরিহার করুন

স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই নেতিবাচক চিন্তা বর্জন করতে হবে। পাঞ্জাবিরা বলে-

بھاندے را سب کچھ بھاوے تے نہ بھاندے را کچھ ہی نہ بھاوے

'যাকে ভালো লাগে তার সব কাজই ভালো লাগে। আর যাকে মন্দ লাগে, তার সব কাজই মন্দ লাগে।'

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে নেতিবাচক মনোভাব থাকলে একজনের কথা অন্যজনের কাছে বিষতুল্য মনে হয়। একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, এক বুযুর্গের স্ত্রী হরহামেশাই তার সাথে ঝগড়া-বিবাদ করত। বুযুর্গ একদিন আল্লাহ তা'আলার নিকট দোআ করলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার হাতে এমন কোনো কারামত প্রকাশ করে দাও, যা দেখে আমার স্ত্রী আমার ভক্ত হয়ে যায়। আল্লাহর পক্ষ হতে তার ইলহাম হলো, তুমি বাতাসে উড়তে চাইলে বাতাসে ওড়ার কারামত লাভ করতে পারবে। বুযুর্গ একদা উড়তে-উড়তে নিজঘরের ওপর দিয়ে অতিক্রম করলেন। সন্ধ্যাবেলা যখন ঘরে ফিরলেন, আসামাত্রই স্ত্রী বলে উঠল 'তুমি তো নিজেকে বড় বুযুর্গ দাবি করে বেড়াও!

কিন্তু বুযুর্গ কাকে বলে আজ আমি দেখেছি। এক বুযুর্গকে দেখলাম, তিনি বাতাসে উড়ছেন। বুযুর্গ বললেন, ওহে আল্লাহর বান্দী! সে তো আমিই ছিলাম। স্ত্রী তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, ও তুমি? সেজন্যই তো আমি ভাবছিলাম, লোকটা বাঁকা হয়ে কেন উড়ছে।

দেখুন, নেতিবাচক ভাবনা কতই-না মন্দ। স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মাঝে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে। প্রতিটি কদম উঠানোর পূর্বে দেখা দরকার, রাস্তাটা কোন দিকে যায়। যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর প্রতি অনুগ্রহ করবে, নিঃসন্দেহে সে তার মন জয় করে ফেলবে। তাই জবরদস্তি করে স্ত্রীর মনজয়ের চেষ্টা না করে মমতা, অনুগ্রহ ও সদাচরণের মাধ্যমে চেষ্টা করুন। নেতিবাচক মনোভাব দাম্পত্যজীবনের জন্য বড়ই ক্ষতিকর। একটি উদাহরণের মাধ্যমে মনোভাবের ভিন্নতা বুঝে নিন। যেমন– একটা গাছে ফুলও আছে, কাঁটা ও আছে। হে শ্রোতা! তোমার কাছে খারাপ লাগছে যে, ফুলের সাথে কাঁটা কেন? আর আনন্দ লাগছে যে, কাঁটার মধ্যেও ফুল রয়েছে। এটা হলো যার-যার দৃষ্টি– কারো দৃষ্টি কাঁটার প্রতি আর কারো দৃষ্টি ফ্লের প্রতি। সত্য কথা হলো, যার-যার দৃষ্টি তার-তার পছন্দ।

মুচকি হাসিও নেক কাজ

হাদীছে বর্ণিত আছে, যখন কোনো স্ত্রী তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে এবং স্বামীও তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে, আল্লাহও উভয়কে দেখে মুচকি হাসেন। (মানে, সন্তুষ্ট হন)[১]

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই ঘরে তাশরীফ নিয়ে আসতেন, সবসময় মুচকি হাসি মুখে নিয়েই তাশরীফ আনতেন।[২]

স্বামীদের উচিৎ অফিস-আদালতের ঝগড়া-বিবাদ অফিস-আদালতে রেখে ঘরে আসার সময় হাসি মুখে ঘরে প্রবেশ করা। তাহলে সুন্নাত পালনের ছাওয়াবও হাসিল হবে, আবার স্ত্রীর পানে হাসি মুখে তাকানোরও ছাওয়াব মিলবে।

---

১. মাজমাউয যাওয়ায়িদ : হাদীছ নং ৭৪৩৮

২. ছহীহ বোখারি : হাদীছ নং ৬২৯২

A Smile

A smile is something mice to see it does not casta cent.

A smile is something all you own. It never can be spent.

A simle is well come every where it does a way with frowns.

A simle is good for every one. To ease lifes up and downs.

অর্থ.

হাসি দেখতে কিছুটা সুন্দর। এটি একটা পয়সাও খরচ করে না।

হাসি পুরোটাই তোমার নিজের, এটি ব্যয় করা যায় না।

হাসি সর্বত্রই সমাদৃত। এটি চোখের পলকেই চলে যায়।

হাসি সবার জন্যই ভালো জীবনের উত্থানে ও পতনে।

এমন যেন না হয়, স্বামী মুখে হাসি নিয়ে ঘরে আসবে আর স্ত্রী গাল ফুলিয়ে বসে থাকবে। স্বামীর হাসির জবাব স্ত্রীকে নিম্নোক্ত শব্দে দেয়া উচিৎ :

معیشت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلستاں میں

رہے تو ساتھ تو صحرا میں گلشن کا مزہ پاؤں

'তোমার সঙ্গ বিনা ফুল বাগানেও ত্রস্ত হব

সঙ্গে তুমি থাকলে মরুপ্রান্তরেও ফুল বাগানের স্বাদ পাব।'

লিখে ঝুলিয়ে রাখুন

ইংরেজীতে একটি কথা আছে। কথাটি আমার বন্ধুরা মনে রাখবেন; বরং লিখে ঘরের কোথাও ঝুলিয়ে রাখবেন। Howse is built by hands but home is built by harts কোনো বক্তা বলেছেন, বাড়ি তো হাত দ্বারা নির্মিত হয়; তবে সংসার তৈরি হয় হৃদয় দ্বারা। কতগুলো ইট একত্র হলে তো বাড়ি তৈরি হয়ে যায়; কিন্তু কতগুলো মন মিলে গেলে সংসার সমৃদ্ধ হয়।

বন্ধুরা আমার! আমরা কথাগুলো মনোযোগসহ শুনব এবং সুন্দর দাম্পত্যজীবন যাপনের চেষ্টা করব। আমরা ভিন দেশে বসে যদি ছোট-খাট ব্যাপারেও ঝগড়া করি, স্থানীয় প্রশাসনের নিকট এ সংবাদ যখন পৌছে, তখন তারা ইসলামকে নিয়ে ঠাট্টা করে। তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার প্রতি আঙুল উঠায়। কত বড় দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার যে, আমরা আমাদের হীনম্মন্যতার দরুন কাউকে ইসলামের ওপর আঙুল উঠিয়ে কথা বলার সুযোগ দেই। তাই আসুন, ঘরোয়া ছোটখাট ব্যাপার ঘরেই মীমাংসা করে নিই। এমন কোনো বিবাদ সৃষ্টি করব না, যা সমাজের কাছে

আলোচিত বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে মুসলমানদের দুর্নামের পরিবর্তে সুনামের কারণ হই। কিন্তু এমন চিন্তার মানুষ এতই কম যে, তাদের প্রদীপ নিয়ে খোঁজা প্রয়োজন।

ایک ہجوم اولاد آدم کا جدھر بھی دیکھئے

ڈھونڈیئے تو ہر طرف اللہ کے بندوں کا کال

যেদিকেই তাকাবে বনী আদমের ভিড় দেখতে পাবে। তবে তালাশ করলে চতুর্দিকেই আল্লাহর বান্দাদের চরম আকাল।

সাধারণত দেখা যায়, স্বামী-স্ত্রী যখন কাছে থাকে, তখন আপসে অনেক বিরোধ হয়। কিন্তু যদি স্বামী মারা যায়, তাহলে এই স্ত্রীই জীবনভর স্বামীকে স্মরণ করে কেঁদে বেড়াবে যে, এমন ভালো ছিল, অমন ভালো ছিল। আর স্ত্রী মারা গেলে এই স্বামীই সারা জীবন কেঁদে ফিরবে যে, মহিলাটা কতই-না ভালো ছিল, আমার প্রতি কতই-না খেয়াল রাখত।

পাঞ্জাবীদের একটি প্রবাদ আছে, 'মানুষের কদর বোঝা যায় সরে গেলে বা মরে গেলে।' আমরা কাছে থাকতেই মূল্যায়ন করব। বহুবার এমনও দেখা গেছে, স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া করে একজন অন্যজনকে তালাক দিয়ে দেয়। যখন জ্ঞান ফিরে আসে, তখন স্বামী চতুর্দিকে পাগলের মতো ঘুরে বেড়ায়। আর স্ত্রী তো আপন জায়গায় পাগল হয়ে পড়ে থাকে। তারপর আমাদের কাছে এসে বলে, মৌলভী সাহেব! এমন কোনো সুরত কি হয় না যে, আমরা পুনরায় স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘর-সংসার করতে পারি। এমন পরিস্থিতি কখনোই হতে দেয়া উচিৎ নয়। ক্ষমা, মার্জনা আর বুঝিয়েসুঝিয়ে কাজ চালিয়ে নিতে হবে। বরং একজন অসন্তুষ্ট হলে অপরজন মানিয়ে নিবে।

কবি কতই-না চমৎকার বলেছেন!

اتنے اچھے موسم میں روٹھنا نہیں اچھا

ہار جیت کی باتیں کل پہ ہم اٹھا رکھیں

'এত ভালো মৌসুমে রাগ করা ভালো নয়।

জয়-পরাজয়ের কথা আগামী কালের জন্য তুলে রাখি।

আজ আমরা বন্ধুত্ব করে নিই।'

একথাটিই অন্য কবি নতুন রঙে সাজিয়েছেন-

زندگی یوں ہی بہت کم ہے محبت کے لئے

روٹھ کر وقت گنوانے کی ضرورت کیا ہے

'ভালোবাসার জন্য জীবনের পরিধি এমনিতেই অনেক কম।
রাগ করে সময় নষ্ট করার কী প্রয়োজন?'

অসাধারণ ঘটনা

ওলামায়ে কেরাম একটি ঘটনা লিখেছেন, এক সুন্দরী রূপসী স্ত্রী ছিল, যার স্বামীর চেহারা ছিল কুৎসিত। রং ছিল কালো। সদ্ভাবে জীবন যাপন করছিল। একদিন স্বামী তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে আনন্দ প্রকাশ করল। স্ত্রী দেখে বলতে লাগল, আমরা দুজনই জান্নাতী। স্বামী বলল, তুমি কীভাবে জানতে পারলে? স্ত্রী বলল, আপনি আমাকে দেখে খুশি হয়ে শোকর আদায় করেন আর আমি আপনাকে দেখে ধৈর্যধারণ করি। শরীয়তের সিদ্ধান্ত হলো ধৈর্যশীল ব্যক্তিও জান্নাতী, শোকর জ্ঞাপনকারীও জান্নাতী।

আগে বিয়ে পরে প্রেম

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করা অমূলক হবে না। তাহলো, ইসলাম Love After Marriage (বিয়ের আগে প্রেম করার) এর অনুমতি দেয়নি। Love Marriage মানে প্রেমঘটিত বিবাহ যদি দাম্পত্যজীবনের ভিত্তি হয়, তাহলে তা হয় নড়বড়ে ও দুর্বল। এর অশুভ পরিণতি পাশ্চাত্য জগতে নিশ্চয় আপনারা দেখছেন। হতে হবে Love After Marriage মানে মাতাপিতা উকিল হয়ে ছেলের জন্য সেরা বধূ বা মেয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ জামাতা নির্বাচন করলেন। এভাবে তারা স্বামী-স্ত্রী হলো। এবার তাদের ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সাথে জীবন যাপন করতে হবে। তাদের ভালোবাসা ও আন্তরিকতা যে পরিমাণ হবে, সেই পরিমাণ বিনিময়ও পেতে থাকবে। আমার মনিব তো তাঁর এক-একটি কথায় জীবনের সোনালী নীতি বলে দিয়েছেন। আসুন, চমৎকার দাম্পত্যজীবন যাপনের জন্য আমি আমার মনিব ও সরদার নবীজির একটি আমল বাতলে দিই।

ভালোবাসাপূর্ণ জীবন

একদা নবীজি ঘরে তাশরীফ আনলেন। আঙিনায় হযরত আয়েশা (রাযি.)কে পানি পান করতে দেখলেন। দূর থেকে দেখে সেখান থেকেই বলে উঠলেন, হুমায়রা! (নবীজি হযরত আয়েশা (রাযি.)কে আদর করে হুমায়রা

বলে ডাকতেন) হযরত আয়েশা (রাযি.) বললেন, ওগো আল্লাহর নবী! কী বলবেন বলুন। নবীজি বললেন, সামান্য একটু পানি আমার জন্য রেখে দাও। তিনি একদিকে উম্মত, অপর দিকে স্ত্রী ছিলেন। নবীজি একদিক থেকে স্বামী অপর দিক থেকে নবী।আবার রাহমাতুল্লিল আলামীনও। বরকত তো নবীজির কাছ থেকে নেওয়া প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু সুবহানাল্লাহ্! ভালোবাসা এমন এক আশ্চর্য জিনিস যে, জীবনসঙ্গিনীকে পানি পান করতে দেখে দূর থেকে বলে দিচ্ছেন, একটু পানি আমার জন্য রেখে দাও। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) কিছু পানি বাঁচিয়ে রাখলেন। নবীজি কাছে এসে অবশিষ্ট পানিটুকু হাতে নিয়ে পান করতে চাইলেন। কিন্তু হঠাৎ থেমে গেলেন এবং বললেন, হুমায়রা! তুমি এই পাত্রের কোন স্থানে ঠোঁট লাগিয়ে পানি পান করেছ? হযরত আয়েশা (রাযি.) কাছে এসে জায়গাটি চিহ্নিত করে দিলেন। হাদীছে পাকে এসেছে, নবীজি পেয়ালার পার্শ্ব পরিবর্তন করে ঠিক ওই জায়গায় আপন ঠোঁট মোবারক লাগিয়ে পানি পান করলেন।[১] আল্লাহ্! আল্লাহ্!

বন্ধুরা আমার! স্বামী যদি স্ত্রীকে এ পরিমাণ ভালোবাসে, তাহলে স্ত্রীর কি মাথা খারাপ হয়েছে যে, সে স্বামীর ঘর আবাদ করবে না? বরং সে তো নিজের জীবনটা বাজি রেখে হলেও স্বামীর ঘর আবাদ করবে। সে ভালোবাসার প্রতিউত্তর ভালোবাসা দ্বারা, প্রেমের জবাব প্রেম দ্বারা, স্নেহের উত্তর স্নেহ দ্বারা, বিশ্বস্ততার জবাব বিশ্বস্ততার দ্বারা-ই দেবে। স্বামীর প্রেম অন্তরে গেঁথে নিবে।

এ হলো দাম্পত্যজীবনের চমৎকার ইসলামী ভাবনা। তাই আসুন, ঘৃণা, বৈরিতা দূর করে হৃদ্যতাপূর্ণ পবিত্র জীবনের সূচনা করি। কবি বলেছেন :

فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لئے

لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لئے

ভালোবাসার জন্য জীবনের অবসর (একেবারেই) কম। মানুষ ঘৃণার জন্য সময় পায় কোথায়? আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সুখময় দাম্পত্য জীবন যাপনের তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

---

১. ছহীহ মুসলিম : হাদীছ নং ৩০০

সাধনা উন্নতির সোপান

'জীবন যাপনের দুটি পথ আছে। নিজের দেখা ও অভিজ্ঞতার আলোকে জীবন যাপন করা। নিজস্রষ্টা ও মালিকের বিধান মোতাবেক জীবন যাপন করা। আমরা পূর্বেই বিশ্লেষণ করেছি, মানুষের জ্ঞানার্জনের মাধ্যমগুলো যেমন দুর্বল, তেমনি তার অভিজ্ঞতাও দুর্বল। যে মানুষ নিজ অভিজ্ঞতার পরিবর্তে আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের বিধানের ওপর জীবনের গোড়া পত্তন করবে, নিঃসন্দেহে সে সফল হবে। যেমন– কোনো ইঞ্জিনিয়ার কোনো যন্ত্র তৈরি করলে সে-ই বেশি জানে, যন্ত্রটা কীভাবে ভালো কাজ করবে। সাধারণত বিদেশ থেকে কোনো মেশিন আমদানী করলে তারা মেশিনের সাথে ইঞ্জিনিয়ারও পাঠিয়ে দেয় এবং একটি ছোট পুস্তিকাও দিয়ে দেয়। ইঞ্জিনিয়ার এসে মেশিনটা স্থাপন করে দেয় এবং চালু করে দেয়। তারপর স্থানীয় লোকজনকে প্রশিক্ষণ দেয়, আমার অবর্তমানে তোমরা এভাবে করলে সফল হবে এবং এতে কোনো প্রকার ব্যত্যয় করলে ব্যর্থ হবে। কোথাও আটকে গেলে নির্দেশক পুস্তিকাটি দেখে নিবে। এতে সব কিছুর সবিস্তার বিবরণ রয়েছে।'

সাধনা উন্নতির সোপান

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ﴿٣٩﴾ وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى ﴿٤٠﴾

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

মানবজীবনের লক্ষ্য

মানুষ গাছ নয় যে, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে। পাথরও নয় যে, সটান পড়ে থাকবে। সে তো সৃষ্টিকুলের সেরা। তার উচিৎ প্রভুর স্মরণে লেগে থাকা। আল্লাহ তা'আলার দাসত্ব আর স্মরণই হলো জীবনের লক্ষ্য। সুবিশাল এই সৃষ্টিজগৎ যা আমাদের সামনে বিস্তৃত রয়েছে, এসবই মানুষের জন্য বানানো। আর কেবল মানুষকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কবির ভাষায়–

نہ تو زمیں کے لئے ہے نہ آسماں کے لئے

جہاں ہے تیرے لئے تو نہیں جہاں کے لئے

'না তুমি জমিনের জন্য, না আসমানের জন্য।

পৃথিবী তোমার জন্য, নও তুমি পৃথিবীর জন্য।'

সৃষ্টিজগৎ কার জন্য?

আসমানের এই সাজ-গোজ, জমিনের এই সৌন্দর্য, সমুদ্রের গভীরতা, আকাশের উজ্জ্বল তারকারাজি, পাহাড়, তৃণভূমি, বাতাস ও মহাশূন্য সব কিছুই মানুষের জন্য। এসবের স্রষ্টা কত মহান এবং কত শ্রেষ্ঠ যে, মানুষের জন্য সুবিশাল এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

কবি বলেন :

کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے
چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے
بحر و بر شمس و قمر ماو شما کے واسطے
یہ جہاں تیرے لئے ہے تو خدا کے واسطے

'শস্য-শ্যামল, ফসলাদি তব আহারের তরে
চন্দ্র, সূর্য নক্ষ্যত্ররাজি, আলোদানের তরে।
জল, স্থল, চাঁদ, সুরুজ, আমার-তোমার তরে
এজগৎ তোমার লাগি আর তুমি খোদার তরে।'

জীবনের পথ

মানুষ পৃথিবীতে দুভাবে জীবন যাপন করতে পারে। মনচাহি জীবন আর রবচাহি জীবন। আসুন, এবার বিশ্লেষণ করে দেখা যাক, এ দুটির কোনটি ভালো। একজন মানুষ যখন মনগড়া জীবন যাপন করে, তখন সে তার নিজস্ব চিন্তাচেতনার ভিত্তিতেই তা করে থাকে। আর তার চিন্তাচেতনার কতগুলো মাধ্যম রয়েছে। যেমন– মানুষ চোখে দেখে, কানে শোনে, মুখে বলে। এ অঙ্গগুলোর মাধ্যমেই সে জ্ঞান আহরণ করে আর এ জ্ঞানের ওপরই সে তার জীবনের ভিত্তি স্থাপন করে।

মানুষের দেখা অসম্পূর্ণ

মানুষের জ্ঞানার্জনের মাধ্যমগুলোর প্রতি গভীরভাবে তাকালে আমরা সেগুলোকে অসম্পূর্ণই দেখতে পাব। যেমন– মানুষের দেখা খুবই অসম্পূর্ণ। কারণ, সে সব কিছু দেখতে পায় না। আলোতে দেখলেও অন্ধকারে দেখতে পায় না। অথচ বিড়াল অন্ধকারেও দেখে। আবার আমরা নির্দিষ্ট একটা সীমা পর্যন্ত দেখতে পাই। এর বেশি দেখি না। অথচ ঈগল কয়েক মাইল দূরেও দেখতে পায়। বাতাসে লক্ষ-কোটি ধূলি-কণা ও জীবানু রয়েছে। কিন্তু আমরা তা দেখতে পাই না। দেখলে হয়ত আমাদের জীবনযাত্রা দুষ্কর হয়ে যেত। সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ কারণেই নির্দিষ্ট একটা গণ্ডি পর্যন্ত

দেখার শক্তি দান করেছেন। তার বাইরে দেখতে পাই না। এটিই আমাদের জন্য কল্যাণকর ছিল।

বাতাসের এই অসংখ্য ধূলি-কণা খালি চোখে না দেখা গেলেও অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়। অধুনা এমন কিছু ক্যাপসুল তৈরি হয়েছে, যেগুলো খুলে টেবিলের ওপর রাখলে পাউডারের মতোই মনে হয়। কিন্তু অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাকালে অসংখ্য জীবাণু কিলবিল করতে দেখা যায়। সাধারণ দৃষ্টিতে তা পাউডার হলেও অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দৃষ্টিতে তা প্রাণময় জীবাণু। অতএব, প্রমাণিত হলো, মানুষের দেখা অসম্পূর্ণ। দেখুন, চুরির হাত থেকে রক্ষা পেতে যে এলার্ম লাগানো হয়, তার এক প্রান্তে থাকে একটি ট্রান্সমিটার অপর প্রান্তে রিসিভার। মাঝের সংযোগ কেবল আলোর রেখা। খোলা চোখে কেউ তা দেখতে পায় না। কিন্তু চোর যখন রেখাটা অতিক্রম করতে শুরু করে, অমনি এলার্ম বেজে ওঠে। আর চোর ধরা পড়ে যায়। মানুষের দৃষ্টি যে অসম্পূর্ণ তা বোঝাতে উদাহরণগুলো দেয়া হলো।

মানুষের শ্রবণশক্তি অসম্পূর্ণ

মানুষের শ্রবণ নিয়ে ভাবলে দেখা যায়, আমরা কোনো-কোনো আওয়াজ শুনতে পেলেও সকল আওয়াজ শুনতে পাই না। বর্তমান এই অত্যাধুনিক যুগেও বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে ভূমিকম্পের আভাস পেতে কুকুর ও বিড়াল পালন করা হয়। বিজ্ঞানীদের ভাষ্যমতে ভূমিকম্পের বেশ পূর্বে ভূ-পৃষ্ঠ হতে কিছু আওয়াজ নির্গত হয়, যা মানুষ অনুভব করতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য জীব-জন্তুরা উপলব্ধি করে এবং লাফালাফি শুরু করে। ফলে ভূমিকম্প আগমনের আভাস মিলে। এত মামুলি আওয়াজ যে, আমরা শুনতে পাই না; অথচ অন্য প্রাণীরা দারুণভাবে উপলব্ধি করে। মূলত আমাদের শ্রবণশক্তির জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট পরিসীমা। আর সেই গণ্ডির আওতায় কোনো আওয়াজ হলে আমরা তা শুনতে পাই। নতুবা শুনতে পাই না। এমন অনেক আওয়াজই মানুষ শুনতে পায় না। যেমন– অধুনা ইঁদুরের জন্য Electronic instru আবিষ্কৃত হয়েছে, যাকে Bye bye rat বলে। এটি মূলত একটি Sound System (শব্দ যন্ত্র), যা বৈদ্যুতিক আওয়াজ এতই সূক্ষ্মভাবে নিক্ষেপ করে যে, সাধারণ কোনো মানুষ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলে টেরই পায় না। অথচ ইঁদুরের কানে তা হাতলের প্রচণ্ড আঘাতের মতো ধ্বনিত হয়। তাই ইঁদুর নিমিষেই পালিয়ে যায়।

এবার ভেবে দেখুন, আমরা আওয়াজটি শুনতে পেলাম না; অথচ ইঁদুরের জন্য সেখানে থাকা-ই কষ্টকর হয়ে পড়ল। এমনকি সে পালাতে বাধ্য হলো।

বোঝা গেল, মানুষ যেকোনো আওয়াজ শুনতে পায় না। রেডিওর Band এর মতো Band রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রেডিওর Short ways এবং Medium ways রয়েছে। এখন আমরা যদি Short ways এ রেডিও অন করি, তাহলে তা Shart ways কে রিসিভ করে। কিন্তু Medium ways কে রিসিভ করতে পারে না। আর যদি Medium ways এ অন করি, তাহলে তা Short ways কে রিসিভ করতে পারে না। অনুরূপ আমাদের শ্রবণ-দর্শনেরও একটি Band রয়েছে। সে Band এর আওতার মধ্যেই কেবল আমরা শুনতে পাই। এর বাইরে শুনতে পাই না। বলার উদ্দেশ্য ছিল, মানুষ তার স্মৃতিতে যে জ্ঞান সঞ্চয় করে, তা তো এসব মাধ্যমেই করে থাকে। যেহেতু এ মাধ্যমগুলো দুর্বল, সেহেতু তার মধ্যে সঞ্চিত জ্ঞানও দুর্বলই হবে।

জীবন যাপনের দুটি পথ

জীবন যাপনের দুটি পথ আছে। নিজের দেখা ও অভিজ্ঞতার আলোকে জীবন যাপন করা। নিজস্রষ্টা ও মালিকের বিধান মোতাবেক জীবন যাপন করা। আমরা পূর্বেই বিশ্লেষণ করেছি, মানুষের জ্ঞানার্জনের মাধ্যমগুলো যেমন দুর্বল, তেমনি তার অভিজ্ঞতাও দুর্বল। যে মানুষ নিজ অভিজ্ঞতার পরিবর্তে আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের বিধানের ওপর জীবনের গোড়া পত্তন করবে, নিঃসন্দেহে সে সফল হবে। যেমন– কোনো ইঞ্জিনিয়ার কোনো যন্ত্র তৈরি করলে সে-ই বেশি জানে, যন্ত্রটা কীভাবে ভালো কাজ করবে। সাধারণত বিদেশ থেকে কোনো মেশিন আমদানী করলে তারা মেশিনের সাথে ইঞ্জিনিয়ারও পাঠিয়ে দেয় এবং একটি ছোট পুস্তিকাও দিয়ে দেয়। ইঞ্জিনিয়ার এসে মেশিনটা স্থাপন করে দেয় এবং চালু করে দেয়। তারপর স্থানীয় লোকজনকে প্রশিক্ষণ দেয়, আমার অবর্তমানে তোমরা এভাবে করলে সফল হবে এবং এতে কোনো প্রকার ব্যত্যয় করলে ব্যর্থ হবে। কোথাও আটকে গেলে নির্দেশক পুস্তিকাটি দেখে নিবে। এতে সব কিছুর সবিস্তার বিবরণ রয়েছে।

একজন মুসলমান এ উদাহরণটি মাথায় রাখলে স্বীয় জীবনের স্বরূপ সহজেই উপলব্ধি করতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা মানুষ নামক এই মেশিনটা তৈরি করেছেন এবং আম্বিয়া (আ.) কে পাঠিয়েছেন। সর্বশেষ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরিফ আনলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন মানুষের জন্য ইঞ্জিনিয়ার আর তাঁর ওপর নাযিল হওয়া পবিত্র কুরআন হলো মানুষের জীবন-নির্দেশিকা। তিনি এ নির্দেশনা মোতাবেক জীবন যাপন করেছেন এবং বলে দিয়েছেন, হে লোকসকল! তোমরা আমার মতো জীবন যাপন করলে সফল হবে। তারপর তিনি একথাও বলে দিয়েছেন যে, আমি আমার অবর্তমানে এই Instruction Book রেখে যাচ্ছি। তোমরা এর নির্দেশনা মোতাবেক জীবন যাপন করলে সফল হবে।

একথা বাস্তব সত্য যে, পবিত্র কুরআন হলো সকল সত্যতা ও বাস্তবতার সমষ্টি ও ভাণ্ডার। পক্ষান্তরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত হলো আমাদের জন্য আলোর সুউচ্চ মিনার।

ইল্‌মের গুরুত্ব

ইসলাম ইল্‌ম অর্জনের এতই গুরুত্ব বর্ণনা করেছে যে, আর কেউ কখনো এরূপ করেনি। ১৪০০ বছর পূর্বে যে সময় আরবের অধিবাসীরা মূর্খ ও বর্বর জাতি হিসেবে খ্যাত ছিল, তৎকালীন বিশ্বের দুটি পরাশক্তি রোম-পারস্যের সম্রাটগণ তাদের শাসন করতেও পছন্দ করতেন না। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গিভন্ তার বইয়ে লিখেছেন–

At that time arbia was the most degraded motion of the world

'সে সময় আরবজাতি বিশ্বের সবচেয়ে অপদস্থ ও নিকৃষ্ট জাতি ছিল।'

এই লোকগুলোর কাছে নবীজিকে পাঠানো হলো এবং নবীজি তাদের আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিলেন। তিনি এ মূর্খ জাতিকে ইল্‌মের ফজীলত শোনালেন। বললেন :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

'ইল্‌ম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও নারীর ওপর ফরজ।'[১]

বিজ্ঞজনেরা বলেছেন :

اُطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

'তোমরা দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইল্‌ম অন্বেষণ করো।'

ইমাম গাযযালি (রহ.) বলেন, জ্ঞানীর কলমের কালি শহীদের রক্ত অপেক্ষা অধিক মূল্যবান। এবার বলুন ইল্‌মের এত গুরুত্ব আর কেউ বলতে

---

১. ইবনে মাজা : হাদীছ নং ২২০

পারে? পাকিস্তানে ব্যাপক খ্যাতি অর্জনকারী একটি বই আছে, যার নাম A ranking of the most influential personalities of the history. (ইতিহাসে অধিক প্রভাবশালী ব্যক্তিদের শ্রেণীবিন্যাস) যার লেখক হলেন মাইকেল হার্ট, যিনি ছিলেন খ্রিষ্টান। তিনি তার ধারণা মোতাবেক ইতিহাসের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের শ্রেণীবিন্যাস করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি সর্বাগ্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম লিখেছেন। তার প্রথম বাক্যটি খুবই বিস্ময়কর। তিনি লিখেছেন–

My choaice of mohammad to lead the ranking of the most influential personalities in history will surprise some of the readers

'কোনো-কোনো পাঠক হয়ত অবাক হবেন যে, আমি মুহাম্মদে আরাবিকে ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি?' আমি সর্বাগ্রে কেন তার নাম লিখলাম? তিনি এর চমৎকার দলিল দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'পৃথিবীতে যে সকল খ্যাতনামা ব্যক্তির আগমন ঘটেছে, তাদের জীবনী অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, তারা সমকালীন কোনো সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন। নিউটন এত বড় একজন বৈজ্ঞানিক হওয়া সত্ত্বেও সমকালীন শ্রেষ্ঠ শিক্ষকমণ্ডলীর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন বলে আমরা দেখতে পাই। এমনিভাবে তাদের সকলেই সমকালীন সেরা ইউনিভার্সিটি, সেরা কলেজ, সেরা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করেছেন। গোটা সৃষ্টিজগতে কেবল একজন ব্যক্তিই এমন রয়েছেন, যিনি সারা জীবনে কখনও ছাত্র হয়ে কোনো শিক্ষকের সামনে বসেছেন বলে দেখা যায় না। এতদসত্ত্বেও তিনি বিশ্বমানবতাকে অপার জ্ঞান দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন। এ বাস্তবতাই আমাকে তাঁর নাম সর্বাগ্রে লিখতে বাধ্য করেছে।

কথাটি এতই বাস্তবসম্মত যে, তাতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। দেখুন! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে আরব সীমানার বাইরে পা রাখেননি। শৈশবে তিনি ব্যাবসার উদ্দেশ্যে গেলেও নবুওতপ্রাপ্তির পর আর কখনো আরবের বাইরে পা রাখেননি। তার নবুওতকালে তাঁর সাহাবীগণ সদা তাঁর সংশ্রবেই ছিলেন। কেউ কোনো দিন রোম ও পারস্য প্রশাসনের কাছে Management (পরিচালনা)-এর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে যাননি, (Economics) (অর্থ বিজ্ঞান)-এর প্রশিক্ষণ নিতে যাননি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানেই ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামও তাঁর পাশে ছিলেন। এরই ফলে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে এমন যোগ্যতা ও গুণাবলির

সমাহার ঘটেছে যে, কিসরা ও কায়সারের মতো দুটি পরাশক্তিকে পরাজিত করে তাদের রাজমুকুট ছিনিয়ে নিলেন, বিশ্বকে রাজত্ব শেখালেন। এসব কিছু তারা কোথা থেকে শিখলেন? এসব মূলত ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তার প্রীয় হাবীবকে শিখিয়েছিলেন আর সাহাবায়ে কেরাম সেই শিক্ষাকেই আপন আচঁলে ধারণ করেছেন।

বিস্ময়কর ঘটনা

সম্মানিত শ্রোতৃমণ্ডলী! ইল্‌মের যত গুরুত্ব নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন, নিঃসন্দেহে বলা যায়, এত গুরুত্ব আর কেউ বর্ণনা করেননি। আমি একবার একটি কোর্সে অংশ গ্রহণ করেছিলাম, যার আলোচ্য বিষয় ছিল Effective manager আমাদের প্রশিক্ষক ছিলেন ইংল্যান্ডের Mr. Borrodi যিনি বেশ কয়েকটি ইউনিভার্সিটির visiting প্রফেসর ছিলেন। ইংল্যান্ড, জার্মানি, হল্যান্ড প্রভৃতি দেশের ভার্সিটিসমূহে এত যোগ্য ও অভিজ্ঞ একজন ব্যক্তি আমাদের লেকচার দি'চ্ছিলেন। লেকচারদানের প্রাক্কালে তিনি জ্ঞানার্জন সম্পর্কেও কথা রাখলেন। একপর্যায়ে তিনি বললেন, আমাদের বিজ্ঞানীরা আজ উপলদ্ধি করেছে, মানুষ কেবল ছাত্রাবস্থায়ই পড়া-লেখা করে না বরং (Porfession) পেশায় নিয়োজিত হয়েও পড়াশোনা করে। বরং জীবনভরই করে। কথাটির উপস্থাপনভঙ্গি ছিল এমন যে, যেন এটি কোনো গবেষণামূলক কথা।

কথাটি বলা মাত্রই আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। বললাম, আমি আপনাকে আমার সর্দার রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীছ শোনাব। তিনি বললেন, ঠিক আছে; শোনাও। আমি তখন 'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইল্‌ম অর্জন কর' হাদীছটি শুনিয়ে দিলাম। বিশ্বাস করুন, তিনি তৎক্ষণাৎ তার লেকচার বন্ধ করে ব্রিফকেস থেকে ডায়েরিটা বের করে আমাকে বললেন, হাদীছটি আমাকে লিখে দাও; ভবিষ্যতে আমি আমার লেকচারে লোকদের পড়ে শোনাব এবং বলব, ১৪০০ বছর আগে মুসলমানদের নবী ইল্‌ম (জ্ঞান) অর্জনের এত গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। সুবহানাল্লাহ!

ইল্‌ম কীভাবে অর্জন হবে?

এবার আলোচনা করা যাক, ইল্‌ম কীভাবে অর্জন হবে? এর জন্য সাধনা করতে হবে।

আরবী প্রবাদ আছে–

مَنْ طَلَبَ فَقَدْ وَجَدَ

'যে খোঁজে নিঃসন্দেহে সে পায়।'

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعٰى

'আর মানুষ তা-ই পায়, যার সে চেষ্টা করে।'[১]

আমরা নিজহাতেই আমাদের জীবন গঠন করি। অথবা নিজহাতেই নিজের জীবন ধ্বংস করি। এ ব্যাপারটি চূড়ান্ত যে, সাধনা এমনই মিষ্টি যে, জীবনে তাকে যতই ঢোকাবে, জীবন ততই মধুময় হবে।

---

১. সূরা নাজ্‌ম : আয়াত ৩৯

সালাফে সালেহীনদের সাধনার ঘটনা

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর ঘটনা

সাধারণ মানুষেরা আমাদের পূর্বসূরীগণের ঘটনা শুনলে অবাক হয়ে যায়। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) মাত্র ১৩ বছর বয়সে কুরআন ও হাদীছের জ্ঞানের একটি ভান্ডার তিনি সঞ্চয় করেছিলেন এবং কুরআনের দারস (পাঠদান) শুরু করেছিলেন। এ ছিল তাঁর সাধনার কৌতূহল, যার ফলে এত অল্প বয়সেই জ্ঞানের মহাসাগরগুলো পাড়ি দিতে পেরেছিলেন।

মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের ঘটনা

মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের বয়স তখন কত ছিল? মাত্র ১৭ বছর। বর্তমানে ১৭ বছরের ১টি ছেলেকে সংসার পরিচালনার দায়িত্ব দিলে সে তাও সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে না। অথচ ১৭ বছরের এ ছেলেটি সেনাপ্রধান নিযুক্ত হলেন এবং সৈন্য নিয়ে চলছেন। কোথায়? যেখানে চলছিল রাজা দাহিরের সুশৃঙ্খল রাজত্ব। আমি সিন্ধু প্রদেশের সেই ময়দানটি দেখেছি, যে ময়দানে রাজা দাহিরের সাথে মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের লড়াই হয়েছিল। তাতে আমার দারুণ আনন্দ লাগছিল। আমি বলতে লাগলাম, এই যুবক কোথা থেকে এল তার সাথে কোনো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্যও ছিল না।

অপর দিকে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ তাকে ডেকে বলে দিয়েছিল, আমার সেনাবাহিনী বেশ কয়েকটি রণাঙ্গনে কাজ করছে। কিন্তু আমাকে সংবাদ পৌঁছানো হয়েছে, আমাদের কিছু মহিলা আসছিল। রাজা দাহিরের ডাকাতরা কাফেলাটা লুণ্ঠন করেছে। একটি মেয়ে বলছিল, আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! সুতরাং মুহাম্মদ ইবনে কাসিম গোপন সভা করে যুবকদের একত্রিত করলেন। এরা পেশাদার সৈনিক ছিল না। এরা ছিল ঈমান ও আবেগের পতাকাবাহী। অশ্বারোহী এসব যুবক একত্র হয়ে বলল, আমরা আপনার সাথে যাব। বিভিন্ন কিতাবে লিখা আছে, কথাটি মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের হৃদয়ে এমনভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে, বসে-বসে হঠাৎ চমকে উঠছিলেন আর বলছিলেন–

لَبَّيْكِ يَا أُخْتِيْ لَبَّيْكِ يَا أُخْتِيْ

'হে আমার বোন! আমি হাজির আছি। হে আমার বোন! আমি হাজির আছি।'

এই কয়েকজন যুবকের দল সেখানে পৌঁছল এবং রাজা দাহিরের লোহাপরিহিত সৈন্যদের পরাজিত করে এলাকাটা কেবল নিয়ন্ত্রণই করেনি বরং দ্বিতীয় সেনাপতির হাতে পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে নিজে সামনে অগ্রসর হলেন। সামনে চলতে-চলতে সিন্ধু থেকে মুলতান পর্যন্ত ইসলামের বিজয় পতাকা উড়াতে থাকলেন।

সফল জীবন

আজও যদি আমাদের যুবকদের বুকে এই চেতনা উজ্জীবিত হয় বন্ধুরা আমার! তাহলে পৃথিবীর কোনো শক্তি আমাদের দিকে বাঁকা চোখে তাকানোর সাহস পাবে না। আজ চেষ্টা-সাধনাকে আপন করে নেওয়ার খুবই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আরামপ্রিয় জীবন সফল জীবন নয়। চিরাচরিত নিয়মে সাধনা ও পরিশ্রেমের জীবনই সফল জীবন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.)-এর ঘটনা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.)-এর নিকট হাদীছ অধ্যয়নের মানসে এত বড় জমায়েত হতো যে, একবার গণনা করে চল্লিশ হাজার দোয়াত পাওয়া গিয়েছিল। সেসময় মাইক ছিল না; তাই তিনি হাদীছ বলার পর কিছু লোক নামাযের মুকাব্বিরের মতো উঁচু আওয়াজে তার পুনরাবৃত্তি করত, যাতে পুরো মজমায় আওয়াজ পৌঁছে যায়। এমন মুকাব্বিরের সংখ্যা ছিল ১২০০। এবার বুঝে নিন, মজমাটি কত বড় হবে? এত বড় মজমায় বসে তিনি হাদীছের দর্স দিতেন।

এক মুহাদ্দিছের ঘটনা

এক মুহাদ্দিছের জীবনীতে লেখা আছে, তিনি এত পরিমাণ কিতাব লিখেছেন যে, যদি তাঁর জন্মের দিন থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত হিসাব করা হয় এবং তাঁর লিখিত কিতাবের পৃষ্ঠা গণনা করা হয়, তাহলে প্রতিদিন দশ পৃষ্ঠা করে হয়। এটি কোনো মামুলি কাজ নয়। বার-তের বছর তো ইল্ম অর্জনেই কেটেছে। এগুলো বাদ দিলে তো দশের পরিবর্তে দিনে ২০ পৃষ্ঠা করে হবে।

আমাদের জন্য একদিনে বিশ পৃষ্ঠা বুঝে পড়াই তো মুশকিল হয়ে যায়। সেখানে নতুন করে রচনা বা সংকলনের তো প্রশ্নই ওঠে না। যারা লেখালেখির কাজ করেন, তারা বোঝেন, এক দিনে ১ পৃষ্ঠা লেখাও সহজ কাজ নয়। তাহলে এবার ভাবুন, তাঁরা কী পরিমাণ সাধনা করেছেন!

কয়েকটি ঘটনা

- ইসলামী যুগের প্রসিদ্ধ পর্যটক ইবনে মাওকিল ২৮ বছর যাবৎ ভ্রমণ করেছেন। তাই আজ তাকে صاحب المسالك الممالك والمغدر والمهالك নামে আখ্যায়িত করা হয়।

- হাফিজ আবুল কাসিম সুলায়মান ইবনে আহমাদ তিবরানী, যিনি আল-মু'জামুল কাবীর, আল মু'জামুল আওসাত হাদীছ সংগ্রহে ৩৩ বছর ভ্রমণ করেছেন।

- আবু হাতেম রাজী (রহ.) বলেছেন, তিনি ইল্মে হাদীছ অর্জনের লক্ষ্যে নয় হাজার মাইল পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেছেন।

- ইবনুল মুকরি (রহ.) কোনো একটি কিতাবের কপি সংগ্রহের জন্য পায়ে হেঁটে ৮৪০ মাইল পথ অতিক্রম করেছেন।

- হাফিজ আবু আব্দুল্লাহ ইস্পাহানি (রহ.) হাদীছ অন্বেষণ করতে ১২০ জায়গায় ভ্রমণ করেছেন।

- আরবী সাহিত্যের ইমাম, সিবওয়াইহ (রহ.) প্রথম যুগে হাম্মাদ ইবনে সালামার ছাত্র ছিলেন। উস্তাদ বললেন ليس ابا الدردا ছাত্র লিখলেন ليس ابوالدردا ভুলের দরুন উস্তাদ তাকে পাকড়াও করলেন। ফলে ইল্মে নাহু অর্জনে তিনি এমন কঠোর সাধনা করলেন যে, বর্তমানে নাহুবিদ হতে গেলে প্রত্যেক ছাত্রকে তাঁর নাম নিতে হয়।

- আল্লামা ইবনুল জাওযি (রহ.) একদা মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি আমার আঙুল দ্বারা দু-হাজার খণ্ড (কিতাব) লিখেছি। তার অসিয়ত মোতাবেক মৃত্যুর পর কলমের অবশিষ্ট টুকরাসমূহ দ্বারা পরপারের গোসলের পানি গরম করা হয়েছে।

- ইবরাহীম হার্‌বি (রহ.) ৫০ বছর পর্যন্ত আরবি ভাষা ও সাহিত্যের ইমাম সা'লাব (রহ.)-এর সকল বর্ণনা ও সাহিত্যের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

● ইমাম রাযী (রহ.) একবার বললেন :

وَاللهِ إِنِّيْ أَتَأَسَّفُ فِي الْفَوَاتِ عَنِ الْإِشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ فِيْ وَقْتِ الْأَكْلِ فَإِنَّ الْوَقْتَ وَالزَّمَانَ عَزِيْزٌ

'আল্লাহর শপথ! খানা-পিনার সময় ইল্‌মের চর্চা ছুটে যাওয়ার দরুন আমার আক্ষেপ হয়। কেননা, সময় ও কাল অতিশয় মূল্যবান সম্পদ।'

● ইমাম গায্‌যালি (রহ.)-এর تعليقات (তা'লীকাত) (যা তিনি আবু নসর ঈসমাঈল (রহ.) থেকে লিখেছিলেন) লুট হয়ে গেল। তিনি ডাকাতদলের সর্দারের নিকট তা ফেরত চাইলেন। সে হেসে উঠে বলল, হে ছেলে! তুমি ছাই পড়েছ; একটা কাগজ হারিয়ে গেল আর তুমি অন্ধ হয়ে গেলে!

তিনি তা'লীকাত পেয়ে গেলেন এবং তা মুখস্থ করতে শুরু করলেন। ইমাম গায্‌যালি তিন বছরে তার হাফেয হয়ে গেলেন।

● কুরতুবী (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে, ইমাম শাতেবি (রহ.) যখন قصيدة شاطبة পুস্তিকাটি লিখেছেন, তখন তিনি তা সাথে নিয়ে বারো হাজারবার বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করেছেন। প্রত্যেক তাওয়াফে বাইতুল্লাহকে সাতবার প্রদক্ষিণ করেছেন। তাওয়াফের দু-রাকাত ওয়াজিব নামায পড়েছেন। দোআর স্থানসমূহে পৌছলে তিনি এই দোআটি পাঠ করতেন :

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ الْعَظِيْمِ اَنْفَعَ بِهَا كُلَّ مَنْ قَرَأَهَا

' হে আল্লাহ! ও হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! ও হে সেই সত্তা, প্রকাশ্য-গোপন সবই যাঁর জানা! ও হে এই মর্যাদাবান গৃহের অধিপতি! যে-ই একে পাঠ করেছে, সে-ই এর দ্বারা উপকৃত হয়েছে।'

বিজ্ঞানীদের সাধনার ঘটনা

নিউটনের ঘটনা

পৃথিবীতে যিনি-ই প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি লাভ করেছেন, তিনি-ই সাধনা করেছেন। চাই তা দীনি ক্ষেত্রে হোক বা দুনিয়াবি ক্ষেত্রে। সাধনা তাঁকে করতেই হয়েছে। নিউটনের জীবনীতে লেখা আছে, তিনি গবেষণামূলক একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করলেন এবং সেটি রেখে বাথরুমে গেলেন। এদিকে বাতি জ্বলছিল। ইতিমধ্যে তার কুকুরটা—যার নাম ছিল টনি—ভিতরে এসে লাফ দিল। বাতিটা কাগজের ওপর পড়ে গেল। ফলে পুরোটা পাণ্ডুলিপি জ্বলে ছাই হয়ে গেল। তিনি ফিরে এসে যখন দেখলেন, তার গবেষণামূলক পাণ্ডুলিপিটি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, তখন শুধু এতটুকুই বললেন যে, টনি! তুমি আমার অনেক কাজ বাড়িয়ে দিয়েছ। তারপর তিনি আবার নতুন করে বিষয়টি লিখতে শুরু করলেন। কয়েক মাস সাধনা করে পুনরায় লিখে ফেললেন।

বাস্তবিকই যে ধন ও ধ্যান অর্জন করল, সে অনেক বড় নেয়ামত হাসিল করল।

আইনস্টাইনের ঘটনা

পৃথিবীর প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী আইনস্টাইন সম্পর্কে লিখিত আছে, তিনি যখন ছোট বেলায় স্কুলে পড়তে যেতেন, তখন টাকা-পয়সার হিসাব জানতেন না। ফলে প্রায় সময়ই কন্ডাক্টরের সাথে তার ঝগড়া বাঁধত যে, তুমি আমার কাছ থেকে এত টাকা নিয়ে এত টাকা ফেরৎ দেওয়ার কথা ছিল। পরে হিসাব করে দেখা যেত, কন্ডাক্টরের হিসাবই ঠিক ছিল। দু-চারবার এভাবে ঝগড়া হওয়ার পর কন্ডাক্টর তাকে বলল, তুমি যোগ-ভাগ করতে জান না; তাহলে কীভাবে জীবন যাপন করবে? কথাটি তার অন্তরে গেঁথে গেল। তিনি বললেন, ঠিক আছে; আমি গণিত শাস্ত্র পড়ব। এবার তিনি Mathematics এর ওপর সাধনা করতে শুরু করলেন। সাধনা করতে-করতে একদিন সেই সময়টিও এল যে, তিনি Theory of relativity মতবাদ আবিষ্কার করে পৃথিবীর বিজ্ঞানে এক বিপ্লব সৃষ্টি করেছেন। সাধনার ফল অবশ্যই পাওয়া যায় কথাটি একদম সত্য।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও ঘটনাবলি

বোর্ডে দ্বিতীয় স্থান অধিকারকারী ছাত্রের ঘটনা। এক যুবক এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ভালো নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হলো। তার পিতামাতা দুজনই বৃদ্ধ ছিলেন। পিতা অসুস্থ ও দুর্বল ছিলেন। কাজকর্ম করতে পারতেন না। ছেলেটি বলল, আমাকে কলেজে ভর্তি করিয়ে দিন। পিতা বললেন, আমরা তো রাতের খাবার নিয়েই আশঙ্কা করছি। বেটা! তুমি একটা দোকান বানাও, যাতে আমাদের খানা-পিনার ব্যবস্থা হয়। পিতা তার জন্য তিন হাজার টাকা দিয়ে বৈঠক ঘরে দোকান তৈরি করে দিলেন।

স্কুলে ১ম স্থান অধিকারকারী ছেলেটি দোকান চালাতে লাগল। ছেলেটির পড়ার খুবই আগ্রহ ছিল। তাই সে F.S.C এর বইগুলো সংগ্রহ করে নিল এবং গোপনে-গোপনে পড়তে লাগল। দোকানে অবসর সময়ে বই পড়ার কথা মাতাপিতা জানতেন না। কোনো গ্রাহক এলে সদাই দিয়ে দিত। মোটকথা, সে F.S.C এর Physics ও Mathe এর সবগুলো বই নিজে প্রাইভেট পড়ে নিল। কোথাও আটকে গেলে সে একজন প্রফেসরকে বলেছিল আমি পড়তে চাই এবং প্রাকটিক্যালও করতে চাই; আপনি আমাকে সাহায্য করবেন। প্রফেসর সাহেব বললেন, আমি তো Practical করাই। কোনো অসুবিধা নেই; এ তো আনন্দের ব্যাপার।

এবার দেখুন ছেলেটি কতখানি জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে যে, যেদিন Practical হতো, সেদিন সে দোকানের মাল আনার দিন ধার্য করত এবং পিতাকে চার দিন আগ থেকেই বলত, অমুক দিন মাল আনতে হবে। পিতা বলতেন, ভালো কথা। সেদিন ছেলেটি টাকা নিয়ে বাজারে যেত এবং একজন দীনদার ব্যক্তির নিকট তালিকাটি দিয়ে বলত, মাল বের করে রাখুন; আমি এক্ষুনি আসছি। যতক্ষণ সময়ে দোকনদার সদাই প্রস্তুত করত, ততক্ষণে ছেলেটি কলেজে গিয়ে Practical করে ফিরে আসত এবং সদাই নিয়ে বাড়ি ফিরত। পিতা বুঝতেই পারতেন না, ছেলে কি শুধু সদাই নিয়ে এসেছে, নাকি পাশাপাশি Practicalও করে এসেছে?

এভাবে পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল। সে সদাইয়ের আড়ালে পরীক্ষা দিল। F.S.C এর প্রাইভেট পরীক্ষা দিল। আপনি বিশ্বাস করুন। ছেলেটি প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে লাহোর বোর্ডে ২য় স্থান অধিকার করল। যখন পত্রিকায় সংবাদ এল, মহল্লাবাসী তার পিতাকে ধন্যবাদ জানাতে গেল। পিতা বলতে লাগলেন, আমার ছেলে তো পড়া-লেখাই করে না। সে তো দোকানদারি

করে। লোকেরা বলল, আপনার ছেলে বোর্ডে ২য় স্থান অধিকার করেছে আর পিতা বলল, আমার ছেলে তো পড়ালেখাই করে না। একপর্যায়ে লোকেরা তাকে সান্ত্বনা দিল, আসলে ব্যাপারটা ছিল এই। তারপর কয়েকজন লোক মিলে কয়েকজন সামর্থ্যবান ব্যক্তির নিকট গিয়ে অবস্থাটা তুলে ধরল এবং তাকে বলল, যদি আপনি আপনার পক্ষ থেকে প্রাইভেট বৃত্তি প্রদান করেন, তাহলে ছেলেটি পড়া-লেখা করতে পারবে এবং তার পিতামাতারও একটি ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

তারা এভাবে তার জন্য দু-তিন হাজার টাকার ব্যবস্থা করল। কিছু টাকা তার মাতাপিতাকে দিল আর বলল, আরামে খাওয়া-দাওয়া করুন এবং ছেলেকে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করিয়ে দিন, যেন সে সেখানে ইঞ্জিনিয়ারিং করতে পারে। সে লাহোর ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে গেল। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে কোর্স করল। আজ সেই ছেলেটি গাড়ি-বাড়ির মালিক হয়েছে। তার মাতাপিতাও সে বাড়িতে বাস করেন।

ঘটনাটি সত্য ও বাস্তব। ফলাফল এই দাঁড়াল যে, যখন কোনো মানুষ দৃঢ় সংকল্প করে নেয়, তখন কাজটি হয়েই যায়। যে নিজে নিজেকে সাহায্য করে, আল্লাহ তা'আলাও তাকে সাহায্য করেন।

এক মহিলা ডাক্তারের ঘটনা

আমাদের কলেজে ইসলামী বিভাগের একজন প্রফেসর ছিলেন। তার মেয়ে এসএসসি পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়ে পাস করল। মেয়েটির স্বপ্ন ছিল, সে ডাক্তার হবে। পিতা বললেন, কলেজে তো সহশিক্ষার পরিবেশ; তাই আমার মেয়ে সেখানে পড়ুক এটা আমার পছন্দ নয়। সে সময় মহিলা বিজ্ঞান কলেজ ছিল না। শুধু আর্টস কলেজ ছিল। মেয়েটি বলল, আব্বু আমি পড়তে চাই। পিতা বললেন, প্রাইভেটভাবে পড়তে পারলে পড়ে নাও। সুতরাং পিতা মেয়েকে মেডিক্যালের সব বই এনে দিলেন। তার মেয়ে প্রাইভেট পরীক্ষার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। মাঝে কোথাও কোথাও সমস্যা দেখা দিল। সে পিতাকে বলল, আব্বু আমি অমুক বিষয়টি বুঝতে পারছি না। কোনো প্রফেসরকে বলুন বিষয়টি আমাকে বুঝিয়ে দিতে। পিতা বললেন, কোনো প্রফেসর তোমাকে পড়াবেন আমি তা পছন্দ করি না। মেয়ে বলল আব্বু! আপনি আমাকে বুঝিয়ে দিন।

ইসলামী বিভাগের প্রফেসর নিজের মেয়ের কাছ থেকে মেডিক্যালের সমস্যাগুলো বুঝে নিতেন এবং কলেজে গিয়ে প্রফেসরের কাছে তার উত্তর

চাইতেন। এবার বলুন, ইসলামী বিভাগের প্রফেসর মেডিক্যালের প্রশ্ন কতটুকু বুঝবেন আর উত্তরইবা কী বুঝবেন? যাহোক কম-বেশি যা ইঙ্গিত তিনি নিয়ে আসতেন, তা মেয়েকে দিতেন আর মেয়ে তা থেকেই বুঝে নিত। এভাবে প্রস্তুতি নিয়ে মেয়েটি মেডিক্যালের প্রাইভেট পরীক্ষা দিল। ফলাফল এত ভালো করল যে, লাহোরের ফাতেমা জিন্নাহ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে গেল। কলেজটি মহিলা কলেজ ছিল। অবশেষে মেয়েটি ডাক্তার হয়ে গেল।

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ড. আব্দুস সালামের ঘটনা

আমি আপনাদের আজ এমন একটি কথা শোনাব যে নিশ্চয় এমন কথা ইতিপূর্বে আপনারা কখনও শোনেননি। একবার আমার কাছে কলেজের প্রিন্সিপালের নিকট হতে একটি পত্র এল যে, আমরা আগামী অমুক তারিখে একটি অনুষ্ঠান করব এবং আপনাকে রুল অফ অনার প্রদান করব। এই রুল অফ অনার প্রদানের জন্য আমরা বিখ্যাত বিজ্ঞানী আব্দুস সালাম খোরশেদকে দাওয়াত করেছি। (যিনি অমুসলিম হলেও পাকিস্তানের অধিবাসী ছিলেন। তাকে কানাডা থেকে দাওয়াত দিয়ে আনা হয়েছে) আমি তখন ইউনিভার্সিটি থেকে ছুটি নিয়ে কলেজে পৌঁছলাম। অনুষ্ঠানটি ছিল অনেক বড়। প্রিন্সিপাল বললেন, ছেলেটি আমার কলেজে অনেক ভালো রেকর্ড করেছে। তাই আমি তার সম্মানে যথাযথ অনুষ্ঠান করব। তিনি আব্দুস সালাম খোরশেদকে দাওয়াত দিলেন। আমি যে কলেজে পড়েছি, তিনিও ওই কলেজেই পড়েছেন।

মোটকথা, আব্দুস সালাম খোরশেদ আমাকে রুল অফ অনার প্রদান করলেন। পরে চায়ের পার্টিতে একত্রিত হয়ে আপসে কথাবার্তা হলো। আমাদের একজন প্রফেসর আব্দুস সালাম খোরশেদকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কীভাবে নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন? তিনি বললেন, আমি খুব পরিশ্রমী। প্রফেসর বললেন, সাইন্সের সব ছাত্রই তো পরিশ্রমী হয়। সকলেই পড়ুয়া এবং বইয়ের পোকা হয়। তিনি বললেন, না; তার চেয়েও বেশি পরিশ্রমী। প্রফেসর সাহেব বললেন, ড. সাহেব! সেটা কোন পরিশ্রম, যা অন্য ছাত্ররা করে না? সাইন্সের সব ছাত্রই মেধাবী এবং কঠোর পরিশ্রমী হয়; কিন্তু নোবেল পুরস্কার পায় না।

ড. সাহেব বললেন, আমার মেধা খুব বেশি নয়। তবে আমি অতি পরিশ্রমী। প্রফেসর সাহেব বললেন, নিশ্চয় আপনি অনেক মেধাবী। তিনি বললেন, আমি বলছি, আমি অতি পরিশ্রমী। তারপর তিনি একটি আশ্চর্যজনক

উদাহরণ দিলেন। ডাক্তার বললেন, আমি কেমিস্ট্রির বই পড়ে বুঝতে পারলাম না। পুনরায় পড়লাম; বুঝে এল না। তৃতীয়বার পড়লাম; বুঝতে পারলাম না। এভাবে বইটি আমি সর্বমোট ৬৩বার পড়েছি। বইটি প্রায় মুখস্থই হয়ে গিয়েছিল।

তার কথা শুনে আমরা অবাক হয়ে গেলাম যে, এমন কোনো মানুষও হতে পারে, যিনি কোনো বই বুঝে না এলে বইটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ৬৩বার পড়েন? বাস্তবই যার মধ্যে এত সাধনার বাসনা রয়েছে, সে-ই পৃথিবীর নোবেল পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তি।

আমি এ আয়াতটি পড়েছিলাম :

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ۝ وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى ۝

'আর মানুষ তা-ই পায়, যা সে মেহনত করে। আর তার কর্ম (ফল) অচীরেই দেখানো হবে।'[১]

সব ছাত্রই জীবনের প্রথম প্রান্তে রয়েছে। এ সময় আপনারা যেমন সাধনা করবেন, সমাজে সেই অবস্থানই পাবেন। আর যদি এই সোনালী সময়কে নষ্ট করে ফেলেন, তাহলে আজীবন ধোঁকায় পড়ে থাকতে হবে। এজন্য সাধনা শিরোনামে বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে কিছু কথা আপনাদের সামনে আরজ করলাম, যাতে অন্তরে একথাটি গেঁথে যায় যে, আমরা নিজের হাতে নিজেদের জীবন গড়ব। অথবা নিজের হাতে তা নষ্ট করব। কবি বলেন :

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی

یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے

'কর্মেই গড়ে জীবন, জান্নাত বল আর জাহান্নাম,
মাটির এ দেহ নয় মূলত স্বর্গ ও নরকের কারণ।'

আপনারা যেমন সাধনা করবেন, তেমন ফলই পাবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে বিপ্লবী জীবন যাপনের তাওফীক দান করুন, যেন আমরা নিজের জন্য, সমাজের জন্য, মুসলিম জাতির জন্য, গোটা বিশ্বের জন্য কাজ করে যেতে পারি।

---

১. সূরা নাজম : আয়াত ৩৯, ৪০

ভাববার বিষয়

আমাদের সত্তা দ্বারা যেন মানুষ উপকৃত হয়। তাহলে এটা আমাদের পরকালের মুক্তির উসিলা হবে। কত আশ্চর্যের কথা যে, ময়লা-আবর্জনা, মল-মূত্র শুকিয়ে গেলে গ্রাম্য লোকেরা তা জমিতে ছড়িয়ে দেয়; ফলে তা সারের কাজ করে। আমি মাঝেমধ্যে ভাবি, হে মানুষ! ভাবতেও অবাক লাগে। আমরা যাকে নাপাক ময়লা-আবর্জনা বলি, তাও কোনো জমিতে ফেললে তা জমির উপকারে আসে। আমরা যদি আমাদের সাথী-সঙ্গীরও উপকার করতে না পারি, তাহলে আমরা তো তার চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে গেলাম। আমরা জীবন যাপন তো করবই। তাহলে নিজের কল্যাণ, বন্ধুবান্ধবদের কল্যাণ, মুসলিম জাতির কল্যাণ, মানবতার কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখব। বিশ্বমানবতাকে কিছু না কিছু আমরা দিয়ে যাব।

লং পিলু চমৎকার কথা বলেছেন

Lives of great man all remindus.
We can make our life sublime.
And departing Leave behind us.
Foot prints on the sands of time.

একটা মানবজীবন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, আমরাও আমাদের জীবনকে আলোকিত করতে পারি এবং পৃথিবী থেকে যাওয়ার সময় আমরাও আমাদের পিছনে সময়ের বালিতে স্বীয় পদচিহ্ন রেখে যেতে পারি।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

তাকওয়ার কল্যাণ

'তাকওয়া একটি বিরল নেয়ামত, যা অবলম্বন করলে নেয়ামতের দরজা খুলে যায়, কল্যাণের দ্বার উন্মোচিত হয়, গুনাহ মাফ হয়ে যায়, অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয়। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে–

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ

'আর যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে।'

يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّـَٔاتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗٓ اَجْرًا

'আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ মাফ করে দেন এবং তাকে মহা বিনিময় প্রদান করেন।'

অর্থাৎ– তাকে অনেক বেশি বিনিময় দান করেন।

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا

'হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তিনি তোমাদের ফুরকান (পার্থক্যকারী শক্তি) দান করবেন।'

ফুরকান কী জিনিস? এটি একটি জ্যোতি, যা হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য করে দেয়। অর্থাৎ এমন অন্তর্দৃষ্টি দান করা হয় যে, মানুষ যখন তাকওয়া অবলম্বন করে, তখন কল্যাণ ও প্রাচুর্যের দ্বার খুলে যায়।'

তাকওয়ার কল্যাণ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِہِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰہِ اَتْقٰىكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰہَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿۱۳﴾

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

জমিনের সৌন্দর্য

আকাশের সৌন্দর্য তারকা আর জমিনের শোভা পরহেযগার বান্দা-বান্দী। জিন্দেগীর লক্ষ্য আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের বন্দেগী। জীবনের উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার স্মরণ।

কে অধিক সম্মানিত?

ইরশাদ হচ্ছে :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ

হে লোকসকল!

اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى

'আমি তোমাদের একজন নর ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি।'

অর্থাৎ– এক মাতা ও এক পিতা থেকে সৃষ্টি করেছি।

وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا

'এবং আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্র ও বংশে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার।'

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَىٰكُمْ

'নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্য হতে আল্লাহর নিকট সে অধিক সম্মানিত, যে বেশি মুত্তাকী।'[১]

কাজেই শ্বেতবর্ণ কৃষ্ণবর্ণের চেয়ে, আরবী অনারবীর চেয়ে, ধনী গরীবের চেয়ে বেশি সম্মানিত নয়। বরং

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَىٰكُمْ

'তোমাদের মধ্য থেকে আল্লাহর নিকট সে অধিক সম্মানিত, যে বেশি মুত্তাকী।'

আল্লাহর নৈকট্যের মানদণ্ড

আল্লাহর নৈকট্য বান্দার সাথে যার-যার তাকওয়া অনুপাতে। যে যত বেশি মুত্তাকী হবে, সে তত বেশি আল্লাহওয়ালা হবে। তাকওয়াকে আল্লাহর নৈকট্য নির্ণয়ের মানদণ্ড সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেউ আল্লাহর নৈকট্যের পরিমাণ নির্ণয় করতে চাইলে তাকওয়ার মাধ্যমেই করতে হবে। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ

'মুত্তাকীরা-ই হলো তাঁর (আল্লাহর) বন্ধু।'[২]

আল্লাহর অলীদের কোনো চিন্তা ও ভয় নেই

আল্লাহ বলেছেন :

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

জেনে রাখো, যারা আল্লাহর অলী হয়, তাদের ভয় নেই এবং কোনো চিন্তাও নেই।'[৩]

خوف বলে বাইরের ভয়কে আর حزن বলে ভিতরের চিন্তাকে। অর্থাৎ বাইরের কোনো ভয় এবং ভিতরের কোনো চিন্তা তাদের নেই!

---

১. সূরা হুজুরাত : আয়াত ১৩
২. সূরা আনফাল : আয়াত ৩৪
৩. সূরা ইউনুস : আয়াত ৬২

এই মর্যাদা কাদের?

আল্লাহর অলীদের। অলী কারা?

আল্লাহ্ বলেন :

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٦٣﴾

'যারা ঈমান আনে ও তাকওয়া অবলম্বন করে।'[১]

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ؕ

'তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ দুনিয়ার জীবনে এবং আখেরাতের জীবনে।'[২]

لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ؕ

'আল্লাহর সিদ্ধান্তের কোনো পরিবর্তন নেই।'[৩]

ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٤﴾

এটি মহা সফলতা।'[৪]

কাজেই মানুষের উচিৎ তাকওয়া ও পরহেযগারী অবলম্বন করত আল্লাহ তা'আলার বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া।

অলী কারা?

বেলায়াত (অলী হওয়া)-এর কতিপয় স্তর আছে। প্রত্যেক কালেমা পাঠকারী ব্যক্তি বেলায়েতের একটি অংশের অধিকারী। অলী কে? অলী আল্লাহর বন্ধু। যদি আমি বলি, আপনাদের মাঝে যারা-যারা আল্লাহর শত্রু আছেন, তারা দাঁড়িয়ে যান, তাহলে কেউই দাঁড়াবেন না। তাহলে বোঝা গেল, আমরা সকলেই আল্লাহর বন্ধু।

আলহামদুলিল্লাহ!

---

১. সূরা ইউনুস : আয়াত ৬৩
২. সূরা ইউনুস : আয়াত ৬৪
৩. সূরা ইউনুস : আয়াত ৬৪
৪. সূরা ইউনুস : আয়াত ৬৪

গাধার বেলায়াতও বিশেষ বেলায়াত

ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে একজন মানুষ বেলায়াতের সর্বনিম্ন স্তরের অধিকারী হয়। বেলায়াতের এই স্তরকে সাধারণ বেলায়াত বলে আর বিশেষ বেলায়াত লাভের জন্য তাকওয়া অবলম্বন করতে হয়। বেলায়াতের এই স্তর লাভ না করা পর্যন্ত আল্লাহর কাছে কোনো আমলই কবুল হয় না।

আল্লাহ বলেন :

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ

'নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা মুত্তাকীদের আমলই কবুল করেন।'[১]

কুরআন তাকওয়া দ্বারা সুসজ্জিত

কুরআনে হাকীমের দিকে তাকালে দেখবেন, প্রায় আয়াতের শেষেই তাকওয়ার আলোচনা রয়েছে। যেমন– কেউ প্লেট সাজালে উপরে ফল রেখে দেয়। তেমনি আল্লাহ্ তা'আলাও আপন কিতাবকে তাকওয়া দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন। কুরআনে কারীম তেলাওয়াত করতে গেলে মুত্তাকীদের আলোচনা এমনভাবে আসে, যেন শব্দটি উজ্জ্বল হয়ে আছে। কোনো-কোনো আয়াতে তো দুই-দুবার তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই বাক্যে দুবার এক কথার পুনরাবৃত্তি বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার। বর্ণনার এমন ভঙ্গি থেকে বিষয়টির গুরুত্ব ফুটে ওঠে। অপর দিকে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া কোনো মামুলি ব্যাপার নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ

'হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করে চলো।'[২]

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ①

---

১. সূরা মায়েদা : আয়াত ২৭

২. সূরা নিসা : আয়াত ১

'হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের সেই রবকে ভয় করে চলো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে আর তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গিনীকে। তারপর তাদের দুজন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন অসংখ্য পুরুষ ও নারীকে। তোমরা ভয় করে চলো সেই আল্লাহকে, যার দোহাই দিয়ে তোমরা একজন আরেকজনের কাছে প্রার্থনা কর। আর সতর্ক থাকো আত্মীয়তাবন্ধন সম্পর্কে। মনে রেখো, আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ নজরদারি রাখেন।'[১]

দেখুন, আয়াতটিতে শুরুতে একবার ও শেষে একবার তাকওয়ার কথা রয়েছে।

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝۱۸

'ও হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলো আর প্রতিজন মানুষেরই মনে এই ভাবনা থাকা দরকার যে, আগামী কালের জন্য সে আগাম কী পাঠিয়েছে। আবারও বলছি, তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলো। এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে, তোমরা যা-কিছুই করছ; আল্লাহ তার সব কিছুর খবর রাখছেন।'[২]

এখানেও একই আয়াতে দুবার তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ রয়েছে। এতে বিষয়টির গুরুত্ব অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে যায়।

তাকওয়ার কোনো সীমারেখা নেই

শরীয়ত সব জিনিসেরই সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। তবে যেখানে তাকওয়ার আলোচনা এসেছে, সেখানে এ ময়দান খোলা রাখা হয়েছে। বলে দেয়া হয়েছে :

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

'তোমরা তোমাদের সাধ্য মোতাবেক তাকওয়া অবলম্বন করো।'[৩]

---

১. সূরা নিসা : আয়াত ১

২. সূরা হাশর : আয়াত ১৮

৩. সূরা তাগাবুন : আয়াত ১৬

অন্যত্র বলা হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ

'হে মুমিনগণ! তোমরা যথাযথভাবে তাকওয়া অবলম্বন করো।'[১]

আল্লাহু আকবার!

এতে তাকওয়ার গুরুত্ব ফুটে উঠেছে।

তাকওয়ার উপকারিতা

তাকওয়া একটি বিরল নেয়ামত, যা অবলম্বন করলে নেয়ামতের দরজা খুলে যায়, কল্যাণের দ্বার উন্মোচিত হয়, গুনাহ মাফ হয়ে যায়, অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয়।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে–

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ

'আর যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে।'

يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا

'আল্লাহ্ তা'আলা তার গুনাহ্ মাফ করে দেন এবং তাকে মহা বিনিময় প্রদান করেন।'[২]

অর্থাৎ– তাকে অনেক বেশি বিনিময় দান করেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا

'হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তিনি তোমাদের ফুরকান (পার্থক্যকারী শক্তি) দান করবেন।'[৩]

ফুরকান কী জিনিস? এটি একটি জ্যোতি, যা হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য করে দেয়। অর্থাৎ এমন অন্তর্দৃষ্টি দান করা হয় যে, মানুষ যখন তাকওয়া অবলম্বন করে, তখন কল্যাণ ও প্রাচুর্যের দ্বার খুলে যায়।

আল্লাহু আকবার!

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১০২

২. সূরা তালাক : আয়াত ৫

৩. সূরা আনফাল : আয়াত ২৯

বরকত কী জিনিস?

বরকত কী জিসিন? শব্দটি ইংরেজী অভিধানে পাওয়া যাবে না। তবে এর বাস্তবতা আল্লাহওয়ালাদের জীবনে দৃষ্টিগোচর হয়। বর্তমান বিশ্ব বরকতকে স্বীকার করুক বা না করুক আমরা তা অকপটে স্বীকার করি।

দেহের খাদ্য

আল্লাহ বলেন :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرٰى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

'আর যদি জনপদবাসী ঈমান আনে ও তাকওয়া অবলম্বন করে, তাহলে অবশ্যই আমি আসমান ও জমিন হতে বরকতের দরজা খুলে দেব।'[১]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ

'তারা (আহলে কিতাবরা) যদি তাওরাত ও ইনজীলকে এবং তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের কাছে যা-কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে প্রতিষ্ঠিত করত, তা হলে তারা খেতে পারত তাদের ওপর থেকে এবং তাদের পায়ের নিচ থেকে।'[২]

মুফাসসিরগণ বলেছেন, মানুষ দুটি জিনিসের সমষ্টি। একটি হলো দেহ, অপরটি রূহ বা আত্মা। দেহ মাটি থেকে সৃষ্টি হয়েছে। যেমন– আল্লাহ বলেছেন مِنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ অর্থাৎ দেহ মাটির তৈরী। আর তার প্রয়োজনীয় আসবাবও মাটি থেকে বের হয়। যেমন– পানি মাটি থেকে বের হয়। গম মাটি থেকে বের হয়। পোশাকের উপকরণাদি মাটি থেকে বের হয়। ঘরবাড়ি মাটি থেকে উৎপন্ন জিনিস দ্বারা তৈরি হয়। মানুষের অন্যান্য প্রয়োজনও মাটি থেকে উৎপন্ন সামগ্রী দ্বারা পূরণ হয়। ফলও মাটির উৎপাদিত বস্তু।

মোটকথা সব কিছুই মাটি থেকে উৎপন্ন হয়। আল্লাহু আকবার! দেহ মাটির তৈরী। তাই দেহের প্রয়োজনাদিও মাটিতেই রেখেছেন। যেন এখান থেকেই পূরণ হতে থাকে।

---

১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ৯৬

২. সূরা মায়েদা : আয়াত ৬৬

রূহের খাদ্য

মানুষের রূহ عالم امر (নির্দেশ জগৎ) থেকে আসা জিনিস।

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ۭ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ

'তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন, রূহ আমার প্রভুর নির্দেশ।'[১]

রূহ যেহেতু নির্দেশজগৎ থেকে এসেছে, সেহেতু ঊর্ধ্বজগৎ থেকে আগত জ্যোতিমালা ও কল্যাণাদি হবে তার প্রয়োজনীয় উপকরণ। ফলাফল এই দাঁড়াল যে, ঊর্ধ্ব জগৎ হতে আগত জ্যোতিমালা ও কল্যাণাদি রূহের খাদ্য। আর মাটি থেকে নির্গত উৎপাদনসমূহ দেহের খাদ্য। তাকওয়া এমন নেয়ামত যে, আল্লাহ তা'আলা রিযিকের দরজা উন্মুক্ত করে দেন। ইরশাদ করেন :

لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ۚ

'সাবা গোত্রের আবাসসমূহে রয়েছে নিদর্শন।'

جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّ شِمَالٍ ۬

'ডানে ও বামে দুটি উদ্যান।'

كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ۭ

'তোমাদের প্রভুর দেওয়া রিযিক ভক্ষণ করো এবং তাঁর শোকর আদায় করো।'

بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ

'পবিত্র নগরী ও ক্ষমাশীল প্রভু।'[২]

আল্লাহ তা'আলা তো বলছেন, খাও আর শোকর করো। যার খাও তার গাও। তাকওয়া অবলম্বন করলে আল্লাহ রুটিও দিবেন, গোস্তও দিবেন, গাড়িও দিবেন, বসন্ত কালও দিবেন। মোটকথা, সব ধরনের নেয়ামতই দান করবেন। পক্ষান্তরে মানুষ যখন নেয়ামতের নাশোকরি করে, তখন আল্লাহ তা'আলা আপন নেয়ামতরাজিকে আটকে রাখেন।

---

১. সূরা বানী ইসরাঈল : আয়াত ৮৫

২. সূরা সাবা : আয়াত ১৫

ইরশাদ করেন :

لَئِنۡ شَكَرۡتُمۡ لَاَزِيۡدَنَّكُمۡ وَلَئِنۡ كَفَرۡتُمۡ اِنَّ عَذَابِىۡ لَشَدِيۡدٌ ۝

'যদি তোমরা আমার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় কর, আমি অবশ্যই আমার নেয়ামত বৃদ্ধি করে দেব। আর যদি নাশোকরি কর, তাহলে আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।'[১]

এক জাতি আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামতের নাশোকরি করেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের আলোচনা করেছেন :

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرۡيَةً كَانَتۡ اٰمِنَةً مُّطۡمَئِنَّةً يَّاۡتِيۡهَا رِزۡقُهَا رَغَدًا مِّنۡ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتۡ بِاَنۡعُمِ اللّٰهِ ۝

'আর আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন এমন এক জনপদের, যা ছিল নিরাপদ প্রশান্তিকর। চতুর্দিক থেকে তাদের রিযিক প্রশস্তভাবে আসত। তারপর তারা আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামতরাজির নাশোকরি করল।'[২]

দুটি শব্দ কেন বললেন? امن বলে বহিরাগত শত্রুর ভয় না থাকাকে। আর اطمينان বলে ভেতরগত চিন্তামুক্ত হওয়াকে। তাই বললেন, সেখানে امن (নিরাপত্তা)ও ছিল। اطمينان (প্রশান্তি)ও ছিল। ইরশাদ করেন :

فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الۡجُوۡعِ وَالۡخَوۡفِ بِمَا كَانُوۡا يَصۡنَعُوۡنَ ۝

'ফলে আল্লাহ্ তাদের ক্ষুধা ও ভয়ের পোশাক পরিয়ে দিলেন। তাদের কৃতকর্মের দরুন।'[৩]

তাহলে মানুষ যদি নাশোকরি করে, আল্লাহ্ তা'আলা নেয়ামত ছিনিয়ে নেন আর তাকওয়া অবলম্বন করলে রিযিকের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন।

وَمَنۡ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجۡعَلۡ لَّهٗ مَخۡرَجًا ۝ وَّيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُ

'আর যে আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার জন্য পথ খুলে দেন এবং তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক দান করেন।'[৪]

---

১. সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৭
২. সূরা নাহ্ল : আয়াত ১১২২
৩. সূরা নাহ্ল : আয়াত ১১২
৪. সূরা তালাক : আয়াত ২, ৩

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.) বরকতের একটি চমৎকার ঘটনা লিখেছেন। এক যুবক তার মাতাপিতার খুব খেদমত করেছে। ভাইদের বলল, জায়গা-সম্পত্তির ভাগ তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম। আমাকে মাতাপিতার খেদমতের দায়িত্ব দিয়ে দাও। সবাই রাজি হয়ে গেল। সে মাতাপিতার খেদমত করল। মাতাপিতার ইন্তেকালের পর সে স্বপ্নে দেখল, কে যেন তাকে বলছে, অমুক পাথরের নিচে তুমি ১০০ দিনার পাবে। কারণ, তুমি মাতাপিতার অনেক খেদমত করেছ। সে জিজ্ঞাসা করল, তাতে বরকত হবে? বলল, বরকত হবে না। যুবক বলল, আমি নেব না।

সকালে উঠে স্ত্রীকে বললে স্ত্রী বলল, নিঃসন্দেহে তুমি তা নেবে না। তবে গিয়ে দেখে এসো; আছে কি-না? সে বলল, আমি যখন নেব না, তখন দেখবও না।

দ্বিতীয় রাতে আবার স্বপ্ন দেখল, অমুক পাথরের নিচে দশটা দিনার আছে; এখনই নিয়ে নাও। এ তোমার খেদমতের বিনিময়। জিজ্ঞেস করল। বরকত হবে? বলল, বরকত হবে না। যুবক বলল, তাহলে ও আমার প্রয়োজন নেই।

তৃতীয় রাতে পুনরায় স্বপ্ন দেখল, অমুক পাথরের নিচে একটা দিনার পড়ে রয়েছে; এক্ষুনি নিয়ে নাও। জিজ্ঞেস করল। বরকত হবে? বলল, বরকত হবে। যুবক সকালে ঘুম থেকে উঠে সেই পাথরের নিচ থেকে একটা দিনার উঠিয়ে নিল। বাড়ি ফেরার পথে ভাবল, আজ রান্নার জন্য ভালো কিছু না নিয়ে গেলে কেমন হয়? সে একটা মাছ কিনে বাড়ি এল। স্ত্রী মাছটা কাটতেই তার পেট থেকে এমন একটা মুক্তা বের হলো, যা বিক্রয় করে তার সারা জীবনের যাবতীয় ব্যয়ের টাকা হয়ে গেল।

একেই বলে বকরত। আল্লাহ তা'আলা এমন জায়গা থেকে রিযিক দান করেন, যা মানুষ ভাবতেও পারে না।

আল্লাহওয়ালাগণ কোথা থেকে খান?

আল্লাহওয়ালাগণ কোথা থেকে নেন? কোথা থেকে খান? নবীগণ যেখান থেকে খেতেন, আল্লাহওয়ালাগণ সেখান থেকেই খান। আল্লাহওয়ালাদের হাত আল্লাহর পকেটে থাকে। কথাটি শুধু বোঝানোর জন্য বলছি। মূলত আল্লাহর কোনো পকেট নেই। আসলে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য তাঁর ভাণ্ডারের মুখ খুলে দেন।

আল্লাহ্ বলেন :

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۝ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

'আর যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তিনি তার জন্য পথ করে দেন এবং তাকে ভাবনাতীত উৎস থেকে রিযিক দান করেন।'[১]

বরকত কী?

মানুষের ইজ্জত, সম্মান, খানাপিনা, স্ত্রী, পুত্র, দুনিয়ার সুখ-শান্তি সবই রিযিকের অন্তর্ভুক্ত। এসবের কারণেই আজ আমরা পেরেশান হয়ে ঘুরে বেড়াই। আমরা দুয়ারে-দুয়ারে কেন ধরনা দিই? রিযিকের পেরেশানীর জন্যই তো। পরিবারের দুজন সদস্য চাকরি করে; তবুও সংসার চলে না। পরিবারের সবাই চাকরি করে; তারপরও সব খরচ চলে না। বলে, কী করব; ডাক্তারকে দিয়েই তো কূল পাই না। আসলে বরকত নেই। বরকত উঠে গেছে।

আশ্চর্য চ্যালেঞ্জ

বর্তমানে মানুষ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কেন হয়? এজন্য যে আলেম হলে কোথা থেকে খাবে? প্রয়োজন তো আছেই। এজন্য ডাক্তার হয়, ইঞ্জিনিয়ার হয়। আচ্ছা, আমি আপনাদের একটি প্রশ্ন করব। আপনারা কেউ জীবনে কখনও কোনো আমলদার আলেম কিংবা হাফেযকে ক্ষুৎ-পিপাসার তাড়নায় ছটফট করে মারা যেতে দেখেছেন? এমন কোনো দৃষ্টান্ত আছে কি? নেই। আমলদার কোনো আলেম ক্ষুধার তাড়নায় ছটফট করতে-করতে মৃত্যুবরণ করেছেন এমন কোনো দৃষ্টান্ত আপনারা দিতে পারবেন না। আমি এই মিম্বরে বসে দৃষ্টান্ত দিতে পারি, একব্যক্তি ইঞ্জিনিয়ারিং করেছে। অথচ ক্ষুধার তাড়নায় ছটফট করতে-করতে মৃত্যুবরণ করেছে। এবার বলুন, রিযিক দীনি বিদ্যার পথে এল, নাকি দুনিয়াবি বিদ্যার পথে এল?

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর ঘটনা

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ছাত্র জামানায় ইমাম আবুহানীফা (রহ.)-এর খেদমতে এলেন। মা তাকে পাঠিয়েছেন ধোপার কাছে গিয়ে কাপড় ধোওয়া শিখতে। পথে একজায়গায় ইমাম আবুহানীফা (রহ.)-এর খেদমতে গিয়ে

---

১. সূরা তালাক : আয়াত ২, ৩

পৌছলেন। তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তিনি তার শিষ্য হয়ে গেলেন এবং ইল্‌মের উঁচু মাকাম অর্জন করলেন। মা বললেন, তোমাকে পাঠালাম ধোপার কাছে। তোমার পিতা নেই। তুমি কোনো কাজ করবে। তাতে দু'মুঠো খাবারের ব্যবস্থা হবে।

তিনি এসে ইমাম আজম (রহ.)-এর কাছে কথাটি বললেন। উত্তরে ইমাম আজম বললেন, মাকে গিয়ে বলবে, আমি একটি কাজ শিখছি। এতে আমি বড় ধরনের আমদানির আশা করছি। তিনি গিয়ে মাকে বললেন। কথাটি মায়ের মনঃপুত হলো না। তিনি নিজে ইমাম আবুহানীফা (রহ.)-এর কাছে এলেন এবং বললেন, আমি তো ছেলেকে ধোপার কাছে পাঠিয়েছিলাম, যেন সে কোনো কাজ শিখতে পারে আর আপনি তাকে কিতাব পড়াচ্ছেন। হযরত বললেন, আমি তাকে এমন কাজ শেখাচ্ছি যে, সে পেস্তা বাদামের তৈরী ফালুদা খাবে। তার মা ভাবলেন, তিনি হয়ত সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলেছেন।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বললেন, কথা চূড়ান্ত হয়ে গেল। মা সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। পরে একটি সময় এল, যখন ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) দেশের প্রধান বিচারপতি হলেন। তিনি বলেন, তখনকার বাদশাহ হারুনুর রশীদ আমার পাশে বসা ছিলেন। বাদশাহ বলতে লাগলেন, জনাব, আমি আপনার জন্য একটি জিনিস তৈরি করেছি। প্রতিদিন পাঠিয়ে দেব। আমি খেয়ে দেখেছি; খুবই সুস্বাদু। তিনি বললেন, জিনিসটা কী? বাদশাহ বললেন, আমার জন্য মাঝেমধ্যে তৈরি হয়। কিন্তু আপনি যেহেতু জ্ঞানের উঁচু মাকাম লাভ করেছেন, তাই আপনার জন্য নিয়মিত আসবে। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বলুন জিনিসটা কী? বাদশাহ বললেন, পেস্তা বাদামের তৈরী ফালুদা। হযরত বলেন, তখন ইমাম আজম (রহ.)-এর সেই কথাটি আমার মনে পড়ে গেল। তিনি আমার মাকে বলেছিলেন, আমি তাকে এমন কাজ শেখাচ্ছি যে, সে পেস্তা বাদামের তৈরী ফালুদা খাবে।

দেখুন! আল্লাহ তা'আলা এভাবেই রিযিক দিয়ে থাকেন।

হযরত সালিম (রহ.)-এর ঘটনা

হযরত সালিম (রহ.) একজন মুহাদ্দিছ ছিলেন। গোলাম ছিলেন। তিনশত দেরহাম মূল্যে বিক্রি হয়েছেন। তারপর তিনি ইল্‌ম অর্জন করলেন। ইল্‌ম অর্জন করে এমন উঁচু স্তরে পৌছলেন যে, তৎকালীন বাদশাহও অনুমতি নিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে যেতেন। একবার বাদশাহ সাক্ষাৎ করতে গেলেন। অনুমতি চাইলেন। তিনি ইল্‌মী ব্যস্ততার দরুন অপারগতা প্রকাশ

করলেন। ফলে বাদশাহকে সাক্ষাৎ না করেই ফিরে যেতে হলো। হযরত সালিম (রহ.) মাত্র তিনশত দেরহাম মূল্যে বিক্রি হলেন। অথচ ইল্ম তাকে সম্মানের এমন উঁচু আসনে আসীন করল যে, যুগের বাদশাহও তাঁর দরজায় করাঘাত করত। সুবহানাল্লাহ! দুনিয়ার কাজে তিনি মাত্র তিনশত দেরহামে বিক্রি হলেন; কিন্তু যখন আল্লাহর সাথে সওদা করলেন, তখন মূল্য অনেক বেড়ে গেল।

جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا
تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا

'যতদিন বিক্রি হইনি, কেউ খবরও নিত না। তুমি ক্রয় করে আমাদেরকে মূল্যবান করে দিয়েছ। মাশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলার সাথে কেনাবেচা করলেন। আল্লাহ তা'আলা মূল্যবান বানিয়ে দিলেন।

یہ بازی عشق کی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا
اگر جیت گئے تو کیا کہنے گر ہار گئے تو مات نہیں

'এ বাজি প্রেমের বাজি; যে চাও ধরো বাজি; তাতে কীসের ভয়!
জিতে গেলে আর বলব কী? হেরে গেলেও নেই পরাজয়।'

যদি জিতে যায় আর ইল্মের উচুঁ স্তর লাভ করে, তাহলে কতইনা ভাগ্যবান। আর সেই স্তর যদি লাভ না হয় আর ছাত্রই থেকে যায়, তাহলেও তো সৌভাগ্য! সুবহানাল্লাহ।

রিযিক কার দায়িত্বে?

বন্ধুরা আমার! আল্লাহ তা'আলা তাকওয়ার মাধ্যমে রিযিকের দ্বার খুলে দেন। রিযিক কোথা থেকে আসে? আল্লাহ তা'আলার ভান্ডারসমূহ থেকে।

আল্লাহ বলছেন :

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ

'সব কিছুরই ভান্ডার আমার কাছে রয়েছে। আর আমি তা নির্দিষ্ট পরিমাণে নাযিল করি।'[১]

---

১. সূরা হিজ্‌র : আয়াত ২১

আল্লাহ্ বলছেন :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا

'পৃথিবীতে যত প্রাণী রয়েছে, সকলের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর।'[১]

আল্লাহ্ বলছেন :

وَكَأَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ

'অনেক প্রাণী আছে, যারা রিযিক সঞ্চয় করে রাখে না। আল্লাহ্ তাদেরও রিযিক দেন, তোমাদেরও দেন।'[২]

এক ব্যক্তি হযরত বায়জিদ বোস্তামী (রহ.)-এর কাছে এল এবং বলল, আমার সন্তানাদি অনেক। খুবই সংকটের মধ্যে আছি। অনেক চিন্তার মধ্যে আছি। তিনি বললেন, ঘরে ফিরে যাও। যার রিযিক আল্লাহ্র জিম্মায়, তাকে ঘরে থাকতে দাও। আর যার রিযিক তোমার জিম্মায়, তাকে ঘর থেকে বের করে দাও।

পরিবার পরিকল্পনা

১৯৬৫ সালে শুনতাম, পরিবার-পরিকল্পনা না করলে ১৯৭০ সালে মানুষ অনাহারে মারা যাবে। ১৯৭০ সাল যখন এল, তখন শুনলাম ১৯৮০ সাল পর্যন্ত পরিবার পরিকল্পনা না করলে মানুষ মানুষকে খেয়ে ফেলবে। ১৯৮০ সালও তো এসে গেল। এবার বলছে, ১৯৯০ সাল পর্যন্ত পরিবার পরিকল্পনা না করলে মানুষ আপন বাচ্চাকে খেয়ে ফেলবে। ১৯৯০ সালও তো এসে গেল। আল্লাহর বান্দারা! বর্তমানে আল্লাহ্ তা'আলা যেসব নেয়ামত দিচ্ছেন ১৯৬০ সালের মানুষের ভাগ্যে তা জোটেইনি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'আলা রিযিকও বৃদ্ধি করে দেন।

যখন হযরত আদম (আ.) ছিলেন, তখন পৃথিবীতে একজন মানুষের রিযিক ছিল। আর বর্তমানে শত কোটি মানুষ। আল্লাহ্ তা'আলা সব মানুষের রিযিক দিয়ে দিয়েছেন। হযরত আদম (আ.)-এর যুগে কি এসব খনিজ সম্পদ উত্তোলন হতো? না; হতো না। মানুষ যখন কম ছিল, পৃথিবীর উৎপাদনও কম হতো। যখন সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সম্পদের ভাণ্ডারসমূহের মুখ উন্মুক্ত করে দিলেন। সুবহানাল্লাহ্!

---

১. সূরা হূদ : আয়াত ৬

২. সূরা আনকাবূত : আয়াত ৬০

তাকওয়া ও রিযিকের দ্বার

রিযিক কার দায়িত্বে? আল্লাহ তা'আলার দায়িত্বে। হ্যাঁ; আমি একথারও প্রবক্তা যে, আমাদের জীবনের একটি শৃঙ্খলা থাকা চাই। এর অর্থ এই নয় যে, আমাদের জীবনে কোনো শৃঙ্খলা থাকবে না। শৃঙ্খলা থাকতেই হবে। তারপরও আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব। তবে দৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার জাতের প্রতি নিবদ্ধ থাকবে। এমন অবস্থা যখন হবে, তখন কেউ আর ঘুষ নিবে না। দৃষ্টি যখন আল্লাহর সত্তার প্রতি নিবদ্ধ থাকবে, তখন কেউ ভেজাল মাল ভক্ষণ করবে না। আল্লাহকে ভুলে বস্তুজগতের প্রতি যখন দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, তখনই এসব বিপদ এসে দাঁড়ায়। কাজেই তাকওয়া অবলম্বন করলে আল্লাহ তা'আলা রিযিকের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করে দিবেন।

তাকওয়া সর্বক্ষেত্রেই কার্যকর

আপনি বলবেন তাকওয়া। আগে বলুন তাকওয়া কী? এটি সেই নেয়ামত, যা দুনিয়াতেও কাজে আসে, বরযখেও কাজে আসে, কবরেও কাজে আসে, হাশরেও কাজে আসে, জান্নাতে ও কাজে আসে। সব জায়গায়-ই কাজে আসে। তাকওয়া এমনই এক বিরল প্রতিষেধক, যা সর্বক্ষেত্রেই কাজে লাগে। শুনুন কুরআনের কথা–

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا

'আর মূসা তার জাতিকে বলল, তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো এবং ধৈর্যধারণ করো।'[১]

اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ

'নিঃসন্দেহে এ পৃথিবী আল্লাহ তা'আলার।'[২]

يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ

'তিনি তার বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চান, তাকেই তার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন।'[৩]

---

১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১২৮

২. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১২৮

৩. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১২৮

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا

'এটি ওই জান্নাত, যার অধিকারী আমি আমার বান্দাদের মধ্য হতে মুত্তাকীদের বানাব।'[১]

জান্নাতের যাবতীয় দৃশ্য মুত্তাকীদের জন্য। আল্লাহ্ বলছেন :

إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ﴿٣١﴾ حَدَآئِقَ وَ اَعْنَابًا ﴿٣٢﴾ وَّ كَوَاعِبَ اَتْرَابًا ﴿٣٣﴾ وَّ كَاْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّ لَا كِذّٰبًا ﴿٣٥﴾ جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾

'মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে সাফল্য। উদ্যান, দ্রাক্ষা, সমবয়স্কা উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণী ও পূর্ণ পানপাত্র। কোথাও তারা অসার ও মিথ্যা বাক্য শুনবে না। এটি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে পুরস্কার।'[২]

এই বিনিময় মুত্তাকীদের জন্য।

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلٰلٍ وَّ عُيُوْنٍ ﴿٤١﴾ وَّ فَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٤٢﴾ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا هَنِيْٓـئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٤٤﴾

'মুত্তাকীরা ছায়া, ঝরনাবহুল স্থান ও তাদের কাম্য ফলমূলের মধ্যে থাকবে। তোমাদের কর্মের পুরস্কারস্বরূপ তোমরা তৃপ্তিসহ পানাহার করো। এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করি।'[৩]

দেখলেন তো জান্নাতের আলোচনা কেমন চমৎকার! মুত্তাকীদের জন্য জান্নাতের নেয়ামতরাজির বিবরণ সম্বলিত কত আয়াত পড়ব?

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى

'মোত্তাকীদের জন্য যে-জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত হলো, তাতে আছে নির্মল পানির অনেকগুলো নহর। আরও আছে একাধিক দুধের নহর, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়। আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর। আছে পরিশোধিত মধুর নহর।'[৪]

চারটি ঝরনার কথা বলা হয়েছে, যা মুত্তাকীদের জন্য জান্নাতে থাকবে।

---

১. সূরা মারয়াম : আয়াত ৬৩

২. সূরা নাবা : আয়াত ৩১-৩৬

৩. সূরা মুরসালাত : আয়াত ৪১-৪৪

৪. সূরা মুহাম্মাদ : আয়াত ১৫

আখেরাতের মনযিলসমূহ ও তাকওয়া

বন্ধুরা আমার! আখেরাতের মনযিলসমূহ তাকওয়ার মাধ্যমেই অতিক্রম হবে। দুনিয়ার মনযিলসমূহও তাকওয়ারই মাধ্যমে অতিক্রম হবে। যদি দুনিয়াতে ইজ্জত-সম্মান কামনা কর, তাহলে তাকওয়া অবলম্বন করো। দেখবে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেও ইজ্জত দান করবেন। আর আখেরাতের ইয্যাতের ব্যাপারে তো অনেক কথাই শুনিয়ে দিলাম।

দুনিয়ার ইজ্জত ও তাকওয়া

আপনারা হয়ত বলবেন, এ জগতের কথাও কিছু বলুন! তাহলে আসুন আলোচনা করি, দুনিয়াতেও ইজ্জত তাকওয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা

সূরা ইউসুফ–কুরাআনের ভাষায় যাকে اَحۡسَنَ الۡقَصَصِ (সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা) বলা হয়েছে–বড় শিক্ষণীয় বিষয়।

সূরাটিতে এ ঘটনাকে এত গুরুত্ব দেওয়ার কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা এখানে দুটি জামাতের (দল) আলোচনা করেছেন। একটি জামাত হলো ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদের আর অপর জামাত ইউসুফ (আ.)-এর। জি; কোনো মানুষ একা হলেও গুণের বিচারে একটি জামাততুল্য হতে পারে। কুরআন থেকে তার প্রমাণ পেশ করছি। আল্লাহ বলছেন :

اِنَّ اِبۡرٰهِيۡمَ كَانَ اُمَّةً

'নিঃসন্দেহে ইবরাহীম ছিল একটি জাতি।'[১]

দেখলেন তো! জি; এমনও হয়। তাহলে একটি জামাত ইউসুফ (আ.)-এর আর অপরটি তাঁর ভাইদের। ভাইদের ওপর পরীক্ষা শুরু হলো। তারা বলতে লাগল, আমরা ইউসুফকে হত্যা করব।

اُقۡتُلُوۡا يُوۡسُفَ اَوِ اطۡرَحُوۡهُ اَرۡضًا ①

'তোমরা ইউসুফকে হত্যা করে ফেলো কিংবা কোনো একটা জায়গায় ফেলে আসো।'[২]

---

১. সূরা নাহল : আয়াত ১২০

২. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৯

আমরা পাপটা করে পরে তাওবা করে ভালো হয়ে যাব। ফলে তারা পাপ করেই ফেলল। ইউসুফ (আ.)-এর ওপরও পরীক্ষা শুরু হলো। আল্লাহ বলছেন :

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا

'সে যে মহিলার ঘরে ছিল, সে তার কাছে অসৎ কর্ম কামনা করল।'[১]

এ আল্লাহ তা'আলার রহমত ছিল যে, তিনি এমন পরীক্ষা থেকে বেঁচে গেলেন। এমনকি মহিলারাই সাক্ষ্য দিয়ে দিল এবং বলতে বাধ্য হলো :

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ

'হে সত্যবাদী ইউসুফ!'[২]

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহু আকবার! শেষে কী হলো? আল্লাহ তা'আলা তাকে জেলখানা থেকে মুক্ত করে সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন। তারপর ইউসুফ (আ.) বললেন, আমাকে অর্থমন্ত্রী বানিয়ে দাও। নবী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে রাজত্বের লাগাম নিয়ন্ত্রণের যোগ্যতা দান করেছিলেন। তিনি রাজ্যপরিচালনা করে দেখালেন। দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ভাইয়েরা সবাই দুর্ভিক্ষের শিকার হলেন। আর ইউসুফ (আ.) তখন সিংহাসনে সমাসীন। এবার আল্লাহ তা'আলা নির্যাস বের করছেন। পবিত্র কুরআনে তার দৃশ্য তুলে ধরেছেন। দৃশ্যটি অত্যন্ত বিস্ময়কর। ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা খাদ্য চাইল। বলল, পূর্ণ মূল্য তো নেই; আপনি কিছু দান করুন। এরাও নবীর সন্তান, তিনিও নবীর সন্তান। এরা ব্যর্থ হলো আর তিনি সফল হলেন। তিনি রাজসিংহাসনে আর তারা ঢালা বিছানায়। কুরআন চিত্রটি বর্ণনা করেছে। জীবন উৎসর্গ হোক! কী দারুণ কিতাব! ইরশাদ হচ্ছে :

قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَ اَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴿۸۸﴾

'তারা বলল, হে আযীয! সংকট আমাদের ও আমাদের পরিবারবর্গকে বিপন্ন করে তুলেছে আর আমরা তুচ্ছ পণ্য নিয়ে এসেছি। আপনি আমাদের

---

১. সূরা ইউসুফ : আয়াত ২৩

২. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৪৬

পূর্ণমাত্রায় রসদ দিন। আমাদের দান করুন। আল্লাহ তা'আলা দানকারীদেরকে পুরস্কৃত করেন।'[১]

ইউসুফ (আ.) যখন এই পরিস্থিতি অবলোকন করলেন, তখন বললেন :

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ

'তোমাদের কি জানা আছে, তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে কীরূপ আচরণ করেছিলে যখন তোমরা অজ্ঞ ছিলে?'[২]

তারা বলল–

قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ

'আরে! তবে কি তুমিই ইউসুফ?'[৩]

قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا

'সে বলল, আমি হলাম ইউসুফ আর এ হলো আমার ভাই (বিনইয়ামীন)। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।'[৪]

إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ

'নিশ্চয় যে তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ধৈর্য ধারণ করে।'[৫]

فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

'নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের বিনিময় নষ্ট করেন না।'[৬]

কাজেই সর্বকালে ও সর্বযুগে যে কেউ ইউসুফ (আ.)-এর গুণের অনুসারী হবে, আল্লাহ তাকে গাছতলা থেকে নিয়ে রাজসিংহাসনে বসিয়ে দিবেন।

দেখলেন তো যে, দুনিয়াও হলো, আখেরাত ও হলো!

---

১. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৮৮
২. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৮৯
৩. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৯০
৪. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৯০
৫. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৯০
৬. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৯০

তাকওয়া ও আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য

পূর্বযুগের আলেমগণ তাকওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করেছেন আর বর্তমানে আমরা তাকওয়ার অভাবে নিজেদের ইজ্জত-সম্মান হারিয়ে বসেছি। ব্যাপার কী? কাসিম নানুতবি (রহ.), রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহ.), শাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান (রহ.), মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি (রহ.), মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.) প্রমুখ তো এই দরসে নেজামীতেই পড়াশোনা করেছেন। তবে কেন আজ প্রতিটি ছাত্র থানবি হয় না? নানুতবি হয় না? এ পার্থক্য কেবল তাকওয়ার কারণে। তাঁরা এই কিতাবগুলোই পড়েছেন। কিন্তু তাকওয়ার কারণে তারা এই কিতাবগুলোতে মণি-মুক্তা লাভ করেছেন। আর আমরাও এই কিতাবগুলোই পড়ি। কিন্তু পড়ি আর ভাবি, আমল পরে করব। এখন কোনোভাবে জীবনটা কাটাই। যেসব ওলামায়ে কেরাম হালাল খাদ্য দ্বারাও উদর ভর্তি করতেন না, আজ তাদের সন্তানরা হারাম মাল দ্বারা উদর ভর্তি করছে। যারা সারাটা রাত নামাযের মুসল্লায় কাটিয়ে দিতেন, আজ তাদের সন্তানরা নরম বিছানায় শুতে অভ্যস্ত।

ইল্‌ম অত্যন্ত নাজুক জিনিস

এই ইল্‌ম অত্যন্ত নাজুক জিনিস। তার জন্য খুবই আফসোস হয়, যার মুখ আলেম; কিন্তু তার দিল মূর্খ। লুকমান হাকীম বলতেন, আমি লোহা ও পাথর বহন করেছি। তবে দীনের চেয়ে ভারী কোনো জিনিস দেখিনি। আমি বাসর ঘরের মজা লাভ করেছি; তবে আল্লাহর যিকিরের চেয়ে মজাদার আর কিছু পাইনি। আজ আমাদের পোশাক পশমের চেয়েও কোমল। আমাদের ভাষা মধুর চেয়েও মিষ্টি; কিন্তু অন্তর সিংহের অন্তরের চেয়েও কঠিন।

অন্তর ও ডাস্টবিন

আমরা অন্তরের ওপর মেহনত করি না। এই তাকওয়া কোথায় থাকে?

اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا وَاَشَارَ اِلَى الصَّدْرِ

'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুকের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, তাকওয়া এখানে থাকে।'[১]

---

১. শু'আবুল ঈমান : হাদীছ নং ১০৭৯৩

সুতরাং এই অন্তর বদলাতে হবে। তাহলে তাতে তাকওয়া সৃষ্টি হবে। আজ আমরা তো অন্তরকে মন্দিরে পরিণত করেছি। বরং সত্য কথা হলো, ডাস্টবিনে পরিণত করেছি। আল্লাহ্ বলছেন :

مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ۝

'এই মূর্তিগুলো কী যে, তোমরা এগুলোকে সামনে নিয়ে বসে থাক?'[১]

অন্তরে মূর্তি রাখা আছে। কেউ অন্তরে নারীর মূর্তি, কেউ টাকা-পয়সার মূর্তি, আবার কেউ চাকরির মূর্তি রেখে দিয়েছে। যে ঘরে ছবি থাকে, সেই ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। তাহলে যে অন্তরে অন্যের মূর্তি থাকে, সেই অন্তরে আল্লাহ্র তাজাল্লী কীভাবে আসতে পারে? এই অন্তরকে পরিপাটি করতে হবে। এই অন্তরের ওপর মেহনত করতে হবে। তখনই তাকওয়া আসবে এবং আপনারা এ নিয়তে লেখাপড়া করবেন যে, হে আল্লাহ! আমরা পড়তে থাকব এবং আমল করতে থাকব। নিজেকে উপরে রাখলে তাকওয়া আসে না।

اُوْصِيْ نَفْسِيْ اَوَّلًا وَاِيَّاكَ بَعْدَهٗ

'আগে আমি নিজেকে উপদেশ দিই; পরে তোমাকে।'

এ কারণেই তো জীবনে তাকওয়া আসে না। মানুষের ওপর কথার কোনো প্রভাব পড়ে না। অভিযোগ করে, মানুষ কথা শোনে না। বন্ধুরা আমার! নিজের মুখ থেকে বের হওয়া কথা যখন নিজের কান এত নিকটে হওয়া সত্ত্বেও শোনে না, তখন এত দূরে অবস্থিত অন্যের কান তা কীভাবে শুনবে? এমন হওয়া উচিৎ ছিল যে, আমরা বলব; আমাদের কান শুনবে আর আমাদের দেমাগ তা নিয়ে ভাববে। আমাদের অন্তর এর ওপর আমল করবে যে, আমরা কী বলছি? আমরা যখন মানুষদের বলি, তখন নিজেদেরও নিয়ত করে নেব যে, আমরা কুরআন ও হাদীছ এজন্য পড়ছি যে, আমরা পড়ব এবং আমল করব।

মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরি (রহ.)-এর বিস্ময়কর ঘটনা

আমি হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি (রহ.)-এর জীবনীতে পড়েছি, মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরি (রহ.)-এর মাধ্যমে কয়েকজন

১. সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৫২

হিন্দু মুসলমান হলো। কেউ তাদের জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কেন মুসলমান হয়েছ? তখন তারা কাশ্মিরি (রহ.)-এর দিকে ইঙ্গিত করে বলল, এ চেহারাটি আমাদের দৃষ্টিতে মিথ্যাবাদীর চেহারা বলে মনে হয় না। এটি কোনো মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না। সুবহানাল্লাহ। তাদের চেহারায় তাকওয়ার জ্যোতি চমকাত। তাদের নির্জনের ইবাদত তাদের চেহারায় জ্যোতি বানিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হতো।

তাকওয়া কী জিনিস?

এবার শেষ কথাটি হলো তাকওয়া জিনিসটি কী? তাকওয়া সম্পর্কে প্রসিদ্ধ কথা হলো, হযরত ওমর (রাযি.) উবাই ইবনে কাব (রাযি)কে জিজ্ঞাসা করলেন, তাকওয়া কী জিনিস? তিনি বললেন, কখনও কি কোনো কন্টকাকীর্ণ রাস্তায় হেঁটেছেন? বললেন, হেঁটেছি। জিজ্ঞাসা করলেন, কীভাবে হাঁটেন? বললেন, কাপড় গুটিয়ে ও বাঁচিয়ে হাঁটি, যেন আমার আঁচলে কোনো কাঁটা বিদ্ধ না হয়। তিনি বললেন, তাকওয়া হলো, একজন মানুষ জীবনের আঁচলকে এভাবে রক্ষা করে চলবে, যেন তার আঁচল কোনো গুনাহে জড়িয়ে না পড়ে। আল্লাহ বলছেন :

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

‘নিজের কাপড় পবিত্র করো।’[১]

وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ

‘আর তাকওয়ার পোশাকই হলো সর্বোত্তম পোশাক।’[২]

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى

‘এবং নিজের জন্য পাথেয় গুছিয়ে রাখো। আর সর্বোত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া।’[৩]

সুবহানাল্লাহ! এ কারণে যেখানে স্বামী-স্ত্রীর আলোচনা এসেছে, সেখানে তাকওয়া, তাকওয়া, তাকওয়া। সূরা নিসা পড়ে দেখুন; কত আয়াতের শেষে

১. সূরা মুদ্দাছছির : আয়াত ৪
২. সূরা আ'রাফ : আয়াত ২৬
৩. সূরা বাকারা : আয়াত ১৯৭

তাকওয়া, তাকওয়া, তাকওয়া। কেননা, তাকওয়া ব্যতীত দাম্পত্যজীবন সঠিকভাবে চলতে পারে না।

এ কারণেই বলা হয়েছে :

وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ؕ

'আর আল্লাহকে ভয় করো এবং একথাটি জেনে রাখো যে, তোমাদেরকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতেই হবে।'[১]

আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত আমাদের মাঝে তাকওয়া দান করুন। আমীন! আমাদের হযরত পীর গোলাম হাবীব (রহ.) বলতেন, এমনসব জিনিস বর্জন করতে হবে, যা অবলম্বন করলে আল্লাহর সাথে সম্পর্কে ঘাটতি আসে। একেই তাকওয়া বলে। কিছু মানুষ মনে করে, সুফি সেজে বাজারের তৈরী খাবার না খেলেই যথেষ্ট। আরে মিয়া! এ তো তাকওয়ার একটি ক্ষুদ্র অংশ। তাকওয়া কোনো একটি জিনিসের নাম নয়; বরং এটি মাথার তালু হতে পায়ের তালু পর্যন্ত সংযুক্ত। সারা জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। আসুন, পবিত্র কুরআনকে জিজ্ঞাসা করি, তাকওয়া কী? তাহলে কুরআন আমাদের বুঝিয়ে দিবে।

কুরআন বলছে :

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ ۚ وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِی الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَ السَّآئِلِيْنَ وَ فِی الرِّقَابِ ۚ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَ الصّٰبِرِيْنَ فِی الْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ۝

'পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানোতে কোনো পুণ্য নেই। কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতাকুল, সমস্ত কিতাব ও নবীগণের প্রতি ঈমান আনলে এবং আল্লাহপ্রেমে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, অভাবগ্রস্ত, পথিক ও সাহায্যপ্রার্থীদের এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করা, সালাত কায়েম করা,

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ২২৩

যাকাত প্রদান করা, প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করা, অর্থসংকটে, দুঃখ-ক্লেশে, ঘোরতর যুদ্ধ চলাকালে ধৈর্য ধারণ করা। এরা-ই হলো সত্যবাদী, এরা-ই হলো মুত্তাকী।"[১]

আল্লাহ রব্বুল ইয্‌যাত আমাদেরকে এমন মুত্তাকী হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ১৭৭

জবানের হেফাজত

'জিহ্বার রং দেখেই ডাক্তাররা যেমন রোগ নির্ণয় করতে পারেন, তেমনি ওলামায়ে কেরাম ও রূহানি ডাক্তারগণ জবানের কথা শুনেই আত্মার ব্যাধিসমূহ নির্ণয় করেন। হযরত আলী (রাযি.) বলতেন, তোমরা যতক্ষণ কথা না বলবে, ততক্ষণ তোমাদেরকে আলেম জ্ঞান করা হবে। কখনও তিনি বলতেন, তোমরা কথা বলো; তাহলে তোমাদের চেনা যাবে। আবার কখনও বলতেন, মানুষ তার জিহ্বার তলে লুকিয়ে থাকে। অর্থাৎ– কিছু বলল তো সে তার হাকীকত খুলে দিল। কাজেই মানুষ ভেবেচিন্তে কথা বলবে। যে বলে, আমি সঠিক কথা বলি। তাহলে তার একটু ক্ষোভের কথা শুনবেন। কারণ, যখন আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে, তখন তো আর কুকুরে কামড়ায়নি যে, আবোল-তাবোল বকবে। যখন কোনো অপ্রকৃত কথা অন্তরে বজ্রের মতো এসে আঘাত করে, তখনই আসল অবস্থা বোঝা যায়। তখনই দেখতে হবে, সে তার কী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে ভেবেচিন্তে উত্তর দেয়, নাকি মূর্খের মতো বাগ্‌বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়।'

জবানের হেফাজত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ -

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

জবানের গুরুত্ব

মানুষ হলো কতগুলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমষ্টি। এগুলো সংশোধন হলে মানুষ সংশোধন হয়ে যায়। জবান মানবদেহের একটি ক্ষুদ্র অঙ্গ। বর্তমানে একে অনেক অসৎ উপায়ে ব্যবহার করা হয়। আরবীতে প্রবাদ আছে—

اَللِّسَانُ جِرْمُهٗ صَغِيْرٌ وَ جُرْمُهٗ كَبِيْرٌ

'জবানের আকার অতি ক্ষুদ্র হলেও তার অপরাধ অনেক বড়।'

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

'তোমরা যা করছ না তা বলছ কেন?'[১]

তোমরা যা করছ না, তা বলা আল্লাহ্র কাছে অতি অপছন্দনীয়। কথা এক আর কাজ ভিন্ন। এ কাজটি আল্লাহ্ তা'আলার খুবই অপছন্দের। মুমিনের মুখনিঃসৃত শব্দাবলী আল্লাহ্র কাছে অতি মূল্যবান।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ

---

১. সূরা সফ : আয়াত ২

'মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে-না কেন, তা লিপিবদ্ধ করতে তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে।'[১]

জবানে কালেমা পাঠ করা

আল্লাহর নিকট বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন কাফের জীবনভর গুনাহ করেছে। চুল-দাড়ি সাদা হয়ে গেছে। সেও যদি বিশুদ্ধ চিত্তে কালিমা পাঠ করে, তবে তাকেও তিনি ক্ষমা করে দেন। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, যখন কোনো বান্দা বিশুদ্ধ চিত্তে কালিমা পাঠ করে, তখন একজন ফেরেশতা তার এই আমলটি নিয়ে আসমানের দিকে যায়। রাস্তায় থাকতেই ওপর থেকে নিচে আগমনকারী ফেরেশতার সঙ্গে তার সাক্ষাত হয়। নিচে আগমনকারী ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাচ্ছেন? উত্তরে নিচ থেকে উপরে গমনকারী ফেরেশতা বলে, একব্যক্তি কালিমা পাঠ করেছে। আমি সেই আমলটি আল্লাহর দরবারে পেশ করতে যাচ্ছি। তারপর সে ওপর থেকে নিচে আগমনকারী ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? উত্তরে সে বলে, কালিমা পাঠকারীর জন্য মাগফেরাতের সংবাদ নিয়ে যাচ্ছি।

ভেবে দেখুন, জবানে মাত্র কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করল আর তার জীবনের সমস্ত পাপ মাফ করে দেওয়া হলো। দুনিয়ার আদালতের নিয়ম দেখেছি, যদি কারো নামে মিথ্যা মামলা হয়ে যায় এবং এ ব্যাপারে আদালত অবগতও হয় যে, মামলাটি মিথ্যা ছিল, লোকটিকে সসম্মানে বেকসুর খালাস করে দিলেও রেকর্ড বইয়ে তা লিপিবদ্ধ করে রাখে। কিন্তু আল্লাহর আদালতের ব্যপারটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। বাস্তবিক পক্ষেও যদি কেউ গুনাহ করে এবং তা পাহাড়ের চেয়েও ভারী হয়, সে যদি বিশুদ্ধ চিত্তে তাওবা করে, তাহলে তার গুনাহ কেবল মাফই করা হয় না বরং আল্লাহ তা'আলা গুনাহের রেকর্ডও তার আমলনামা থেকে মুছে দেন। হাদীছে এসেছে, যে সকল ফেরেশতা তার গুনাহগুলো লিখেছিলেন, আল্লাহ তাদের স্মৃতি থেকেও তা খতম করে দেন, যেন কেয়ামত দিবসে তারা সাক্ষ্য দিতে না পারে।

সুবহানাল্লাহ! মুখনিঃসৃত কয়েকটি শব্দ কেমন পরিবর্তন সাধন করল!

ঠাট্টা-বিদ্রূপের অনিষ্টসমূহ

এখন তো কিছু লোক একজন অন্যজনকে খুশি করতে মিথ্যা কথা বলে। কাউকে বিদ্রূপ করে। কারো মনে যাতনা দেয়। মনে রাখবেন, তরবারির

---

১. সূরা কাফ : আয়াত ১৮

আঘাত শরীরের ওপর হয় আর জবানের আঘাত হয় সর্বদা অন্তরের ওপর। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের একদল অপর দলকে যেন বিদ্রূপ না করে। কারণ, হতে পারে, তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম।'[১]

ঠাট্টা-বিদ্রূপ এজন্যই নিষেধ করা হয়েছে যে, জবান থেকে উল্টাপাল্টা কথা বের হয়। অতি সহজেই জবান তা উচ্চারণ করলেও আল্লাহর দরবারে এই কথাগুলোকে সত্যে পরিণত করা মানুষের জন্য বড়ই দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

কুফরি বাক্যসমূহ

আলেমগণ বিভিন্ন কিতাবে এমন কতিপয় বাক্য উদ্ধৃত করেছেন, যাকে কুফরি বাক্য বলা হয়। এমন কিছু বাক্য বর্তমানে মানুষের মুখে অহরহ শোনা যায়। দু-একটি উদাহরণ দিচ্ছি। কুফরি বাক্য উদ্ধৃত করা কুফরি নয়। যেমন– কেউ বলল, আরে ভাই! কোথায় থাকেন? উত্তরে অপরজন বলল, আমি তো অমুক জায়গায় থাকি। প্রথম ব্যক্তি বলল, আচ্ছা; এত দূরে? সে তো আল্লাহরও আয়ত্তের বাইরে। আমরা তো হাসি-ঠাট্টা করে বলে ফেললাম, আল্লাহর ক্ষমতার বাইরে; কিন্তু কথাটা কুফরি; বলামাত্রই ঈমান চলে গেল। স্ত্রী তালাক হয়ে গেল। কেউ বলল, অমুক কাজটা তো শরীয়তসম্মত নয়। অপরজন বলে উঠল, রাখো তোমার শরীয়ত। এগুলো কুফরি বাক্য।

এবার বলুন, প্রতিনিয়ত এমন কত কথা আপনি শুনছেন? একবার আমি এক ফ্যাক্টরী ম্যানেজারের নিকট বসা ছিলাম। ইত্যবসরে তিনি এক ব্যক্তিকে ডাকলেন। বেশ ভালো কথা। লোকটাকে দেখে জ্ঞানী মনে হলো। বরং মুখে ছোট-ছোট দাড়িও ছিল। ম্যানেজার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই কেমন আছেন? বলল, জনাব আগে তো আমি পাঁচ মিনিট শুধু দোআই শুনতাম। এখন মোটেও শুনি না। ম্যানেজার বললেন, আরে, আমি তো নামাযই ছেড়ে দিয়েছি।

আল্লাহর বড়ত্বের প্রতি লক্ষ রেখে লোকটার বাচনভঙ্গির প্রতি লক্ষ করুন। আস্তাগফিরুল্লাহ!

---

১. সূরা হুজুরাত : আয়াত ১১

বিশ্বাস করুন, আমি যখন তার কথাটা শুনলাম, তখন মনে হচ্ছিল ভূপৃষ্ঠ কেঁপে উঠেছে। অথচ সে খুব মজা করে বলছে আর হাসছে, যেন শুধু হাসানোর জন্যই মামুলি কোনো কথা বলেছে।

এসব হলো কুফরি কথা।

কথার গুরুত্ব

মুখনিঃসৃত শব্দাবলীর এতই গুরুত্ব যে, একজন অপরিচিতা মহিলা, যার প্রতি দৃষ্টিপাত করার অনুমতি ছিল না। এমন মহিলাকে শরীয়তসম্মত সাক্ষীর সামনে বলে দিল, আমি তোমাকে আমার বিবাহে কবুল করলাম। এখন উক্ত মহিলা এ ব্যক্তির জীবনসঙ্গীনিতে পরিণত হলো, যার প্রতি দৃষ্টিপাতেরই অনুমতি ছিল না। দুটি বাক্য বলে দিল আর ওই মহিলা তার জীবনসাথী হয়ে গেল। আবার এ মহিলাকেই তিনবার তালাক শব্দ বলে দিলে অমনি সে বেগানা নারীতে পরিণত হবে।

এবার ভাবুন, বিবাহ করতে কিংবা তালাক প্রদান করতে মাথায় কোনো পাথর বহন করতে হয়নি। কোনো আগুনের দরিয়া পাড়ি দিতে হয়নি। কোনো পাহাড় থেকেও লাফ দিতে হয়নি। কেবল কয়েকটি বাক্য উচ্চারণ করতেই একজন অপরিচিত মহিলা স্ত্রী হয়ে গেল। আবার তালাক শব্দ উচ্চারণ করামাত্রই জীবনসাথী চিরতরে বিদায় হয়ে গেল।

আল্লাহ তা'আলার দরবারে মানুষের মুখনিঃসৃত কথার অনেক মূল্য আছে। একযুবক আবোল-তাবোল বকছিল। কোনো এক আল্লাহওয়ালা শুনে বললেন, বেটা! একটু ভেবেচিন্তে কথা বল এবং দেখো, তুমি আল্লাহর নামে কেমন চিঠি পাঠাচ্ছ। আমাদের মুখ থেকে বের হওয়া প্রতিটি শব্দ আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয় আর এই আমলনামা দৈনিক আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। আল্লাহওয়ালাগণ যখন কথা বলেন, তখন এই অনুভূতি নিয়েই বলেন যে, আমার আমলনামা আল্লাহ তা'আলার দরবারে পেশ করা হবে। সালাফে সালেহীনদের কারো-কারো অভ্যাস ছিল, তাঁরা যেসব কথা বলতেন, সব লিখে রাখতেন। রাতের বেলা নিরিবিলি বসে ভাবতেন, যা বলেছি ঠিক বলেছি কিনা? যদি কোনো কথা ভুল প্রমাণিত হত, সাথে-সাথে ওই রাতেই তাওবা করে নিতেন।

আল্লাহর ভয়ের বিরল ঘটনা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.) বলেন, আমি একবার হজের সফর থেকে ফিরছিলাম। ইতিমধ্যে এক আরোহীকে আমার দিকে আসতে দেখলাম। কাছে এলে বুঝলাম, লোকটা মহিলা। আমি তাকে সালাম দিলাম।

উত্তরে তিনি বললেন :

سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ

'সালাম পরম দয়ালু রবের পক্ষ থেকে।'[১]

তিনি আয়াতটি পাঠ করলেন। আমি বুঝে নিলাম, তিনি আমার সালামের উত্তর দিয়েছেন। আমি বললাম, এখন কোথা থেকে আসছেন?

বললেন :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

'তোমরা আল্লাহর জন্য হজ ও ওমরা পূর্ণ করো।'[২]

আমি বুঝে ফেললাম, তিনি হারামাইন শরীফাইন জিয়ারত করে ফিরছেন। বললাম, এখানে কোথায় উঠেছেন?

বললেন :

مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ

'আল্লাহ যাকে গুমরাহ করেন, তাকে কেউ হেদায়াত দিতে পারে না।'[৩]

আমি বুঝে নিলাম, তিনি পথ হারিয়ে ফেলেছেন। আমার অনুমানে তিনি ছিলেন বৃদ্ধ; তাই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মা আপনি কোথায় যেতে চান?

বললেন :

ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ

'তোমরা নিরাপদে শহরে প্রবেশ করো।'[৪]

---

১. সূরা ইয়াসীন : আয়াত ৫৮
২. সূরা বাকারা : আয়াত ১৯৬
৩. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৮৬
৪. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৯৯

আমি বুঝলাম, তিনি শহরে যেতে চান। বললাম, আমাকেও শহরে যেতে হবে। তাই আসুন, আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই।

বললেন :

وَاَحۡسِنُوۡا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الۡمُحۡسِنِيۡنَ

'তোমরা সৎকাজ করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।'[১] এবার আমি বাহনের লাগাম ধরে চলতে লাগলাম। কিছুদূর চলার পর আমি কিছু আরবী কবিতা আবৃতি করতে লাগলাম।

তিনি বললেন :

فَاقۡرَءُوۡا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الۡقُرۡاٰنِ

'কুরআন হতে যা সহজ হয় পাঠ করো।'[২]

আমি চুপ হয়ে গেলাম আর ভাবতে লাগলাম, মহিলাটি কে? আমি তার কিছু পারিবারিক বিবরণ জানতে চাইলাম।

তিনি বললেন :

لَا تَسۡـَٔلُوۡا عَنۡ اَشۡيَآءَ اِنۡ تُبۡدَ لَكُمۡ تَسُؤۡكُمۡ

'এমন বিষয়াদি জিজ্ঞেস করো না; যদি তা প্রকাশ করা হয়, তা হলে তোমাদের কাছে অপ্রীতিকর ঠেকবে।'[৩]

আমি বুঝে নিলাম, ঘরোয়া বিষয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী নয়। আমি চলতে থাকলাম। শহরের নিকটবর্তী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, শহরে কার সাথে সাক্ষাৎ করবেন?

বললেন :

اَلۡمَالُ وَالۡبَنُوۡنَ زِيۡنَةُ الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا

'সম্পদ ও সন্তানাদি পার্থিব জীবনের শোভা।'[৪]

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ১৯৫
২. সূরা মুযযাম্মিল : আয়াত ২০
৩. সূরা মায়েদা : আয়াত ১০১
৪. সূরা কাহফ : আয়াত ৪৬

আমি বুঝলাম, আল্লাহ্ তাকে সম্পদ ও সন্তানাদি দান করেছেন।

যা-ই হোক, আমি শহরে প্রবেশ করলাম। হজ করে ফিরে আসা সেই কাফেলাটিও পেয়ে গেলাম। তারা সেখানে তাঁবু গেড়েছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার ছেলেদের নাম কী?

তিনি বললেন, ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক।

আমি বুঝে নিলাম, এগুলো তার ছেলেদের নাম। আমি উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলাম। অমনি সুন্দর ও উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট তিনটা ছেলে দ্রুত দৌড়ে এল। আম্মাজানকে হারিয়ে তারা অত্যন্ত পেরেশান ছিল। মাকে তারা কাফেলার মাঝে তালাশ করে ফিরছিল। এবার পেয়ে তারা খুবই আনন্দিত হলো। আমি আমার বাড়ি যাওয়ার কথা ভাবলাম। ইত্যবসরে মহিলা পুনরায় কুরআন শরীফের একটি আয়াত তেলাওয়াত করল–

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ

'তারা তাঁর ভালোবাসায় খানা খাওয়ায়।'[১]

মহিলা তার বাচ্চাদের ইশারা করে দিলেন, একে কিছু খাওয়াও। ঝটপট তারা কিছু ফল নিয়ে এল। আমি খেতে আপত্তি জানালাম।

তিনি আয়াত পাঠ করলেন–

اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ

'আমরা তোমাদের খাওয়াই কেবলই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে।'[২]

আমি বড় অবাক হলাম, এ কেমন ব্যাপার? আমি কিছু ফল খেলাম আর বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কী? যখন থেকেই তোমাদের আম্মাজান আমার সাথে কথা বলছেন, আমার প্রতিটি কথার জবাবে কুরআনের আয়াত পাঠ করছেন। তারা বলল, হ্যাঁ; আমাদের আম্মাজান কুরআনে পাকের হাফেযা এবং হাদীছেরও আলেমা। তাঁর অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, কেয়ামত দিবসে আমার প্রতিটি কথার জবাব দিতে হবে। ফলে তিনি বিশ বছর যাবত মুখে কুরআনের আয়াত ব্যতীত অন্য কোনো শব্দ উচ্চারণ করছেন না।

---

১. সূরা দাহ্‌র : আয়াত ৮

২. সূরা দাহ্‌র : আয়াত ৯

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহভীতির কী আশ্চর্য নমুনা যে, আল্লাহর কালাম ব্যতীত অন্য কোনো শব্দই উচ্চারণ করতেন না!

কেয়ামত দিবসের উপস্থিতি

কেয়ামত দিবসে এমন লোকও আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হবে, যাদের জবানে ২০ বছর যাবত কুরআন ব্যতীত অন্য কোনো শব্দ বের হয়নি। সেখানে যদি আমরা আমাদের মূর্খতাসুলভ কথাবার্তা নিয়ে হাজির হই, তাহলে আমাদের কতই-না লজ্জিত হতে হবে। মহান প্রভু যদি আমাদের প্রশ্ন করেন, অমুককে কেন অপদার্থ বলেছিলে? অমুককে অসভ্য কেন বলেছিলে? অমুককে বেঈমান কেন বলেছিলে? সেখানে উত্তর দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। সেখানে তো নবীরাও কম্পিত হবেন।

শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানি (রহ.) তাঁর বিশ্ববিখ্যাত কিতাব গুনিয়াতুত তালিবীন-এ লিখেছেন, কেয়ামত দিবসে আল্লাহ ক্রোধান্বিত অবস্থায় থাকবেন। সবাই ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী করতে থাকবে, আল্লাহ তা'আলা খ্রিষ্টান সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করবেন, তোমরা আমার সাথে মাখলুককে কেন শরীক করেছ? তারা হযরত ঈসা (আ.)-এর নাম নিয়ে বলবে, তিনি আমাদের এটা করতে বলেছিলেন। তখন আল্লাহ ঈসা (আ.)কে জিজ্ঞাসা করবেন–

ءَأَنتَ قُلْتَ

'আপনি কি বলেছিলেন?'[১]

আল্লাহ যখন হযরত ঈসা (আ.)কে জিজ্ঞাসা করবেন, তখন আল্লাহর ভয়ের প্রভাবে তাঁর প্রতিটি পশমের গোড়া থেকে রক্ত নির্গত হবে। যেখানে সত্যবাদীদের অবস্থা এমন, সেখানে আমাদের মতো মিথ্যাবাদীদের কী দশা হবে? আজ তো মুখে উল্টাপাল্টা কথা বলা খুবই সহজ। তবে কেয়ামত দিবসে জবাব দেওয়া যারপরনাই কঠিন।

কারা জাহান্নামে যাবে?

একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো। হে আল্লাহর নবী! বেশির ভাগ মানুষ কী কারণে জাহান্নামে যাবে? নবীজি ইরশাদ করলেন, দুটা অঙ্গের অসতর্কতার কারণে।

---

১. সূরা মায়েদা : আয়াত ১১৬

مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ

'দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী অঙ্গ, অর্থাৎ– জিহ্বা আর দুই রানের মধ্যবর্তী অঙ্গ'; মানে যৌনাঙ্গ।'[১]

বেশির ভাগ মানুষ জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের ভুল ব্যবহারের দরুন জাহান্নামে যাবে।

জান্নাতের নিশ্চয়তা

হাদীছে পাকের ভাবার্থ হলো, যে ব্যক্তি আমাকে জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের সঠিক ব্যবহারের নিশ্চয়তা দেবে, আমি তাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দেব।[২]

এতে জবানের সঠিক ব্যবহারের গুরুত্ব কতখানি, তা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

আগে ভাবো তারপর বলো

মানুষের উচিত, নিজের মুখের কথা নিজে শোনার অভ্যাস করা। নিজের কান এত নিকটে হওয়া সত্ত্বেও যদি নিজের কথা না শোনে, তাহলে অন্যের কান একথা কীভাবে শুনবে? এজন্যই বলা হয়েছে, আগে ভেবে নাও; তারপর বলো। বর্তমানে আমরা আগে বলি, পরে ভাবি। অনেক সময় তো শুধুই বলি; মোটেও ভাবি না।

কবি কী দামি কথা-ইনা বলেছেন!

خدا نے زبان ایک دی کان دو   کہے ایک جب سن لے انسان دو

'আল্লাহ তা'আলা জিহ্বা একটি আর কান দুটি দিয়েছেন। এভাবে তিনি একথা বোঝালেন যে, হে মানুষ! তুমি দুটি কথা শুনবে; তারপর একটি বলবে। এখন তো আমরা শুনতেই চাই না। আপনারা দেখে থাকবেন, কোনো-কোনো আলোচনাসভায় এমন হয় যে, একজন আলোচনা করছে তো অন্যজন তার আলোচনা শেষ করতেই দেয় না। বরং অর্ধেক শুনেই উত্তর দিতে শুরু করে। একই সাথে উভয়জন বলতে থাকে। মনে হয়, যেন দেওয়ালকে শোনাচ্ছে অথবা কাঁধের ফেরেশতাকে। এতটুকুও বরদাশত হয় না যে, অন্যের কথা আগে মনোযোগসহকারে শুনি।

---

১. বোখারি : হাদীছ নং ৫৯৯৩
২. বোখারি : হাদীছ নং ৫৯৯৩

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযি.)-এর খোদাভীতি

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযি.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি কখনও-কখনও নিজের জিহ্বাটা ধরে টানতেন আর বলতেন, এটা দেহের এমন একটা অঙ্গ, যার দরুন বেশির ভাগ মানুষ জাহান্নামে যাবে। সেই ব্যক্তি মহান, যার নীরবতা হয় ভাবনার সঙ্গে আর বলা হয় যিকিরের সঙ্গে।

জবানের স্খলন

জবানের স্খলন পায়ের স্খলন অপেক্ষা বেশি ভয়ানক। পা পিছলে গেলে মানুষ উঠে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু মুখ থেকে ভুল কথা উচ্চারিত হলে কিছু করার সুযোগ থাকে না। হাসান বসরী (রহ.) তাঁর বিভিন্ন মজলিসে প্রায়ই বলতেন, আমাকে ছোট একটা বাচ্চা উপদেশ দিয়েছে। কেউ প্রশ্ন করল, হযরত কী উপদেশ দিয়েছে? তিনি বললেন, একবার বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তা কর্দমাক্ত ছিল। মানুষ খুব সাবধানে হাঁটছিল। আমিও যাচ্ছিলাম। পথে ছোট্ট একটা বাচ্চাকে আসতে দেখে বললাম, সাবধানে হাঁটো, যেন পা পিছলে না যায়।

সে আমাকে দেখে বলল, আমি পিছলে পড়ে গেলে পুনরায় উঠে দাঁড়াতে পারব। কিন্তু আপনি সর্বদা লক্ষ রাখবেন। কারণ, আপনি একটুখানি পিছলে গেলে গোটা জাতির সর্বনাশ হয়ে যাবে। আপনি জাতির অনুসৃত ব্যক্তি। আপনার যেন কোথাও কোনো পদস্খলন না ঘটে।

এই ছোট্ট শিশুটি আমাকে দৃঢ়তার সবক দিয়ে দিয়েছে।

ইয়াহইয়া ইবনে মু'আজ নামক একজন বুযুর্গ ছিলেন। তিনি বলতেন, মানুষের দিলের উপমা হলো পাতিলের মতো। আর জবানের উপমা চামচের মতো। চামচ তা-ই বের করে, যা পাতিলে থাকে। জবান তাই প্রকাশ করে, যা অন্তরে থাকে। অন্তরে অন্ধকার থাকলে জবানে মন্দ কথা প্রকাশ পায় আর নূর থাকলে জবানে পবিত্র কথা প্রকাশ পায়।

জবানের সঠিক ব্যবহার করুন

জিহ্বার রং দেখেই ডাক্তাররা যেমন রোগ নির্ণয় করতে পারেন, তেমনি ওলামায়ে কেরাম ও রূহানি ডাক্তারগণ জবানের কথা শুনেই আত্মার ব্যাধিগুলো নির্ণয় করেন। হযরত আলী (রাযি.) বলতেন, তোমরা যতক্ষণ কথা না বলবে, ততক্ষণ তোমাদেরকে আলেম জ্ঞান করা হবে। কখনও তিনি

বলতেন, তোমরা কথা বলো; তাহলে তোমাদের চেনা যাবে। আবার কখনও বলতেন, মানুষ তার জিহ্বার তলে লুকিয়ে থাকে। অর্থাৎ– কিছু বলল তো সে তার হাকীকত খুলে দিল। কাজেই মানুষ ভেবেচিন্তে কথা বলবে। যে বলে, আমি সঠিক কথা বলি, তার একটু ক্ষোভের কথা শুনবেন। কারণ, যখন আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে, তখন তো আর প্রয়োজান হয় না যে, আবোলতাবোল বকবে। যখন কোনো অপ্রীতিকর বিষয় অন্তরে বজ্রের মতো এসে আঘাত হানে, তখনই আসল অবস্থা বোঝা যায়। তখনই দেখতে হবে, সে তার কী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে ভেবেচিন্তে উত্তর দেয়, নাকি মূর্খের মতো বাগ্‌বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়।

মোটকথা, মানুষের কথাবার্তার ধরন নির্ণয় করবেন রাগের সময়। সাধারণত দেখা যায়, রাগের সময় পুরুষের হাত আর মহিলার জবান নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। মহিলাদের জবান তো এমন তরবারি, যাতে কখনও মরিচা ধরে না। সর্বদাই সচল ও ঝকঝকা থাকে। অথচ জবানের তরবারি এমন আত্মীয়তার বন্ধনকেও ছিন্ন করে দেয়, যা লোহার তরবারিও ছিন্ন করতে পারে না।

একটু সামলে থাকুন

বন্ধুরা আমার! মজলিসে বসে কখনও নিজের ব্যাপারে মন্দ বলবেন না। আপনি যখন চলে যাবেন, এ দায়িত্ব আপনার বন্ধুরাই পালন করবে। কোনো-কোনো ব্যক্তি মজলিসে বসে নিজের অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করে। মূলত সে যেন একথাই বলছে, তোমরা আমাকে চিনে নাও। জ্ঞানীরা বলেন, ওলামায়ে কেরামের মজলিসে বসলে জবান সামলে বসবে, বিচারকের মজলিসে বসলে দৃষ্টি সামলে বসবে আর আল্লাহওয়ালাদের মজলিসে বসলে অন্তর সামলে বসবে। সাধারণত এমনটিই পরিলক্ষিত হয়েছে যে, দীর্ঘ জবান মানুষের আয়ু কমিয়ে দেয়। কেননা, যত বেশি বলবে, তত বেশি নিজের মাথার ওপর বিপদের বোঝা চাপবে।

আশ্চর্য উপদেশ

হযরত খাজা বাকি বিল্লাহ (রহ.) কথা খুবই কম বলতেন। জনৈক ব্যক্তি বলল, হযরত আপনি আমাদের নসীহত করুন; তাতে আমাদের উপকার হবে। তিনি জবাব দিলেন, যে আমার নীরবতা থেকে কিছু পায়নি, সে আমার সরবতা থেকেও কিছু পাবে না।

সুবহানাল্লাহ! কী দারুণ কথা বলেছেন!

কবি বলেছেন :

کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت

جتنا جسکا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے

'সমুদ্রের নীরবতা নদীর গর্জনকে ডেকে বলে, যার পাত্র যতখানি, তার নীরবতাও ততখানি।'

এ-কারণে আল্লাহওয়ালাগণ নীরব প্রকৃতির হয়ে থাকেন। হ্যাঁ; কোনো জ্ঞানের কথা হলে তাঁরা মুখ খোলেন। কোনো মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। এ ছাড়া তাদের কথা বলার কোনো অভিলাষ থাকে না। জবানের ভুল ব্যবহারের দরুন মানুষ তার মাথার ওপর পাহাড়তুল্য গুনাহের বোঝা চাপিয়ে নেয়। কথায় বলে, নির্বোধের গলায় ঘণ্টা বাঁধার প্রয়োজন হয় না। তার মুখের কথা-ই বলে দেয়, সে নির্বোধ। জ্ঞানীরা বলেন, বুদ্ধিমান ভেবেচিন্তে বলে আর নির্বোধ বলার পরে ভাবে। যেন বুদ্ধিমান ও নির্বোধের মাঝে পার্থক্য এতটুকুই যে, বুদ্ধিমান চিন্তা ভাবনা করে কথা বলে। আর নির্বোধ কথা বলার পরে ভাবতে শুরু করে। বরং এমন লোকের সাথে কথা কম বলবে, যার জবান মন্দ। কারণ, তার কোনো মন্দ কথার জবাবে তুমি কিছু বললে জবাব দেওয়ার জন্য আরো অনেক মন্দ কথা তার কাছে থাকবে।

মন্দ কথা থেকে বেঁচে থাকুন

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ইরশাদ করলেন, 'তোমরা তোমাদের মাতাপিতাকে গালি দিয়ো না।' সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেউ তার পিতামাতাকে কখনও গালি দেয় নাকি? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা কারো মাতাপিতাকে গালি দিবে আর জবাবে সে তোমার মাতাপিতাকে গালি দিবে। এটা এমন যেন তোমরা তোমাদের মাতাপিতাকে গালি দিলে।[১]

ভারতের কোনো এক শহরে একটি জমি নিয়ে বিবাদ দেখা দিল। মুসলমানদের দাবি হলো, জমিটি আমাদের আর হিন্দুদের দাবি জমিটি

---

১. বোখারি : হাদীছ নং ৫৩৩৬

আমাদের। হিন্দুরা সেখানে মন্দির বানাতে চায় আর মুসলমানরা মসজিদ বানাতে চায়। তখন শাসক ছিল ইংরেজ। আপসে লড়াই বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হলো। মামলাটি বড় নাজুক ছিল। বিচারকও চিন্তিত ছিলেন, যদি মীমাংসার কোনো পথ বেরিয়ে আসত, তাহলে ভালোই হত।

মামলার শুনানি শুরু হলো। ইংরেজ জজ জিজ্ঞাসা করলেন, মীমাংসার কোনো পদ্ধতি আছে কি? হিন্দুরা বলল, আমরা একটি প্রস্তাব দিচ্ছি, যাতে কোনো মামলা ছাড়াই নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। জজ বললেন, তা কী? তারা বলল, আমরা একজন মুসলমান আলেমের নাম বলব। আপনি তাকে আপনার কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করবেন। জায়গাটি মূলত কার? তিনি যদি বলেন, হিন্দুদের, তাহলে আমাদের দিয়ে দিন আর যদি বলেন, মুসলমানদের, তাহলে তাদের দিয়ে দিন। তবে আমরা তার নাম কেবল আপনাকেই বলব – জনসম্মুখে প্রকাশ করব না। একথার ওপর জজ রায় স্থগিত করলেন এবং মামলার শুনানির জন্য নতুন তারিখ ধার্য করলেন। লোকজন আদালত কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল। হিন্দু জনসাধারণ তাদের নেতৃবর্গের ওপর চরম অসন্তুষ্ট হতে লাগল যে, তোমরা তো সর্বনাশ করেছ, যার নাম দিয়েছ, সে তো মুসলমান। সে তো মুসলমানদের পক্ষেই কথা বলবে। অপর দিকে মুসলমানরা আনন্দে আত্মহারা হচ্ছিল যে, সাক্ষ্য প্রদানের জন্য একজন মুসলমান আলেমকে নির্বাচন করা হয়েছে। তিনি যেহেতু মুসলমান; তাই মসজিদ বানানোর কথা-ই বলবেন।

সকলেই সেই দিনটির অপেক্ষায় প্রহর গুণছে। মামলার তারিখে বিপুলসংখ্যক লোক আদালতে এসে পৌঁছল। এজলাস শুরু হলো। একজন আল্লাহওয়ালাকে সামনে হাজির করা হলো, যার সাক্ষ্য হিন্দুরাও মানতে প্রস্তুত ছিল। জজ তাঁকে বললেন, আপনি বলুন, জমিটি কি হিন্দুদের, নাকি মুসলমানদের?

আলেম বললেন, জমিটি হিন্দুদের। জজ বললেন, তাহলে কি হিন্দুরা তাতে মন্দির বানাতে পারে? তিনি বললেন, মালিকানা যখন হিন্দুদের, এখন তারা তাতে মন্দির নির্মাণ করুক বা ঘর নির্মাণ করুক সেটা তাদের ইচ্ছা। নির্মাণের ব্যাপারে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।

জজ ঐতিহাসিক এ মামলাটির রায় ঐতিহাসিক শব্দে লিখলেন–

آج کے اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا

'আজকের এই মামলায় মুসলমান পরাজিত হলো; কিন্তু ইসলাম জিতে গেল।'

জজ যখন রায় শোনালেন, তখন হিন্দুরা বলল, মাওলানা সাহেব! আপনি সাক্ষ্য আমাদের পক্ষে দিয়েছেন। এবার আমরা কালিমা পড়ে মুসলমান হব এবং জায়গাটিতে মসজিদ নির্মাণ করব।

সুবহানাল্লাহ! সত্য বলার বরকতে আল্লাহ হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দান করলেন এবং সেখানে মসজিদ নির্মাণেরও তাওফীক দান করলেন। সত্যের জয় হলো।

কোনো কবি কতই-না চমৎকার বলেছেন :

ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق

یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق

'হাজারো ভীতি থাকুক জবান হবে দিলের বন্ধু

তবু আদিকাল থেকে সুফী-সাধকদের এ নীতির ব্যত্যয় হয়নি কভু।'

গুনাহ মাফের পদ্ধতি

বর্তমানে অনেক বন্ধু প্রায়শই অভিযোগ করে, লতিফাগুলো তাজা হচ্ছে কিনা সেই খবর নেই। মাকাম অতিক্রম হচ্ছে কিনা, কদম সামনে অগ্রসর হচ্ছে কিনা তাও জানা নেই। বলতে পারেন, এর কারণ কী? এর কারণ হলো, মানুষ তার অঙ্গগুলোর ভুল ব্যবহার করছে। ফলে পথ্য বর্জন করে ওষুধ সেবনকারী রোগীর দশা হচ্ছে। বলুন, তার আরোগ্য কীভাবে হবে?

অন্তরে গুনাহের বোঝা পড়ে থাকলে মুখে তাসবীহ জপলে কী ফল হবে? আমার বন্ধুরা! আমাদের উচিৎ, আপন-আপন জবানের সঠিক ব্যবহার করা। আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত আমাদেরকে জবানের সঠিক ব্যবহারের তাওফীক দান করুন। এ যাবত জবানের মাধ্যমে যত গুনাহ আমরা করেছি, আল্লাহ তা'আলা সেগুলো মাফ করে দিন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

আত্মার সংশোধন

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

أَلا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ

'নিঃসন্দেহে বনী আদমের দেহে একটা গোস্তের টুকরা আছে। যখন সেটা খারাপ হয়ে যায়, তখন সমস্ত দেহ খারাপ হয়ে যায়। আর যখন তা ভালো হয়ে যায়, তখন গোটা দেহ ঠিক হয়ে যায়। জেনে নাও, তাহলো মানুষের অন্তর।'

আত্মার সংশোধন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ﴿٨٨﴾ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٨٩﴾

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

আত্মার সংশোধন

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

'নিঃসন্দেহে বনী আদমের দেহে একটা গোস্তের টুকরা আছে। যখন সেটা খারাপ হয়ে যায়, তখন সমস্ত দেহ খারাপ হয়ে যায়। আর যখন তা ভালো হয়ে যায়, তখন গোটা দেহ ঠিক হয়ে যায়। জেনে নাও, তাহলো মানুষের অন্তর।'[১]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ إِلٰى صُوَرِكُمْ وَلَا إِلٰى أَمْوَالِكُمْ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের চেহারা আর সম্পদের প্রতি তাকান না। তিনি তাকান তোমাদের অন্তর ও আমলসমূহের প্রতি।'[২]

'বোঝা গেল, মানুষের অন্তর ঠিক হয়ে গেলে আমলও ঠিক হয়ে যায়। অন্তর নষ্ট হয়ে গেলে আমলও নষ্ট হয়ে যায়। অন্তর মানুষের জন্য রাজার মতো। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

---

১. বোখারি : হাদীছ নং ৫০

২. ছহীহ মুসলিম : হাদীছ নং ৪৬৫০

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ

'আল্লাহ তা'আলা কোনো ব্যক্তির বক্ষে দুটি অন্তর সৃষ্টি করেননি।'[১]

এমন হলে না হয় একটা রহমানের জন্য আর অপরটা শয়তানের জন্য হতো। না-না, অন্তর মাত্র একটা। আর তা এক সত্তার জন্যই। আল্লাহর স্মরণ দ্বারা অন্তর সুবাসিত থাকার চেষ্টা যেন মানুষের থাকে। এ অন্তর যেন আল্লাহর দিকে ঝুঁকে থাকে।

জান্নাত কাদের জন্য?

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ﴿٨٨﴾ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٨٩﴾

'সেদিন উপকার করবে না কোনো ধনসম্পদ, না সন্তানসন্ততি। তবে যে আসবে সুস্থ হৃদয় নিয়ে।'[২]

কেয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, সেদিন সম্পদ-সন্তান কোনো উপকারে আসবে না। তবে যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আসবে, তা তার কাজে আসবে। মনে হচ্ছে, যেন আল্লাহ অন্তর-ব্যবসায়ী; বান্দার কাছ থেকে অন্তর খরিদ করতে চান যে, তোমরা আমাকে তোমাদের অন্তর দিয়ে দাও; বিনিময়ে আমার জান্নাতগুলো তোমাদের কাছে হস্তান্তর করব। এবার একটু ভাবুন, আমরা তো আমাদের এক টাকার বিনিময়ে একটা ত্রুটিযুক্ত আপেলও গ্রহণ করতে রাজী নই। তাহলে আল্লাহ তা'আলা আপন জান্নাতসমূহের বিনিময়ে আমাদের দাগী অন্তর কীভাবে গ্রহণ করবেন?

এজন্যই বলেছেন :

اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ

'তবে যে নিখুঁত ও সুস্থ অন্তর নিয়ে আসবে...।'

মানে, এমন অন্তর, যা অন্যের মহব্বত থেকে পবিত্র এবং অন্যের প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকবে। এমন অন্তরকেই قلب سليم (নিখুঁত অন্তর) বলা হয়। এমন অন্তরই তার কাজে আসবে।

---

১. সূরা আহযাব : আয়াত ৪

২. সূরা শু'আরা : আয়াত ৮৮, ৮৯

এ কারণেই আল্লাহ ইরশাদ করেছেন :

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ

'মানুষের অন্তরে যা আছে, হাশরের দিন সব খুলে তিনি প্রকাশ করে দেবেন।'[১]

আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তরের অবস্থা দেখবেন যে তাতে আল্লাহর মহব্বত আছে কি-না? অন্তরে মায়ের মহব্বত বেশি, নাকি আপন মালিক ও স্রষ্টার মহব্বত বেশি।

অন্তর শক্ত হয় কীভাবে?

মানুষের অন্তর জমির মতো। মানুষ যদি দীর্ঘদিন যাবৎ জমি চাষাবাদ না করে, তাহলে সেই জমি আবাদের অযোগ্য হয়ে যায়। সেই জমি ফসল উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। কারণ, তাতে মেহনত করা হয়নি। ফলে জমিটি শক্ত হয়ে গেছে। এমনিভাবে মানুষের অন্তরের ওপর যখন মেহনত বন্ধ করে দেওয়া হয়, তখন ধীরে-ধীরে অন্তর শক্ত হয়ে যায়। আর অন্তর যখন শক্ত হয়ে যায়, তখন তা পাথরের চেয়েও বেশি শক্ত হয়। ইরশাদ হচ্ছে :

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ

'তার পর তোমাদের অন্তর শক্ত হয়ে গেল।'[২]

فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً

'ফলে তা পাথরের মতো বা তারচেয়েও বেশি শক্ত হয়ে গেছে।'[৩]

নিঃসন্দেহে পাথর থেকে ঝরনা প্রবাহিত হয়। আবার ফেটে অনেক সময় তা থেকে পানি বেরিয়ে আসে। আবার কোনো-কোনো পাথর এমনও রয়েছে, যা আল্লাহর ভয়ে কেঁপে ওঠে। কিন্তু হে মানুষ! তোমার অন্তর যখন শক্ত হয়, তখন আল্লাহর ভয়েও কাঁপে না। অন্তরের এই কঠোরতা দেখে পাথরও লজ্জা পায়। মানুষের কাছে একটিমাত্র পুঁজি আছে, যা সংশোধন করলেই আল্লাহর কাছে সে সফল হয় আর ধ্বংস করলে একেবারেই বিফল হয়ে যায়।

---

১. সূরা আদিয়াত : আয়াত ১০

২. সূরা বাকারা : আয়াত ৭৪

৩. সূরা বাকারা : আয়াত ৭৪

অন্তর কীভাবে অন্ধ হয়?

অলসতাপূর্ণ জীবন যাপন করলেই মানুষের অন্তর অন্ধ হয়ে যায়। একেবারে এমন অন্ধ হয়ে যায় যে, নেকি-বদির তারতম্যও করতে পারে না। যেমন কারো চর্মচোখ না থাকলে সে বন্ধু-শক্রর মাঝে, আলো-অন্ধকারের মাঝে পার্থক্য করতে পারে না। কোনটি উপকারী আর কোনটি ক্ষতিকর নির্ণয় করতে পারে না। তেমনি মানুষের অন্তর অন্ধ হয়ে গেলে সে বড়-বড় গুনাহ করে ফেলে। কিন্তু তার মাথার একটা উকুনও টের পায় না, আমি আল্লাহর নাফরমানী করেছি কি-না? ভালো মানুষের সঙ্গ তার ভালো লাগে না, অসৎ মানুষের সঙ্গই তার ভালো লাগে। এখন আর তার বন্ধু-শক্রর পার্থক্যজ্ঞান রইল না। রইল না নেকি-বদির তারতম্যজ্ঞান। আলো ও অন্ধকারের পার্থক্য তার জানা নেই। কারণ, অন্তর অন্ধ হয়ে গেছে। পৃথিবীতে এমন একটা জাতি অতিবাহিত হয়েছে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ

'তারা ছিল অন্ধ জাতি।'[১]

কথাটির অর্থ কী? তাদের কি চর্মচোখ ছিল না? না; এমন কোনো বর্ণনা মিলেনি যে, একটা জাতির সব কজন লোকই অন্ধ ছিল। হ্যাঁ; এমন একটা জাতি অতিক্রম করেছে, যারা তাদের নবীর নির্দেশ মানেনি, তার ওপর ঈমান আনেনি। ফলে আল্লাহ বলে দিয়েছেন :

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ

'তারা ছিল অন্ধ জাতি।'

তারা তাদের নবীকে চিনেনি। চিনেনি তাদের মালিক ও স্রষ্টাকে এবং ঈমান গ্রহণ করেনি। তাদেরই অন্ধ জাতি বলা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا

'আর যে এ পৃথিবীতে অন্ধ থাকবে, সে আখেরাতেও অন্ধ থাকবে এবং হবে সে পথহারা।'[২]

---

১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ৬৪

২. সূরা বানী ইসরাঈল : আয়াত ৭২

এর অর্থ কি এই যে, দুনিয়াতে যার দৃষ্টিশক্তি থাকবে না আখেরাতেও তার দৃষ্টিশক্তি থাকবে না? না-না। এর অর্থ হলো, যে দুনিয়াতে আল্লাহর আদেশ অবজ্ঞা করে চলেছে এবং আল্লাহর নির্দেশ এড়িয়ে ফিরছে, তার হুকুম হতে অন্ধ হয়ে আছে, পরকালে আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিবেন। তাই তিনি অন্যত্র ইরশাদ করেন :

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمٰى

(যখন অন্ধ অবস্থায় দাঁড় করানো হবে, তখন সে বলবে) 'হে প্রভু! আমাকে অন্ধ বানিয়ে দিলেন কেন?'[১]

وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا

'অথচ, পৃথিবীতে আমি চক্ষুষ্মান ছিলাম![২]

قَالَ كَذٰلِكَ أَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى

'(তখন) বলা হবে, যখন তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। অনুরূপ আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হলো।'[৩]

বোঝা গেল, যে মানুষ আপন পরওয়ারদেগারের নির্দেশ অমান্য করবে এবং তা এড়িয়ে চলবে, তাকে পরকালে দৃষ্টিশক্তি থেকে বঞ্চিত করা হবে এবং অন্ধ করে উঠানো হবে।

যারা আল্লাহর পথে না চলে নফস ও শয়তানের গ্রাসে পরিণত হয়েছে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَآ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ ۝

'তাহলে তারা জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন অন্তর এবং শ্রবণশক্তিসম্পন্ন কানের অধিকারী হতে পারত। বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ নয় বরং অন্ধ হলো বক্ষস্থিত অন্তর।'[৪]

---

১. সূরা ত্বহা : আয়াত ১২৫
২. সূরা ত্বহা : আয়াত ১২৫
৩. সূরা ত্বহা : আয়াত ১২৬
৪. সূরা হজ : আয়াত ৪৬

অন্তরে মহর লাগে কীভাবে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'মানুষ গুনাহ করলে তার অন্তরে একটা দাগ বসিয়ে দেওয়া হয়। পুনরায় গুনাহ করলে আরেকটা দাগ বসিয়ে দেওয়া হয়। পুনরায় গুনাহ করলে আরও একটা দাগ বসিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে দাগ দিতে-দিতে এমন একটি সময় চলে আসে যে, অন্তর একেবারেই কালো হয়ে যায়। একপর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা তাতে মহর এঁটে দেন।'[১]

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ

'আল্লাহ তাদের অন্তরে মহর এঁটে দিয়েছেন।'[২]

যার অন্তর একেবারে কালো হয়ে যায়, ভালো কাজের প্রতি মোটেই আকর্ষণ থাকে না, তার সম্পর্কেই বলা হয়, অন্তরে মহর এঁটে গেছে।

অন্তর পরিষ্কার হয় কীভাবে?

মানুষ যখন তাওবা করে, তখন তার অন্তরের কালিমা ও কঠোরতা দূর হয়ে যায় এবং মানুষ যখন আল্লাহপাকের সম্মুখে মাথানত করে আপন গুনাহ থেকে সত্যিকার তাওবা করে, তখন আল্লাহ তার অন্তরকে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেন। একবার হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে ওহী এল, আপনার অন্তরকে ধুয়ে ফেলুন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! ওখানে তো পানি পৌঁছে না; কীভাবে ধোব? ইরশাদ হলো, পানি দ্বারা নয়; এই অন্তর তো আমার সামনে ক্রন্দনের মাধ্যমে ধৌত হয়। অর্থাৎ তুমি যদি আমার দরবারে তোমার গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা কর, অনুনয়বিনয় ও কান্নাকাটি কর, তাহলে চোখের অশ্রু ঝরানোর মাধ্যমে তোমার অন্তর পরিষ্কার করে দেওয়া হবে। এভাবেই অন্তর ধৌত হয়।

অন্তরের খাদ্য কী?

মানুষের দেহের জন্য আল্লাহ তা'আলা খাদ্য তৈরি করেছেন। মানুষ সেই খাদ্য গ্রহণ না করলে দেহ দুর্বল হয়ে পড়ে, শরীর কাজের অনুপযুক্ত হয়ে যায়। অনুরূপ অন্তরেরও খাদ্য রয়েছে। তা হলো নেক কাজ করা, আল্লাহওয়ালাদের মজলিসে বসা, আল্লাহর যিকির এসব হলো অন্তরের খাদ্য।

---

১. সুনানে তিরমিযী : হাদীছ নং ৩২৫৬

২. সূরা বাকারা : আয়াত ৭

অন্তরের পালিশ কি?

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

لِكُلِّ شَيْئٍ صِقَالَةٌ

'প্রতিটি জিনিসেরই পালিশ আছে।'

যেমন জুতা পালিশ করলে খুব চকচক করে। এমনিভাবে লোহারও পালিশ আছে। রেত দিয়ে ঘর্ষণের ফলে লোহা চকচক করে। এমনিভাবে কাপড়ের পালিশ হলো সাবান। সাবান দিয়ে কাপড় ধৌত করলে কাপড় পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়। ঠিক তেমনি ইরশাদ হচ্ছে–

لِكُلِّ شَيْئٍ صِقَالَةٌ وَصِقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللهِ

'সব জিনিসেরই পালিশ আছে। অন্তরের পালিশ হলো আল্লাহর স্মরণ।'[1]

ফলে যে মানুষটি আল্লাহ-আল্লাহ যিকিরে নিমগ্ন থাকে, তার অন্তরের কালিমা পরিষ্কার হয়ে যায় এবং গুনাহের ময়লা নিঃশেষ হয়ে যায়।

আল্লাহওয়ালাদের মজলিসের বরকত

আল্লাহওয়ালাদের মজলিসগুলো এমনই হয় যে, তাদের মজলিসে প্রতিটি মুহূর্তে মানুষের গুনাহ ঝরে। হেমন্তকালে গাছের পাতা ঝরার মতো মানুষের গুনাহ ঝরতে থাকে। আল্লাহর যিকিরের দরুন অন্তরের কঠোরতা দূর হয়। মৃত অন্তর প্রাণবন্ত হয়।

একটি বিস্ময়কর ঘটনা

একব্যক্তি হাসান বসরী (রহ.)-এর মাহফিলে এসে বলল, আমাদের কী হয়ে গেল যে, মনে হচ্ছে, আমাদের অন্তরগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে? আপনি উপদেশ দিচ্ছেন; কিন্তু তা আমাদের ওপর কোনো ক্রিয়া করছে না। তিনি বললেন, ঘুমন্ত ব্যক্তিকে তো নাড়া দিলেই জেগে ওঠে। তোমরা যদি তাতেও সজাগ না হও, তাহলে তোমরা ঘুমন্ত নও; তোমরা বরং মৃত। যে মানুষ আল্লাহওয়ালাদের মজলিসে এসে নসীহত গ্রহণ করে না, গুনাহ থেকে খাঁটি তাওবা করে না, ভবিষ্যতে নেক আমলের নিয়ত করে না, নিঃসন্দেহে তার অন্তর ঘুমন্ত নয়; বরং মৃত। কত মানুষ এমন আছে, যারা জীবিত – পানাহার

---

১. মিশকাত : হাদীছ নং ২২৮৬

করে, চলাফেরা করে, তথাপি তাদের ভেতরের মানুষটা মৃত। ভেতরে মানুষের আকৃতি মোটেও নেই। অন্তরের প্রতি একটু তাকালে তার আকৃতি পশুর মতো দৃষ্টিগোচর হবে। এক-একজনকে এক-এক আকৃতির মনে হবে। অভ্যন্তরেও মানুষের আকৃতি থাকা এটা তো কোনো ভাগ্যবানেরই কপালে জোটে।

اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی

تو اگر میرا نہیں بنتا، نہ بن، اپنا تو بن

'আপন হৃদয়সাগরে ডুব দিয়ে তুমি জীবনের সার্থকতা লাভ করো।

তুমি যদি আমার না হবে, না হও, নিজের তো হবে।'

হে মানুষ! তুমি তোমার হৃদয়-মাঝে একটু তাকিয়ে তার জানালাগুলো খুলে দাও। নিজের আসল রূপটা একটু দেখে নাও, তোমার কী হওয়া উচিৎ ছিল আর তুমি কী হয়ে ফিরছ।

অন্তরের খোরাক কী?

অন্তর তার খোরাকের প্রতি এমনি মুখাপেক্ষী, যেমন দেহ তার খোরাকের প্রতি মুখাপেক্ষী। ওয়াজ-নসীহত, আল্লাহর স্মরণ ও আল্লাহওয়ালাদের মজলিস হলো অন্তরের খোরাক। এর ফলে অন্তর্জগতের চিত্র পাল্টে যায়।

হাকীম আনসারীর ঘটনা

চোখের জ্যোতি এক জিনিস আর অন্তরের জ্যোতি ভিন্ন জিনিস। হাকীম আনসারী দিল্লীর একজন বিখ্যাত হাকীম ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অনেক মেধা ও বিচক্ষণতা দান করেছিলেন যে, তিনি অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজ করতেন। রোগীর হাত ধরেই রোগ নির্ণয় করে ফেলতেন। চোখ না থাকায় রোগীর চেহারা দেখতে পেতেন না। দেখতেন না তার রং ও জিহ্বা। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁকে এতই বিচক্ষণতা দান করেছিলেন যে, তিনি রোগীর শিরা ধরেই সকল রোগ নির্ণয় করে ফেলতেন। বিখ্যাত হাকীম ছিলেন। অন্যান্য হাকীমরা ব্যর্থ হলে রোগীরা তার কাছে যেত। আমাদের সিলসিলার একজন বুযুর্গ খাজা আব্দুল মালেক সিদ্দীকি (রহ.) বলেন, আমার হাকীম সাহেবকে দেখার বড় আগ্রহ জন্মাল। ফলে আমি তার দোকানে গিয়ে কিছু না বলে চুপচাপ বসে তার অন্তরের ওপর তাওয়াজ্জুহ দিতে লাগলাম

যেন তিনি কিছুই বুঝতে না পারেন। কিছুক্ষণ পর আমি ভাবলাম, অন্তরের পরিবর্তে রূহের প্রতি তাওয়াজ্জুহ দিতে শুরু করি। আমি যখন রূহের প্রতি তাওয়াজ্জুহ দিতে চাইলাম, অমনি তিনি বলে উঠলেন, না হযরত! আপনি আমার অন্তরের প্রতিই তাওয়াজ্জুহ দিতে থাকুন। কারণ, এটি ঠিক হয়ে গেলে সবই ঠিক হয়ে গেল। আমি অবাক হয়ে গেলাম! এ ব্যক্তিকে অন্ধ বলে কে? যার অন্তর এত স্বচ্ছ যে, কিছু না বলতেই আগন্তুকের নূর (জ্যোতি) অনুভব করছেন। আল্লাহু আকবার!

دل بینا بھی کر خدا سے طلب   آنکھ کا نور دل کا نور نہیں

'দৃষ্টিমান অন্তরও খোদার কাছে করো কামনা
চোখের জ্যোতি আর অন্তরের জ্যোতি কভু সমান হয় না।'

অন্তরের ছানি ও তার চিকিৎসা

চোখে এক ধরনের ছানি বা পর্দা পড়ে। চোখ বাহ্যত ঠিকই থাকে; কিন্তু পর্দার কারণে দেখা যায় না। তেমনি মানুষ যখন গুনাহের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়, তখন তার অন্তরে ছানি পড়ে যায়। অর্থাৎ ছানি পড়লে মানুষ সারাদিন নামায কাজা করতে থাকে। কোনো পরোয়া-ই করে না। মুখে মিথ্যা বলতে কোনো পরোয়া-ই করে না। অথচ কোনো-কোনো হাদীছে ইরশাদ হয়েছে, মানুষ মিথ্যা বললে তার মুখ হতে এত দুর্গন্ধ বের হয় যে, ফেরেশতা তার নিকট থেকে দুই মাইল দূরে চলে যায়।[১]

এত দুর্গন্ধ বের হওয়া সত্ত্বেও মানুষ টের পায় না। যে জমিনের ওপর গুনাহ করা হয়, কিতাবে লিখা আছে, সেই জমি চিৎকার করে আর ডাকতে থাকে, হে আল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি আপনার এই নাফরমান বান্দাটাকে গ্রাস করে ফেলি। কিন্তু মানুষ গুনাহে মত্তই থাকে। সে কোনো পরোয়া-ই করে না।

চোখে ছানি পড়লে যেমন মানুষ ডাক্তারের কাছে গিয়ে চিকিৎসা করায়, তেমনি অন্তর কঠোর হয়ে গেলে মানুষ আল্লাহওয়ালাদের মজলিসে যায়। তাদের কাছে গেলে অন্তরের ছানি দূর হয়ে যায়। অন্তর দৃষ্টি ফিরে পায়। অন্তর পুনরায় দেখতে শুরু করে। এক আঘাতের ফলেই মানুষের অন্তরে বিপ্লব সাধিত হয়।

---

১. তিরিমিযি : হাদীছ নং ১৯৭২

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا

نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں

'তার বাহুবল কি কেউ অনুমান করতে পারে?

ঈমানদারের দৃষ্টির ফলে ভাগ্যসমূহ বদলে যেতে পারে।

অনেক সময় অনেক বিপথগামী মানুষও আল্লাহওয়ালাদের সংশ্রবে আসে এবং এক দৃষ্টিতেই তাঁর অন্তর্জগৎ সম্পূর্ণ বদলে যায়।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টি

সাহাবায়ে কেরাম পূর্বে কুফর ও শিরকের গুনাহে নিমজ্জিত ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে যখন এলেন, তাঁর দৃষ্টির এমনই প্রভাব ছিল যে, তাদের অন্তর ধুয়ে-মুছে একদম পরিষ্কার করে দিলেন।

خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے

وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا

'যাদের ছিল না পথের দিশা হলেন দিশারী অন্যের তারা,

কেমন ছিল সেই দৃষ্টি যাহা মৃতে জাগাল প্রাণের সাড়া।'

আল্লাহর ভালোবাসার রং

কেউ রংনির্মাতা, কেউ রংবিক্রেতা। আবার কেউ রংশিল্পী, যিনি রং বিক্রি করেন, তিনি হলেন রং বিক্রেতা। যিনি কাপড়ে রং লাগান, তিনি হলেন রংশিল্পী। কুরআন-সুন্নাহ হলো এক জাতীয় রং আর সুফী-মাশায়েখগণ রংশিল্পী। যারা তাদের কাছে গমন করে, তাদের অন্তরে তারা কুরআন সুন্নাহর রং লাগিয়ে দেন। আল্লাহু আকবার!

আল্লাহর রং ও অন্তর

صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً

'আল্লাহর রং; আল্লাহর রঙের চেয়ে ভালো রং আর কার হতে পারে?'[১]

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ১৩৮

মানুষ যদি এমন লোকদের মজলিস লাভ করে এবং আল্লাহর যিকিরের সংকল্প করে আর মৃত্যুমুখে পতিতাবস্থায়ও যদি অন্তর সংশোধন হয়ে যায়, তবুও সে সফল।

মানুষের জীবন কতটুকু?

মানুষ এই ভাবনা নিয়েই গুনাহ করে যে, তাওবা করে নেব। আর পরে তাওবা এজন্য করে না যে, জীবন তো এখনও অনেক বাকি। ইমাম গায্যালি (রহ.) বলেছেন, হে বন্ধু! তুমি কি জান, যে কাপড়ে তোমার কাফন হবে, সেই কাপড় বাজারে পৌঁছে গেছে?

মানুষ একথা বলেই গুনাহ করে যে, তাওবা করব। আর তাওবা করে না এজন্য যে, তার জীবন অনেক দীর্ঘ। অথচ সে জানে না, তার জীবন অতি নগণ্য।

آشیانہ شاخ گل پہ کب تیری میراث ہے　بس غنیمت جان لے جتنا بسیرا ہو گیا

غنیمت جان لو ملکر بیٹھنے کو جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے

غنیمت سمجھ زندگی کی بہار آنا نہ ہوگا یہاں بار بار

'ফুলের ডালের পাখির বাসায় অধিকার ছিল কিসের তোমার?
রাত্রি যাপনের যতখানি সুযোগ পেয়েছ তাহা ভেবে নাও গনীমতের
গনীমত জেনে নাও একত্রে বসার সুযোগখানি।
বিরহের ক্ষণ তোমার শিয়রে দাঁড়িয়ে দিচ্ছে যে হাতছানি।'
গনীমত ভেবে নাও জীবনের বসন্তকালটুকু
জেনে রাখো এখানে বারবার আসা হবে না কিন্তু।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করলেন, জীবনের ব্যাপারে তোমার ভাবনা কী? আরজ করলেন, সকালে ঘুম থেকে উঠে এতটুকু নিশ্চয়তা পাই না যে, জীবনে পুনরায় রাত আসবে কিনা? অপর একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন মনে করছ?

বললেন, চার রাকাত নামাযের নিয়ত বাঁধি আর ভাবি, শেষ করতে পারব কিনা আমার জানা নেই।

এবার নবীজি বললেন, আমার অবস্থা তো এই যে, একদিকে নামাযের সালাম ফিরানোর পর অপর দিকে ফিরাতে পারব কিনা সেই নিশ্চয়তাটুকুও পাই না।

এই তো হলো জীবন। আমার আশ্চর্য বোধ হয় তার প্রতি, যে তাওবা করবে বলে গুনাহ করে। আবার জীবনটাকে দীর্ঘ মনে করে তাওবা করে না। নিঃসন্দেহে এ মানুষটা ধোঁকায় পড়ে আছে।

আল্লাহ্ তা'আলা কী ভালোবাসেন?

নবীজি ইরশাদ করেন :

إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের চেহারার দিকেও তাকান না, তোমাদের টাকা পয়সার প্রতিও না। তিনি তাকান কেবল তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি।'[১]

আল্লাহু আকবার!

হযরত বেলাল হাবশী (রাযি.)-এর রং ছিল কালো। ঠোঁট মোটা আর দাঁত লম্বা। কিন্তু আল্লাহর কাছে এতই গ্রহণযোগ্য ছিলেন যে, নবীজি আরশে গমনকালে জান্নাতে কার যেন পদধ্বনি শুনতে পেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, এ কার পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি জিবরীল? জিবরীল (আ.) বললেন, এ আপনার গোলাম বেলালের পায়ের শব্দ।

তাঁর কদম জমিনে পড়ত আর তার আওয়াজ জান্নাতে গিয়ে পৌঁছত।

মানুষ যেন তার অন্তর সংশোধন করে নেয়। কেননা, আল্লাহ হলেন অন্তর ব্যবসায়ী। তিনি চান, হে মানুষ! তুমি আমাকে তোমার অন্তরে বসিয়ে নাও। যদি এমন না হয়, তাহলে মানুষ দুনিয়াতেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং আখেরাতেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অন্তর নষ্ট হওয়া খুবই সহজ। কিন্তু অন্তরের সংশোধন বড়ই কঠিন কাজ। যিনি সংশোধিত হন কিংবা যিনি সংশোধন করেন, তিনিই বলতে পারেন – অন্যরা জানে না। মানুষ যে পথে চলে, সেই পথের অণু-পরমাণুও তার দৃষ্টিগোচর হয়। আর যে পথে চলে না, সেই পথের পাহাড়ও তার নজরে আসে না। যেলোক সংশোধনের পথে কখনও চলেনি, এ পথে কত-কত সাধনা করতে হয়, তা সে কী করে জানবে?

---

১. ছহীহ মুসলিম : হাদীছ নং ৪৬৫০

খাঁটি মুসলমান কে?

আমরা তো মুখে কেবল কালিমা পড়ে নিয়েছি আর ভাবছি, ইসলাম খুবই সহজ।

یہ شہادت گہہ الفت میں قدم رکھنا ہے
لوگ آساں سمجھتا ہے مسلماں ہونا

এ সাক্ষ্য তো ভালোবাসার শ্রেণীতে কেবল পা রাখা
মানুষ অতি সহজ ভাবে মুসলমান হওয়া।

ব্যাপার হলো, আমরা কালেমা তো পড়ে নিয়েছি; কিন্তু নিজের ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। ভাবুন তো, জীবনের চল্লিশটা বছর পেরিয়ে গেল; এই সময়ে আমাদের চোখ কি মুসলমান হয়েছে? আমাদের মুখ কি মুসলমান হয়েছে? কান কি মুসলমান হতে পেরেছে?

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে খাঁটি মুসলমান বানিয়ে দিন।

خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل
دل ونگاہ مسلماں نہیں تو کچھ بھی نہیں

'বিবেক লা ইলাহা বলে দিলেও লাভ কী হলো?
অন্তর ও দৃষ্টি মুসলমান না হলে সবই বৃথা গেল!

অন্তরের বসতি

অন্তরকে নষ্ট করা সহজ। গড়া বেশ দুরূহ । কোনো এক কবি কতই-না মজার কথা বলেছেন :

ویرانے بھی دیکھے ہیں آبادی بھی دیکھی ہے
جو اجڑے کو پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہے
دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا کھیل نہیں بھائی
بستی بسنا کھیل نہیں یہ تو بستے بستے بستی ہے

মরুপ্রান্তর আর আবাদ ভূমি সবই আছে দেখা মোর

অন্তর সে অদ্ভুত বস্তি যা ধ্বংস হলে কভু আবাদ হয় না ফের।

অন্তর ধ্বংস করা সহজ বটে আবাদ করা তামাশা নহে ভাই

বস্তি আবাদ করা তামাশা নয় আবাদ হতে হতেই তো তা বস্তি হয়।

বসতি আবাদ করা কোনো মামুলি কাজ নয়। শহর আবাদ হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। শহর আবাদ হতে-হতে বহু জীবন ক্ষয় হয়ে যায়। তারপর শহর আবাদ হয়।

কবি এ কথাটিই বলেছেন যে, অন্তর আবাদ হওয়া কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়। অনেক কষ্ট-ক্লেশের পর যেমন শহর আবাদ হয়, তেমনি অন্তরও বহু সাধনার পর আবাদ হয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আমাদের অন্তরসমূহ সংশোধনের তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

বিজ্ঞান ও মানুষ

'আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

'প্রতিটি জিনিসই আমি জোড়া-জোড়া সৃষ্টি করেছি, যেন তোমরা উপদেশ লাভ করতে পার।'

উক্ত আয়াতে কারীমার প্রতি তাকালে মনে হয়, এটিই গোটা বিজ্ঞানের উৎস। একদিকে পুরুষ আর তার জোড়া হলো নারী। এমনিভাবে জীবজন্তু, পশু-পাখিদের মাঝেও রয়েছে জুড়ি। আয়াতটির ব্যাখ্যা শুধু এতটুকুই নয়; বরং এর ব্যাখ্যা অনেক দীর্ঘ।'

বিজ্ঞান ও মানুষ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ . بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ .

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

বিজ্ঞানের উৎস

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

'প্রতিটি জিনিসই আমি জোড়া-জোড়া সৃষ্টি করেছি, যেন তোমরা উপদেশ লাভ করতে পার।'[১]

উক্ত আয়াতে কারীমার প্রতি তাকালে মনে হয়, এটিই গোটা বিজ্ঞানের উৎস। একদিকে পুরুষ আর তার জোড়া হলো নারী। এমনিভাবে জীবজন্তু, পশু-পাখিদের মাঝেও রয়েছে জুড়ি। আয়াতটির ব্যাখ্যা শুধু এতটুকুই নয়; বরং এর ব্যাখ্যা অনেক দীর্ঘ।

বিশ্বজগতের সবকিছুই জোড়া জোড়া

একটু চিন্তা করলেই বিশ্বজগতের সবকিছু জোড়া-জোড়া দেখতে পাবেন। যেমন– জমিন আর আসমান একটা জোড়া । আসমান বৃষ্টি বর্ষণ করে আর জমিন তাকে নারীর মতো টেনে নেয়। আর উৎপাদিত ফসলাদি যেন জমিনের সন্তান। উদ্ভিদ বিজ্ঞান নিয়ে যারা পড়াশোনা করেন, তারা জানেন, চারাগুলোতে জোড়া রয়েছে। বাতাসের মাধ্যমে বীর্য এক চারা থেকে অন্য চারায় গিয়ে পড়ে। ফলে জন্ম নেয় নতুন ফুল।

মোটকথা, গোটা উদ্ভিদজগতেও জুড়ি রয়েছে। আর একটু ভাবলে উষ্ণতা-আদ্রতা, দিন-রাত সবকিছুতেই রয়েছে জোড়া। আধুনিক বিজ্ঞান তো

---

১. সূরা যারিয়াত : আয়াত ৪৯

বলে বস্তুজগতের প্রতি তাকালেও আমরা দেখতে পাব, জীব ও জড় বস্তুর জোড়া। আরও একটু গভীরে গেলে দেখব, বস্তুজগতের মূল উপাদান হলো পরমাণু। আর পরমাণুতেও রয়েছে ইলেকট্রন ও প্রোটন-এর জোড়া। রসায়ন জগতের সব (Reaction) প্রতিক্রিয়ার মূলে রয়েছে পরমাণু আর প্রতিটি যৌগিক বস্তু Negative ও Positive Ion তথা পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। আর তখনই বস্তুটি পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল হয়। এমনিভাবে কিছু জিনিস হলো Acidic (অম্লজাতীয়) আর কিছু জিনিস Basic বা মৌলিক। এটাও তো এক ধরনের জোড়া। মোটকথা, সবকিছুতেই জোড়া বিদ্যমান।

মুসলমান ছাত্রদের কাছে আবেদন

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

'আমি প্রতিটি জিনিসই জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার।'[১]

আমি মুসলমান ছাত্রদের কাছে আবেদন করছি, যেন তারা উক্ত আয়াতে কারীমাকে মূলনীতি বানিয়ে গবেষণা করে। তাহলে বিজ্ঞানের অনেক নতুন দ্বার তাদের সামনে উন্মোচিত হবে। দেখুন-না, কম্পিউটার জমিনের দূরত্বকে সংকোচিত করে দিয়েছে। কয়েক বছরে যে পরিবর্তন হতো, তা এখন একদিনেই হয়। কম্পিউটারের ভিত্তি হলো Bits এর ওপর। একটি হলো One। অপরটা Zero, one zero মিলেও তো এক ধরনের জোড়া। সুতরাং প্রমাণিত হলো সব জিনিসই জোড়া-জোড়া।

আসল মানুষ আর নকল মানুষ

এসব কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত ইরশাদ করেছেন, আমি প্রতিটি জিনিসকে জোড়া-জোড়া বানিয়েছি, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার। উক্ত মূলনীতিকে সামনে রেখে মানুষের ব্যাপারে একটু ভাবুন। দেখতে পাবেন, মানুষও দুটি জিনিসের সমন্বয়ে গঠিত। একটি হলো দেহ, যা ঘরতুল্য আর অপরটি হলো রূহ, যা ঘরের বাসিন্দা। দেহ হলো নকল মানুষ আর তার অভ্যন্তরের রূহ হলো আসল মানুষ। আসল মানুষের প্রয়োজন-চাহিদা ভিন্ন আর নকল মানুষের প্রয়োজন-চাহিদা ভিন্ন। সেটা আবার কেমন?

---

১. সূরা যারিয়াত : আয়াত ৪৯

মানুষের দেহ মাটির তৈরী। তাই তার প্রয়োজনাদি জমিন হতেই উদ্গত হয়। যেমন– পানি, কাপড়, ফল ইত্যাদি সবকিছুই মাটি থেকে উৎপন্ন হয়। কারণ, মাটিই হলো এসবের মূল উৎস। আর মানুষের রূহ উর্ধ্ব জগৎ থেকে আগত। তাই উর্ধ্ব জগৎ থেকে আগত নূর ও তাজাল্লি হলো তার খোরাক। তাহলে বোঝা গেল, আসল ও নকল মানুষের প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা রয়েছে।

দুই চেহারা

মানুষের দুটি চেহারা রয়েছে। একটি হলো জগদ্বাসী যা দেখতে পায়। অপরটি দেখেন তার স্রষ্টা। এমনও অনেক মানুষ রয়েছে, যার বাহ্যিক চেহারা ভদ্র লোকের আর আভ্যন্তরীণ চেহারাটা ব্যাঘ্রের। দুটি চেহারা নিয়ে প্রতিটি মানুষ জীবন যাপন করে। একটি দেখা যায় চোখ খুললে আর অপরটি দেখা যায় চোখ বন্ধ করলে। একটি দেখা যায় দৃষ্টিকে উঁচু করলে আর অপরটি দৃষ্টিগোচর হয় দৃষ্টিকে নত করলে।

দেহ ও রূহের প্রয়োজন

দেহ ও রূহ উভয়টির প্রয়োজন ভিন্ন-ভিন্ন। কিছু দিন ভাত না খেলে দেহের শক্তি দুর্বল হয়ে যায়। অনুরূপ কিছু দিন নেক আমল না করলে রূহ দুর্বল হয়ে পড়ে। রূহানী শক্তিতে ভাটা পড়ে যায়। দেহের খাদ্যের স্বাদ ভিন্ন, রূহের খাদ্যের স্বাদ ও ভিন্ন। আমরা দস্তরখানের হরেক রকমের খাবারের পৃথক-পৃথক স্বাদ অনুভব করি। রোস্টের স্বাদ আলাদা, সবজির স্বাদ আলাদা, ফলের স্বাদ ভিন্ন, পানির স্বাদ আলাদা। মোটকথা, সব জিনিসেরই স্বাদ ভিন্ন-ভিন্ন অনুভূত হয়। এমনিভাবে প্রতিটি নেক আমলেরও রয়েছে ভিন্ন-ভিন্ন স্বাদ। যার বাতেন জাগ্রত সে আমলের স্বাদ অনুভব করতে পারে।

ভিন্ন-ভিন্ন স্বাদ

বন্ধুরা! সব খাবারের যেমন রয়েছে ভিন্নধর্মী স্বাদ, আল্লাহর কসম! সব নেক আমলেরও রয়েছে ভিন্নধর্মী স্বাদ। পরনারী, পরপুরুষের প্রতি দৃষ্টি না দেওয়ার স্বাদ ভিন্ন আর সত্য বলার স্বাদ ভিন্ন। অন্যের জন্য ত্যাগের মজা আলাদা, ইবাদতসমূহের স্বাদ আলাদা। রাতের শেষ ভাগে নিজের গুনাহের কথা স্মরণ করে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করার মজা আলাদা। আমরা আইসক্রীম খাই। প্রতিটি চোষণে তৃপ্তি অনুভব করি। আর আল্লাহওয়ালাগণ

কুরআনে কারীম তেলাওয়াত করে প্রতিটি আয়াতেই তৃপ্তি পায় এবং তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। ইরশাদ হচ্ছে :

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

'যখন তাদের ওপর তার আয়াত তেলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।'[১]

আমরা কুরআন তেলাওয়াতে তৃপ্তি পাই না কেন?

আল্লাহওয়ালাদের কাছে কুরআন তেলাওয়াত করলে তৃপ্তি অনুভব হয়। সেই তৃপ্তি আমরা পাই না কেন? কারণ, আমরা অভ্যন্তরের মানুষটির ওপর কোনো সাধনা করিনি। আমরা নামায পড়ি আর মনে জল্পনা-কল্পনা চলে বাজার নিয়ে। আমরা কুরআন তেলাওয়াত করি আর মন-মস্তিষ্ক থাকে অন্য ধান্দায় লিপ্ত। এক্ষেত্রে ইবাদতের তৃপ্তি কীভাবে অনুভব হবে?

বিস্ময়কর ইবাদত

আজ আমাদের ইবাদতের অবস্থা বড়ই বিস্ময়কর। কখনও এমন পরিস্থিতিও হয় যে, ইমাম সাহেব নামাযের রাকাত সংখ্যা ভুলে গেছেন অথচ ভরা মসজিদে লোকমা দেওয়ার কেউ থাকে না। যেন সবাই অনুপস্থিত। আল্লাহু আকবার! এ হলো আমাদের নামাযের হালত। এ হলো আমাদের ইবাদতের মান। কোনো আরিফ বড় মজার কথা বলেছেন :

به زمین چوں سجده کردم ز زمین ندا برآمد
که مرا خراب کردی تو بسجده ریائی

জমিনে যখন সেজদায় লুটালাম, তখন জমিন থেকে আওয়াজ এল,
হে লৌকিকতার সেজদাকারী! তুমি তো আমাকেও ধ্বংস করে দিলে!

میں جو سر بسجده ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا
تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملیگا نماز میں

কখনও আমি সেজদায় লুটালে জমিন হতে আসে ডাক,
তোমার অন্তর যখন মূর্তিপ্রিয় নামাযে তোমার হবে কী লাভ?

---

১. সূরা আনফাল : আয়াত ২

অন্তর যখন মূর্তিঘরে পরিণত হয়, প্রতিমাখানায় রূপান্তরিত হয়, তখন আর ইবাদতের তৃপ্তি লাভ হয় না।

وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی
اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب

'যে সেজদার ফলে কেঁপে উঠত পৃথিবীর প্রাণ
মিম্বর ও মেহরাবের যেন আজ তাকেই প্রয়োজন।

সেজদার নেশায় মত্ত সেই কপাল আজ কোথায় গেল, যে অন্তর আল্লাহর ভয়ে কাঁপত, সে কোথায় চলে গেল? আজ জীবনযাত্রা বদলে গেছে।

تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے
شب کی آہیں بھی گئیں صبح کے نالے بھی گئے
ائے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر
اب نہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر

তোমার মাহফিলও গেল, প্রার্থনাকারীরাও গেল।
রাতের আহাজারিও গেল, ভোরের ক্রন্দনও গেল।
বন্ধুরা এসে আগামী কালের ওয়াদা নিয়ে চলে গেল।
এখন তাদের দিগ-দিগন্তে প্রদীপ নিয়ে খুঁজে ফিরো।

মুসলমানদের হীনতার কারণ ও তার প্রতিকার

ইমাম গায্যালির শিক্ষাও দেখা যায় না, ইমাম রাযীর আকুলতা, অস্থিরতাও নজরে পড়ে না। কারণ কী? সাধনার মোড় ঘুরে গেছে। আসল মানুষের ওপর সাধনার পরিবর্তে নকল মানুষের ওপর সাধনা করতে শুরু করেছি। আসল মানুষের কথা ভুলেই বসেছি। আমরা যখন আসল মানুষের কথা ভুলে গেছি, তখনই আমরা পৃথিবীতে অপমান, অপদস্থতা ও হীনতার জীবন যাপন শুরু করেছি।

جس دور پہ نازاں تھے دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے
غیروں کی کہانی یاد رہی اپنا فسانہ بھول گئے

منہ دیکھ لی آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں

جی ایسا لگا یا جینے میں مرنے کو مسلماں بھول گئے

تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور

جس ضرب سے دل ہل جاتے ہیں وہ ضرب لگانا بھول گئے

'যে যুগ নিয়ে গৌরব ছিল পৃথিবীর, সেই যুগকে আমরা ভুলে গেছি।
অন্যের কাহিনী স্মরণ আছে বটে; কিন্তু নিজের কাহিনী ভুলে গেছি।
আয়নায় মুখ দেখে নিয়েছি বটে; কিন্তু দাগে ভরা বক্ষটি দেখিনি।
মৃত্যুকে যেন ভুলে গেছে মুসলমান বাঁচার মোহ এমনি ঘিরে ধরেছে।
তাকবীর তো এখনও হয় মসজিদের প্রশস্ততায় হে আনওয়ার!
সেই আঘাত হানা ভুলে গেছি, যে আঘাতে কেঁপে যায় অন্তর।'

কোথায় গেল সেসব নওজওয়ানেরা, যারা রাতের শেষ প্রহরে উঠে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর জরব লাগাতেন? যাঁদের বক্ষস্থিত অন্তর কেঁপে উঠত, যাঁদের নিষ্পাপ হাতগুলো উত্থিত হলে পৃথিবীতে এটম বোমের চেয়ে বেশি বিপ্লব সাধিত হতো, রাতে উঠে ক্রন্দনের স্বাদের সঙ্গে আমরা একেবারেই অপরিচিত। তাহাজ্জুদের সময় তো দোআ কবুলের সময়।

তাহাজ্জুদ নাকি একশত টাকা

বিশ্বজগতের মহান বাদশাহর পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা ঘোষণা করছে, আছে কি কোনো প্রার্থনাকারী; আমি তার প্রার্থনা মঞ্জুর করব? অথচ প্রার্থনাকারী তো মধুর ঘুমে বিভোর। কেউ যদি আমাদের বলে, রাত তিনটায় তোমাকে একশত টাকা দেব, তাহলে সারা রাত আমাদের আর ঘুমই আসবে না, আসলে আমাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক, আল্লাহর পরিচয়, আখেরাতের সফলতার সেই মূল্য নেই যে মূল্য আছে একশত টাকায়। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ

'তারা আল্লাহকে যথাযথ মূল্যায়ন করেনি।'[১]

---

১. সূরা আনআম : আয়াত ৯১

ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں
راہ دکھلائیں کسے راہرو منزل ہی نہیں

করুণা দিতে প্রস্তুত আমি যাচিবারই তো কেউ নেই
পথ দেখাব কাকে গন্তব্যের পথপ্রার্থীই তো কেউ নেই।

সালাহ্ উদ্দীন আইয়ুবীর দোআয় নৌযান ডুবে যাওয়ার ঘটনা

একটি ঘটনা মনে পড়ল। খ্রিষ্টানদের সাথে যুদ্ধ চলছিল। খ্রিষ্টানরা তাদের সব সৈন্য ময়দানে নামিয়ে দিল, যেন এক ধাওয়াতেই মুসলমানরা পরাভূত হয়। উপরন্তু রিজার্ভ ফৌজ হিসেবে সামুদ্রিক যানও পাঠিয়ে দিল। সালাহ উদ্দীন আইউবী বিষয়টি জানতে পেরে বেশ চিন্তিত হলেন। মুসলমানদের সংখ্যা নগণ্য। যুদ্ধের সরঞ্জামও সামান্য। কীভাবে আমরা কাফেরদের মোকাবেলা করব। আইয়ুবী বাইতুল মুকাদ্দাসে গিয়ে রাতভর রুকু-সেজদা আর দোআ-মুনাজাতে কাটিয়ে ফজরের নামায পড়ে বের হলেন। একজন নেককার বুযুর্গ ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। আইয়ুবী লোকটির কাছে গিয়ে সালামান্তে বললেন, হযরত! জানতে পারলাম কাফেরদের একটি সমুদ্রযান রওনা দিয়েছে। মুসলমানদের ওপর হামলা করবে। তাদের সাথে মোকাবেলা করার মতো সৈন্য আমাদের নেই। আপনি দোআ করুন, যেন মহান আল্লাহ মুসলমানদের বিজয় দান করেন।

তিনি ছিলেন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। চোখ তুলে সালাহ্ উদ্দীন আইয়ুবীর চেহারার দিকে তাকালেন এবং রাতের তাহাজ্জুদের মান যাচাই করে ফেললেন। বলতে লাগলেন, আইয়ুবী! তোমার রাতের চোখের পানি শত্রুদের নৌযান ডুবিয়ে দিয়েছে।

বাস্তবেই পরদিন সংবাদ এল, শত্রুদের নৌযান ডুবে গেছে।

একসময় তো এমন ছিল যে, রাতের শেষ প্রহরে মুসলমানদের হাত উঠত, যার বদৌলতে আল্লাহ পৃথিবীর ভূগোল পাল্টে দিতেন। এখন তো ওই সময় আমাদের ঘুম ভাঙে না। ডাল-শাকের স্বাদ আমাদেরকে ইবাদতের মজা থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে।

হযরত কুতুব উদ্দীন (রহ.)-এর জানাযা পড়ানোর ঘটনা

আপনি হয়তো বলবেন, ব্যস্ততা অনেক বেশি। ব্যস্ততার কথাই যখন এসে গেল, তাহলে ফকির এবার আপনাকে একজন বাদশাহর ঘটনা

শোনাচ্ছে। দিল্লিতে কুতুব মিনারের নিকটে অবস্থিত খাজা বখতিয়ার কাকী (রহ.)-এর মাজার জিয়ারতের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তার জীবনের একটি বিস্ময়কর ঘটনা শুনুন। হযরত কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.)-এর যখন মৃত্যু হলো যেন কেয়ামত ঘটে গেল। জানাযা তৈরি হলো। বিশাল এক ময়দানে নামাযে জানাযার ব্যবস্থা করা হলো। পঙ্গপালের মতো মানুষের ঢল নামল। বিশাল এক জনসমুদ্রে পরিণত হলো। দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত মানুষ আর মানুষ দেখা যাচ্ছিল। জানাযা পড়ানোর সময় হলে একব্যক্তি সামনে অগ্রসর হয়ে বলল, হযরত আমার কাছে একটি অসিয়ত করেছেন। এ মজমার কাছে আমি তা পৌঁছিয়ে দিতে চাই। মজমা নীরব হয়ে গেল। অসিয়ত কী ছিল? খাজা বখতিয়ার কাকি (রহ.) বলেছেন, আমার জানাযা এমন ব্যক্তি পড়াবেন, যিনি চারটি গুণের অধিকারী। ১ম গুণটি হলো, জীবনে যার তাকবীরে উলা ছোটেনি, ২য়টি হলো, তাহাজ্জুদ কখনো কাজা হয়নি, ৩য়টি হলো, পরনারীর প্রতি কখনো কুদৃষ্টি প্রদান করেনি, ৪র্থ গুণটি হলো, তার ইবাদত এত বেশি যে, আসরের সুন্নাতও কখনো ছাড়েননি।

এলানটা শুনে গোটা মজমা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। সর্বত্র নীরবতা ছেয়ে গেল। মানুষের মাথাগুলো নীচু হয়ে গেল। কে সেই ব্যক্তি, যে সামনে এগিয়ে যাবে! বেশ কিছু সময় পার হয়ে গেল। ইত্যবসরে একব্যক্তি কাঁদতে-কাঁদতে সামনে এল। হযরত কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কাকি (রহ.)-এর জানাযার পাশে গিয়ে চাদর সরিয়ে বলল, কুতুব উদ্দীন! তুমি তো চলে গেলে; আমাকে অপদস্থ করে গেলে! তারপর ভরা মজমার সামনে আল্লাহ তা'আলাকে হাজির-নাজির জেনে কসম খেয়ে বললেন, আমার মধ্যে এ চারটি গুণ আছে। মানুষ দেখল, তিনি হলেন তৎকালীন বাদশাহ শামসুদ্দীন আলতামাশ।

বাদশাহী করে যদি দীনি জীবন যাপন করতে পারেন, তাহলে কি আমরা ব্যবসায়ী ও চাকরীজীবীরা এমন জীবন যাপন করতে পারব না? মহান আল্লাহ আমাদেরকে ভালো কাজ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

আল্লাহওয়ালাদের সোহবত

'আল্লাহওয়ালাদের সোহবত এমন একটি প্রতিষেধক, যা মানুষের অন্তর্জগতকে বদলে দেয়। আল্লাহওয়ালাদের দৃষ্টিতে সেই প্রভাব থাকে, সেই ফয়েজ পাওয়া যায়, যার ফলে অন্তর্জগত পাল্টে যায়। এজন্য তাদের সোহবত যার ভাগ্যে জোটে, সে পরম সৌভাগ্যবান মানুষ।'

আল্লাহওয়ালাদের সোহবত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

ঈমানদারের আলামতসমূহ

আল্লাহ্ বলেছেন :

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

'আল্লাহর প্রতি ঈমানদারদের ভালোবাসা অতি দৃঢ়।'[১]

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ

'আর যে আপন প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় পায়।'[২]

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۝

এবং নফ্‌সকে কুচাহিদা থেকে বিরত রাখে।'[৩]

فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ۝

নিঃসন্দেহে জান্নাত তার ঠিকানা।'[৪]

গুনাহ্ থেকে বাঁচার দুটি পদ্ধতি

গুনাহ্ থেকে দুভাবে বাঁচা যায়।

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ১৬৫
২. সূরা নাযিয়াত : আয়াত ৪০
৩. সূরা নাযিয়াত : আয়াত ৪০
৪. সূরা নাযিয়াত : আয়াত ৪১

১. আল্লাহর ভালোবাসা এত বেশি যে, ভালোবাসার প্রবলতার দরুন মানুষ আল্লাহর নাফরমানি করে না।

২. আল্লাহর ভয় এত বেশি যে, সে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোকে ভয় পায়। বিষয়দুটি এমন, যার দরুন মানুষ নফ্‌সের মন্দ চাহিদা থেকে রক্ষা পায়।

জান্নাতের পথ দু-কদম

এক বুযুর্গ বলতেন, জান্নাতের পথ মাত্র দু-কদম। কেউ জিজ্ঞাসা করল, হযরত! কথাটির অর্থ কী? তিনি বললেন, হে বন্ধু! তুমি তোমার প্রথম কদমটা নফ্‌সের ওপর রাখো, তাহলে তোমার দ্বিতীয় কদম জান্নাতে পৌঁছে যাবে।

নফ্‌সকে হত্যা করা

নফ্‌সকে নিয়ন্ত্রণ করা সফলতার চাবিকাঠি। বহু কিতাবে নফ্‌সকে হত্যা করার কথা আছে। এর অর্থ কোনো প্রাণীকে হত্যা করা নয়। বরং এর অর্থ হলো, মানুষের মধ্যে যে আমিত্ব থাকে, তাকে খতম করা। মানুষের মধ্যকার মন্দ চাহিদাগুলো খতম হয়ে যাওয়া; এমনকি একপর্যায়ে শরীয়তের পছন্দনীয় বস্তুগুলোই তার পছন্দনীয় বস্তুতে পরিণত হওয়া। এ বিষয়টি অধিক পরিমাণ যিকিরের মাধ্যমে অর্জিত হয় এবং আল্লাহওয়ালাদের সোহবতের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

পরম সৌভাগ্যবান মানুষ কে?

আল্লাহওয়ালাদের সোহবত এমন একটি প্রতিষেধক, যা মানুষের অন্তর্জগতকে বদলে দেয়। আল্লাহওয়ালাদের দৃষ্টিতে সেই প্রভাব থাকে, সেই ফয়েজ পাওয়া যায়, যার ফলে অন্তর্জগত পাল্টে যায়। এজন্য তাদের সোহবত যার ভাগ্যে জোটে, সে পরম সৌভাগ্যবান মানুষ।

আল্লাহকে কোথায় পাওয়া যায়?

আমার পীর সাহেব বলতেন, সবজিওয়ালার কাছে সবজি পাওয়া যায়। কাপড়ওয়ালার কাছে কাপড় পাওয়া যায়। লোহাওয়ালার কাছে লোহা পাওয়া যায়। ঠিক তেমনি আল্লাহওয়ালাদের কাছে আল্লাহকে পাওয়া যায়।

আউলিয়ায়ে কেরামের সোহ্বতের বরকত

আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে বসেই আল্লাহর ভালোবাসা লাভ হয়। তারপর মানুষের জীবনের মোড় ঘুরে যায়। তার গতি দুনিয়া থেকে ঘুরে আপাদমস্তক আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়।

বোঝা গেল, আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে বরকত রয়েছে।

আল্লাহ্ওয়ালাদের সোহ্বতের প্রভাব

আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে এমন আকর্ষণ আছে যে, নিমিষেই মানুষের মনোজগত পরিবর্তন হয়ে যায়।

نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی

اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے

অলীর দৃষ্টিতে আমি সেই প্রভাব দেখেছি।
হাজারো মানুষের ভাগ্য বদলাতে দেখেছি।
যদি কোনো শুয়াইব (খুঁজে) পাওয়া যায়,
যৌবন হতে কালীমি (আল্লাহর সাথে কথা বলা) পর্যন্ত
দু-কদমেই পৌছা যায়।

আল্লাহ্র ভালোবাসা লাভের সহজ পথ

যদি কোনো আরেফে কামেল ও আল্লাহওয়ালার সোহবত ভাগ্যে জুটে যায়, তাহলে আল্লাহর ভালোবাসার পথ অতিক্রম করা অতি সহজ হয়ে যায়। আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে বসেই আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যায়।

আল্লাহ্ওয়ালাদের পরিচয়

আল্লাহওয়ালাদের পরিচয় সম্পর্কে বলা হয় :

اَلَّذِيْنَ اِذَا رُءُوْا ذُكِرَ اللّٰهُ

'যাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়।'

'কারণ, তাদের বাঁচা-মরা সবই আল্লাহর জন্য। তারা যেন নিম্নলিখিত আয়াতের জ্বলন্ত প্রমাণ :

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

'বলো, আমার নামায, আমার কুরবানি, আমার জীবন, আমার মরণ সব বিশ্বপ্রভু আল্লাহরই জন্য।'[১]

আল্লাহর সন্তুষ্টিই হলো তাদের চলার পথের বিশ্রামাগার।

অন্তরচক্ষু কোথায় খোলে?

আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে বসলেই অন্তরচক্ষু খোলে। কোনো কবি বলেছেন :

بابا من کی آنکھیں کھول بابا من کی آنکھیں کھول
مطلب کی ہے دنیا ساری مطلب کے ہیں سب سنساری
جگر میں تیرا کوہت کاری تن من کا سب زور لگا کر
نام اللہ کا بول
بابا من کی آنکھیں کھول بابا من کی آنکھیں کھول
دنیا ہے یہ یک تماشا چار دنوں کی جھوٹی اشنا
پل میں تولہ پول میں ماشہ گیان ترازو ہاتھ میں لے کر
تول سکے تو تول
بابا من کی آنکھیں کھول بابا من کی آنکھیں کھول

অন্তরচক্ষু খোলো বাবা! অন্তরচক্ষু খোলো।
স্বার্থের পাগল সারাটা পৃথিবী,
স্বার্থের পাগল পুরোটা সংসার।
পৃথিবীতে তোমার পর্বত বিধ্বংসকারী
দেহ-মনের সবটুকু শক্তি দিয়ে আল্লাহর নাম বলো।

---

১. সূরা আনআম : আয়াত ১৬২

অন্তরচক্ষু খোলো বাবা! অন্তরচক্ষু খোলো।
পৃথিবীটা হলো খেল-তামাশা, চার দিনের মিছে ভালোবাসা।
নিমেষেই তোলা, নিমেষেই মাশা,
জ্ঞানপাল্লা হাতে নিয়ে মাপতে পারলে মাপো।
অন্তরচক্ষু খোলো বাবা! অন্তরচক্ষু খোলো।

কবর থেকে শিক্ষা নাও

মানুষ যেন পৃথিবীর অস্থায়ী জিনিসের ভালোবাসা বর্জন করে। কারণ, মাটির ওপর যা কিছু আছে সবই মাটি। বড়ই লাবণ্যময়, বড়ই কান্তিমান ব্যক্তি কবরে যায়। পোকা-মাকড় তাদের দেহ খেয়ে ফেলে। কবর দেখে শিক্ষা নাও, একটু চিন্তা করো, মাটি কত সুন্দর-সুন্দরীদের বিলীন করে ফেলছে।

আল্লাহওয়ালাদের সোহবতের উপকারিতা

আল্লাহওয়ালাদের সোহবতের দরুন অন্তর থেকে দুনিয়াপ্রীতি বেরিয়ে যায় এবং অন্তরে আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের ভালোবাসা বদ্ধমূল হয়। আল্লাহর ভালোবাসা অন্তরে বদ্ধমূল হওয়া সফলতার চাবিকাঠি। তারপর এই ভালোবাসা-ই মানুষকে আনুগত্য করায়। আল্লাহর ভালোবাসার কারণে তাঁর হুকুমের অনুসরণ সহজ হয়ে যায়।

বিবেক ও ভালোবাসার তুলনা

বিবেকের তাড়নায় মানুষ আল্লাহর হুকুমের তাবেদারি করে। আবার অন্তরে গভীর ভালোবাসা থাকলেও ভালোবাসার তাড়নায় মানুষ আনুগত্য করে। উভয়টির মাঝে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। এই ময়দানে বিবেকের পা ল্যাংড়া। এই পথ প্রেম-ভালোবাসার ডানায় ভর করে অতিক্রম করতে হয়।

কবির ভাষায়-

عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے　　عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم

نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی　　اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی

پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل　　عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی

عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی

بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی

বিবেক খুব ধূর্ত; তাই বেশ বানিয়ে নেয়।
প্রেম বেচারা শিক্ষকও নয়, সাধকও নয়, মহাজ্ঞানীও নয়।
প্রেমিক বুলবুল, তোমার খাদেম, এখন ও কাঁদে।
আপন বক্ষে এখন আরও একটু জায়গা দাও তারে,
পরিণামদর্শী হলে বিবেক তখন পোক্ত অতি।
প্রেম পরিণামদর্শী হলে এখনও সে রয়েছে কচি।
দূতকে ডেকে বলছে প্রেম আমলের পদক্ষেপ হালকা অতি।
বিবেক এখনও বার্তার অর্থ বুঝতেই পারেনি।
নমরুদের আগুনে প্রেম নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।
বিবেক এখনও খেল-তামাশার মজায় ডুবে রয়েছে।

আল্লাহর ভালোবাসা কীভাবে লাভ হয়?

আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে বসেই আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা লাভ হয়। যদি তাদের সোহবত ভাগ্যে না জোটে, তাহলে অধিক পরিমাণ যিকিরের মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা লাভ হয়। এ ভালোবাসার গুণ এমন যে, যদি হাসিল হয়ে যায়, তা হলে অন্তরের চিত্রই পাল্টে যায়।

এক সাহাবীর খোদাপ্রেমের ঘটনা

এক সাহাবী ছাগলের রাখাল ছিলেন। যখন তিনি মদীনায় ফিরে আসতেন, তখন জিজ্ঞাসা করতেন, কুরআনে পাকের কোনো নতুন আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কি? অথবা নবীজি বিশেষ কোনো বিষয় ইরশাদ করেছেন কি? তখন তাঁকে সব বলে দেওয়া হতো। একবার তিনি ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলে তাকে বলা হলো, এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে। সেই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা কসম করে বলেছেন, 'হে আমার বান্দারা! আমিই তোমাদের রিযিকদাতা।' তিনি যখন এ কথাটি শুনলেন, তখন অসন্তুষ্ট

হয়ে বলতে লাগলেন, কে সেই ব্যক্তি, যার দৃঢ় বিশ্বাসের জন্য আমার আল্লাহর কসম খেতে হয়েছে?

সুবহানাল্লাহ! এ তো ভালোবাসার কথা।

রাতে জাগ্রত হওয়া কীভাবে সহজ হয়?

অন্তরে যখন ভালোবাসা থাকে, তখন মানুষ আনুগত্য করে তৃপ্তি অনুভব করে। ফলে রাতে জাগ্রত হওয়া সহজ হয়ে যায়।

اٹھ فریدا ستیاتے جھاڑو دے مسیت

تو ستا تیرا رب جاگدا تیری کیویں بھے پریت

'ঘুম হতে জাগো ফরিদ, ঝাড় দাও মসজিদ।

তুমি ঘুমাও আর তোমার প্রভু সজাগ এ তোমার কেমন পিরিত?'

আল্লাহর ভালোবাসার তাড়নায় রাতের শেষ প্রহরে জাগ্রত হওয়া সহজ হয়ে যায়। আপনা-আপনিই ঘুম ভেঙে যায়। এলার্মের কোনো প্রয়োজন হয় না। অন্তরের ঘড়ি নিজেই বলে দেয়। ভালোবাসার কারণেই মানুষ রাত জাগে।

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا

'তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের প্রতিপালককে ভয় ও আশা নিয়ে ডাকতে থাকে।'[১]

জীবিত ও মৃত শহর

সাহাবায়ে কেরামের যুগে যদি কেউ রাতের শেষ প্রহরে কোনো গলি দিয়ে চলাচল করতেন, তাহলে গোটা শহরটাকেই জীবিতদের শহর মনে হতো। বর্তমানে আমাদের শহরগুলোতে কেউ চলাচল করলে কবরস্তানের মতো মনে হবে। সে সময়কার মানুষ রাত জাগরণকারী ছিলেন, মৌমাছির গুনগুন শব্দের মতো প্রতিটি ঘর থেকে কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ বেরিয়ে আসত, পুরো শহরই জীবন্ত থাকত। কেউ উঁচু স্বরে আবার কেউ নিচু স্বরে কুরআন তেলাওয়াত করত।

---

১. সূরা আলিফ লাম মীম আস-সাজদা : আয়াত ১৬

হযরত আবুবকর ও হযরত ওমর (রাযি.)

একদা আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে তাশরীফ আনলেন। তিনি এসে দেখলেন, সাইয়্যিদুনা হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযি.) তাহাজ্জুদে কুরআন আস্তে তেলাওয়াত করছেন। পাশেই হযরত ওমর জোরে তেলাওয়াত করছেন। উভয়ের অবস্থা ছিল ভিন্ন-ভিন্ন। উভয়ে তাহাজ্জুদ শেষে নবীজির খেদমতে হাজির হলেন। নবীজি হযরত আবু বকর (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কেন আস্তে তেলাওয়াত করছিলেন?

আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো সেই সত্তাকে শোনাচ্ছি, যিনি অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত। কাজেই আমার জোরে পড়ার কী প্রয়োজন?

নবীজি এবার সাইয়্যিদুনা হযরত ওমর (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কেন উঁচু আওয়াজে তেলাওয়াত করছিলেন? তিনি আরজ করলেন, ওগো আল্লাহর নবী! আমি ঘুমন্ত ব্যক্তিদের জাগাচ্ছিলাম এবং শয়তানকে বিতাড়িত করছিলাম।[১]

এভাবেই রাতে কুরআন তেলাওয়াত করা হতো।

ভালোবাসা নিয়ে কুরআন তেলাওয়াতের ঘটনা

এক সাহাবী নিজঘরে তাহাজ্জুদ নামাযে কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। খুবই তৃপ্তি লাগছিল; তাই একটু উঁচু আওয়াজে তেলাওয়াত করার সাধ জাগল। ঘরের আঙিনা ছোট ছিল। একদিকে ঘোড়া বাঁধা ছিল আর অপর দিকে চৌকির ওপর বাচ্চা শোওয়া ছিল। যখন উঁচু আওয়াজে পড়তে শুরু করলেন, তখন ঘোড়া লাফালাফি শুরু করে দিল। তাঁর মনে একটু ভয় হচ্ছিল, নাজানি কখন বাচ্চার কোনো ক্ষতি করে বসে, লাথি মারে। এজন্য পুনরায় তিনি আস্তে পড়তে থাকেন। কিছুক্ষণ পর মন আবারও ব্যাকুল হয়ে উঠল। তখন আবার জোরে পড়লেন। এবারও ঘোড়া লাফালাফি করতে শুরু করল। ফলে আবারও আস্তে পড়তে থাকেন।

প্রায় সারাটা রাত এমন কাণ্ডই চলতে থাকল। সকালবেলা যখন মুনাজাতের জন্য হাত উঠালেন, আসমানের দিকে তার দৃষ্টি পড়ল। দেখতে

---

১. সুনানে তিরমিযী : হাদীছ নং ৪০৯

পেলেন, কিছু আলো অতি দ্রুতগতিতে তার মাথার ওপর থেকে দূর আকাশের দিকে চলে যাচ্ছে। অবাকচিত্তে ভাবলেন, এগুলো আবার কী?

তিনি সকালে উঠে আল্লাহর নবীর দরবারে হাজির হলেন এবং আরজ করলেন, হে আল্লার নবী! রাতভর আমার সাথে এমন একটা কাণ্ড চলছিল। যখন উঁচু আওয়াজে পড়ি, তখন আশঙ্কা করি, বাচ্চার কোনো ক্ষতি হয় কিনা? যখন আস্তে পড়ি, তখন জোরে পড়তে মন ব্যাকুল হয়ে যায়। যখন দোআর জন্য হাত উঠালাম, উপরের দিকে নজর পড়তেই দেখি, কিছু আলো দ্রুত দূর আকাশের দিকে চলে যাচ্ছে। আল্লাহর মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এরা হলো আল্লাহর ফেরেশতা, যারা তোমার কুরআন তেলাওয়াত শুনতে আসমান থেকে নিচে নেমে এসেছিল। তুমি যদি উঁচু স্বরে পড়তে থাকতে, তাহলে আজ মদীনাবাসী স্বচক্ষে ফেরেশতাদের দেখতে পেত। তারা আপন বিছানায় কুরআন পড়ত আর আরশ হতে ফেরেশতা নেমে আসত।[১]

আল্লাহু আকবার!

ইখলাস ও ভালোবাসা নিয়ে কাঁদার ঘটনা

এক সাহাবী তাহাজ্জুদ নামাযে দোআ করতে গিয়ে কান্নাকাটি করলেন। সকালে নবীজির খেদমতে হাজির হলেন। তখন আল্লাহর মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমার রাতের কাঁদা আল্লাহর ফেরেশতাদেরও কাঁদিয়েছে।

আল্লাহু আকবার! কেমন ইখলাসপূর্ণ কান্না ছিল!

ইখলাস ও ভালোবাসার দুটি ফোঁটা

ইখলাস ও ভালোবাসার দু-ফোঁটা অশ্রু অনেক মূল্যবান। হায় যদি আমাদের তা ভাগ্যে জুটত!

ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہے

বের হতে না হতেই সাড়া পড়ে যায়।

কোনো অশ্রু তো এমনিই গ্রহণযোগ্য হয়।

---

১. ছহীহ মুসলিম : হাদীছ নং ৭৬৯

হায়! যদি আমাদের এ চক্ষুদ্বয় হতে
এমন দু ফোঁটা অশ্রু ঝরতো।

এক সাহাবীর ভালোবাসার সাথে কুরআন শোনানোর ঘটনা

হযরত উবাই ইবনে কাব (রাযি.) অতি চমৎকার কুরআন তেলাওয়াত করতেন। একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে তাশরীফ এনে তাকে ডাকলেন এবং বললেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার প্রতি নির্দেশ এসেছে, তোমার কুরআন তেলাওয়াত যেন আমি শুনি। সাহাবী অবাক হয়ে বলতে লাগলেন, ওগো আল্লাহর নবী! আল্লাহ কি আমার নাম উল্লেখ করে বলেছেন? বললেন, হ্যাঁ আল্লাহ তোমার নাম উল্লেখ করে বলেছেন, তুমি কুরআন পড়বে আর আমি তোমার কুরআন পড়া শুনব।[১]

ভালোবাসা কীভাবে লাভ হয়?

এই ভালোবাসা ও ইখলাস এমন একটি সম্পদ, যা অর্জিত হলে জীবন মজাদার হয়ে যায়। তবে এটি লাভ হয় আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে।

قال را بگذار مرد حال شو   پیش مرد کامل پامال شو
صدکتاب وصدورق در نار کن   جان و دل را جانب دلدار کن

মৌখিক বাগ্‌বিতণ্ডা পরিহার করে হালবিশিষ্ট ব্যক্তি হও।
কামিল কোনো ব্যক্তির সামনে বিলীন হয়ে যাও,
শত কিতাব আর শত পাতা সব আগুনে ফেলে দাও,
মন-প্রাণকে কোনো দিলওয়ালার অভিমুখী করে দাও।

আল্লাহর ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা

আল্লাহর ভালোবাসা লাভ হয়ে গেলে তখন বলবেন, আল্লাহ তা'আলা যদি আমার অন্তরে বসে যেতেন! আল্লাহ যদি আমার অন্তরে এসে যেতেন! আল্লাহ যদি আমার অন্তরে ঢুকে যেতেন! হায়! যদি আল্লাহ আমার অন্তরকে পরিবেষ্টন করে নিতেন! এমন অবস্থা সৃষ্টি হলে জীবন অতি মজাদার হয়ে যাবে।

---

১. ছহীহ বোখারি : হাদীছ নং ৩৮০৯

আমাদের জীবন কেমন?

আমাদের জীবন অনেকটা ভিন্ন ধরনের। আমাদের অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসাও রয়েছে আবার গাইরুল্লাহর ভালোবাসাও রয়েছে। দুনিয়ার ভালোবাসার ফলে আজ আমাদের মন-মানসিকতা নষ্ট হয়ে গেছে। যদি কারো সর্দি লাগে, তার সামনে গোলাপ, আম্বর, কস্তুরি নিয়ে গেলে সে এগুলো সনাক্ত করতে পারে না। অন্যান্য জিনিসের ভালোবাসা আমাদের অন্তরে এমনভাবে ছেয়ে গেছে যে, আজ আমাদের অন্তর আল্লাহর ভালোবাসার সালাদের স্বাদ অনুভব করতে পারে না।

কয়েক হাজারবার কুরআন খতম করেছেন

আমরা নামায পড়ি; কেবল হাজিরা দেই। আমাদের নামাযে আল্লাহর নৈকট্য নেই। তেলাওয়াতও করতে থাকি আবার তন্দ্রাচ্ছন্নতাও থেকে যায়। এক পারা তেলাওয়াত করাও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। যাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা বিদ্যমান, তাদের কথা আর কী বলব? আমি আমার জীবনে এমন ব্যক্তিকে দেখেছি, যিনি জীবনে প্রায় দু-হাজারবার কুরআন খতম করেছেন।

জনৈক বুযুর্গের কুরআনপ্রেমের ঘটনা

মাংগুরায় দারুল উলুম দেওবন্দ হতে ফারেগ এক বুযুর্গের সাথে আমার মুলাকাত হলো। তিনি বললেন, আজ থেকে প্রায় ৪৫ বছর আগে আমি যখন আমার পীর ও মুরশিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করি, তখন তিনি আমাকে দৈনিক এক পারা কুরআন তেলাওয়াতের নির্দেশ দিয়েছেন। ৪৫ বছরে একদিনও ওই এক পারা কাজা হয়নি। এসব লোক এখনও জীবিত আছেন। আল্লাহর ভালোবাসার মাধ্যমেই এ ধরনের দৃঢ়তা নসিব হয়।

নেক কাজ কীভাবে সহজ হয়?

প্রেমের ডানায় ভর করে যখন মানুষ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার পথ পাড়ি দেয়, তখন তেলাওয়াত করা, যিকিরে বসা, রাতে তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হওয়া, সত্য বলা সবই সহজ হয়ে যায়। এ মহা নেয়ামত আল্লাহ তা'আলা আমাদের দান করুন। এটা আল্লাহওয়ালাদের সোহবত ও যিকিরের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

আল্লাহর ভালোবাসা প্রার্থনা

মানুষের অন্তরে যেন আল্লাহর ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। মানুষ যেন মনে-মনে এই প্রার্থনাই করে, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার ভালোবাসা চাই।

تیرے عشق کی انتہاء چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں

ذرا سا تو دل ہو مگر شوخ اتنا وہی لن ترانی سننا چاہتا ہوں

আমি তোমার প্রেমের শেষ সীমা চাই।
আমার শূন্যতা দেখো, আমি কী কামনা করি।
ক্ষুদ্র একটু অন্তর, তবু হিম্মত এত!
لن ترانی এর ওহী শুনতে যে চাই।

আল্লাহর ভালোবাসার উপকারিতা

অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা সৃষ্টি হলে মানুষের জীবনের মোড় পাল্টে যায়। চোখের দেখা, পায়ের চলা সবই পাল্টে যায়। মন-মস্তিষ্কের চিন্তাচেতনাও বদলে যায়। দেখতে তাকে সাধারণ মানুষের মতোই মনে হয়। তবে বাস্তবে সে সাধারণ থেকে অনেক ভিন্ন।

হযরত শিবলি (রহ.)-এর আল্লাহ প্রেমের ঘটনা

হযরত শিবলি (রহ.) নামে এক বুযুর্গ অতীত হয়েছেন। তার হাল ছিল বড়ই আশ্চর্যজনক ও দুর্লভ। তিনি নিহাওয়ান্দ এলাকার গভর্নর ছিলেন। একবার বাদশাহ সবাইকে কোনো উৎসব উপলক্ষ্যে পোশাক হাদিয়া দিলেন। তারপর বললেন, আগামী কাল সকলে এ পোশাক পরিধান করে রাজদরবারের আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করবে।

সবাই নির্ধারিত পোশাক পরে এলেন। আল্লাহর কী মহিমা! সভা যখন জমে উঠল, মজমা বেশ গরম হয়ে উঠল, ঠিক এমন মুহূর্তে এক গভর্নরের হাঁচি এল। তিনি যতই ঠেকাতে চেষ্টা করছিলেন, ততই হাঁচি আসতে থাকল। এভাবে তিন-চারবার এক সাথে হাঁচি আসায় লোকেরা তার দিকে মনোনিবেশ করল। অথচ এটা মানুষের সাধ্যের বাইরে। তথাপি অনুষ্ঠানাদিতে একে দোষ মনে করা হয়। তৎক্ষণাৎ আবার বাদশার দিকে মনোনিবেশ করল।

বাদশাহ যখন তার দিকে তাকালেন, তখন তার নাক থেকে একটু পানি ঝরে পড়ল। কাছে কোনো কাপড় ছিল না। অগত্যা পোশাকের একটা কোণ দিয়ে মুছে নিলেন। দেখামাত্রই বাদশার চোখে যেন রক্ত উঠে গেল। গর্জে উঠে বললেন, আমার দেওয়া পোশাক দিয়ে নাক পরিষ্কার করে সে আমার পোশাকের অবমাননা করেছে। কাজেই তার পোশাক খুলে নিয়ে তাকে দরবার থেকে বের করে দেওয়া হোক।

হুকুম পালিত হলো। এবার যেন সভার মোড়ই পাল্টে গেছে। সকলেই পেরেশান হয়ে গেলেন যে, একজন গভর্নরের সাথে এমন অসদাচরণ করা হলো। ব্যাপারটি সাধারণ ছিল না। বাদশাহ সভা সমাপ্ত করে দিলেন। সবাই চলে গেলেন। অল্প কিছুক্ষণ পর প্রহরী এসে বলল, নিহাওয়ান্দের গভর্নর আপনার সাক্ষাত প্রার্থনা করছে। বললেন, তাকে হাজির করো। গভর্নর ঢুকেই জিজ্ঞাস করলেন, বাদশাহ্ সালামত! আমি জানতে চাই, গভর্নরের হাঁচি কি ইচ্ছাকৃত এসেছিল নাকি অনিচ্ছাকৃত?

বাদশাহ বললেন, তোমার প্রশ্নে তো মনে হয়, তুমি কৈফিয়ত চাইছ। সাবধান! ভবিষ্যতে এমন প্রশ্ন আর কখনও করবে না। তিনি বললেন, বাদশাহ্ সালামত! তার যদি ভুল হয়েও থাকে, তাতে কি তাকে শাস্তি দেওয়া জরুরি ছিল অথবা এর জন্য তাকে কোনো লঘু শাস্তি দেওয়া যেত না?

বাদশাহ বললেন, তুমি চুপ থাকো; অন্যথায় তোমারও শাস্তি হবে। গভর্নর বললেন, বাদশাহ্ নামদার! আজ আমার একটি কথা বুঝে এসেছে যে, আপনি একজনকে একটি পোশাক দিয়েছেন। সে তার মূল্যায়ন করতে না পারায় আপনি তাকে ভরমজলিসে অপদস্থ করে আপনার দরবার থেকে বের করে দিলেন। আমার একথা বুঝে এসেছে যে, হে আল্লাহ! তুমিও তো আমাকে মনুষ্যত্বের পোশাক পরিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছ। আমি যদি তার যথাযথ মূল্যায়ন করতে না পারি, তাহলে তুমিও তো আমাকে কেয়ামতের ময়দানে তোমার দরবার থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিবে।

একথা বলে পোশাকটা খুলে বাদশার মুখের ওপর নিক্ষেপ করে বেরিয়ে গেলেন এবং হযরত জুনাইদ বাগদাদি (রহ.)-এর দরবারে গিয়ে পৌঁছলেন। পরিশেষে তিনি কী হলেন? যুগের শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হলেন, যার নাম হযরত শিবলি (রহ.)। যেহেতু তাঁর ত্যাগ ছিল অনেক বড়, তিনি গভর্নরের পদকে লাথি মেরে আল্লাহর ভালোবাসার পথকে আপন করে নিয়েছেন। তাই তার অবস্থা

ছিল বিস্ময়কর ও বিরল। আল্লাহপ্রেমের এমন অবস্থা তাঁর হতো, যা সাধারণ মানুষের ভাগ্যে জোটে না।

হযরত শিবলি (রহ.)-এর খোদাপ্রেম

হযরত শিবলি (রহ.)-এর সামনে কেউ আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলে তিনি তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে চকলেট বের করে তাকে দিতেন। বড়ই আশ্চর্য ধরনের অবস্থা ছিল। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, হযরত এ কেমন ব্যাপার? তিনি বললেন, যে আমার প্রিয়তমের নাম উচ্চারণ করে আমি তার মুখে মিষ্টি দেব না তো কী দেব? আল্লাহু আকবার!

আল্লাহর রহমতের ঘটনা

নিকটতম বান্দাদের সাথে আল্লাহর বিশেষ কিছু আদান-প্রদান হয়। হযরত শিবলি (রহ.)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা ইলহাম করলেন, হে শিবলি! তুমি কি চাও, আমি তোমার সকল দোষ-ক্রটি প্রকাশ করে দেই; ফলে কোনো মানুষ আর তোমার দিকে ফিরেও তাকাবে না? হজরত শিবলি (রহ.) উত্তরে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি কি চাও, আমি তোমার দয়ার কথা মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেই; তাহলে দুনিয়াতে তোমাকে আর কেউ সেজদা করার মতো থাকবে না?

এবার ইলহাম হলো, শিবলি! তুমিও আমার কথা বলো না, আমিও তোমার কথা কাউকে বলব না।

এ'তেকাফকারীরা আল্লাহর শ্রমিক

আপনারা দশ দিনের জন্য এ'তেকাফে বসেছেন। এই দশ দিন আপনারা আল্লাহ আল্লাহ করে কাটাবেন। একটি উদাহরণের প্রতি লক্ষ করুন। আমি যদি কাউকে আমার কাজ করতে ডেকে আনি আর শ্রমিক যদি সারা দিন শ্রম দেয়, তাহলে সন্ধ্যায় আমি তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে আমার আত্মমর্যাদায় বাঁধবে। আমার বিবেক চিন্তা করবে, লোকটা সারা দিন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটল, পরিশ্রম করল; কীভাবে তাকে বিনিময় ব্যতীত ফিরিয়ে দেই। আমার আপাদমস্তক দোষে ভর্তি। তথাপি সামান্য আত্মমর্যাদাবোধের কারণে আমি এতটুকু বরদাশত করতে পারি না যে, কেউ পরিশ্রম করবে আর আমি তাকে বিনিময়বিহীন ফিরিয়ে দেব। তাহলে আমার বন্ধুরা! আল্লাহর ব্যাপারে আপনারা কেমন ধারণা করেন?

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

'আসমান ও জমিনের ভান্ডারসমূহের চাবি তাঁরই হাতে।'[১]

আসমান-জমিনের ভান্ডারসমূহের চাবি যাঁর হাতে, তার কোনো বান্দা ১০দিন তার ঘরের চৌকাঠ ধরে থাকবে আর ফেরার বেলায় তিনি তাকে কোনো বিনিময় না দিয়েই কি পাঠিয়ে দিবেন? এমনটা কখনও হতে পারে না। আমার বন্ধুরা! আজকের দিনটি আপনাদের পারিশ্রমিক গ্রহণের দিন। এ কদিন আপনারা ইবাদত করেছেন; আজ তার ফলাফল গ্রহণের দিন।

দুটি কথা

আমি এই মাহফিলে দুটি কথা আরজ করতে চাই। এক. আপনারা অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করবেন। যেখানে অবস্থান করবেন, সেখানে কোনো আল্লাহওয়ালার সোহবত ভাগ্যে জুটলে তাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করবেন, যাতে আমাদের অন্তরে আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। দুই. বিগত জীবনে যত গুনাহ সংগঠিত হয়েছে, আজ এই মাহফিলে খাঁটি দিলে ক্ষমা প্রার্থনা করব, যাতে পূর্বের হিসাব-নিকাশ শেষ হয়ে যায় এবং সামনে নতুন জীবনের সূচনা হয়।

আমলের বিনিময় উভয় জাহানে পাওয়া যায়

আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত মানুষকে আমলের বিনিময় দুনিয়াতেও দান করেন এবং আখেরাতেও দান করবেন। মনে রাখতে হবে, আমাদের প্রতিপালক এমন স্বভাব থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র যে, বান্দা আনুগত্যের মাধ্যমে তার লেনদেন নগদ পরিশোধ করবে আর তিনি তার বিনিময় কেবল আখেরাতের বাকির ওপরই ছেড়ে দেবেন। না-না; ব্যাপারটা এমন নয়; বরং তিনি দুনিয়াতেও বিনিময় দান করেন এবং কেয়ামত দিবসেও বিনিময় দান করবেন।

আখেরাতে বিনিময় প্রদানের কারণ

কেয়ামত দিবসে বিনিময় প্রদানের কতিপয় কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো, আল্লাহ যে পরিমাণ বিনিময় দিতে চান, সেই পরিমাণ বিনিময় ধারণ করার ক্ষমতা এ পৃথিবীর করুর নেই। আখেরাতে সর্বশেষ জান্নাতী

---

১. সূরা যুমার : আয়াত ৬৩

ব্যক্তি যে জান্নাত লাভ করবে, তা এ পৃথিবী থেকে দশ গুণ বড় হবে। সুতরাং তিনি কীভাবে দুনিয়াতে আখেরাতের বিনিময় প্রদান করবেন?

দ্বিতীয় কারণ হলো, এই পৃথিবী নশ্বর। ফলে এ পৃথিবীতে প্রদেয় বিনিময়ও নশ্বরই হবে। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু অতীব দয়ালু, তাই তিনি মানুষের সামান্য ও সংক্ষিপ্ত আমলের বিনিময়ে তাদের স্থায়ী কিছু দিতে চান, যা আখেরাত ব্যতীত সম্ভব নয়। এজন্যই তিনি বলেছেন, কিছু বিনিময় তো আমি পৃথিবীতে নগদ প্রদান করব আর বাদবাকি আখেরাতে প্রদান করব, যা ধারণ করার ক্ষমতা এই পৃথিবীর কারুর নেই।

Quallty এবং Quantity

আল্লাহ আমাদের দুনিয়াতেও বিনিময় প্রদান করবেন এবং আখেরাতেও প্রদান করবেন। এ পৃথিবী তার সেই মহান বিনিময় Quallty এবং Quantity কোনো দিক থেকেই ধারণ করার ক্ষমতা রাখে না। অর্থাৎ গুণগত মান ও পরিমাণ কোনোটিই ধারণ করার ক্ষমতা-যোগ্যতা এই দুনিয়ার নেই।

হূর কেমন?

জান্নাতী কোনো হূর যদি কোনো নোনা পানিতে একটু থুতু নিক্ষেপ করে, তাহলে সেই পানি মিষ্টি পানিতে পরিণত হবে। যদি সে তার ওড়নার আঁচল পৃথিবীর দিকে একটু ঝুলিয়ে দেয়, তাহলে সূর্যের কিরণ মলিন হয়ে যাবে। যদি কোনো মৃত ব্যক্তির সাথে কথা বলে, সে জীবিত হয়ে যাবে। এমন বিনিময় পৃথিবী ধারণ করতে পারে না। তাই তিনি আখেরাতের ওয়াদা করেছেন। তা না হলে বান্দার নগদ আমলের বিনিময় তিনিও নগদই পরিশোধ করতেন। ব্যাপারটি এমন নয় যে, অর্থনৈতিক কোনো ঘাটতি রয়েছে, যার ফলে তিনি বাকি লেনদেন করছেন। এমনটি কখনই হতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের উভয় জগতেই বিনিময় প্রদান করবেন।

আল্লাহর কাছে আল্লাহকেই প্রার্থনা করুন

পৃথিবীতে আমরা কী প্রার্থনা করব? আল্লাহর নিকট তার ভালোবাসা প্রার্থনা করব। আল্লাহর নিকট কায়-কারবার, ঘর-বাড়ি, পদমর্যাদা, ইত্যাদি প্রার্থনাকারী অনেকেই রয়েছে। আল্লাহর নিকট আল্লাহকে প্রার্থনা করার মানুষ

খুবই কম। যারা বলবে, হে আল্লাহ! আমি তোমার ভালোবাসা চাই, তোমার সাথে সুসম্পর্ক চাই। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমাকে চাই এমন মানুষ একেবারেই নগণ্য।

চমৎকার নেয়ামত

এ সময়ের দোআগুলোতে আল্লাহ তা'আলার নিকট তার ভালোবাসা প্রার্থনা করবেন। আখেরাতের সফলতা কামনা করবেন। পৃথিবীতে আল্লাহর ভালোবাসা নসিব হলে তো কিসমত জেগে ওঠে, ভাগ্য খুলে যায়। আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা চমৎকার একটি নেয়ামত।

مجھکو سراپا ذکر بنادے ذکر تیرا اے میرے خدا

نکلے میرے ہر بن مو سے ذکر تیرا اۓ میرے خدا

اب تو کبھی چھوڑے نہ چھوٹے ذکر تیرا اۓ میرے خدا

حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اۓ میرے خدا

اب تو رہے بس تا دمِ اخر وردِ زباں اۓ میرے الہ

لا الہ الا اللہ و لا الہ الا اللہ

আমার আপাদমস্তক তোমার যিকিরে পরিণত করো হে আমার খোদা!

আমার প্রতিটি লোমকূপের গোড়া থেকে যেন তোমার ইরশাদ বের হয় হে আমার খোদা!

কভু যেন না ছোটে বা না ছাড়ি তোমার ইরশাদ হে আমার খোদা!

গলদেশ থেকে নিঃশ্বাসের পরিবর্তে যেন তোমার ইরশাদ বের হয় হে আমার খোদা!

শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত যেন তুমি থাক আমার মুখের বুলি হে আল্লাহ!

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

হায়! যদি এমন অবস্থা আমাদের নসিব হয়ে যেত!

یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھکو یاد رہے

تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے

سب خوشیوں کو آگ لگادوں غم سے تیرے دل شاد رہے

سب کو نظر سے اپنی گرادوں تجھ سے فقط فریاد رہے

اب تو رہے بس تا دم اخر وردِ زباں اۓ میرے الہ

لا الہ الا اللہ و لا الہ الا اللہ

স্মরণে তোমার সব ভুলব কেউ যেন মোর স্মরণে না থাকে।

তব তরে ঘরদোর সব লুটাব আমি মনের ঘর যেন আবাদ থাকে সব খুশিতে।

আগুন লাগাব তোমার জ্বালায় যেন মন তুষ্ট থাকে

মোর দৃষ্টি থেকে হটাব সবাইকে; তোমার কাছেই যেন মোর ফরিয়াদ থাকে আমরণ।

তুমিই হবে আমার জবানের অজিফা হে আমার আল্লাহ! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

হায়! এমন ভাগ্য যদি আমাদের হতো যে, গাইরুল্লাহর ভালোবাসা অন্তর থেকে বেরিয়ে যেত!

লক্ষ টাকার কবিতা

হযরত থানবি (রহ.)-এর একজন শীর্ষস্থানীয় খলিফা হযরত খাজা মাজযূব হাসান (রহ.) একদা একটি কবিতা পাঠ করে আপন পীর ও মুরশিদ হাকীমুল উম্মত (রহ.)কে শোনালেন। কবিতাটি শুনে তিনি এতই খুশি হলেন যে, বলতে লাগলেন, যদি আমি সামর্থ্যবান হতাম, তাহলে তোমাকে এই কবিতাটির জন্য এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দিতাম।

যে যুগে এক টাকার মূল্যই অনেক ছিল, সেই যুগে এক লক্ষ টাকার মূল্য কত ছিল, তা বলে বোঝানোর দরকা হয় না। সেই কবিতাগুলো হলো :

ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی

ایک ان سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی

لاکھ جھڑ کو اب کہاں پھرتا ہے دل ہو گئی اب تو محبت ہو گئی

আশা-আকাঙ্ক্ষা সব দিল থেকে বিদায় নিয়ে গেছে।
এবার তুমি আসো (প্রভু) নির্জনতা হয়ে গেছে।
সেই এক সত্তার সাথে কেমন মহব্বত হয়ে গেল যে,
সারা পৃথিবীর সাথেই যেন বিজনতা জন্মে গেছে।
লাখো ভর্ৎসনা এখন! তবু অন্তর কভু কি ফিরে গেছে।
এখন তো (প্রভু) মহব্বত হয়ে গেছে।

আল্লাহপ্রেমিক পাগল এক বুযুর্গের ঘটনা

নিটক অতীতে মাওলানা মোহাম্মদ আলী জাওহার (রহ.) নামে এক বুযুর্গ ছিলেন। আমাদের নকশবন্দি সেলসেলার বুযুর্গদের তত্ত্বাবধানে ছিলেন এবং তাদের তরবিয়ত পেয়েছেন। আল্লাহ তার অন্তরে তাঁর ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছেন। তিনি মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যত দিন মুসলমানরা স্বাধীনতা লাভ করবে না, তত দিন কলমযুদ্ধ চালিয়ে যাব। তিনি ইংল্যান্ড গেলেন। সেখানকার পত্র-পত্রিকায় এইমর্মে লিখতে শুরু করলেন যে, ইংরেজদের উচিৎ যেন তারা মুসলমানদের স্বাধীনতা দান করে। কলমযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন আর নিয়ত করে নিয়েছেন, স্বাধীনতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত ঘরে ফিরবেন না। এমতাবস্থায় কয়েকবার তার ওপর নির্যাতনও করা হয়েছে। জেলখানায়ও বন্দি করা হয়েছে। জেলখানায় বসে তিনি কয়েকটি কবিতা লিখেছেন :

تم یونہی سمجھنا کہ فنا میرے لئے ہے
پر غیب میں سامان بقا میرے لئے ہے
اللہ کے راستے کی جو موت آئے مسیحا
اکسیر یہی ایک دوا میرے لئے ہے
توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے
یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے

'তোমরা তো ভেবেছ, ধ্বংসই অনিবার্য আমার,
অদৃশ্য জগতের সব সামান প্রস্তুত আমাকে বাঁচাবার।
খোদার রাহের মৃত্যুর মর্ম জান কি হে খ্রিষ্টান?
সে যেন এক মহৌষধ আমায় বাঁচাবার।
তাওহীদ হলো, হাশরের ময়দানে খোদা বলবেন ডেকে,
উভয় জগত হতে বিরাগ এ বান্দা কেবল আশায় আমার।'

সন্তানের চেয়ে আল্লাহর ভালোবাসা প্রাধান্য দেওয়ার ঘটনা

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আলী জাওহার (রহ.)-এর মেয়ে ভীষণ অসুস্থ। ডাক্তাররা বলে দিয়েছেন, বাঁচবে না। মেয়েটি ছিল যুবতী। মা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার জীবনের শেষ আশা এবং চাহিদা কী? বলল, আব্বাজানকে একটু দেখতে চাই।

মা তার নামে চিঠি লিখে পাঠালেন। ভিনদেশে বসে হাতে চিঠি এল, আব্বা! আমি জীবনের শেষ প্রহর গুণছি। আপনি যদি আসতেন, তাহলে শেষবারের মতো আপনাকে এক নজর দেখতাম!

কত বড় কথা ছিল! কিন্তু তিনি মেয়ের চিঠির অপর পৃষ্ঠে দুটি কবিতা লিখে পাঠালেন। কী লিখলেন তিনি?

میں تو مجبور سہی اللہ تو مجبور نہیں   تجھ سے میں دور سہی وہ تو مگر دور نہیں

تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اسکو   نہیں منظور تو پھر ہمکو بھی منظور نہیں

'আমি অপারগ বটে; আল্লাহ তো আর অপারগ নন,
তোমা হতে আমি দূরে বটে; তিনি তো আর দূরে নন।
তোমার সুস্থতা কাম্য আমার তবে
যদি তাঁর কাম্য না হয়, তাহলে আমারও কাম্য নয়।'

এমন অবস্থা সৃষ্টি হলে তো জীবনটাই মজাদার হয়ে যাবে। আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত আমাদের উক্ত নেয়ামত অর্জন সহজ করে দিন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

রমজান মোবারকের বরকতসমূহ

'রমজান মাস বরকত নাযিলের মাস। বরকতের দুয়ার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এ-মাসে। হাদীছে পাকে বর্ণিত হয়েছে, রমজানের আগমন উপলক্ষ্যে জান্নাতে সুগন্ধি ছিটানো হয়। ঈমানদারদের জন্য জান্নাতকে সুসজ্জিত করা হয়। আর ১লা রমজান এলে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেন এবং ফেরেশতাদের বলেন, আজ ঈমানদারদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হবে। বরের জন্য কনেকে যেমন সাজানো হয়, ঈমানদারের জন্য জান্নাতকেও তেমনি সাজানো হয়।'

রমজান মোবারকের বরকতসমূহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۭ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۭ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۡ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٨٥﴾

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সফল মানুষ

আল্লাহ এ জগতে মানুষকে তার ইবাদতের জন্য পাঠিয়েছেন। এখানে সে মাত্র কয়েক দিনের মেহমান। মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেই সে আখেরাতে পাড়ি জমাবে। ভাগ্যবান সে, যে তার সময়গুলো আল্লাহর স্মরণে কাটায় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণে প্রতিনিয়ত অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়ায়। যার সব আমল হয় শরীয়তের নির্দেশনার আলোকে এবং নবীর সুন্নাত অনুসারে। এমন মানুষ ইহকালেও সফল, পরকালেও সফল

শা'বান মাসের জীলত

শা'বান মাসটি বড়ই বরকতময় মাস। কারণ, এটি হলো রমজানের ভূমিকা। এ মাসের পনেরো তারিখের রাতকে শবেবরাত বলা হয়। এ রাতটি আল্লাহর দরবারে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। এ রাতে মানুষের আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়, আগামী এক বছরের মৃত্যুর তালিকা তৈরি করা হয় এবং মালাকুল মউত-এর হাতে হস্তান্তর করা হয়। জীবিতদের রিযিকের সিদ্ধান্ত করা হয়।

হাদীছ শরীফের বর্ণনামতে এ রাতটি অতি বরকতময়। মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) তাঁর মাকতুবাতে লিখেছেন, সূর্যোদয়ের বেশ আগ থেকেই সকালের শুভ্রতা প্রকাশ পেতে থাকে এবং তা ধীরে-ধীরে বাড়তে থাকে। একপর্যায়ে সূর্যোদয়ের সামান্য পূর্বে মনে হয়, যেন সূর্যই উদিত হয়েছে। ঠিক তেমনি রমজান মোবারকের বরকত শা'বানের ১৫ তারিখের রাত থেকেই শুরু হয়ে যায় এবং দিন-দিন তা বাড়তে থাকে। রমজানের দু-চার দিন পূর্বে তো এমন নূর উপলব্ধি হয়, যেন রমজান মোবারকই এসে গেছে। আর রমজানের প্রথম তারিখে তো নূরানী সূর্য তার উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে প্রকাশ পায়। আলোকিত করে দেয় মুমিনদের অন্তর। এজন্যই নবীজি শা'বান মাসে বেশি করে রোযা রাখতেন। এমনকি লাগাতার কয়েক দিন (ইফতার না করে) রোযা রাখতেন, যাকে ফকীহদের পরিভাষায় 'সাওমে বেসাল' বলা হয়।

রমজান মোবারকে নবীজির মামুলাত

সাহাবায়ে কেরাম বলেন, রমজান এলেই আমরা নবীজির আমলে তিনটি অতিরিক্ত জিনিস উপলব্ধি করতাম :

প্রথমত : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকহারে ইবাদত করতেন। অথচ তাঁর দৈনন্দিনের ইবাদতের অবস্থা ছিল–

حَتّٰى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ

'তাঁর কদম মোবারক ফুলে যেত।'[১]

তথাপি সাধারণ সময়ের তুলনায় রমজানে তাঁর ইবাদতের মাত্রা অনেক বেড়ে যেত।

দ্বিতীয়ত : আল্লাহর রাহে প্রচুর পরিমাণ দান-খয়রাত করতেন। মন-দিল সব উজাড় করে দিয়ে মুক্ত হস্তে দান করতেন।

তৃতীয়ত : মুনাজাতে খুব বেশি কান্নাকাটি করতেন। এ তিনটি বিষয়ে রমজানে বেশ পরিবর্তন মনে হতো। আমরাও রমজান মোবারকে এ আমলগুলোর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করব। দুনিয়াবি কাজে প্রতিদিনই আমরা ক্লান্ত হয়ে যাই। এ মাসে ইবাদত করে শরীরটাকে ক্লান্ত করব। জীবনে যেন এমন একটি সময়ও আমাদের আসে, যে সময়ে ইবাদতের দরুন ক্লান্ত হয়ে পড়ি, চোখ যেন ঘুমাতে ভয় পায়। নিজেকে যেন একথা বোঝানোর

---

১. ছহীহ বোখারি : হাদীছ নং ৪৪৫৭

চেষ্টা করি, যদি তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জাগরণ কর, তাহলে কেয়ামত দিবসে তোমার আল্লাহ তা'আলার দিদার নসিব হবে। এ চক্ষু যদি আজ জাগরণ করে, তাহলে কবরে গিয়ে মধুর নিদ্রায় বিভোর হবে।

موت کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام   نیند بھر کر وہی سویا جو کہ جاگا ہوگا

মৃত্যুর পর প্রশান্তি তাদের, জাগ্রত অন্তর রয়েছে যাদের,
পূর্ণ ঘুমে বিভোর তারাই, জাগরণ করেছে চক্ষু যাদের।

তাহলে আগত এ মাসটি হলো জাগ্রত থাকার মাস। এ মাসকে কঠোর সাধনার মাস ভেবে আরাম-আয়েশ একটু কমিয়ে দেব।

নেকীর মৌসুম

যারা ব্যবসায়ী, তাদের যখন মৌসুম আসে, তারা তখন কঠোর পরিশ্রম করে। সব ব্যস্ততা ফেলে রাখে, অন্যদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, আমার এখন মৌসুম; তাই খুব একটা সময় দিতে পারছি না। সে তো খাওয়া-দাওয়ারও কোনো পরোয়া করে না, রাতে ঘুমানোর চিন্তা করে না। তার সব সময় শুধু একটা-ই চিন্তা, এ মৌসুমে আমি কীভাবে উপার্জন করব। মৌসুমে যতটুকু সম্ভব লাভ করে নিই। সে ভাবে কিছু দিন কষ্ট-ক্লেশ করলেই তো পরে আরাম করতে পারব। এমনিভাবে রমজান মাস নেকী উপার্জনের মৌসুম। যারা গুনাহ মাফ করাতে চায়, যারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য হাসিল করতে চায়, যারা আল্লাহকে সদা সঙ্গে পেতে অস্থির, তাদের জন্য রমজান বড়ই উপযোগী মৌসুম। তাদের রোযা যেন কেবল খানা-পিনা থেকে বিরত থাকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না হয়। বরং তার চোখ, মুখমণ্ডল, কান, লজ্জাস্থান, চিন্তাচেতনাও রোযাদার হয়। এভাবে আমাদের আপাদমস্তক যখন রোযাদারে পরিণত হবে, তখন ইফতারের সময় রব্বুল ইয্যাতের দরবারে হাত উঠালে তিনি সেই দোআ কবুল করবেন।

জান্নাতের সাজসজ্জা

রমজান মাস বরকত নাযিলের একটি চমৎকার মাস। বরকতের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এ-মাসে। হাদীছে পাকে বর্ণিত হয়েছে, রমজানের আগমন উপলক্ষ্যে জান্নাতে সুগন্ধি ছিটানো হয়। ঈমানদারদের জন্য জান্নাতকে সুসজ্জিত করা হয়। আর পহেলা রমজান এলে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেন এবং ফেরেশতাদের বলেন, আজ

ঈমানদারদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হবে। বরের জন্য কনেকে যেমন সাজানো হয়, ঈমানদারের জন্য জান্নাতকেও তেমনি সাজানো হয়।

নবীজিকর্তৃক রমজান মাসের জন্য অপেক্ষা

হাদীছে পাকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোআ করতেন–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

'হে আল্লাহ! রজব ও শাবান মাসে আমাদের জন্য বরকত দান করুন এবং আমাদেরকে রমজান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিন।'[১]

তাহলে এ-মাসটি কত বরকতময়, যে মাস প্রাপ্তির জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে দোআ করতেন!

আল্লাহু আকবার!

রোযাদারের মর্যাদা

এ মাসের বরকত এতই বেশি যে, যখন কেউ রোযা রাখে, আকাশের পাখিরা, গর্তের পিপিলিকারা, সমুদ্রের মাছেরা তখন তার জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে। রোযাদার ব্যক্তি যখন দোআ করে, ফেরেশতারা তখন তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে এবং আমীন বলে। এতই বরকতের মাস যে, এর একটি মুহূর্তের বরকত লাভকারী অলী-আবদালে পরিণত হয়। আমরা যদি এসব বরকত হাসিলে ধন্য হতে পারি, তাহলে আমরাও তাঁর পরিচয় লাভে সক্ষম হব।

সুবর্ণ সুযোগ

রমজান মাস ঈমানদারের বসন্ত কাল। বসন্তকালে চতুর্দিকে সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ে, বৃক্ষরাজি ফলে ভরে যায়, ফুলগুলো ফুটে থাকে। বাগানে প্রবেশ করলে শূন্য জায়গাগুলো সুঘ্রাণে বিমোহিত হয়ে যায়। কেন এমনটি হয়? কারণ, এটা যে বসন্তকাল। সকলেই যেন টের পায় বসন্ত কাল। ঠিক তদ্রূপ রমজান মাস আল্লাহর রহমতের মাস। তার সকালে রহমত, সন্ধ্যায় রহমত, তাহাজ্জুদের সময়েও রহমত। যে মানুষটি তার গুনাহ মাফ করাতে চায়,

---

১. আল-মু'জামুল আওসাত : হাদীছ নং ৪০৮৬

আল্লাহকে রাজি করতে চায়, তার জন্য এই মাসটি হলো 'সুবর্ণ সুযোগ' (Golden chance) যেন এ শব্দটি এ উদ্দেশ্যেই গঠিত। কেননা, এ শব্দটি এক্ষেত্রে একেবারেই যথার্থ।

সালাফে সালেহীনের ঘটনাবলি

আমাদের পূর্বসূরীরা কীভাবে এমাসের বরকত লাভে ধন্য হয়েছেন, তার কতিপয় নমুনা নিম্নে আরজ করা হচ্ছে, যাতে আমরা আন্দাজ করতে পারি, আমাদের পূর্বসূরীরা এমাসটি কীভাবে কাটাতেন।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর অভ্যাস

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর জীবনীতে লিপিবদ্ধ আছে, তিনি রমজানে ৬৩ বার কুরআন শরীফ খতম করতেন। দিনে এক খতন, রাতে এক খতম আর তারাবীতে তিন খতম। দিনে-রাতে মিলে ষাট খতম, তারাবীহতে তিন খতম, সর্বমোট তেষট্টি খতম।

আল্লাহু আকবার!

হযরত রায়পুরি (রহ.)-এর অভ্যাস

হযরত রায়পুরি (রহ.)-এর মামুলাতে লিখা আছে, তিনি শাবান মাসের ২৯ তারিখে সকল মুরীদ ও ভক্তদের একত্রিত করে বলতেন, হায়াত থাকলে রমজানের পর সাক্ষাৎ হবে। কোনো খাদেমকে ডেকে একটা চটের ছোট বস্তা দিয়ে বলতেন, রমজান মাসে যত চিঠি আসবে, সব এখানে রেখে দেবে। বেঁচে থাকলে রমজানের পর খুলে পড়ব। রমজানে কোনো চিঠি খুলতেন না। বলতেন, এ মাসটি আমি আমার জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছি। তাঁর দরবারে গোটা রমজান মাস এ'তেকাফ করার নিয়ম ছিল, দূর-দূরান্ত থেকে অনেক মানুষ এখানে রমজান কাটাতে আসত। ২৯ শে শাবান এলে মসজিদে বিছানা বিছানোর জায়গা পাওয়া যেত না। এভাবেই তিনি গোটা রমজান মাস ইবাদত ও আল্লাহর স্মরণে কাটিয়ে দিতেন।

রমজান সম্পর্কে মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.)-এর নির্দেশ

আমাদের নকশবন্দিয়া সেলসেলার ইমাম ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) তাঁর মাকতুবাতে রমজানের ফজীলত বর্ণনা করতে গিয়ে

বলেছেন, রমজান মাসের বরকত সমুদ্রতুল্য। আর অন্যান্য মাসের বরকত হলো সমুদ্রের একটা ফোঁটার মতো। একারণেই আল্লাহ জাল্লা শানুহু আপন কুরআন এ মাসে নাযিল করেছেন। এমনকি আসমানী সকল কিতাবই এ মাসে নাযিল করেছেন। কোনোটি হয়তো চার তারিখে আর কোনোটি সাতাশ তারিখে। আল্লাহু আকবার! এ মাসের সাথে আল্লাহর কালামের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তাই এমাসে অত্যধিক পরিমাণ কুরআন তেলাওয়াত করা উচিৎ।

ছাওয়াব বৃদ্ধি

রমজান মোবারকে রোযাদারের ইবাদতের ছাওয়াব বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। নফল ইবাদতে ফরজের সমতুল্য ছাওয়াব আর প্রতিটি ফরজ ইবাদতে সত্তর গুণ বেশি ছাওয়াব প্রদান করা হয়।[১]

তিন দশকের ফজীলত

বরকতের এ সুমহান মাসটি আল্লাহর রহমত ও মাগফেরাতের মাস। হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ

'তার প্রথম দশ দিন রহমতের।'

وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ

'তার মধ্যবর্তী দশদিন মাগফেরাতের।'

وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ

'আর তার শেষ দশ দিন জাহান্নাম থেকে মুক্তির।'[২]

আল্লাহর রহমত অজুহাত তালাশ করে

মদীনা তায়্যেবার অদূরে বনু কাল্‌ব নামে একটি গোত্রের বসতি ছিল। ভেড়া-বকরি পালনে যাদের বেশ খ্যাতি ছিল। তাদের এক-একজনের শত-শত, হাজার-হাজার ভেড়া-বকরি থাকত। হাদীছে পাকের মর্মার্থ এমন যে, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ গোত্রের নাম উল্লেখ করে

১. শুআবুল ঈমান : হাদীছ নং ৩৩৩৬

২. শুআবুল ঈমান : হাদীছ নং ৩৪৫৫

বললেন, আল্লাহ তা'আলা রমজানের এক রাতে বনু কাল্ব গোত্রের ভেড়া-বকরির পশমপরিমাণ জাহান্নামীকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করবেন।[১]

আল্লাহু আকবার!

মনে হচ্ছে, যেন আল্লাহর রহমত বান্দার গুনাহ মাফ করার জন্য কেবল অজুহাত তালাশ করে। ফার্সী ভাষায় একটি প্রবাদ আছে–

رحمتِ حق بہانہ می جوید

ফার্সীতে بہا শব্দের অর্থ মূল্য আর بہانہ এর অর্থ অজুহাত। প্রবাদটি এভাবে পড়লে رحمت حق بہا نمی جوید অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহর রহমত মূল্য চায় না। আর এভাবে পড়লে رحمت حق بہانہ می جوید অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহর রহমত অজুহাত তালাশ করে।

ইবাদতে অন্তরায়

আসমান-জমিনের স্রষ্টা রমজান মোবারকে স্বীয় বান্দাদের জন্য মাগফেরাতের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন, বড়-বড় শয়তানগুলোকে বন্দি করে দেন। তারপরও মানুষের ইবাদত না করার পিছনে বাধা কোথায়? আসলে নফ্সই হলো আসল বাধা। তাই নফ্সকে বোঝাতে হবে, সারাটা বছর অলসতায় কাটিয়েছ; অন্তত এমাসে তো কিছু উপার্জনের প্রয়োজন আছে।

বুযুর্গির মাপকাঠি

সালাফে সালেহীনের জীবনীতে লিখা আছে, তাঁরা যখন কারো বুযুর্গি নিয়ে আলোচনা করতেন, তখন বলতেন, অমুক ব্যক্তি অনেক বড় বুযুর্গ। প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করতেন, তিনি তো জীবনে এতগুলো রমজান পেয়েছেন। যেন রমজানই ছিল তাঁদের নিকট কারো বুযুর্গি ও উঁচু মর্যাদা নির্ণয়ের মানদণ্ড। তাঁরা বলতেন, অমুক তো এতগুলো রমজান পেয়েছেন; কাজেই আমরা তার স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে পারব না। আল্লাহু আকবার!

জান্নাতের নিলাম

বাজারে অনেক সময় বিভিন্ন জিনিসের নিলাম হয়। কোথাও জুতার নিলাম আবার কোথাও অন্যান্য জিনিসের। নিলাম হলে দামী জিনিসও সস্তায়

১. তাখরীজুল আহাদীছিল কাশশাফ : হাদীছ নং ১১৭১

পাওয়া যায়। এমন হলো কেন? কারণ, নিলাম হয়েছে। সাধারণ প্রচলন এমনই। নিলামের সময় অতি মূল্যবান জিনিসও সস্তা হয়ে যায়। কুরআন-হাদীছ অধ্যয়ন করলে জানা যায়, রমজান মোবারকে আল্লাহ জাল্লা শানুহূ জান্নাতের নিলাম ঘোষণা করেন। তারপরও কেন মানুষ তা হাসিল করবে না? অথচ আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত স্বয়ং ইরশাদ করেছেন :

وَاللّٰهُ يَدْعُوْا إِلٰى دَارِ السَّلَامِ

'আল্লাহ তোমাদের শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করছেন।'[১]

তাহলে কেন আমরা তাঁর দরবারে তাঁর রহমত প্রার্থনা করব না?

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

'হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি কামনা করি।'[২]

হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)-এর অভ্যাস

শাইখুল হাদীছ হযরত যাকারিয়া (রহ.) নিজের ব্যাপারে বলেন, আমি আকাবিরের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই রমজান মাসে একাগ্রতার সাথে ইবাদতে কাটাতাম। আমার অভ্যাস ছিল, আমি দিনভর কুরআন তেলাওয়াতে লিপ্ত থাকতাম এবং কিছু সময় নফল ইত্যাদিতে কাটাতাম। আমার এক বন্ধু – যিনি অন্য মহল্লায় থাকতেন—রমজানে আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য এলেন। আমার রমজানের মামুলাত সম্পর্কে তার ধারণা ছিল না। তিনি এসে সালাম দিলেন। আমি সালামের জবাব দিয়েই কামরায় প্রবেশ করে তেলাওয়াত শুরু করলাম। তিনিও আমার পিছু-পিছু কামরায় এসে অপেক্ষা করতে থাকলেন। আর আমিও তেলাওয়াত করতে থাকলাম। এভাবেই আসরের সময় হলো।

আসরের আযান হলো। আমরা দুজনে আসরের নামায আদায় করলাম। নামায শেষে আমি সোজা কামরায় গিয়ে আপন জায়গায় বসে তেলাওয়াত শুরু করলাম। তিনি পুনরায় কামরায় এসে দেখলেন, আমি তেলাওয়াত শুরু করে দিয়েছি। তিনি ছিলেন আমার বাল্যকালের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বললেন, 'ভাই! রমজান তো আমাদের কাছেও আসে। তবে

১. সূরা ইউনুস : আয়াত ২৫

২. কিতাবুদ্দু'আ লিততাবরানী : হাদীছ নং ৫৫

এমন করে জ্বরের মতো তো আসে না। অর্থাৎ– তার কাছে এমই মনে হয়েছে যে, রমজান যেন তাঁর ওপর জ্বরের মতো এসেছে। তিনি বলেন, বাস্তবেই আমার মধ্যে মাসভর এক ধরনের আবেগ কাজ করত।

শাইখুল হিন্দ (রহ.)-এর অভ্যাস

শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (রহ.)-এর তারাবীর নামায সাহরীর সময় শেষ হত। তিনি তারাবীহ শেষ করেই সাহরী খেতেন। তার পর-পরই ফজরের নামাযের প্রস্তুতি নিতেন। সারাটা রাত ইবাদতে কাটাতেন। একবার লাগাতার কয়েক দিন মুজাহাদা করায় ঘরের মহিলারা অনুভব করল, হযরত একটু দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আবার বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন কি-না ভেবে তারা অনুরোধ করল, হযরত! মাঝে একদিন একটু বিরতি দিলে স্বাস্থ্য একটু ভালো হত। পুনরায় দশ-পনেরো দিন আবার ইবাদতে কাটাতে পারবেন। কিন্তু হযরত বললেন, আগামী রমজান কার ভাগ্যে জুটবে সে তো কারো জানা নেই। ঘরের মহিলারা কোনো এক বাচ্চার মাধ্যমে কারী সাহেবের নিকট সংবাদ পাঠিয়ে দিলেন, কারী সাহেব! আপনি কোনো একরাতে ক্লান্তির অজুহাত পেশ করবেন। বলবেন, হযরত! আজ আমি ক্লান্ত; তাই একটু বিশ্রাম করতে হবে। (হযরতের নীতি ছিল, অন্যের ওজর-আপত্তি খুব সহজেই গ্রহণ করে নিতেন) কারী সাহেব বললেন, আচ্ছা; ঠিক আছে। তিনি তো আমার পীর ও মুরশিদ; তিনি যেহেতু একটু দুর্বল এবং ক্লান্ত; তাই আজ রাত একটু বিশ্রাম করে কাটিয়ে দেব।

কারী সাহেব তারাবীহ পড়ানোর জন্য এসে বলতে লাগলেন, হযরত আজ আমি ক্লান্ত; তাই আজ বেশি তেলাওয়াত করতে পারব না। হযরত বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে; আজ আপনি সামান্য পরিমাণ তেলাওয়াত করবেন। কারী সাহেব দু-এক পারা পড়েই তারাবীহ শেষ করে দিলেন। হযরত বললেন, কারী সাহেব! আপনি শুয়ে পড়ুন। কারী সাহেব হুকুম মানতে বাধ্য হলেন। অগত্যা হযরতের বিছানায়ই শুয়ে পড়লেন। হযরত বললেন, কারী সাহেব! আপনি বিশ্রাম করুন; ঘুমিয়ে পড়ুন। তিনি লাইট বন্ধ করে দিলেন, জানালা লাগিয়ে দিলেন। কারী সাহেব বলেন, কিছুক্ষণ পর আমার ঘুম ভাঙলে দেখতে পেলাম, কে যেন আমার পা টিপছে। আমি অস্থির হয়ে উঠে বসে পড়লাম। কাছে গিয়ে যখন দেখলাম, তখন আমার অস্থিরতার অন্ত রইল না যে, আমার পীর ও মুরশিদ অন্ধকারে আমার পা টিপছেন। আমি

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বললাম, হযরত! আপনি এ কী করছেন? তিনি বললেন, কারী সাহেব! আপনিই তো বলেছেন; আপনি ক্লান্ত; তাই আমি ভাবলাম, একটু পা টিপে দেই; তাতে আপনার আরাম হবে। কারী সাহেব বললেন, হযরত যদি আপনি জাগরণ করেই রাত কাটাতে চান, তাহলে আসুন, আমি কুরআন তেলাওয়াত করি আর আপনি শুনুন। এভাবেই রাত কেটে যাবে। কারী সাহেব আবার মুসল্লায় এসে কুরআন পড়তে শুরু করলেন আর হযরত শুনতে লাগলেন।

আল্লাহু আকবার!

আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার পদ্ধতি

সালাফে সালেহীনগণ আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য এমন ইবাদত করতেন, যেন কেউ কোনো অসন্তুষ্ট ব্যক্তিকে রাজি করার চেষ্টা করছে। সুবহানাল্লাহ! তাঁরা অসন্তুষ্ট প্রভুকে সন্তুষ্ট করতেন। যদি কোনো গোলাম পালিয়ে যায়, তারপর তাকে ধরে এনে মালিকের সামনে হাজির করা হয়, তখন সে কেমন করে? সে তখন মালিকের সামনে হাত জোড় করে মালিকের পায়ে পড়ে যায় আর বলতে থাকে, হে আমার মালিক! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। ভবিষ্যতে এমন কাজ পরিহার করে চলব। বন্ধুরা! রমজান মোবারকে আমরা যদি আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের সামনে দুহাত জোড় করে সেজদায় লুটে পড়ি এবং আরজ করি, হে আল্লাহ! আমি অনুতপ্ত ও লজ্জিত; এ যাবৎ আমি যত অন্যায় করেছি, সব মাফ করে দিন। ভবিষ্যতে তাকওয়াপূর্ণ জীবন যাপনের আপ্রাণ চেষ্টা করব।

সুখ-শান্তি

আল্লাহওয়ালাগণ এমাসে সুখ-শান্তিকে বিদায় জানান। আমরাও রমজান মোবারকে সুখ-শান্তিকে বিদায় জানাব। আমরা ভাবব, বছরের এগারটি মাস তো স্বাধীনভাবে ঘুমাই। একটি মাস তো এমনও থাকা চাই যে, কম ঘুমাব। চোখ যদি ঘুমাতে ভয় পায়, তাহলে তো বেশ ভালো কথা। আর যদি শরীরটাকে ক্লান্ত করে দিতে পারি, তাহলে তো আরও ভালো হয়। হ্যাঁ, কাল কেয়ামত দিবসে আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের সম্মুখে বলতে পারব, হে আল্লাহ! জীবনের একটি মাস তো এমন কাটিয়েছি, যে মাসে চোখ ঘুমাতে ভয় পেত। শরীরটা বিশ্রাম নিতে ভয় করত।

আমাদের আরামপ্রীতি

তারাবীতে এক খতম কুরআন শ্রবণ করাই আমাদের জন্য মুশকিল হয়ে পড়ে। কেউ তো বলে, অমুক মসজিদে যেতে হবে। এমন কেন? কারণ, সেখানে ৩০ মিনিটে তারাবী শেষ হয়ে যায়। অমুক জায়গায় ২৫ মিনিটে শেষ হয়ে যায়। আমরা মসজিদ খুঁজে ফিরি যে, কোথায় গেলে পাঁচ মিনিট আগে শেষ করতে পারব। এ হলো আমাদের আরামপ্রিয়তার অবস্থা।

মহিলাদের কুরআনের প্রতি ভালোবাসা

হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.)-এর এলাকায় মহিলারা তারাবীতে কুরআন খতম করত। হযরতের সাহেবজাদা নামায পড়াতেন। ঘরের মহিলারা ও পার্শ্ববর্তী আরো অন্যান্য মহিলারা পর্দার অন্তরালে থেকে জামাতে শরীক হত। একদিন হযরতের সাহেবজাদা অসুস্থ হলে হযরত অন্য একজন কারী সাহেবকে পাঠিয়ে দিলেন। কারী সাহেব তারাবীতে মোট চার পারা তেলাওয়াত করলেন। সাহরীর সময় হযরত যখন ঘরে তাশরিফ নিলেন, মহিলারা খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বলতে লাগল, হযরত! আজ আপনি কোন কারী সাহেবকে পাঠালেন? সে তো আমাদের তারাবীই নষ্ট করে দিয়েছে। তিনি বললেন, কেন? কী হয়েছে? তারা বলল, তার যে কী তাড়া ছিল! কেবল চার পারা পড়েই পালিয়েছে। পরে সংবাদ নিয়ে জানা গেল, এই মহিলারা তারাবীতে মোট ৭বার কুরআন খতম করত। জি এখনো কোনো-কোনো খানকায় তিন খতম কুরআন তারাবীতে পড়ার রীতি চালু আছে। কোনো-কোনো খানকায় গোটা রমজান মাস এ'তেকাফ করার রীতিও রয়েছে। আমাদের পূর্বসূরীরা মাহে রমজানে এমন মুজাহাদা করতেন, যেন এমাস নেকী উপার্জনের মাস। যেন এমাস দেহটাকে ক্লান্ত করার মাস।

সাধনার মাস

আমার বন্ধুরা! বছরের অন্য সময় তো আমাদের মতো দুর্বলদের জন্য তাহাজ্জুদের উদ্দেশ্যে জাগ্রত হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তাহলে আসুন রমজানে তো রোযা রাখার সুবাদে জাগ্রত হই-ই। সেই সাথে কয়েক রাকাত নফল নামাযও পড়ে নেই। দিনের বেলা কুরআন তেলাওয়াতে সময় কাটাই। এক মাসের জন্য গীবত বর্জন করি। অহেতুক ও নিরর্থক কথাবার্তা পরিহার করি। বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়ার দুই এক ঘণ্টা সময় ত্যাগ করি। কিছুদিনের

জন্য একটু অপরিচিত হই। আমরা বলব এমাস ব্যক্তিগত সাধনার মাস। যা উপার্জন করা সম্ভব উপার্জন করে নাও।

জিবরীল (আ.)-এর বদদোআ

হাদীছে পাকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত জিবরীল (আ.) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এসে বদদোআ করেছেন, হে আল্লাহর নবী! সেই ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে যাক যে রমজান মাস পেয়েও তার গুনাহ মাফ করাতে পারেনি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীন বলে দোআটিকে মহরাংকিত করে দিলেন।[১]

প্রথমত একজন নিকটতম ফেরেশতার বদদোআই যথেষ্ট। উপরন্তু নবীজি তাতে মহর মেরে তার শক্তি এতই বাড়িয়ে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি রমজান মাস পেয়েও গুনাহ মাফ করাবে না, তার ধ্বংসের ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।

আমাদের দুর্বলতার সমাধান

সালাফে সালেহীনগণ কেয়ামত দিবসে আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের সম্মুখে বড়-বড় আমল পেশ করবেন। কেউ চল্লিশ বছর যাবৎ এশার ওজু দ্বারা ফজরের নামায আদায় করার আমল পেশ করবেন। এভাবে বিভিন্নজন জীবনের বিভিন্ন আমল পেশ করবেন। তখন তো আমাদের অনুশোচনা হবে। যদি আমাদের আমল অন্তত এতটুকুও হয় যে, আমরা আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের সামনে রমজানের রোযা, তার তেলাওয়াত ও ইবাদত পেশ করতে পারি আর বলি, হে আল্লাহ! আমরা তো দুর্বল ছিলাম, এগার মাস অলসতার শিকার ছিলাম। কিছু করতে পারিনি। একটি মাস এমন ছিল যে, সে মাসে তোমাকে সন্তুষ্ট করার পূর্ণ চেষ্টা করেছি; তুমি কবুল করে নাও।

میری قسمت سے الٰہی پائیں یہ رنگ قبول

پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کیلئے

'আমার ভাগ্যজোরে প্রভু হয় যেন ইহা কবুল,

তব আঁচলের তরে বাছাই করেছি আমি সামান্য কিছু ফুল।

---

১. সহীহ ইবনে হিব্বান : হাদীছ নং ৪০৯

জনৈক বৃদ্ধা মহিলার হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি ভালোবাসা

হযরত ইউসুফ (আ.)কে ক্রয় করার জন্য এক বৃদ্ধা রওনা হলো। কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করল, মা! তুমি কোথায় যাচ্ছ? বলল, ইউসুফকে ক্রয় করতে। সে বলল ইউসুফ (আ.)কে তো ক্রয় করতে অনেক বড়-বড় ধনীরা এসেছেন, যুগ শ্রেষ্ঠ নবাবেরা এসেছেন, বড় বড় আমীরগণ এসেছেন। তুমি ইউসুফ (আ.)কে কীভাবে খরিদ করবে? বৃদ্ধা বললেন, আমিও জানি, আমি ইউসুফকে খরিদ করতে পারব না। তবুও আমার মনে একটি কথার উদয় হয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করল, কথাটি কী? তিনি বললেন, কেয়ামতের দিবসে আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত যখন বলবেন, আমার ইউসুফের খরিদপ্রার্থীরা কোথায়? তখন আমিও ইউসুফ-এর খরিদপ্রার্থীদের মধ্যে গণ্য হতে পারব।

এমনিভাবে আমার বন্ধুরা! আমাদের পূর্বসূরীরা যখন আল্লাহ জাল্লা শানুহুর সম্মুখে তাঁদের জীবনের এত-এত আমল পেশ করবেন, তখন আমরা জীবনের একটি মাসকেই পেশ করব। বলব, হে আল্লাহ! আর কিছু তো করতে পারিনি। কেবল একমাস সাধনা করেছি। তুমি একেই গ্রহণ করে নাও।

ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি পাখিদের ভালোবাসা

হযরত ইবরাহীম (আ.)কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হলো, তখন অগ্নিশিখা এত উঁচু ছিল যে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত জ্বলছিল। কেউ তার নিকটে যেতে পারছিল না। ছোট একটা পাখি তার ঠোঁটে করে পানি নিয়ে সেই আগুনে ঢালছিল। দেখে অন্য একটা পাখি তাকে ডেকে বলল, আরে ভাই! তোমার এ যৎসামান্য পানিতে তো আর এই আগুন নিভবে না! সে বলল, আমিও জানি, এই সামান্য পানিতে এমন বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড নিভতে পারে না। কিন্তু তারপরও ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি আমার বন্ধুত্বের দাবি তো পূরণ করতে হবে।

মুক্তির উপায়

আমার বন্ধুরা! আমরা সকলেই তো জানি, আমাদের গুনাহ অনেক বেশি, চেষ্টা সাধনা অতি অল্প। তবে কথা হলো, আমরা রমজান মোবারক আল্লাহর রহমত কামনায় কাটিয়ে দেব। কোনো দুনিয়াদারের দরজায় কেউ যদি এক মাস ধরে নক করে, তাহলে সে দুনিয়াদারও দরজা খুলে দিবে। আর আমরা

তো আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরজা নক করব। আমরা যখন পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে স্বীয় গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করব, তখন নিশ্চিত আল্লাহর রহমতের দরিয়ায় তরঙ্গ সৃষ্টি হবে এবং আমাদের জন্য মাগফেরাতের বার্তা বয়ে আনবে। আমাদের মুক্তি তো প্রকৃত বন্ধু মহান আল্লাহর একটি দৃষ্টি বরং সামান্য দৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল।

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيزٍ

'আল্লাহর পক্ষে তা কঠিন কিছু নয়।'[১]

আল্লাহ তা'আলা আমাদের আপন রহমতের বিশেষ অংশ দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

---

১. সূরা ইবরাহীম : আয়াত ২০

রোযা কেন ফরজ করা হলো?

'ডাক্তারদের গবেষণামতে ১ মাস রোযা রাখার ফলে মানুষের দেহের অনেক রোগ-ব্যাধি এমনিতেই দূর হয়ে যায়। রোযার শারীরিক উপকারিতাও রয়েছে, রূহানি উপকারিতাও রয়েছে। অনেক মানুষ এমনও রয়েছে, যাদের ঘরের বাথরুম-গোসলখানা গরিবের বসত ঘরের চেয়ে উন্নত। যদি রোযার বিধান না থাকত, তাহলে তারা বুঝতেই পারত না, গরিবেরা তাদের স্ত্রী -বাচ্চা নিয়ে অনাহারে কেমন কষ্ট ভোগ করে। আল্লাহ তা'আলা রোযা ফরজ করে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। মানুষ যখন সারাটা দিন উপোস কাটায়, তখনই সে অনুভব করে, যারা অনাহারে থাকে, তাদের কেমন কষ্ট হয়।'

রোযা কেন ফরজ করা হলো?

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

রোযা কেন ফরজ করা হলো?

উক্ত আয়াতে কারীমায় রোযা কেন ফরজ করা হলো তার দর্শন ও হেকমত বর্ণনা করা হয়েছে। ভাববার বিষয় হলো, আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারগণকে তো শাস্তি দিতে চান না। আপন বান্দাকে তিনি ক্ষুধা-পিপাসার কষ্টও দিতে পছন্দ করেন না। বান্দাকে ক্ষুধার্ত রেখে তাঁর তো কোনো লাভ হয় না। তাহলে কেন বলা হলো, তোমরা রোযা রাখো? তাতেই বোঝা যায়, এতে আমাদেরই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তাই বলা হয়েছে, রোযা ফরজ করা হলো, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার।

রোযার দর্শন ও হেকমত

রোযার দর্শন ও হেকমত কী? তাহলো মানুষের মাঝে তাকওয়া বা খোদাভীতি সৃষ্টি হওয়া। জনৈক সাহাবী হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করলেন, তাকওয়া কাকে বলে? তিনি বললেন, কখনও কি কন্টকাকীর্ণ পথে চলেছেন? বললেন, কয়েকবার চলেছি। জিজ্ঞাসা করলেন, কীভাবে এপথ অতিক্রম করলেন? বললেন, সাবধানে জামার আঁচল গুটিয়ে যেন কোথাও কাঁটা বিদ্ধ না হয়। এবার তিনি বললেন, একজন মানুষ তার জীবনের আঁচল এমনভাবে বাঁচিয়ে চলবে, যেন তাতে কোনো গুনাহ্ জড়িয়ে না যায়।[১]

---

১. তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/২৬৪

একেই বলে তাকওয়া। কেবল ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত থাকাকে রোযা বলে না। অর্থাৎ রোযার সম্পর্ক কেবল পানাহারের সঙ্গে নয়। বরং এর সম্পর্ক চোখের সঙ্গে, জবানের সঙ্গে, কানের সঙ্গে, দিল ও দেমাগের সঙ্গে। এক কথায় রোযাদারের আপাদমস্তকের সঙ্গে রোযার সম্পর্ক জড়িত রয়েছে।

রোযার পূর্ণতা

মানুষের আপাদমস্তক যখন রোযাদার হয়, তখনই রোযা পূর্ণতা লাভ করে। এ কারণেই হাদীছে পাকে বর্ণিত হয়েছে, বহু রোযাদার এমন রয়েছে, যাদের পানাহারের কষ্ট বৈ আর কিছুই লাভ হয় না। কেন? সে রোযাও রেখেছে আবার অন্যের গীবতও করেছে। রোযা তো রেখেছে; তবে মিথ্যা বলেছে। রোযা তো রেখেছে; কিন্তু অন্যদের ধোঁকা দিয়েছে। রোযা তো রেখেছে; আবার অন্যের হকও নষ্ট করেছে। রোযা রেখে এসব কাজ করায় যেন রোযার বিনিময় নষ্ট হয়ে গেছে। এজন্যই হাদীছে পাকে বর্ণিত হয়েছে, অনেক বান্দা এমন রয়েছে, যাদের রোযা দ্বারা পানাহারের কষ্ট ব্যতীত আর কিছুই হাসিল হয় না।

রোযার আদবসমূহ

রোযার কতিপয় আদব রয়েছে। এক ধরনের রোযা তো হলো আমাদের মতো সর্বসাধারণের রোযা, যা কেবল খানাপিনা থেকেই বেঁচে থাকা। আরেক ধরনের রোযা হলো বিশেষ ব্যক্তিবর্গের। আর তাহলো খানাপিনা থেকে বেঁচে থাকার পাশাপাশি অন্য সকল গুনাহ থেকেও বেঁচে থাকা। যেমন– চোখের গুনাহ্ থেকে বাঁচা, কানের গুনাহ্ থেকে বাঁচা, জবানের গুনাহ্ থেকে বাঁচা ইত্যাদি। মোটকথা, রোযা অবস্থায় যাবতীয় গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা।

রোযার কষ্ট বেশি অনুভব হওয়ার কারণ

সাধারণত দেখা গেছে, যে ব্যক্তি পরহেযগারির সাথে রোযা রাখে, তার খানাপিনার কষ্ট খুবই কম অনুভূত হয়। আর যে পরহেযগারির সাথে রোযা রাখে না, তার খানাপিনার কষ্ট বেশি অনুভূত হয়।

গীবত থেকে বেঁচে থাকা

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের কথা। এ ঘটনাগুলো এজন্যই সংঘটিত হয়েছে, যেন ভবিষ্যতে আমাদের মতো ব্যক্তিদের জন্য দৃষ্টান্ত হতে পারে। দুজন মহিলা রোযা রাখল। রোযায় তাদের এতই কষ্ট

অনুভব হলো যে, তারা মৃত্যুর মুখোমুখী হলো। বিষয়টি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করা হলে তিনি বললেন, তাদের কুলি করতে বলো। তাদের কুলি করতে বলা হলো। ফলে দেখা গেল, তাদের মুখ থেকে ছোট-ছোট গোস্তের টুকরা বের হয়েছে। তারা আশ্চর্য হলো, আমরা তো কোনো পানাহারই করিনি! এটা কেমন হলো? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মূলত তারা রোযা রেখে অন্যের গীবতে লিপ্ত ছিল। আর গীবত হলো মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া।[১]

আল্লাহ বিষয়টিকে শিক্ষণীয় বানালেন, যেন মানুষ এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

ঈমানের ঢাল

ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, রোযাদারের সাথে ঝগড়া করলে বা বাড়াবাড়ি করলে সে বলে দিবে আমি রোযাদার। এভাবে সতর্কতার সাথে রোযা রাখলে এ রোযা ঈমানের ঢালে পরিণত হবে। এ রোযা আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে সম্মান ও ইয্যাতের কারণ হবে।

রোযার উদ্দেশ্য

আমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি করার লক্ষ্যেই রোযা ফরজ করা হয়েছে। যেমন– মা অনেক সময় বাচ্চাকে কোনো জিনিস খেতে দেয় না। কেননা, এতে বাচ্চার কল্যাণ রয়েছে। বাচ্চার মনে চায় বরফের চাকা খেতে। কিন্তু মা দেয় না। অথচ বাচ্চার সাথে মায়ের কোনো শত্রুতা নেই। মা বাচ্চাকে বঞ্চিত করতে চায় না। বাচ্চাকে কাঁদানো মায়ের পছন্দ নয়। এসব কেবল বাচ্চার উপকারার্থে। ঠিক তেমনি আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রোযার নির্দেশ দিয়েছেন। এতে আমাদেরই উপকার রয়েছে এবং আমাদের ব্যক্তিগত কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

ডাক্তারদের গবেষণায় রোযা

ডাক্তারদের গবেষণামতে এক মাস রোযা রাখার ফলে মানুষের দেহের অনেক রোগ-ব্যাধি এমনিতেই দূর হয়ে যায়। রোযার শারীরিক উপকারিতাও রয়েছে, রূহানি উপকারিতাও রয়েছে। অনেক মানুষ এমনও রয়েছে, যাদের

---

১. মুসনাদে আহমাদ : হাদীছ নং ২৩৬৫৩

ঘরের বাথরুম-গোসলখানা গরিবের বসত ঘরের চেয়ে উন্নত। যদি রোযার বিধান না থাকত, তাহলে তারা বুঝতেই পারত না, গরিবেরা তাদের স্ত্রী-বাচ্চা নিয়ে অনাহারে কেমন কষ্ট ভোগ করে। আল্লাহ তা'আলা রোযা ফরজ করে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। মানুষ যখন সারাটা দিন উপোস কাটায়, তখনই সে অনুভব করে, যারা অনাহারে থাকে, তাদের কেমন কষ্ট হয়।

রোগীর সেবা করা ও প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ রাখা

হাদীছে পাকে এসেছে, কেয়ামত দিবসে এক ব্যক্তিকে দাঁড় করিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে আমার বান্দা! আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম; তুমি আমাকে খাবার দাওনি। সে অস্থির হয়ে বলবে, হে আল্লাহ! আপনি তো মহান। আপনি তো পানাহার থেকে মুক্ত ও পবিত্র। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে আমার বান্দা! আমি অসুস্থ ছিলাম; তুমি আমার সেবা-যত্ন করনি। সে অবাক হয়ে যাবে। বলবে, হে আল্লাহ! এ কেমন কথা যে, আপনি ক্ষুধার্ত-পিপাসার্ত ছিলেন আর আমি পানাহার করাইনি! আপনি অসুস্থ ছিলেন আর আমি সেবা-যত্ন করিনি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, অমুক সময় তোমার প্রতিবেশী অনাহারে ছিল সেদিন তুমি তাকে খানা খাওয়ালে আমাকেই খাওয়ানো হতো। তুমি যদি তোমার অসুস্থ প্রতিবেশীর সেবা-যত্ন করতে, তাহলে আমারই সেবা করা হত। সেদিন মানুষ বুঝতে পারবে, প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতি দেখালে কেমন বিনিময় রয়েছে। বর্তমান যুগে ভালো প্রতিবেশী পাওয়াও ভাগ্যের ব্যাপার। এখন তো ঝগড়া-বিবাদ সব প্রতিবেশীর সাথেই হয়। অথচ প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে নবীজি বলেন, জিবরীল এ ব্যাপারে আমার নিকট এতবার এসেছে যে, আমি আশঙ্কা করেছিলাম, হয়তো প্রতিবেশীকে মৃত্যুর পর ত্যাজ্য সম্পত্তির অধিকারী বানানো হবে।[১]

একটি আশ্চর্য ঘটনা

দুই ভাই ছিল, যাদের পরস্পরে আন্তরিকতা ছিল। কিন্তু তাদের স্ত্রীদের মাঝে বনিবনা ছিল না। এক ভাই অপর ভাইকে দাওয়াত দিল। খানা এনে সামনে দিল। এমন সময় তার স্ত্রী টের পেয়ে ভাইয়ের সামনে থেকে খাবার নিয়ে নিল আর বলল, আমরা এমন ব্যক্তিকে খানা খাওয়াই না। ভাই তো

---

১. ছহীহ মুসলিম : হাদীছ নং ২৫৬৯

বেশ কষ্ট পেল। ভাইয়ের চেহারায় রাগের চিহ্ন দেখে অপর ভাই বলতে লাগল, তোমার কি মনে আছে, আমিও একদিন তোমার ঘরে গিয়েছিলাম। তুমি আমার সামনে খানা হাজির করেছিলে। তোমার একটা মুরগি এসে তরকারির পাত্রে পা দেওয়ায় তরকারি পড়ে গেল। অন্য তরকারি না থাকায় আমি আর রুটি খাইনি। তোমার ঘরের মুরগি খাবার নষ্ট করে দেওয়ায় আমি তো কিছু মনে করিনি। আমার স্ত্রী রাগ করে খাবার তুলে নেওয়ায় তুমি রাগ করছ কেন? অপর ভাই বলল, কথা ঠিকই বলেছেন। আপনি আমার মুরগির ব্যাপারটা বরদাশত করতে পারলে আমি কেন এ ব্যাপারটা বরদাশত করতে পারব না? সুতরাং সে সহজেই বুঝে গেল। ঘটনার মোড় অন্য দিকে যেতে না যেতেই আবার ঠিক হয়ে গেল। যদি বুঝবার ইচ্ছা থাকে, তাহলে সহজেই বুঝে আসে। আর বুঝতে না চাইলে মোটেই বুঝে আসে না। ভালো প্রতিবেশী হয়ে থাকা সচ্চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত।

সচ্চরিত্র

হাদীছে আছে, নবীজি বলেছেন :

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

'আমি সচ্চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য প্রেরিত হয়েছি।'[১]

প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করাও সচ্চরিত্রের একটি শাখা। বর্তমানে যখন এক ভাই অপর ভাইয়ের সাথে মিলে-মিশে থাকাই দুরূহ ব্যাপার, তখন প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ করার ব্যাপারটি বড়ই মুশকিল! আমাদের অভ্যন্তরীণ মন্দের প্রভাব প্রতিবেশীর ওপর গিয়ে পড়ে।

রোযা রাখার মূল উদ্দেশ্য

রোযা রাখার মূল উদ্দেশ্যই হলো, মানুষ পানাহার থেকে বিরত থাকলে রিযিকের অভাব বুঝতে পারবে এবং তার মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হবে।

নেয়ামতের কদর

এক লোকমা রুটি কতগুলো স্তর অতিক্রম করে আমাদের মুখে এসে পৌঁছয়! মাটি, পানি, বাতাস, সূর্যের কিরণ এসব ব্যবহৃত হয়ে গমের চারা বড় হয়েছে। তারপর মানুষ কেটে পরিষ্কার করে আগুনে রান্না করেছে।

---

১. মুসনাদে আহমাদ : হাদীছ নং ৮৯৫২

তারপর আমাদের সামনে এসেছে। এতগুলো স্তর পেরিয়ে এই নেয়ামত আমাদের সামনে আসে। অথচ আমরা খেতে গিয়ে বিসমিল্লাহও পড়ি না। কী আশ্চর্যজনক ব্যাপার!

আশ্চর্য ঘটনা

আমার দাদাপীর হযরত ফজল আলী কুরাইশী (রহ.)-এর জমি ছিল। তিনি নিজেই তাতে চাষ করতেন। নিজের হাতে পানি দিতেন, নিজহাতে গম কেটে ঘরে আনতেন। তারপর এশার পর স্বামী-স্ত্রী মিলে গমগুলো পেষণ করতেন। সেই আটার তৈরী রুটি এনে খানকায় মুরীদদের খাওয়াতেন। এবার আন্দাজ করুন হযরত (রহ.) এ সব কাজ নিজের হাতে করতেন। হযরতের অভ্যাস ছিল, তিনি সর্বদা অজু অবস্থায় থাকতেন। তাঁর পরিবারের সদস্যদেরও এমনই অভ্যাস ছিল।

একদিন তিনি খাবার রান্না করে খানকায় নিয়ে এলেন। শিক্ষার জন্য আগত সালেকরা হাজির ছিল। হযরত তাদের সামনে খানা রাখলেন। তারা যখন খেতে লাগল, তিনি তাদের বললেন, হে ফকিরেরা! (তিনি মুরীদদের ফকির বলতেন) তোমাদের সামনে দেওয়া রুটিগুলোর হাল চাষ করা হয়েছে অজু অবস্থায়, বীজ বপন করা হয়েছে অজু অবস্থায়, তাতে সেচ দেওয়া হয়েছে অজু অবস্থায়, কাটা হয়েছে অজু অবস্থায়, এগুলো মাড়াই করা হয়েছে অজু অবস্থায়, পেষণ করা হয়েছে অজু অবস্থায়, আটা খামির করা হয়েছে অজু অবস্থায়, তারপর রুটি বানানো হয়েছে অজু অবস্থায়, তোমাদের সামনে রাখা হয়েছে অজু অবস্থায়, 'যদি তোমরা অজু অবস্থায় খেয়ে নিতে!'

খাওয়ার আদব

এবার চিন্তা করুন, কতগুলো স্তর পেরিয়ে খাবারের লোকমা আমাদের সামনে আসে! যে ব্যক্তি নেয়ামতের সম্মান করে, সে আল্লাহর নিকট অতি পছন্দনীয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র অভ্যাস ছিল, তিনি যখন খানা খেতেন, অত্যন্ত বিনয়ের সাথে খেতেন। অহংকারীদের মতো হাঁটা-চলাবস্থায় খেতেন না। বসে খেতেন, যেমন কোনো গোলাম তার মনিবের সামনে ভদ্রভাবে বসে খানা খায়। তিনি আল্লাহর স্মরণ নিয়ে বসে খানা খেতেন। বান্দা যখন খানা খায়, তখন তার অন্তরে যেন এমন অনুভূতি থাকে যে, হে আল্লাহ! এটা তোমার নেয়ামত।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

একবার পত্রিকায় পড়লাম, অমুক দেশের এক কোটিপতি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে, কোনো ডাক্তার যদি আমাকে চিকিৎসা করে একটা চাপাতি খাওয়ার যোগ্য বানাতে পারে, আমি তাকে এত কোটি টাকা পুরস্কার দেব। কোটি-কোটি টাকা খরচ করতে রাজী; তবু একটা চাপাতি খাওয়ার মতোও সুস্থ নয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সুস্থতা দান করেছেন। আমরা আমাদের চাহিদা মোতাবেক পানাহার করতে পারি। এটি মহান আল্লাহর কত বড় নেয়ামত। তারপরও ভেবে দেখি না, আমরা তার ইবাদতের হক আদায় করেছি কিনা।

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ঘটনা

এসব হাদীস নয় ২/৪০ পৃষ্ঠা

হযরত সুলায়মান (আ.)কে আল্লাহ তা'আলা রাজত্ব দান করেছিলেন। মানুষ, জীব-জন্তু, পশু-পাখি, বাতাস, পানি সকলের ওপর তাঁকে রাজত্ব দান করেছিলেন। একদা সুলায়মান (আ.) দোআ করলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার মাখলুকাতকে দাওয়াত খাওয়াতে চাই। আল্লাহ তা'আলা বললেন, বেশ; দাওয়াত করো। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমি যে খাবারের আয়োজন করব, তা যেন নষ্ট না হয়। আল্লাহ তা'আলা বললেন, ঠিক আছে; নষ্ট হবে না। সুলায়মান (আ.) জিনদের নির্দেশ দিলেন, খাবার তৈরি করো। জিনেরা বড়-বড় পাতিলে করে খাবার তৈরি করতে শুরু করল। রান্না করে-করে কয়েক বছর যাবৎ জমা করতে লাগল। একপর্যায়ে সুলায়মান (আ.)-এর মন সায় দিল, এ খাবার কুল মাখলুকাতের জন্য যথেষ্ট হবে। আত্মতৃপ্তি অনুভব করে তিনি আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, হে আল্লাহ! এবার আমি তোমার মাখলুকাতকে খাওয়াতে চাই। আল্লাহ বললেন, খাওয়াও।

সুলায়মান (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ! আগে স্থলভাগের মাখলুককে খাওয়াব, নাকি জলভাগের মাখলুককে খাওয়াব? আল্লাহ বললেন, সমুদ্র যেহেতু নিকটে, সেহেতু জলভাগের মাখলুককে আগে খাওয়াও। একটা মাছ সাঁতার কাটতে-কাটতে কিনারায় এল এবং মুখটা খুলে দিল। জিনেরা তার মুখে খাবার ঢালতে লাগল। ঢালতে ঢালতে যত পাতিল রান্না করেছে, সব শেষ হয়ে গেল। এত বড় মাছ! জি এত বড়-বড় মাছ থাকে। কোনো-কোনো মাছ তো এত বড় হয় যে, সামুদ্রিক জাহাজ সেগুলোকে মাটি মনে করে তাতে নোঙর করে।

আমার নিজের ঘটনা

বিদেশগামী উড়োজাহাজগুলো আপনারা দেখেছেন। এগুলো এত বড় যে, তাতে পাঁচ-ছয় শত লোক চড়তে পারে। এগুলো এত উপরে উড়ে যে, নিচ থেকে দেখলে পাখির মতো ছোট মনে হয়। আমি একবার প্যারিস থেকে কোনো এক দেশে বিমানভ্রমণ করেছি। পথে সমুদ্র অতিক্রম করতে হতো। আমি বিমানে বসে সমুদ্রের দিকে যখন তাকালাম, তখন টয়োটা করোল্লা গাড়ীর মতো বড়-বড় মাছ দেখতে পেলাম। আমি অবাক হলাম যে, উড়োজাহাজগুলো নিচ থেকে পাখির মতো মনে হয়; অথচ উড়োজাহাজে বসে মাছগুলোকে গাড়ির মতো মনে হলো। তাহলে মাছগুলো কত বড় হবে? বাস্তবিকই তিমি ও শার্ক মাছ এমন বড় আকৃতিরই হয়। এবার চিন্তা করুন, সুলায়মান (আ.)-এর জিনেরা ওই মাছটার মুখে সব খাবার ঢেলে দিল। তারপরও সে মুখ বন্ধ করেনি। সুলায়মান (আ.) আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে, হে আল্লাহ! সব খাবার তো শেষ হয়ে গেল! মাছটাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এত খাবার খেয়ে ফেললে? মাছ বলল, আমি সেই আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি আমাকে প্রতিদিন আপনার দেওয়া খাবারের তিন গুন বড় লোকমা খাবার খাওয়ান। আল্লাহু আকবার!

রিযিক বণ্টন

আল্লাহ তা'আলার এত বড়-বড় মাখলুক থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাদের রিযিক দেওয়ার কথা ভোলেন না। কাজেই কোনো পচা সবজিও যদি ভাগ্যে জুটে যায়, তাহলে ভাববেন না, সবজিই কপালে জুটল। বরং এটা-ই ভাববেন যে, আল্লাহ তা'আলা রিযিক বণ্টনের সময় আমাদের কথাও মনে রেখেছেন। এটা মালিকের অনুগ্রহ। মোটকথা, রোযার মূল উদ্দেশ্য আমাদের মধ্যে আল্লাহর নেয়ামতের অনুভূতি সৃষ্টি করা, যেন তাকওয়া সৃষ্টি হয়।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

নামাযের গুরুত্ব

'যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, যাও; উঠে নামায পড়ে নাও। তখন সে হুট করে বলে বসে, তোমার জন্য পড়তে হবে? যাও তুমি পড়ে নাও আমি পড়ব না। আবার কখনো বলে, তুমি কি আমার কবরে যাবে? আবার কখনো বলে, জাহান্নামে জ্বলতে হলে আমি জ্বলব, তাতে তোমার কী? এ জাতীয় কথা কেবল তখনই মুখ থেকে বের হয়, যখন আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য তাঁর দরজা বন্ধ করে দেন। যখন তিনি তোমাকে তাঁর দরবারে মাথা নোওয়াতে দিতে না চান, তুমি তাহলে বুঝে নিবে, রাজাধিরাজ আহকামুল হাকিমীনের দরজা তোমার জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। তাহলে তোমার কী দশা হবে? তোমার ঝোলা খালি থাকবে। তুমি খালি হাতে কবরে যাবে।'

নামাযের গুরুত্ব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ -

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

দরসে কুরআনের আদব

সব সভা-সমাবেশেরই কিছু আদব থাকে। এটি কুরআন শিক্ষার মাহফিল। এরও কতিপয় আদব রয়েছে। মহিলারা যতখানি মনোযোগসহকারে বসবেন এবং যতটা ধীর ও স্থিরভাবে কথা বুঝবেন, ততটাই লাভ হবে। বৃষ্টি যতই মুষলধারে হোক-না কেন, পাত্র যদি উল্টানো থাকে, তাতে এক ফোঁটা পানিও আসবে না। এটা বৃষ্টির দোষ নয়; বরং পাত্রের দোষ। কারণ, তার মুখ ঠিক ছিল না। কুরআন শিক্ষার মাহফিলে আল্লাহ তা'আলার যত রহমতই বর্ষিত হোক-না কেন, যে মহিলা সম্পূর্ণ মনোযোগী হবে না, তার অন্তরের পাত্র উল্টা থাকায় সে রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগী হয়ে বসা অত্যন্ত জরুরি বিষয়। জীবনে এমন সময় খুব কমই আসে যে, মানুষ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা পূর্ণ মনোযোগী ও প্রকৃত আগ্রহী হয়ে শ্রবণ করে।

مَنْ طَلَبَ فَقَدْ وَجَدَ

'যার আগ্রহ থাকবে, আল্লাহ তার আশা আকাঙ্ক্ষা পূরন করবেন।'

মাহফিলের আদব

যদি ছোট বাচ্চা (কান্নাকাটি করে এমন) থাকে, তাহলে মায়েরা প্রথম থেকেই একটু পিছনে বসবেন, যাতে অন্যান্য মহিলাদের ব্যাঘাত না ঘটে। দু-তিনজন মহিলার এমন একটি দল থাকবে, যারা আগত মহিলাদের বসাবে। মাঝখানে কথা বললে, শোরগোল করলে মাহফিলের প্রতিক্রিয়া কমে যায়।

কাজেই আপনারা সকল মা-বোনেরা স্থিরভাবে বসে পড়ুন। এমন মনোভাব নিয়ে বসুন যে, একটা ঘণ্টা পূর্ণ মনোযোগসহকারে আল্লাহ তা'আলার কথা শ্রবণ করতে হবে। ইনশাআল্লাহ নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবেন।

মনচাহি জীবন

মানুষ নিজের ইচ্ছায় এ পৃথিবীতে আসেনি। আবার নিজের ইচ্ছায় ফিরেও যাবে না। আসা ও যাওয়ার মধ্যকার বিরতির এ সময়টুকু নিজের ইচ্ছা মোতাবেক অতিবাহিত করার কোনো অধিকার তার নেই। বরং যে স্রষ্টা ও মালিক তাকে পাঠিয়েছেন এবং যার নির্দেশে তাকে ফিরে যেতে হবে, তার নির্দেশ মোতাবেক জীবন যাপন করলে সফল হবেন। জীবনের লক্ষ্যই হলো আল্লাহ তা'আলার ইবাদত। হায়াতের উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার স্মরণ।

আল্লাহর নৈকট্য কীভাবে লাভ হবে?

আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের জন্য যেমন তাঁর নৈকট্য ও মারেফাত তথা পরিচয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, তেমনি নারীদের জন্যও তিনি আপন নৈকট্য ও পরিচয়ের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। যে নারী আল্লাহ তা'আলার পরিচয় লাভ করতে চায়, সে যেন শরীয়ত ও সুন্নাত মোতাবেক আমল করতে থাকে। আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত তাকে আপন পরিচয়ের নূর দান করবেন।

জরুরি পথ

এ পৃথিবী হতে আল্লাহ তা'আলার এমন অনেক নেক বান্দীগণ অতিবাহিত হয়েছেন, যারা ইবাদত ও তাকওয়াকে আপন করে নিয়েছিলেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পৃথিবীতে উঁচু মর্যাদা দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের পথ অতিক্রম করা কেবল পুরুষদের জন্যই জরুরি নয় বরং নারীদের জন্যও জরুরি।

দুনিয়া ও আখেরাতের জীবন

আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত পুরুষদের জন্যও বিধিবিধান বাতলে দিয়েছেন, নারীদের জন্যও বিধিবিধান দিয়েছেন। আমাদের সকলেরই কর্তব্য আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের ইবাদতের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করা। এ পৃথিবী তো সর্বাবস্থায় ধ্বংস হয়ে যাবে। কোনো এক বুযুর্গ কতই-না চমৎকার কথা বলেছেন, 'হে বন্ধু! তুমি পৃথিবীতে যে পরিমাণ থাকবে, সে পরিমাণ এ

পৃথিবীর জন্য চেষ্টা-সাধনা করো আর আখেরাতে যে পরিমাণ থাকতে হবে, সে পরিমাণ চেষ্টা-সাধনা আখেরাতের জন্য করো।' একথা সত্য যে, মানুষ এ পৃথিবীতে ৫০ বা ১০০ বছর জীবিত থাকবে। কিন্তু আখেরাতে সে হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি, মিলিয়ন-মিলিয়ন, বিলিয়ন-বিলিয়ন বছর বরং অসংখ্য অগণিত বছর বেঁচে থাকবে।

আখেরাতের জীবন কতটুকু?

ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন কিতাবে লিখেছেন, আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী এই ফাঁকা জায়গাটুকু যদি সরিষার দানা দিয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয় আর একটা পাখি যদি এক বছর অন্তর-অন্তর একটা দানা খায়, তাহলে এমন একটি সময় আসবে, যখন এই দানাগুলো নিঃশেষ হয়ে যাবে; কিন্তু আখেরাতের জীবন শেষ হবে না।

আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া দেড়-দুই মিনিট

মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন, আখেরাতের এক দিন দুনিয়ার ৫০ হাজার বছরের সমান। সেই হিসেবে দুনিয়ার শত বছর আখেরাতের দেড়-দুই মিনিট সমপরিমাণ। কত বড় আশ্চর্যের বিষয় যে, মানুষ দেড়-দুই মিনিটের ভোগ-বিলাসের খাতিরে আখেরাতের শাস্তি নিজের জিম্মায় গ্রহণ করে নেয়!

মুত্তাকীর ঠিকানা জান্নাত

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন :

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ

‘আর যে আপন রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় পায়

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى

এবং আপন নফ্‌সকে কুচাহিদা থেকে বিরত রাখে,

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

নিঃসন্দেহে জান্নাত হবে তার ঠিকানা।'[১]

---

১. সূরা নাযিয়াত : আয়াত ৪০, ৪১

মানুষ দিনকতকের মেহমান

এ পৃথিবীতে মানুষ কয়েক দিনের মেহমান মাত্র। এ পৃথিবীটা মুসাফিরখানার মতো। একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে কিছু দিন পর শৈশব কাল কাটিয়ে কৈশোরে পদার্পণ করে। কিছু দিন পর কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা রাখে। তারপর যৌবন কাটিয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়। বার্ধক্যের এ পর্যায়ে এসে মৃত্যুবরণ করে।

আল্লাহকে অস্বীকার করলেও মৃত্যুকে কেউ অস্বীকার করে না

এ দুনিয়ায় ইসলাম অস্বীকারকারী পাওয়া যাবে। আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকারকারী পাওয়া যাবে। কিন্তু মৃত্যুকে অস্বীকার করে এমন কাউকে পাওয়া যাবে না। মৃত্যু এমন নিশ্চিত ও বাস্তব বিষয়, যার আগমন পরিশেষে একদিন হবেই হবে। মানুষ পৃথিবীতে যত দিনই বেঁচে থাকুক পরিশেষে তাকে মরতেই হবে।

আশ্চর্য ঘটনা

এক বাদশাহ বেশ আগ্রহ নিয়ে প্রাসাদ নির্মাণ করালেন। নির্মাণকাজে তিনি আপন ভান্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন। যে কাজটি ভালো হয়নি বলে অনুভব হত, তা পুনরায় নির্মাণ করাতেন। এমনকি বাদশাহর দৃষ্টিতে প্রাসাদটি এতই সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিল যে, তাতে কোনো ত্রুটিই ছিল না। বাদশাহ তাঁর প্রজাদের মাঝে ঘোষণা করিয়ে দিলেন, কেউ এ প্রাসাদে কোনো ত্রুটি শনাক্ত করতে পারলে আমি তাকে পুরস্কার দেব। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হলো যে, প্রজারা এসে-এসে রাজপ্রাসাদ দেখে ফিরে যেতে লাগল। বাদশাহর নির্মিত এ প্রাসাদে কোনো প্রকার ত্রুটি বের করার হিম্মত কারুরই হলো না।

একবার এক বুযুর্গের এখান দিয়ে যাওয়ার সুযোগ হলো। তিনিও বাদশাহর ঘোষণা মোতাবেক প্রাসাদটি দেখতে এলেন। প্রাসাদ দেখে বাদশাহর সামনে হাজির হয়ে বললেন, বাদশাহ সালামাত! প্রাসাদটাতে আমার দুটা ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয়েছে। বাদশাহ হতবাক হলেন যে, সারা দুনিয়ার কোনো মানুষের দৃষ্টিতে কোনো ত্রুটি ধরা পড়ল না; এই বৃদ্ধের দৃষ্টিতে আমার এই প্রাসাদে কোন ত্রুটি ধরা পড়ল? বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন, বলুন তো কী ত্রুটিটা রয়েছে?

উত্তরে আল্লাহওয়ালা বললেন, বাদশাহ সালামাত! প্রাসাদটাতে দুটা ত্রুটি রয়েছে। একটা হলো আপনার এই প্রাসাদ চিরদিন থাকবে না – কোনো একদিন এটা ধ্বংস হয়ে যাবে। দ্বিতীয়টা হলো, আপনিও চিরকাল এই প্রাসাদে থাকতে পারবেন না। কোনো একদিন এ প্রাসাদ আপনাকে ছেড়ে যেতে হবে।

পৃথিবীটা হলো প্রবাস

মানুষ পৃথিবীতে যত দীর্ঘ আশা-ভরসা করুক, যত ভালো কায়কারবার করুক, যত সুন্দর ভবন নির্মাণ করুক পরিশেষে একদিন তাকে পৃথিবী ছেড়ে যেতেই হবে। হাদীছে পাকে ইরশাদ হয়েছে :

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ

'তুমি পৃথিবীতে এমনভাবে থাকো যেন তুমি একজন প্রবাসী কিংবা মুসাফির।'[১]

তিনটি গর্ভ

রূহজগৎ থেকে এসে আমরা কিছুদিন মাতৃগর্ভে অবস্থান করেছি। তারপর সেখান থেকে আসমান ও জমিনের গর্ভে এসেছি। কিছুদিন এখানে জীবন যাপনের পর পরিশেষে জমিনের গর্ভে চলে যেতে হবে। সেখান থেকে যেদিন উঠব, কেয়ামত দিবস কায়েম হবে, সেদিন আল্লাহ মানুষের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তারপর মানুষটি ভালো হলে জান্নাতে যাবে আর মন্দ হলে জাহান্নামে যাবে।

কবরের পরীক্ষা

দুনিয়ার জীবন পরীক্ষার প্রস্তুতির মতো। এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হবে দুটি। সেই প্রশ্ন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলে দিয়েছেন, প্রথম প্রশ্নপত্রটি কবরে হবে। এতে আমাদের তিনটি প্রশ্ন করা হবে। তিনটিরই উত্তর আবশ্যিক হবে। প্রথম প্রশ্নটি করা হবে مَنْ رَبُّكَ তোমার রব কে? পুনরায় দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হবে مَنْ نَبِيُّكَ তোমার নবী কে? আর তৃতীয় প্রশ্ন করা হবে مَا دِيْنُكَ তোমার ধর্ম কী?[২]

---

১. ছহীহ বোখারি : হাদীছ নং ৫৯৩৭

২. আবুদাউদ : হাদীছ নং ৪৭৫৩

এই তিনটি প্রশ্নই করা হবে এবং তিনটির উত্তরই আবশ্যিক হবে। শতভাগ নম্বর না পেলে মানুষ ফেল করবে। তিনটি প্রশ্নের উত্তর প্রদানই জরুরি। আলহামদুলিল্লাহ! এই প্রশ্নপত্রটি ফাঁস হয়ে গেছে! এখন আমাদের কি জানা আছে, কবরে কোন তিনটি প্রশ্ন করা হবে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রতি দয়া করেছেন যে, তিনি সময়ের পূর্বেই প্রশ্নগুলো বলে দিয়েছেন, যেন আমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারি।

কবরের প্রশ্নপত্রের উত্তর কে দিতে পারবে?

কবরের প্রশ্নগুলোর উত্তর কেবল সে দিতে পারবে, যে আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের নির্দেশ মোতাবেক চলে। যে হারাম মাল ভক্ষণ করে, ঘুষ গ্রহণ করে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ উপেক্ষা করে ধন-সম্পদ উপার্জন করে, তার মুখ দিয়ে 'আল্লাহ আমার রব' কথাটি বের হবে না। এমনিভাবে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক আমল করে, সে-ই কেবল বলতে পারবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নবী। আর সুন্নাতের বিরোধিতা করলে সামাজিক প্রথা-প্রচলনের অনুসরণ করলে সে সঠিক জবাব দিতে পারবে না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা মোতাবেক জীবন যাপন করে, সে তো উত্তর দিবে, আমার ধর্ম ইসলাম। অন্যথায় তার মুখ বন্ধ থাকবে।

কবরে মানুষের প্রথম পরীক্ষা হবে। এতে উত্তীর্ণ হলে কবরকে জান্নাতের বাগানে পরিণত করা হবে। এতে ফেল করলে কবরকে জাহান্নামের একটি গর্তে পরিণত করা হবে।

মানুষের দ্বিতীয় পরীক্ষা

তারপর কেয়ামত দিবসে মানুষকে আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের সম্মুখে দাঁড় করানো হবে। সেখানে তার দ্বিতীয় পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। সেখানে চারটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে। প্রথমে জিজ্ঞাসা করা হবে, হে আমার বান্দা! তুমি তোমার জীবন কীভাবে কাটিয়েছ? তারপর দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হবে, তুমি তোমার যৌবন কীভাবে কাটিয়েছ? তৃতীয় প্রশ্নটি করা হবে, তুমি তোমার সম্পদ কোন পথে উপার্জন করেছ এবং তা কোন পথে ব্যয় করেছ? চতুর্থ প্রশ্নটি করা হবে, তুমি তোমার ইল্ম অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছ?[১]

---

১. তিরমিযি : হাদীছ নং ২৪১৬

কোনো আদম সন্তান এ চারটি প্রশ্নের জবাব না দেওয়া পর্যন্ত চুলপরিমাণও কদম নাড়াতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলার মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় প্রশ্নপত্রের প্রশ্নগুলো বলে দিয়েছেন। এখন কেবল প্রশ্নগুলোর উত্তর হৃদয়ঙ্গম করতে প্রস্তুতি নেওয়া আবশ্যক, যেন আমরা দুনিয়া ও আখেরাতে সফল হতে পারি।

মৃত্যুর সময় কখন আসবে?

আমরা যদি অন্তরচক্ষু খুলি, তাহলে এ কথাগুলো ভালোভাবে অবশ্যই বুঝে আসবে। কোনো মানুষ যদি চোখে পট্টি বেঁধে নেয় এবং প্রবৃত্তি তাকে অন্ধ বানিয়ে দেয়, তাহলে আমরা যেকোনো কাজে আজ নয় কাল বলে টালবাহানা করতে থাকব। কোনো নেক কাজের সময় এলে সাধারণত মেয়েরা বলে, আমি কি মা-দাদী হয়ে গেছি যে, নামায পড়ব? মেয়েটি এ চিন্তা করেই কথাটা বলে যে, আমি তো পৃথিবীতে অনেক দিন থাকব। আমার বয়স মাত্র ষোল বছর। কেবল আমার বিবাহ হলো। তারপর বাচ্চা হবে। তারপর আমার চুল পাকবে। আমি বৃদ্ধা হব। তারপর কোথায়ও গিয়ে হয়তো আমার মৃত্যুর সময় আসবে। এসবই ধোঁকা। বাস্তব কথা হলো, বৃদ্ধাদের যেমন মৃত্যু হয় যুবতীদেরও মৃত্যু হয়। শিশুদেরও মৃত্যু হয়। নিষ্পাপ শিশুরাও অনেক সময় মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মৃত্যুর সময় তো নির্ধারিত। তবে কে জানে কখন সেই সময়টি আসবে? তাই সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা চাই।

সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান কে?

কতিপয় যুবক সাহাবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর নবী! সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ও বড় জ্ঞানী কে? নবীজি উত্তর দিলেন, যে অধিক পরিমাণে মৃত্যুকে স্মরণ করে এবং অধিকহারে তার প্রস্তুতি গ্রহণ করে।[১]

দুনিয়ার মর্যাদা ও আখেরাতের সম্মান তারা-ই পাবে। মানুষ আগামী কালের আশায় যেন না থাকে। বরং যা-কিছু করার আজই যেন করে নেয়। আপন মাওলাকে যেন সন্তুষ্ট করে নেয়, যাতে তার আমলনামা থেকে সব গুনাহ ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হয়ে যায় এবং সে আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

---

১. মুসনাদে আহমাদ : হাদীছ নং ১৭১২৩

জীবনের মহা সুযোগের চমৎকার ঘটনা

জীবনের মহা সুযোগ বুঝতে বিভিন্ন কিতাবে একটি চমৎকার ঘটনা আছে। এক বাদশাহর একটি বাগান ছিল। বাগানটি বেশ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক ভাগেই ছিল রকমারি ফলমূল। বাদশাহ্ এক ব্যক্তিকে বাগান থেকে ফল সংগ্রহ করে আনতে পাঠালেন। বলে দিলেন, ভালো ফল সংগ্রহ করতে চেষ্টা করবে; তাহলে আমি সন্তুষ্ট হব এবং তোমাকে পুরস্কার দিব। তবে শর্ত হলো, বাগানের যে অংশটি একবার অতিক্রম করবে পুনরায় সেখানে আর ফিরে আসতে পারবে না। লোকটি ঝুড়ি হাতে নিয়ে বাগানে প্রবেশ করল।

বাগানের প্রথমাংশে হরেক রকমের ভালো-ভালো ফল ধরে রয়েছে। ভাবল, এখান থেকেই ফল সংগ্রহ করে নিই। আবার মনে হলো, সামনের অংশটা একটু দেখে নিই। সামনের অংশে যখন প্রবেশ করল, তখন দেখল, সেখানে আরো ভালো মানের ফলমূল রয়েছে। ভাবল, এখান থেকে ফল সংগ্রহ করে নিই। আবার চিন্তা করল, সামনের অংশে গিয়ে সংগ্রহ করে নেব; হয়তো সেখানে আরো উৎকৃষ্ট মানের ফলমূল থাকবে। সেখানে গিয়ে দেখল, সত্যিই সেখানে আরো উৎকৃষ্ট মানের ফলমূল রয়েছে। ভাবল, এখান থেকে ফল সংগ্রহ করে নেব। আবার ভাবতে লাগল, আমি আমার ঝুড়িতে সর্বোৎকৃষ্ট মানের ফল সংগ্রহ করব। তাই সামনের অংশটা একটু দেখি। সামনের অংশে গিয়ে যখন দেখল, এর চেয়েও উৎকৃষ্ট মানের ফলমূল রয়েছে, মনে-মনে ভাবল, এখান থেকেই ফল সংগ্রহ করে নিই। আবার চিন্তা করল, সামনের অংশ থেকেই সংগ্রহ করব। এবার সর্বশেষ অংশে যখন প্রবেশ করল, তখন দেখতে পেল, সেখানে গাছে কোনো ফলই ধরেনি। এবার কাঁদতে লাগল, হায় যদি এমন হবে জানতাম, তাহলে তো পূর্বের অংশগুলো থেকে ফল সংগ্রহ করে নিতাম। আমার ঝুড়ি খালি থাকত না।

হে মানুষ! তোমার জীবনের উদাহরণও ঠিক এমন। তোমার জীবনের প্রতিটি দিন বাগানের এক-একটা অংশ। তুমি ইচ্ছা করলে তা থেকে ফল সংগ্রহ করতে পার। অর্থাৎ নেকী উপার্জন করতে পার। কিন্তু মানুষ ভাবে, আজ নয় – আগামী কাল নেক কাজ করব। এভাবে আজ-কাল করতে-করতে শেষে একদিন তার মৃত্যু এসে হাজির হয়। তখন সে পরিবারের সদস্যদের কাছে ওসিয়ত করার সুযোগটুকুও পায় না।

ইরশাদ হচ্ছে :

فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۝

'যখন তাদের মৃত্যুর সময় আসে, তখন একটি মুহূর্তও এদিক-ওদিক হয় না।'[১]

মোটকথা, যথাসময়ে মানুষকে চলে যেতে হবে। এমনকি হাতের পেয়ালার পানিটুকু পান করার সুযোগও পাওয়া যাবে না। আধা নিঃশ্বাস বাইরে আধা নিঃশ্বাস ভিতরে থাকা অবস্থায়ই তার রূহ কব্‌জ করা হবে।

জীবন কেন পেলাম?

প্রতিটি মুহূর্তেই মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করা আবশ্যক। ভালো ঘর-বাড়ি বানানোর জন্য আমরা এ জীবন লাভ করিনি। ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সায় পরস্পরে প্রতিযোগিতা করতে এ দুনিয়ার জীবনটুকু পাইনি। বরং আল্লাহ রব্বুল ইয্‌যাতের ইবাদতের জন্যই পেয়েছি।

যাকাত প্রদান না করার শাস্তি

হ্যাঁ, যদি আল্লাহ রব্বুল ইয্‌যাত কাউকে মাল-দৌলত দান করেন, তাহলে সে তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে, নেকী উপার্জনের কাজে লাগাবে। সাধারণত অলংকারের প্রতি মহিলাদের যতখানি আগ্রহ দেখা যায়, যাকাত দেওয়ার প্রতি ততখানি আগ্রহ দেখা যায় না। এখানে তারা অলসতা করে।

আল্লাহ বলেছেন :

يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ

'কেয়ামত দিবসে অলংকারগুলোকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে পাত বানানো হবে।'[২]

فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ

'তারপর তা দ্বারা তাদের কপাল ও পার্শ্বদেশ এবং পিঠে দাগ দেওয়া হবে।'[৩]

---

১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ৩৪

২. সূরা তাওবা : আয়াত ৩৫

৩. সূরা তাওবা : আয়াত ৩৫

আর বলা হবে

هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ

'এগুলোই ওই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য গচ্ছিত করেছিলে।'[১]

فَذُوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ

'এখন তোমরা তোমাদের গচ্ছিত সম্পদের স্বাদ উপভোগ করো।'[২]

অলংকারগুলো হয় সাপ, নয় বিচ্ছু

হে বোন! কাল তোমার এ অলংকার হয় সাপ নয়তো বিচ্ছুতে পরিণত হবে। যদি যাকাত না দাও, তাহলে এই হার তোমার জন্য সাপ হয়ে যাবে। এই আংটি তোমার জন্য বিচ্ছুতে পরিণত হবে। যাকাত আদায় না করলে এ সব অলংকার হবে সাপ-বিচ্ছু। তাহলে একটু চিন্তা করে নাও, এই সাপ-বিচ্ছু যদি তোমাকে পেঁচিয়ে ধরে, তাহলে তোমার কী অবস্থা হবে?

যাকাত প্রদানের সহজ উপায়

নারী যদি তার দৈনন্দিন উপার্জন থেকে সামান্য একটু বাঁচিয়ে রাখে, তাহলে বছরশেষে যাকাত দেওয়া সহজ হয়ে যায়। নেককার নারীদের অভ্যাস এমনই।

নারীদের নামায না পড়ার অজুহাত

নারীরা একেবারে সাধারণ অজুহাতে ফরজ নামায ছেড়ে দেয়। কখনো অজুহাত দেখায়, মেহমান এসেছিল; আমি তো চা বানানোর কাজে ব্যস্ত ছিলাম; কীভাবে নামায পড়ব? কখনো বলে, স্বাস্থ্য ভালো নয়, কীভাবে নামায পড়ব? আবার কখনো অজুহাত দেখায়, মাথাটা ব্যথা করছে; পরে পড়ে নেব। এসব ঠুনকো অজুহাতে নারীরা নামাযে অলসতা করে।

নামায না পড়ার শাস্তি

একটি হাদীছের মর্মার্থ এমন যে, যে ব্যক্তি জেনে-শুনে এক ওয়াক্ত নামায কাজা করল, আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতাকে নির্দেশ দেন, যেন জাহান্নামের দরজাসমূহ হতে আগুনের তৈরী কোনো একটি দরজায় তার নাম

---

১. সূরা তাওবা : আয়াত ৩৫

২. সূরা তাওবা : আয়াত ৩৫

লিখে দেয়। এবার তাকে ওই দরজাটি অতিক্রম করতে হবে এই অপরাধের কারণে যে, সে এক ওয়াক্ত নামায কাজা করেছে। এজন্য হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যার এক ওয়াক্ত নামায ছুটে গেল, যেন তার ঘরে আগুন লেগে তার স্ত্রী-বাচ্চা, আসবাবপত্র সব পুড়ে গেছে। এ ব্যক্তির যতটা ক্ষতি হয়, তার চেয়ে অধিক ক্ষতি হয় ওই ব্যক্তির, যে জেনেশুনে নামায ছেড়ে দেয়।

নামায ও কুফরি

হাদীছে পাকে ইরশাদ হয়েছে :

مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ جِهَارًا

'যে ব্যক্তি জেনে-শুনে নামায ছেড়ে দিল, সে প্রকাশ্যে কুফরি করল।'[১]

নামায ছেড়ে দেওয়া যেন কাফেরসুলভ কাজ যদিও লোকটি মুসলমান বলেই গণ্য হয়। চিন্তা করুন নামায ছেড়ে দেওয়া আল্লাহ তা'আলার নিকট কতখানি অপছন্দের বিষয়।

আশ্চর্য বিষয়

হযরত শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) তাঁর কিতাবে লিখেছেন, একজন বেনামাযীর অমঙ্গল চল্লিশ ঘর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। তাহলে এবার ভাবুন, যে ঘরে বেনামাযী বাস করে, সেই ঘরের অমঙ্গলের অবস্থা কেমন হবে? আর যদি কোনো ঘরের সকল মহিলা বেনামাযী হয়, তাহলে সেই ঘরের অমঙ্গলের অবস্থা কিরূপ হবে? একারণেই মহিলারা আজ কেঁদে ফিরে যে, ঘরে কোনো বরকত নেই। কী যে হলো জানি না, বাচ্চারা কেউ কথা শোনে না।

কখনো বলে, সন্তানরা সব অবাধ্য হয়ে গেছে। আবার কখনো বলে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বনিবনা হয় না। এসব হলো নামায না পড়ার কুফল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

'নিশ্চয় নামায মানুষকে অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।'[২]

---

১. আল-মু'জামুল আওসাত : হাদীছ নং ৩৪৭৯

২. সূরা আনকাবূত : আয়াত ৪৫

মানুষের উচিৎ, তারা যেন নামায নামক আল্লাহর এই দুর্গে আশ্রয় নেয়।

সর্বাবস্থায়ই নামায পড়তে হবে

শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) লিখেছেন, বেনামাযী ব্যক্তিকে মুসলমানদের কবরস্তানে দাফন করা উচিৎ নয়। এবার চিন্তা করুন, এ বুযুর্গ তো বেনামাযী সম্পর্কে এত কিছু বললেন; অথচ আমাদের কানের কাছে মাছিও নড়ে না। সব নামাযই ফরজ। হ্যাঁ; নারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা যে নামাযগুলো মাফ করে দিয়েছেন, সেগুলো তো মাফ হয়ে গেছে। এ ছাড়া বাকি নামাযগুলো তো পড়তে হবে। বাচ্চা থাকুক চাই না থাকুক, শিক্ষিত হোক চাই না হোক সর্বাবস্থায় নামায পড়তে হবে। ঘরে যদি লোকসংখ্যা বেশি হয় এবং তাদের খাবারের ব্যবস্থা করতে হয়, তবুও নামায পড়তে হবে। ঘরে মেহমান এলেও নামায পড়তে হবে। আলহামদুলিল্লাহ নামাযী মহিলারা সকল ব্যস্ততা সত্ত্বেও নামাযের জন্য সময় বের করে নেয়। তারা বাচ্চা লালনপালন করে, ঘরের কাজ-কর্ম করে, ঝাড়ু দেয়, ঘর পরিপাটি করে রাখে। তারপরও নামাযের সময় নামায পড়ে নেয়। তারা মনে করে, এটি আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের দেওয়া দায়িত্ব, যা পালন করতেই হবে। এর গুরুত্ব অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেলে আর কখনো নামায কাজা হতে পারে না। আমরা খাবার তো কখনো কাজা করি না! তাহলে নামায কেন কাজা করব? এটা তো আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ, যা তিনি আমাদের ওপর আবশ্যক করে দিয়েছেন। কাজেই নামায পড়া সকল মুসলমানের কর্তব্য।

নামায কার ওপর ফরজ?

আল্লাহ যাকে জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন এবং যে সাবালক হয়েছে এবং কালিমা পড়ে নিয়েছে তার ওপর নামায ফরজ হয়ে গেছে। কেউ এ দায়িত্ব থেকে মুক্ত নয়। আমি নামায পড়ব না একথা বলার অধিকার কারুর নেই।

কাজা নামায কীভাবে পড়বেন?

বিগত জীবনে যেসব নামায কাজা হয়েছে, সেগুলো এখন অবশ্যই আদায় করে নিতে হবে। অনেক মহিলাকে এমনও দেখা গেছে যে, তারা এ বিষয়টি বোঝার পরই কাজা নামায পড়তে শুরু করে দেয়, বরং প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের সাথে এক ওয়াক্ত কাজা নামায আদায় করে নেয়। ফজরের পূর্বে ফজর পড়ে নেয়। জোহরের সাথে জোহর পড়ে নেয়। অর্থাৎ বিগত

জীবনের এক ওয়াক্ত জোহর পড়ে নেয়; তারপর ওই দিনের জোহর আদায় করে। ফলে এমনও শোনা গেছে, অনেক মহিলা তাদের বার বছরের কাজা নামাযও পড়ে ফেলেছে। আলহামদুলিল্লাহ্! এতে তাদের মাথার বোঝা দূর হয়ে গেছে।

কাজা নামায বেশি হলে কীভাবে পড়বেন?

হে বোন! তুমি তোমার জীবনের নামাযের হিসাব-নিকাশ করে নাও। তুমি যদি সাবালিকা হওয়ার পর থেকে নামায না পড়ে অলসতা করে থাক, তাহলে বসে অনুমান করো, কত ওয়াক্ত নামায তোমার ছুটে গেছে, যা তোমার ওপর পড়া আবশ্যক ছিল; কিন্তু তুমি অলসতা করে পড়নি। চাই তা দু-মাসের হোক বা দু-বছরের হোক। এখন তোমার সময় আছে; সহজেই আদায় করতে পারবে।

বেনামাযীর শাস্তি

হাদীছে পাকে বর্ণিত হয়েছে, কোনো বেনামাযী মহিলা কবরে গেলে আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত তার জন্য একটি অজগর সাপ নিযুক্ত করে দিবেন, যা হবে টেকো এবং অত্যন্ত ভয়ানক। সে যখন নিঃশ্বাস ফেলবে, তখন বেনামাযী মহিলার হাড্ডিগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। বিষক্রিয়ার দরুন তার খুব কষ্ট হবে। যেমন– আমাদের ভিমরুলে কামড় দিলে আমরা কত কষ্ট অনুভব করি। চিন্তা করে দেখুন, বিশাল অজগর কামড় দিলে কেমন কষ্ট হবে?

اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائینگے

مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائینگے

'এখন তুমি ত্রস্ত হয়ে বলছ কেবল মরে যাবে,

মরেও যদি শান্তি না পাও, তাহলে বলো কোথায় যাবে?

চিন্তার বিষয়

চিন্তার বিষয় হলো, মহিলার কাছে কেউ থাকবে না। থাকবে না কেউ তার ফরিয়াদ শোনার। সে চিৎকার করবে। তার চিৎকার শোনার মতো কেউ থাকবে না। যে বেচারী টিকটিকি দেখেও ভয় পেয়ে যায় অথচ কবরে থাকবে অজগর সাপ, যার সম্পর্কে বলা হয়েছে, তা হবে ভয়ানক; তাহলে একাকি সেখানে তার কী অবস্থা হবে?

কবরের ভয়ানক ফেরেশতা

হাদীছে পাকে ইরশাদ হয়েছে, বেনামাযীর জন্য আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন, যার নখগুলো হবে লম্বা, লম্বা, দাঁতগুলো হবে লম্বা, লম্বা। তার চোখগুলো এত ভয়ানক হবে যে, ভীতি সঞ্চার হবে। তার নাক থেকে ধোঁয়া নির্গত হবে। দেহটা হবে কালো। ভয়ানক আকৃতি হবে। চুলগুলো লম্বা-লম্বা হবে। ফেরেশতা তার দিকে হাত বাড়াবে আর সে ভয়ে চিৎকার দিয়ে উঠবে। পৃথিবীতে এ মহিলা কিছু না বললেও ভয় পেত। একটু জোরে বাতাস বইলে ভয় পেত। দরজা নড়াচড়া করার শব্দ শুনে ভয় পেত। সে এতটা ভীতু ছিল। কবরে এত ভয়ানক ফেরেশতা হবে যে, পিত্ত পানি হয়ে যাবে। ভাবতেও অবাক লাগে। সেখানে তার কী অবস্থা হবে? ভীতিগ্রস্ত ও আতংকিত থাকবে। কান্নাকাটি করা সত্ত্বেও তার আর্তনাদ শোনার মতো কেউ থাকবে না সেখানে।

সেই ফেরেশতা এমন হবে যে, তার অন্তরে দয়া-মায়ার নাম-গন্ধও থাকবে না। তার হাতে গুর্জ থাকবে। সে চোখ পাকাবে, দাঁত কিটমিট করবে, নখ দিয়ে আঁচড় দিতে যাবে। এমনকি তাকে গুর্জ দিয়ে আঘাত করবে। হাদীছে পাকের মর্মার্থ এমন যে, মহিলা ৭০ হাত মাটির নিচে ধসে যাবে। আবার বেরিয়ে আসবে। পুনরায় তাকে গুর্জ দিয়ে আঘাত করবে। এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। যদি ফজরের নামায কাজা করে থাকে, ফজর থেকে জোহর পর্যন্ত গুর্জ মারতে থাকবে। জোহর কাজা করলে জোহর থেকে আসর পর্যন্ত মারতে থাকবে।

এই কথাগুলো আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে মহিলা মনে করবে, সামনে কী হবে সে তো আর জানা নেই। হবে কি হবে না তাও তো নিশ্চিত নয়। তার একথা মিথ্যা। আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা সত্য। কবর জগতে এমনই হবে। কারো সন্দেহ থাকলে মৃত্যুর পর স্বচক্ষে সে তা দেখতে পাবে। আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত তার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জবানে কথাগুলো ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের একথাগুলোর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস হাসিল করার তাওফীক দান করুন।

নামাযের উপকারিতা

নামাযের উপকারিতা তো সীমাহীন। একটি তো এই যে, মানুষ দিনে পাঁচবার হাত-মুখ ধৌত করে। ফলে তার চেহারার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়। তার চেহারায় নূর আসে। দ্বিতীয়টি হলো, নামায পড়লে আত্মার প্রশান্তি পাওয়া যায়। অনেক চিন্তা-পেরেশানি এমনিতেই ভুলে যায়। ফলে অন্তর শান্তি পায়। কাজেই নামাযে সীমাহীন উপকারিতা রয়েছে।

নামাযের বিনিময়

কোনো-কোনো হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে নামায পড়ে, আল্লাহ জান্নাতের একজন ফেরেশতাকে নির্দেশ দেন; ফলে সে জান্নাতের একটি নদীতে ডুব দিয়ে উঠে আসে। তার শরীর হতে যত ফোঁটা পানি টপকে পড়ে, তত পরিমাণ নেকী তার আমলনামায় লিখা হয়।

আনন্দের বিষয়

নিয়মিত নামায পড়া কতই-না আনন্দের বিষয়! সুতরাং যে সকল মহিলা নিয়মিত নামায পড়ে, আল্লাহ তা'আলা তাদের কাজে বরকত দিবেন। আর যারা অলসতা করে, তারা যেন পাকাপোক্ত অঙ্গীকার করে নেয় যে, ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ আমরা আল্লাহর দরবারে মাথা নত করব।

وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے

ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

সেই একটি সেজদা, যাকে তুমি আজ ভাবছ বোঝা অতি,

এমন হাজার সেজদার ফলে মানুষকে দান করবেন তিনি মুক্তি।

যে আল্লাহর দরবারে মাথা নত করতে শিখেছে, তাকে আর অন্যের দ্বারে-দ্বারে গিয়ে মাথা ঠুকতে হয় না। হে বোন! তুমি আল্লাহকে ভয় করো। সম্পদের প্রতি আসক্ত হয়ো না। নিজের অবস্থান নিয়ে গর্ব করো না। অনেক প্রমাণ আছে, মহিলারা ঘরে বসেই অপদস্থ হয়। মাথা থেকে ওড়না পড়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হলে পৃথিবীতে দিন বদলাতে সময় লাগে না। শাহী সিংহাসনের মালিককেও এক টুকরা কাঠের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। আল্লাহ তা'আলা যেন কারো প্রতি অসন্তুষ্ট না হন।

এজন্যই বলা হয়েছে-

وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ

'আল্লাহ যাকে অপমান করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না।'[১]

দিন বদলাতে সময় লাগে না

হে বোন! তুমি নামায পড়ে তোমার আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে নাও। অন্যথায় আল্লাহ অসন্তুষ্ট হলে তোমার দিন যে কখন বদলে যাবে তুমি টেরও পাবে না। তোমার মনের শান্তি উধাও হয়ে যাবে, জীবনের সব আনন্দ হারিয়ে যাবে। তখন তুমি কেঁদে বেড়াবে। তোমার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে যাবে। উদাসীনতায় ছেয়ে যাবে তোমার চেহারা। আজ আল্লাহ তোমাকে সুস্থতা দান করেছেন। দিয়েছেন বহু আনন্দ। আজ তোমাকে তিনি সম্মান দান করেছেন। তাই তুমি আজ তাঁর আনুগত্য করে নাও। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে নাও। এজন্যই কোনো কবি বলেছেন :

یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی
وہ اگر نگاہ کر دیں تو ابھی بہار آئیں

'হেমন্ত কালের আগমন তো কেবল তার এড়িয়ে যাওয়া
এখনি আবার বসন্ত আসবে যদি হয় তার ফিরে চাওয়া।'

আল্লাহ তা'আলা যখন রহমতের দৃষ্টিতে তাকান, তখন মানুষের জীবনে বসন্ত নেমে আসে। আর যখন তিনি রহমতের দৃষ্টি সরিয়ে নেন, তখন আবার জীবনে হেমন্ত কাল চলে আসে।

খাঁটি তাওবা ও মূল্যবান সময়

এই অনুষ্ঠানগুলোর আয়োজন এজন্যই করা হয়, যেন আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা শ্রবণ করে আপন গুনাহসমূহ থেকে খাঁটি তাওবা করে নিই এবং এখন থেকেই ঈমান, ইসলাম ও কুরআন মোতাবেক জীবন যাপনের নিয়ত করে নিই। আমরা চিন্তা করব, যদি আজ আমরা নেক কাজ করি, তাহলে কাল কিয়ামতে আল্লাহ তা'আলার দরবারে সম্মান পাব। যে সময়টুকু অতিবাহিত হয়েছে, তা তো হয়েছেই। সামনে যে সময়টুকু বাকি আছে, তাকে মূল্যবান বানানোর প্রয়োজন। এমন যেন না হয় যে, বাকি সময়টুকুও

---

১. সূরা হজ : আয়াত ১৮

অবহেলায় কেটে যায়, পাপ কাজে অতিবাহিত হয়ে যায়। কারণ, নফ্স ও শয়তান সর্বদাই মানুষের ধ্বংসের চেষ্টায় লেগে রয়েছে। মানুষ ধোঁকায় পড়েই কেবল লম্বা-লম্বা আশা করে।

নামায সম্পর্কে ভয়ানক উক্তি

যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, যাও; উঠে নামায পড়ে নাও। তখন সে হুট করে বলে বসে, তোমার জন্য পড়তে হবে? যাও তুমি পড়ে নাও আমি পড়ব না। আবার কখনো বলে, তুমি কি আমার কবরে যাবে? আবার কখনো বলে, জাহান্নামে জ্বলতে হলে আমি জ্বলব, তাতে তোমার কী? এ জাতীয় কথা কেবল তখনই মুখ থেকে বের হয়, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য তাঁর দরজা বন্ধ করে দেন। যখন তিনি তোমাকে তাঁর দরবারে মাথা নোওয়াতে দিতে না চান, তখন তুমি বুঝে নেবে, রাজাধিরাজ আহকামুল হাকিমীনের দরজা তোমার জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। তাহলে তোমার কী দশা হবে? তোমার ঝোলা খালি থাকবে। তুমি খালি হাতে কবরে যাবে।

সময়ের গুরুত্ব

তুমি কবরে গিয়ে তখন আপসোস করবে, হায়! দুনিয়াতে যদি আমার একটু সুযোগ হতো! কিন্তু এখন পস্তালে লাভ কী হবে? জীবনের সময় তো পার হয়ে গেছে। কাজেই সময়ের মূল্য অনুধাবন করা জরুরি। যে দিনটি চলে যায়, আমাদের জীবনে সেই দিনটি আর কখনো ফিরে আসবে না। এজন্যই নেককার নারীরা প্রতি দিনই আল্লাহ্র ইবাদত করে। প্রতি রাতেই আল্লাহ্র দরবারে মাথা নত করে। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তার অন্তরকে আলোকিত করে দেন।

হযরত ফাতেমা (রাযি.)-এর ইবাদতের ঘটনা

হযরত ফাতেমা (রাযি.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি শীতকালের দীর্ঘ রাতে এশার নামাযের পর দু-রাকাত নফল নামাযের নিয়ত করলেন। কুরআন তেলাওয়াতে এমন তৃপ্তি পেলেন, অন্তরে এমন প্রশান্তি পেলেন যে, কুরআন তেলাওয়াত করতে মজা-ই লাগছিল। তিনি তেলাওয়াত করতেই থাকলেন। রুকু-সেজদায়ও বেশ মজা পাচ্ছিলেন। সেজদা থেকে মাথা তুলতেই যেন মন চাচ্ছিল না। এভাবে দু-রাকাত নামায শেষ করে দোআর উদ্দেশ্যে হাত তুললেন। দেখতে পেলেন, সাহরীর সময় অতি নিকটবর্তী। তিনি কাঁদতে শুরু

করলেন আর বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! তোমার রাত কত ছোট হয়ে গেল যে, আমি দু-রাকাত নামায পড়তেই রাত শেষ হয়ে গেল? তাঁদের রাত ছোট হওয়ার অভিযোগ হতো!

আমাদের অবস্থা কী?

বর্তমানে আমাদের অবস্থা হলো, আমরা রাতভর ঘুমিয়ে কাটাই। রাত্র ১২ টা ১টা পর্যন্ত T.V. V.C.R. আমাদের জাগ্রত রাখে। এমন সময় ঘুমাই যে, ফজরের নামাযের ওয়াক্ত কখন যে চলে যায়, টেরও পাই না। হে বোন! তোমার ফজরের নামায যদি আদায় হতো, তোমার বাকি নামাযগুলোও যদি পূর্ণ হতো, তাহলে তুমি আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের তালিকাভুক্ত হতে পারতে।

জীবনের হিসাব মিলিয়ে নাও

এখনও সময় আছে জীবনের হিসাব-নিকাশ করার, যেন আমাদের অন্তরে নেক কাজের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আমাদের পূর্বসূরী মহিলাদের মধ্যে নেক কাজের প্রতি এমন আগ্রহ ছিল যে, তারা একজন অপরজনের আগে যাওয়ার চেষ্টা করতেন।

রাবেয়া বসরিয়ার দোআ

আল্লাহর এক নেককার বাঁদী রাবেয়া বসরিয়া সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি একরাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠলেন। তাহাজ্জুদ শেষে হাত উঠালেন এবং দোআ করতে লাগলেন, হে আল্লাহ! সূর্য অস্ত গেল, রাতের আগমন ঘটল। আকাশে তারকারাজি চমকায়। হে আল্লাহ! দুনিয়ার রাজা-বাদশাহরা সবাই তাদের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু তোমার দুয়ার এখনো খোলা। হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে তোমার রহমত প্রার্থনা করছি।

তাঁরা কত বড় নেককার ছিলেন যে, রাতের শেষ প্রহরে জাগ্রত হয়ে আল্লাহর দরবারে তাঁর করুণা প্রার্থনা করতেন।

মায়ের দোআ কবুল হতো

বাচ্চাদের জন্য মায়ের দোআ যখন কবুল হতো, তখন কোনো বাচ্চা মুহাম্মদ ইবনে কাসিম হতো, কোনো বাচ্চা সুলতান মাহমুদ গজনবি হতো। কোনো বাচ্চা বায়েজিদ বোস্তামি হতো, কোনো বাচ্চা বাহাউদ্দিন নকশবন্দি হতো। এসব ছিল মায়ের দোআর ফসল, যা বাচ্চাদের কপাল খুলে দিত।

আজ মায়েরা তাদের অবস্থান সম্পর্কে অবগত নন। মেয়ে তো মা হয়ে যায়; কিন্তু সে মায়ের অবস্থান সম্পর্কে জানে না। ফলে দুধের শিশু, যে একেবারে নিষ্পাপ ও অবুঝ, মা যখন কোনো কাজে লিপ্ত, সে তার পিছু-পিছু কেঁদে বেড়ায়। মা তখন তাকে অভিশাপ দিতে থাকে। কখনো কোনো ছোট বাচ্চা কোনো কাজ ভুল করলে তাকে গালাগাল করে। ছোট বাচ্চাকে বলে, তুই মরলেই ভালো হতো! হে বোন! তুমি তো মা। তোমার মুখ থেকে যে শব্দ বের হয়, তা সোজা আসমানে চলে যায়। আরশের দরজা খুলে যায়। মায়ের দোআ-বদদোআ সবই আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়। তোমার বদদোআ যদি কবুল হয়ে যায়, তাহলে তোমার অবস্থা কী হবে?

মায়ের বদদোআর ঘটনা

বুযুর্গগণ একটি ঘটনা লিখেছেন। ছোট্ট একটি নিষ্পাপ শিশু কাঁদছিল। মা রাগ করে বললেন, তুই মরে যা। আল্লাহ তা'আলার রাগ এসে গেল। তিনি তার বদদোআ কবুল করে নিলেন। তবে তখনই তার মৃত্যু দেননি। বাচ্চা যখন বড় হলো, ভরযৌবনে পদার্পণ করল, সে যখন মাতাপিতার চোখের শীতলতায় পরিণত হলো, মাতাপিতার অন্তরের প্রশান্তির কারণ হলো, বাচ্চার যৌবন দেখে সকলেই অবাক হতো, ভরযৌবনে ফলটি যখন পেকে উঠল, আল্লাহ তা'আলা তখন এই ফলটি ছিঁড়ে নিলেন।

میٹھا، رسیلا صاف سنہری جوان سا

ایک سیب دھم سے فرش زمین پر ٹپک پڑا

মিষ্টি, রসালো, পরিচ্ছন্ন সোনালি যুবকের মতো।

চাঁদ থেকে একটা আপেল জমীনে ছিঁড়ে পড়ল।

আল্লাহ তাকে মৃত্যু দিলেন। এবার সেই মা তার জন্য কাঁদছেন যে, আমার যুবক ছেলেটা মরে গেল! তাকে বলা হলো, এটা তো তোমার সেই বদদোআর ফসল, যা তুমি তার জন্য কামনা করছিলে। কিন্তু আমি তখন ফলটা ছিঁড়িনি – তাকে পাকতে সুযোগ দিয়েছি। ফলটা যখন পেকে গেল, তখন আমি ছিঁড়ে নিলাম, যেন তোমার অন্তর ভালোভাবে দুঃখিত হয়। এখন তুমি কেন কাঁদছ? এ তো তোমারই হাতের উপার্জন।

এমন ঘটনা অনেকেই ঘটে যে, মা বদদোআ করে। যখন তার সামনেই সেই বদদোআ কবুল হয়, তখন সে কেঁদে বেড়ায় আর বলে, আমার ছেলের

অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল! আমার ছেলের জীবন ধ্বংস হয়ে গেল! হে বোন! এসব এজন্যই হয় যে, তুমি তোমার অবস্থান সম্পর্কে অজ্ঞ। তোমার জানা উচিৎ, তুমি যদি নামায পড়তে আর তোমার বাচ্চার জন্য দোআ করতে, তাহলে আল্লাহ তোমার বাচ্চার কপাল খুলে দিতেন।

মায়ের দোআর ঘটনা

জনৈক বুযুর্গ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তার মাতা ইন্তেকাল করলেন। আল্লাহ তাঁর অন্তরে ইলহাম করলেন, হে আমার প্রিয় বান্দা! তুমি একটু সাবধানে থাকবে। এত দিন যার দোআ তোমাকে হেফাজত করত, তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। আল্লাহু আকবার! বাস্তব বিষয়টি এমনই যে, মাতাপিতার দোআ সন্তানদের পাহারা দেয়।

রূহানি শক্তি

আগেকার যুগে মায়েরা বাচ্চাদের অজু অবস্থায় দুধ পান করাতেন। বর্তমান যুগে মায়েরা V.C.R. এর নৃত্যানুষ্ঠান দেখে, গান-বাদ্য শোনে আর বাচ্চাকে দুধ পান করায়। হে বোন! তোমার এই ছেলে বড় হয়ে জুনায়েদ বাগদাদি কীভাবে হবে? বায়জিদ বোস্তামি কীভাবে হবে? শিশুবেলায় তো তুমি তার রূহানিয়াতকে গলা টিপে হত্যা করছ।

একটি ঈর্ষণীয় ঘটনা

আমি পত্রিকায় সারগোধা এলাকার এক মহিলার একটি সাক্ষাৎকার পড়েছি। তার দুটি ছেলে ছিল। উভয় ছেলেই সেনাবাহিনীর জেনারেল হয়েছে। কেউ তার সাক্ষাৎকার নিল, আপনি একজন সৌভাগ্যবান মা। কেননা, আপনার দুই ছেলে উভয়জনই এমন বীর পুরুষ যে, তারা জেনারেল হয়েছে। এর পিছনে বিশেষ কী কারণ রয়েছে বলুন তো? আপনি কীভাবে তাদেরকে লালন পালন করেছেন? তিনি বললেন, আমি একজন সাধারণ মুসলিম নারী। আমি এক বুযুর্গের কাছে শুনেছি, যে-মহিলা বাচ্চাদের অজু অবস্থায় দুধ পান করাবে, আল্লাহ তার বাচ্চার ভাগ্য সুপ্রসন্ন করবেন। আমি আমার উভয় ছেলেকে অজু অবস্থায় দুধ পান করিয়েছি। হতে পারে, আল্লাহ আমার এই আমলের বদৌলতে দুনিয়াতে তাদের ইজ্জত দান করেছেন।

কাজেই যে সকল নারী এই নেক কাজগুলোকে আপন করে নেন, আল্লাহ তাদের সন্তানদের সৌভাগ্যের অধিকারী বানিয়ে দেন। নিজের জীবনেই

তাদের সুখ দেখার তাওফীক দান করেন। আর যারা আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি করে, তিনি তাদেরকে স্বচক্ষে দেখান যে, দেখো আমি তোমাকে তোমার কাঙ্ক্ষিত সন্তান দান করিনি। আর যদিও দিয়েছি, তাকে তোমার অবাধ্য বানিয়ে দিয়েছি।

বেনামাযী ও অবাধ্য সন্তান

আল্লাহ তা'আলা তোমার সন্তানকে তোমার অবাধ্য বানিয়েছেন। এখন তুমি কেন কেঁদে বেড়াও যে, আমার সন্তান তো আমার কথা শোনে না। এখন কাঁদার কোনো প্রয়োজন নেই। এ তো তোমার নিজেরই হাতের কামাই। এ তো সেই ফসল, যার বীজ তুমি আপন হাতেই বপন করেছ। এখন তোমাকে তার ফসলই কাটতে হবে। বাবলা গাছে কখনো আপেল ধরবে না। যে বাবলা গাছ লাগাবে, সে কাঁটা-ই পাবে। আর যে ব্যক্তি আপেল গাছ লাগাবে, সে আপেলই লাভ করবে।

দীর্ঘ আশা

আজ আমরা লম্বা-লম্বা আশা করছি আর ভাবছি, নেক কাজ তো করব। তবে এখন আমার এমন কী বয়স হয়েছে? সামনে সময় তো অনেক আছে। হে বোন! তুমি কি দেখছ না, যুবতী মেয়েরাও মারা যায়? তাদেরকে কাঁধে বহন করে কবরস্তানে নিয়ে রেখে আসে। এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যে, বিবাহ হয়েছে; কিন্তু প্রথম সন্তান জন্মের সময়ই শহীদ হয়ে আখেরাতে পৌঁছে গেছে। তাহলে মৃত্যু কখন চলে আসে তার কি কোনো নিশ্চয়তা আছে?

আশ্চর্য বিষয়

ইমাম গায্যালি (রহ.) একটি আশ্চর্য বিষয় লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, হে বন্ধু! তোমার কি জানা আছে, বাজারে সেই কাফনের কাপড়টি এসে পড়েছে, যেটি তোমাকে পরানো হবে? আমরা তো মৃত্যুকে ভুলে গেছি; কিন্তু মৃত্যু আমাদের ভোলেনি।

প্রতিদিন কবর মানুষকে সত্তরবার আহ্বান জানায়

হাদীছে পাকে এসেছে, প্রত্যেক মানুষের কবর তাকে প্রতিদিন সত্তরবার করে স্মরণ করে আর বলে, হে মানুষ!

اَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ

আমি নির্জনতার ঘর।

اَنَا بَيْتُ الظُّلُمَاتِ

আমি ঘোর অন্ধকারের ঘর।

اَنَا بَيْتُ الْحَيَّةِ

আমি সাপ-বিচ্ছুর ঘর।[1]

'হে মানুষ! আমার মাঝে তুমি প্রস্তুতি নিয়ে এসো। কিন্তু মানুষ দুনিয়ার জীবন নিয়েই পাগলপারা। এ দুনিয়ার মাল-সম্পদের নেশা তার চোখে পট্টি বেঁধে রেখেছে। বর্তমানে এমন অনেক মহিলা রয়েছে, যারা দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় মাসআলাগুলোও জানে না। নিজেরাও শিক্ষা করে না, অন্যের কাছে জিজ্ঞাসা করার সুযোগও হয় না, তাহলে এবার শুনুন মহিলারা কী-কী উপায়ে নেকী উপার্জন করতে পারে।

মহিলারা পুরুষদের সমপরিমাণ নেকী কীভাবে উপার্জন করবে?

একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এক মহিলা সাহাবি এলেন এবং বললেন, আমি মহিলাদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে এসেছি। আপনার কাছে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জিজ্ঞাসা করো। তিনি বলতে লাগলেন, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, পুরুষরা তো নেক কাজে আমাদের তুলনায় বেশ এগিয়ে গেছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কীভাবে? মহিলা বললেন, পুরুষরা মসজিদে গিয়ে জামাতের সঙ্গে নামায পড়ে। ফলে তাদের অনেক ছাওয়াব হয়। তারা আপনার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করে, কবরস্তানে গিয়ে জানাযা পড়ে, মানুষের দাফনকাজে অংশগ্রহণ করে। আমরা তো ঘরেই থাকি। ফলে আমরা এসব নেকী লাভ করতে পারি না। সুতরাং পুরুষরা আমাদের তুলনায় বেশ অগ্রসর।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রশ্নকারিণী বেশ ভালো প্রশ্নই করেছে। তারপর ইরশাদ করলেন, যে মহিলা ঘরে নামায পড়ে,

---

১. তিরমিযি : হাদীছ নং ২৩৮৪

সে ওই সকল পুরুষদের সমপরিমাণ নেকী লাভ করে, যারা জামাতে নামায পড়ে। আল্লাহ তা'আলা ফরজ নামায মসজিদে গিয়ে আদায় করার সমতুল্য ছাওয়াব দান করেন। তারপর তিনি বললেন, মহিলারা বাচ্চার দুধপান বা অন্য কোনো প্রয়োজনে রাত জাগরণ করে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরও সেই পরিমাণ নেকী দান করবেন, যে পরিমাণ নেকী সারা রাত জাগ্রত থেকে সীমান্ত পাহারা দানকারী মুজাহিদদের দান করেন।[১]

চিন্তার বিষয়

ভাবার বিষয় হলো, আল্লাহ তা'আলা নারীদের জন্য এ সব ছাওয়াব হাসিল করা কতখানি সহজ করে দিয়েছেন? সে ঘরে নামায পড়বে আর মসজিদে জামাতে নামায পড়ার ছাওয়াব পাবে। তার ঘরে বসে বাচ্চার সঠিক লালনপালন এবং জাগ্রত থাকার দরুন সীমান্ত পাহারা দানকারী মুজাহিদগণের সমান হবে। আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত মহিলাদের জন্য কতখানি সহজ করে দিয়েছেন!

সহজ নেকীসমূহ

কোনো-কোনো বর্ণনায় এসেছে, কোনো মহিলা যদি আপন মাতাপিতা বা স্বামীর গৃহে অযত্নে পড়ে থাকা কোনো জিনিস যত্নসহকারে রাখে, আল্লাহ তা'আলা তাকে একটি নেকী দান করেন, একটি গুনাহ মাফ করবেন এবং জান্নাতে তার মর্যাদার একটি স্তর উঁচু করে দিবেন। এবার একটু চিন্তা করুন, কেউ যদি এ বিষয়টি জেনে নেয়, তাহলে একজন নারী দৈনিক কী পরিমাণ নেকী উপার্জন করতে পারে? রান্নাঘরের কতগুলো জিনিস সে গুছিয়ে রাখতে পারে? ঘরের কতগুলো কাপড় সে ভাঁজ করে রাখতে পারে? ঘরের কী পরিমাণ আসবাব সে পরিপাটি করে রাখতে পারে? কিন্তু এই বেচারীদের এ ব্যাপারে কোনো জ্ঞান থাকে না। আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত আমাদেরকে নেকীর প্রতি আগ্রহ দান করুন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

১. সহীহ্ ইবনে খুযাইমা : হাদীছ নং ১৬৮৯

জীবনের উদ্দেশ্য

'এই পৃথিবীটা হলো পরীক্ষার হল। এটি কোনো রং-তামাশার জায়গা নয়। এটি কোনো ভ্রমণস্থল কিংবা বিশ্রামাগারও নয়। বরং এটি পরীক্ষার হল। আফসোসের বিষয় হলো, আমরা একে চারণভূমি বানিয়ে নিয়েছি।'

জীবনের উদ্দেশ্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿٥٦﴾

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

বাস্তব সত্য

মানুষ যে পথে চলে, সেই পথের ধূলি-কণাও তার দৃষ্টিগোচর হয়। আর যে পথে চলে না, সেই পথের পাহাড়ও তার নজরে পড়ে না।

পৃথিবীটা পরীক্ষার হল

এই পৃথিবীটা হলো পরীক্ষার হল। এটি কোনো রং-তামাশার জায়গা নয়। এটি কোনো ভ্রমণস্থল কিংবা বিশ্রামাগারও নয়। বরং এটি পরীক্ষার হল। আফসোসের বিষয় হলো, আমরা একে চারণভূমি বানিয়ে নিয়েছি।

জীবনের উদ্দেশ্য

জীবনের লক্ষ্য আল্লাহ তা'আলার ইবাদত এবং তাঁর স্মরণ। যে বন্দেগি করে, সে-ই তো বান্দা। অন্যথায় পুলিন্দা (পোটলা) – একেবারে গান্ধা, মিথ্যা ও ধোঁকাবাজির পুলিন্দা।

কুরআন হলো আবেহায়াত

কুরআন হলো সততার সমষ্টি, বাস্তবতার ভান্ডার, মানবতার জীবনবিধান, জীবনের ইশতেহার। বরং মানবতার জন্য সঞ্জীবনী সুধা বা আবে হায়াত।

কুরআন অবতরণের উদ্দেশ্য

আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত কুরআন এজন্যই নাযিল করেছেন, যেন আমরা তা পাঠ করি এবং তদনুযায়ী আমল করি। যে তা পড়তে থাকবে এবং তদনুযায়ী

আমল করতে থাকবে, দুনিয়া ও আখেরাতে সে মর্যাদা লাভ করতে থাকবে। এই কুরআন তোমাকে ইজ্জত দান করবে। তোমার ভিতর ও বাহিরকে পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল করে দিবে। এই কিতাব মানুষের ব্যক্তিত্বকে তেজস্বী ও পরিষ্কার করতে এসেছে। আয়নার মতো স্বচ্ছ করতে এসেছে। কুরআন মানুষের অন্তরের ময়লা ধৌত করতে এসেছে। মানুষ কুরআন মোতাবেক জীবন পরিচালনা করলে আল্লাহর সাহায্য তার সহায় হয়। আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হলে মানুষের জীবনতরী তীরে ভিড়ে। সে সফল হয়।

আল্লাহ্ বলছেন :

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِإِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

'আল্লাহর অনুমতিক্রমে অনেক ছোট দল বড় দলের ওপর বিজয় লাভ করেছে। আর আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।'[১]

বিশৃঙ্খল জীবন

প্রতিজন মানুষকে কিছু নিয়ম-নীতি মোতাবেক জীবন যাপন করতে হবে। উচ্ছৃঙ্খল জীবনের প্রতি আল্লাহর কোনো সাহায্য অবতীর্ণ হয় না। মানুষের নয় পশুর জীবনই উচ্ছৃঙ্খল হতে পারে।

মনচাহি জীবন

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। তার জীবনের জন্য শৃঙ্খলা ও নিয়ম-নীতি অনিবার্য। সে আপন ইচ্ছায় পৃথিবীতে আসেনি আবার আপন ইচ্ছায় এ পৃথিবী থেকে যাবে না। কাজেই মধ্যখানের এই অবশিষ্ট সময়টুকুও নিজ ইচ্ছা মোতাবেক কাটাবার অধিকার তার নেই।

সফল জীবন

যে মালিক ও স্রষ্টা তাকে পাঠিয়েছেন, যাঁর হুকুমে সে পৃথিবীতে এসেছে আবার যাঁর হুকুমে এ পৃথিবী থেকে ফিরে যাবে যদি তাঁর বিধান অনুসারে জীবন যাপন করতে পারে, তাহলে তার জীবন হবে সফল ও সার্থক।

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ২৪৯

জীবনের লক্ষ্য

মানুষের প্রয়োজন আর লক্ষ্য দুটি এক নয়। খানা-পিনা ইত্যাদি মানুষের প্রয়োজন। জীবনের লক্ষ্য তো হলো আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ইবাদত। জীবনপ্রাপ্তির হেতু কেবলই বন্দেগী।

মানবজীবনের একটি পাতা

মানুষের অতীত হওয়া একটি দিন যেন জীবনের একটি পাতা। সেই পাতায় ভালো-মন্দ কিছু একটা লেখা আমাদের কর্তব্য। একথাও নিশ্চিত সত্য যে, মানুষের জীবনের কেটে যাওয়া একটি দিন পুনরায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। যে দিনটি কেটে গেল সেটি হাতছাড়া হয়ে গেল!

দিন তিন প্রকার

এক বুযুর্গ বলতেন, দিন তিন প্রকার–

১. যেটি কেটে গেছে, সেটি হাতছাড়া হয়ে গেছে।

২. যেটি ভবিষ্যতে আসবে। অর্থাৎ আগামী কাল বা তার পরের দিন ইত্যাদি। এ দিনটি জীবনে আসবে কিনা তা কারুর জানা নেই। আগামীর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ভিন্ন কোনো সিদ্ধান্ত আছে কি-না তা-ও কেউ বলতে পারে না।

৩. আজকের দিন। এ দিনটি আমাদের হাতে রয়েছে।

তিনি বলতেন, হে মানুষ! গতকালের ওপর ভরসা করো না। আগামী কালের জন্যও আশাবাদী থেকো না। বরং তোমার হাতে থাকা আজকের এ দিনটিতেই তুমি আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করে নাও।

রাবেয়া বসরিয়ার উক্তি

আল্লাহ তা'আলার নেককার বাঁদী হযরত রাবেয়া বসরিয়া বলতেন, হে মানুষ! আল্লাহর নেয়ামত খেতে-খেতে তোমার দাঁত ক্ষয় হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর প্রশংসা করতে-করতে তোমার জিহ্বা তো ক্ষয় হয়নি!

চমৎকার একটি কথা

হযরত মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী তাঁর ক্লাসে একটি চমৎকার ঘটনা বলতেন। একদা আমি বাজারে গেলে আল্লাহপ্রেমে আত্মহারা এক

ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাত হলো। আমি কাছে গিয়ে তাকে সালাম দিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আহমাদ আলী! মানুষ বাস করে কোথায় রে? আমি তখন বাজারের লোকজনের দিকে ইঙ্গিত করে বললাম, হযরত! এরা সবা-ই তো মানুষ। আমার কথা শুনে তিনি মানুষের প্রতি এক আজব ধরনের দৃষ্টি প্রদান করলেন আর বলতে লাগলেন, আচ্ছা! তাহলে এরা সবাই মানুষ! তার এই গভীর দৃষ্টি আমার ওপর এমন প্রতিক্রিয়া করল যে, আমি তাকিয়ে দেখলাম, বাজারের সবগুলো মানুষ যেন কুকুর, বিড়াল আর শূকরে পরিণত হয়ে গেছে। এই অবস্থা শেষ হলে আমি দেখতে পেলাম, বুযুর্গ চলে গেছেন। উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করে তিনি বলতেন :

مالک تو سب کا ایک مالک کا کوئی ایک

ہزاروں میں نہ ملے گا لاکھوں میں تو دیکھ

মালিক তো সকলেরই একজন। কিন্তু মালিকের জন্য হাজারেও একজন মিলবে না। চেয়ে দেখো, লাখের মাঝেও একজন পাবে না।

ভাগ্যবান ব্যক্তিই তার আপাদমস্তক আল্লাহ তা'আলার হাতে সোপর্দ করে দেয়।

مَنْ كَانَ لِلّٰهِ كَانَ اللّٰهُ لَهٗ

'যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার হয়ে যায়, আল্লাহ তার হয়ে যান।'

আল্লাহকর্তৃক বান্দার দোষ গোপন করা

এটা তো আল্লাহ তা'আলার অশেষ করুণা ও দয়া। প্রতিনিয়ত আমরা স্বাধীন জীবন যাপন করা সত্ত্বেও পৃথিবী আমাদের প্রশংসা করে। 'ইকমালুশ শিয়াম' নামক কিতাবে চমৎকার একটি কথা আছে, 'হে বন্ধু! যে তোমার প্রশংসা করল, সে মূলত তোমার প্রভুর দোষ গোপন করারই প্রশংসা করল।' অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমার গুনাহগুলোকে ঢেকে রেখেছেন। তোমার গুনাহগুলো মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে রেখেছেন। তাই তারা তোমার প্রশংসা করে। যে ব্যক্তি তোমার প্রশংসা করে, আসলে সে তোমার প্রভুরই প্রশংসা করে, যিনি তোমাকে আড়াল করে রেখেছেন। হে বন্ধু! আল্লাহ যদি মানুষের মুখে তোমার এমন প্রশংসা করান, যার উপযুক্ত তুমি হতে পারনি, তাহলে তোমার উচিৎ আপন জবানে তাঁর এমন প্রশংসা করা, যার তিনি যথাযোগ্য।

আল্লাহর অসন্তুষ্টির লক্ষণ

আল্লাহ তা'আলার রহমত যদি কারো প্রতি ধাবিত হয়, তাহলে তার প্রথম লক্ষণ হলো, মানুষ তখন নিজের দোষত্রুটিগুলো দেখতে শুরু করে। আর আল্লাহ তা'আলা কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হলে তার প্রথম লক্ষণ হলো, তার দোষগুলো তখন আর তার নজরে পড়ে না। তাই মানুষের উচিৎ নিজের প্রতি দৃষ্টি দান করা এবং স্বীয় দোষ-ত্রুটির প্রতি লক্ষ রাখা।

جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے
غیروں کی کہانی یاد رہی اپنا فسانہ بھول گئے
منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں
جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلماں بھول گئے
تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور
جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے

'যে যুগ নিয়ে গৌরব ছিল পৃথিবীর, সেই যুগকে আমরা ভুলে গেছি। অন্যের কাহিনী স্মরণ আছে; কিন্তু আপন উপাখ্যান ভুলে গেছি।

আয়নায় মুখ দেখে নিয়েছি; দাগে ভরা বক্ষটি দেখিনি।

মৃত্যুকে যেন ভুলে গেছে মুসলমান বাঁচার মোহে।

তাকবীর তো এখনও হয় মসজিদের প্রশস্ততায় হে আনওয়ার! কিন্তু সেই আঘাত হানা ভুলে গেছে, যে আঘাতে কেঁপে যায় অন্তর।'

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর জর্ব (ধাক্কা) প্রদানকারী যুবক

কোথায় গেল আজ সেই নওজোয়ানরা, যারা রাতের শেষ প্রহরে জাগ্রত হতো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর জর্ব (ধাক্কা) লাগাত, বক্ষস্থিত অন্তর কেঁপে উঠত?

تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے
کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ

'তব দৃষ্টির প্রভাবে বক্ষস্থিত অন্তর প্রকম্পিত হতো।

পূর্বেকার তোমার সেই উন্মাদনাপূর্ণ উদ্দীপনা আজ হারিয়ে গেছে।

মানুষ যদি নিজেকে গড়ে তোলে, আল্লাহর শপথ তার অবস্থান এতই ঊর্ধ্বে চলে যায় যে, সে সুরাইয়া সেতারাকেও (সপ্তর্ষিমণ্ডল তারকা) পিছনে ফেলে দেয়।

দুর্লভ গ্রন্থ

এই কুরআন এজন্যই পাঠানো হয়েছে, যেন মানুষ তাকে আপন জীবনে বাস্তবায়ন করে। তারপর পৃথিবীতে তার প্রচলন ঘটায়।

اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا

وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلادی

'হেরা থেকে নেমে এলেন স্বজাতির পানে
এবং একটি দুর্লভ গ্রন্থ এলেন সাথে নিয়ে।
সেটি বজ্রধ্বনি ছিল, নাকি পথপ্রদর্শকের ধ্বনি?
আরব ভূমিকে আন্দোলিত করেছে যার ধ্বনি।'

আরব বিশ্বকে আন্দোলিত করেছে কেন? এজন্য যে, কুরআন তাদের জীবনে বাস্তবায়িত হয়েছিল। এই কুরআন বাস্তবতার এক বিশাল ভান্ডার, সততার সমষ্টি, যাকে আমরা আজ তাকের ওপর রেখে দিয়েছি, যা সাহাবায়ে কেরামের জীবনে বাস্তবায়িত ছিল।

আরোগ্যপত্র

একব্যক্তি হার্টের রোগী। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ডাক্তারের নিকট থেকে একটি চিকিৎসাপত্র গ্রহণ করে সেটি পকেটে রেখে দিল। কিছু দিন পর ডাক্তার সাহেবের কাছে গিয়ে বলল, আমার তো কোনোই উপকার হলো না। ডাক্তার সাহেব বললেন, আপনি কি আমার ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী কাজ করেছেন? লোকটি বলল, আমি তো তা পকেটে রেখে দিয়েছি। তাহলে ডাক্তার কী বলবেন? তিনি বলবেন, বোকা কোথাকার! ব্যবস্থাপত্র পকেটে রেখে দিলে আরোগ্য হয় না, বরং ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ওষুধ সেবন করলে আরোগ্য লাভ হয়।

কুরআনে কারীম হলো রোগমুক্তির একটি অমোঘ ব্যবস্থাপত্র। জাহেরি ও বাতেনি সব ধরনের ব্যাধি থেকে মুক্তি দান করে। কিন্তু আমরা তাকে তাকের ওপর রেখে দিয়ে বলছি, আরোগ্য তো লাভ হলো না, আমার পেরেশানি তো দূর হলো না। পীর সাহেব কী করেন যে, আমার এক পেরেশানি দূর না হতেই অন্য পেরেশানি এসে যায়? পীর সাহেব কী করেন যে, ঘরের লোকজন একেকজন যেন মহা পণ্ডিত হয়ে গেছে। প্রত্যেকেরই গতিবিধি ভিন্ন-ভিন্ন। এসব কেন হয়? যখন মানুষের জীবন থেকে আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের বিধিবিধান বেরিয়ে যায়, তখন মানুষের জীবন হতে বরকত তুলে নেওয়া হয়।

জীবনের লক্ষ্য আল্লাহর স্মরণ

মানুষ আল্লাহ তা'আলার স্মরণকে যেন জীবনের লক্ষ-উদ্দেশ্যে পরিণত করে। প্রতিটি মুহূর্ত যেন আল্লাহর স্মরণে কাটায়। একটি মুহূর্তও যেন অলস না থাকে। যার নুন খাও, গুণও তারই গাও।

গমের দানার শ্রম

একটা গমের দানা তৈরি হতে কী পরিমাণ শ্রম ব্যয় হয়? প্রথমে জমি তাকে আপন গর্ভে ধারণ করে। তাতে খাবার পৌঁছায়। মেঘ তাতে পানি বর্ষণ করে। সূর্য কিরণ দান করে। বাতাস তাকে সহযোগিতা করে। অনেক জিনিসের কর্ম ও শ্রম ব্যয়ের পর একটা গমের দানা তৈরি হয়। সেই দানাটা যখন মানুষের মুখে এসে পৌঁছে, মানুষ তা খেয়ে একটু কৃতজ্ঞতাও আদায় করে না।

দুম্বা আপন মালিককে চিনে

আপনি দেখুন, একটা পশুও তার মালিককে চিনে। আপনি দেখে থাকবেন, দুম্বা ও ভেড়া-বকরির বাচ্চার গলার রশি মালিক খুলে দেয়। তারপর মালিক যে দিকে যায়, তারাও আপন মালিকের পিছু-পিছু যায়। হে মানুষ! একটা পশু যদি তার মালিককে চিনতে পারে, তাহলে তুমি মানুষ হয়ে কি তোমার মালিককে চিনতে পারবে না?

মানুষ ও ঘোড়ার ব্যবধান

ঘোড়া একটা পশু। আপনি দেখে থাকবেন, কেউ যদি যুদ্ধে কাজে লাগবে ভেবে ঘোড়া পালন করে, তো ঘোড়া তার মালিকের প্রতি লাজ-শরম রাখে। মালিক তার পায়ে রশি পরিয়ে দিলে ক্লান্ত ও অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও সে দিনভর

কাজ করতে থাকে। মালিক দ্বিতীয় দিন যদি আবার তার পায়ে রশি পরিয়ে দেয়, সে আবেদন করতে পারে না, আমি অসুস্থ; আমার ছুটির প্রয়োজন। সে কোনো অস্বীকৃতি জানায় না। আল্লাহ তাকে মানুষের এতই অধীন করে দিয়েছেন যে, সে তার প্রয়োজনও উত্থাপন করতে পারে না। পিপাসার্ত হয়; কিন্তু বলতে পারে না, আমি পিপাসার্ত; আমাকে পানি পান করান। প্রচণ্ড গরমে মালিক কোথাও গিয়ে একটু থামল। পাশেই নর্দমা। সেখানেই পানি পান করতে লাগল। চলার পথে তার মলত্যাগের প্রয়োজন হলো। চলতে-চলতেই মল ত্যাগ করল। একটু দাঁড়ানোর সুযোগ তার ভাগ্যে জোটে না। জীবনের মৌলিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও তার একটু অবকাশ মিলে না।

সারা দিন পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যায় ঘরে এল। মালিক তালাশ করে দেখল, আজ খানাপিনা তো অর্ধেক রয়েছে। তাই ভাবল, আজ অর্ধেকই দেওয়া যাক। সে বলতে পারে না, হে মালিক! সারা দিন তো আমাকে কাজে খাটালেন; খাবার তো পূর্ণ দেয়া উচিৎ। শীতের দীর্ঘ রাতে মালিক তো আরামের গদিতে শুয়ে পড়ে। ঘোড়ার জন্য রইল ঠাণ্ডা বাতাস। নেই কোনো বিছানাপত্র। নেই কোনো স্ত্রী-পরিজন। দাঁড়াতে-দাঁড়াতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে বসে যায়। তারও তো একটা জীবন আছে। সে যদি ক্ষত-বিক্ষত হয়, তবুও মালিক তার পায়ে রশি লাগিয়ে দেয়। সে তো বলতে পারে না, আমার ক্ষতের ওপর তো কোনো ব্যান্ডেজ লাগালেন না। এই ক্ষতের ওপর আবার জিন পরালে তো আমার পুরনো ক্ষত আবার তাজা হবে। সেদিকে তো একটু লক্ষও করলেন না। কিছুই বলতে পারে না। কষ্টের তাড়নায় পালিয়েও যেতে পারে না। মালিক তাকে বেত্রাঘাত করছে। সে মালিকের কঠোরতা বরদাশত করছে আর মালিককে সন্তুষ্ট করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যে মালিক ঘোড়াটা পালন করেছে, সেই মালিক যদি তাকে শত্রুর নাগালের মধ্যে নিয়ে যায় যে, সামনেই শত্রুর সারি। মালিক কেবল পায়ের গোঁড়ালি দিয়ে মৃদু আঘাত করে। ঘোড়া মালিকের এই ইঙ্গিত বুঝে নেয় যে, মালিক কেন গোঁড়ালি দ্বারা আঘাত করল। মালিক আমাকে সামনে অগ্রসর হতে বলছে। ঘোড়া সম্মুখপানে এগিয়ে চলে। শত্রুর সারি ভেদ করে চলে যায়। সামনে কত তির, বল্লম, তরবারি থাকে। কোনো কিছুর সে তোয়াক্কা করে না। ঘোড়ার শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে; তবুও সে মালিকের গোঁড়ালির আঘাতের মর্যাদা রক্ষা করে। জীবন বাজি রেখে মালিকের আনুগত্য করে।

যদি একটা প্রাণী মানুষের এত অনুগত হতে পারে, তাহলে আল্লাহর জন্য মানুষের কতখানি অনুগত হওয়া উচিৎ? আমরা তো পেট ভর্তি করে খেয়েও

তাঁর শুকরিয়া আদায় করি না। মানুষের দেহে ৩৬০ টা জোড়া আছে। প্রতিদিন তার জোড়াগুলো সুস্থ থাকায় কতজন বান্দা সন্ধ্যাবেলায় শুকরিয়া আদায় করে যে, হে আল্লাহ! আমার সবগুলো জোড়া সুস্থ ও নিরাপদ রয়েছে; এ তো তোমারই করুণা ও দয়া।

একটি আশ্চর্য ঘটনা

আমার এক বন্ধু একটি আশ্চর্য ঘটনা শোনালেন, এক ব্যক্তি অ্যাক্সিডেন্ট করল। তার চোখের উপরের পর্দা কেটে গেল। এক দু- ঘণ্টা পরই চোখের ওপর মাটি জমে গেল। বাতাসে কী পরিমাণ বালি-কণা উড়ে বেড়ায়, তা তো সাধারণ মানুষ অনুভবও করতে পারে না। এগুলো জমতে থাকল। আপনি লক্ষ করলে দেখবেন, কোথাও কোনো জিনিস রাখলে পরদিন তাতে ধুলার আবরণ পড়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের চোখের ওপর পর্দা বানিয়ে দিয়েছেন, যা খুলতে আর বন্ধ হতে থাকে। সেই সাথে হালকা পানি বেরিয়ে এসে যেন ময়লাগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা ঝাড়েরও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। পর্দাটা খোলে আর বন্ধ হয়। ঝাড়ের কাজও চলতে থাকে। চোখের উপরের পর্দা যখন কেটে গেল, তখন সর্বদা তার চোখ খোলা রইল। ফলে বাতাসে উড়ন্ত ধূলি-কণা এসে তার চোখে জমতে লাগল। আর কিছুক্ষণ পর-পর ধোওয়ার প্রয়োজন হয়। আবার মাটি জমে আবার ধোওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। দিনে কখনো ৫০ বারও ধুতে হয়। একদিনে ৫০ বার পানি ঢালা যায় না। লোকজন তাকে দেখতে এসে বলতে লাগল, চোখের এ ছোট পর্দাটা যে এত বড় নেয়ামত, তা তো কখনো ভাবিনি।

দেখুন, মানুষের দেহের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ আল্লাহ তা'আলার কত বড় নেয়ামত। আমাদের মাঝে কজন এমন আছে, যারা রাতে শয়নকালে এই নেয়ামতগুলোর শুকরিয়া আদায় করে? আমরা তো সবাই আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করি। তবে তার দেওয়া নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার মতো মানুষ খুব কমই আছে। এর মূল কারণ হলো, মানুষের অন্তরে অলসতা রয়েছে। অন্তরে অলসতা থাকলে তখন মানুষের চাল-চলন একরকম হয় আর অন্তর সজাগ থাকলে, অন্তরে আল্লাহর মারেফাত থাকলে তখন চাল-চলন ভিন্ন রকম হয়।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

আমার এক বন্ধু ঘটনা শোনালেন, একব্যক্তি ইন্ডিয়া থেকে হিজরত করে পাকিস্তান এসেছে। তার বেশ কজন আত্মীয়ও ছিল। সকলে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেছে। তার সাথে তার মামাও এসেছিল। তিনি দিশাহারা অবস্থায় কোথায় যেন হারিয়ে গেছেন। কেউ কারও দেখা পেল না। লোকটি বেশ কষ্ট-সাধনা করল। আল্লাহ তা'আলা তাকে বহু টাকা-পয়সার মালিক বানিয়ে দিলেন। কয়েক বছর পর ভাবল, এবার বাড়ি বানাতে হবে। তাই সে নির্মাণকাজ শুরু করে দিল। ইতোমধ্যে একদিন এক অসহায় বৃদ্ধ এসে বলল, বাবা! আমার কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। তোমার এখানে কৃষিকাজ করব। বিনিময়ে তুমি আমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করবে। এতে গরিবের সহযোগিতাও হবে। সে বলল বুড়া মিয়া! আপনি এখানেই থাকুন; আমি আপনাকে এত টাকা দেব।

বৃদ্ধ লোকটি কাজে যোগদান করলেন। এবার তিনি কখনো সুস্থ, কখনো অসুস্থ আবার কখনো ক্লান্তি। কখনো এটা, কখনো সেটা। যখন কাজে একটু বিলম্ব হয়ে যায়, তখনই শুরু হয়ে যায় কথার বর্ষণ। মালিক বকাঝকা করে এবং বলে, তুমি এমন, তুমি তেমন ইত্যাদি। বৃদ্ধ বেচারা তখন কেবলই কাঁদতে থাকেন।

একদিন যুবক তাকে এত গালিগালাজ করল যে, বৃদ্ধ বলতে লাগলেন, বেটা! রিযিকদাতা তো হলেন আল্লাহ। তোমার মন যখন সন্তুষ্ট হয় না, আমি অন্য কোথাও চলে যাচ্ছি। ভাগ্যই আমাকে এমন বানিয়েছে। অন্যথায় আমি তো এখানে আমার আত্মীয়-স্বজনের সাথেই এসেছিলাম। জানা নেই, এখন তারা কে কোথায় চলে গেছে।

কথাটা শুনে যুবক বলল, বাবা! আপনার সাথে কোন আত্মীয়রা ছিল? বৃদ্ধ ঘটনা খুলে বলল। ঘটনার বিবরণ শুনে এবার যুবক বুঝতে পারল, ইনিই তো আমার সেই হারানো মামা, যার স্মরণে আমার মা সারাক্ষণ শুধু ছটফট করতেন। এবার বৃদ্ধের পা জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল, মামা! আমাকে ক্ষমা করে দিন, মামা আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমার ভুল হয়ে গেছে, অন্যায় হয়ে গেছে। এই দালান-কোঠা আপনারই; আপনার যেখানে মন চায় থাকুন।

দেখুন, যুবকের সামান্য একটি বিষয় অজানা থাকায় তার আচরণ ছিল এক ধরনের। অবগতির পর তার আচরণ পাল্টে গেছে। এখন সে তার পা জড়িয়ে ধরল, যাকে কিনা ইতোপূর্বে গালিগালাজ, বকাঝকা করেছিল। ঠিক মানুষের অবস্থাও অনুরূপ যে, যতদিন সে আল্লাহ তা'আলার মারেফাত লাভ

না করে, ততদিন সে পশুসুলভ জীবন যাপন করে। আর যখন কোনো আল্লাহওয়ালার হাতে হাত লেগে যায়, তখন অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়। তখন তার অনুভূতি ফিরে আসে, চোখ খুলে যায়। তখন বলে, এতদিন আমি কেমন জীবন যাপন করছিলাম?

চুল-দাড়ি সাদা, বয়স বারো বছর!

চুল-দাড়ি সাদা এক বুযুর্গকে কেউ জিজ্ঞাসা করল, বাবা! আপনার বয়স কত হবে? বললেন, এই দশ কি বারো। লোকটি হতবাক হয়ে বলতে লাগল, আপনার চুল-দাড়ি সব সাদা আর আপনি বলছেন, আপনার বয়স কেবল বারো বছর! বললেন, হ্যাঁ বেটা আমি যখন থেকে খাঁটি তাওবা করেছি, তখন থেকে আমার বয়স বারো অতিবাহিত হয়েছে। তাই বারো বছরই হলো আমার জীবন। আর এর পূর্বেরগুলো লজ্জা আর অনুতাপ।

শাইখের সোহবতের উপকারিতা

নেককারদের সোহবত মানুষকে জাগ্রত করে। মানুষকে জীবন দান করে। চারায় যদি মালীর হাত লাগে, তাহলে চারাটা বেশ তরতাজা হয়ে ওঠে। তেমনি কোনো সালেকের ওপর যখন কোনো শাইখে কামেলের হাত পড়ে, তখন তার মধ্যে উজ্জ্বলতা সৃষ্টি হয়।

কারুনের মাটিতে ধসে যাওয়ার ঘটনা ও তাওবা

মানুষের তাওবা আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের নিকট অতি প্রিয়। কারুন মূসা (আ.)-এর ওপর কোনো এক মহিলার মাধ্যমে অপবাদ চাপাল। বাস্তবতা যখন প্রকাশ পেয়ে গেল, তখন মূসা (আ.) বড়ই দুঃখিত হলেন। আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! সে আমার ওপর এমন একটা অপবাদ চাপিয়ে দিল! আল্লাহ বললেন, হে আমার নবী! আপনি যা আদেশ করবেন, মাটি তা-ই মেনে নিবে। মূসা (আ.) বললেন, হে কারুন! তুই মাটিতে ধসে যা। কারুন মাটিতে একটুখানি ধসে গেল। পুনরায় মাটিকে নির্দেশ দিলেন। কারুন আরো ধসে গেল। এবার কারুন কেঁদে বলতে লাগল, হে মূসা আমাকে ক্ষমা করে দাও। কিন্তু মূসা (আ.) ছিলেন খুব রাগী মানুষ। তিনি পুনরায় নির্দেশ দিলেন, হে মাটি! তুমি তাকে গিলে ফেল। মাটি তাকে গিলে ফেলল।

এবার আল্লাহ মূসা (আ.)-এর কাছে ওহী পাঠালেন, হে আমার প্রিয়নবী! আপনি অতি ক্রোধান্বিত ছিলেন। তাই আপনি তিনবার মাটিকে নির্দেশ

দিয়েছেন আর মাটি তাকে গিলে ফেলেছে। আমি আমার ইজ্জত ও সম্মানের কসম করে বলছি, যদি কারুন সে-সময় আমার কাছে একবারও ক্ষমা চাইত, তা হলে অবশ্যই আমি তাকে ক্ষমা করে দিতাম।

বোঝা গেল, আল্লাহর নিকট বান্দার তাওবা অতি প্রিয়।

খাঁটি তাওবা

জনৈক বুযুর্গ কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে কয়েকটা বাচ্চা আপসে তর্ক-বিতর্ক করছিল। তিনি যখন নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তারা বলল, বাবাজি! আমরা পরস্পরে একটি মাসআলা নিয়ে বিতর্ক করছি; আপনি একটু ফয়সালা করে দিন। তিনি বললেন, মাসআলাটি কী? বাচ্চারা বলল, আমরা পরস্পর আলোচনা করছিলাম, একব্যক্তি খুবই নেককার। জীবনে কখনো গুনাহ করেনি। অপরজন বড়ই গুনাহগার। তবে সে খাঁটি তাওবা করেছে। এ দুজনের মধ্য থেকে কার অন্তরের প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দৃষ্টি থাকে? বুযুর্গ বললেন, আমি আলেম নই। তথাপিও আমার অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি। আমি কাপড় বুনি। যখন কোনো সুতা ছিঁড়ে যায়, তখন আমি তাতে গিরা দেই এবং তার পর থেকে বিশেষ নজর রাখি, যেন পুনরায় ছিঁড়ে না যায়। তাই এমন সম্ভাবনা রয়েছে যে, কোনো বান্দা শয়তানের রাস্তা ছেড়ে খাঁটি তাওবা করে আল্লাহর সঙ্গে তার সুতাকে গ্রন্থিযুক্ত করে নেয়, তার অন্তরের প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নজর থাকবে, যেন দ্বিতীয়বার তার তাওবা ভঙ্গ না হয়।

আল্লাহওয়ালাদের সোহবত অলস জীবনের চিকিৎসা

আমরা অতি দুর্বলতা ও চরম অলসতায় নিমজ্জিত রয়েছি। বিভিন্ন কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে, কেউ যদি কারো কোনো জমি দখল করে নেয়, তাহলে কেয়ামত দিবসে ওই জমি তার নিচের সাত তবকসহ তার মাথায় তুলে দেওয়া হবে। এবার বলুন, যে লোকটা এক বালতি মাটি বহন করতে পারে না, অথচ সে অন্যের কত বিঘা জমি দখল করে রেখেছে।

শয়তানের ধোঁকা

কিছুলোক বলে, অন্তর পরিষ্কার হওয়াই তো আসল বিষয়। দেহ তো আর মুখ্য বিষয় নয়। হে বন্ধু! এটা শয়তানের ধোঁকা। অন্তর পরিষ্কার হওয়া

জরুরি বিষয় বটে; কিন্তু তার বাহ্যিক প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ পাওয়া চাই। উভয়টিই জরুরি। অনেক সময় এমনও হয় যে, মানুষ তার বাহিরটাকে শুধরে নেয়। তার উসিলায় আল্লাহ তার ভিতর তথা অন্তরকেও সংশোধন করে দেন। আবু মাহযূরা (রাযি.) নামক এক বালক সাহাবী—যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি—অন্যান্য ছেলেদের সাথে বসে হাসি-ঠাট্টা করছিলেন আর হযরত বিলাল (রাযি.)-এর আযান নকল করছিলেন। নবীজি পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তার আওয়াজ শুনতে পেলেন ও তাকে ডাকলেন। ডেকে বললেন, কথা শোনো আবু মাহযূরা! আবু মাহযূরা সভয়ে কাছে এলেন। দেহটা তাঁর ঘর্মাক্ত হয়ে গেল। নবীজি বললেন, কোনো ভয় নেই। যেভাবে আযান দিচ্ছিলে, অনুরূপ আযান দাও। তিনি অনুরূপ আযান নকল করতে শুরু করলেন। এক পর্যায়ে তিনি اشهد ان محمدا رسول الله বললেন। আযান শেষে নবীজি বললেন, এবার যাও। বললেন, আচ্ছা, এখন তুমি কোথায় যাবে? বললেন, আপনি যেখানে যাবেন, আবু মাহযূরাও সেখানে যাবে।[১]

আযান নকল করছিলেন। নবীজি আযান শুনলেন। আল্লাহ তা'আলা নকলকে আসলে পরিণত করে দিলেন। সেই আবু মাহযূরা (রাযি.)কেই নবীজি হারাম শরীফের চাবি দিয়ে মুয়ায্যিন নিযুক্ত করলেন। ৬০ বছর যাবৎ তিনি হারাম শরীফে আযান দিয়েছেন।

আল্লাহ আমাদের নকলকে আসলে পরিণত করুন এবং আমাদের সুরতকে হাকীকত বানিয়ে দিন। কেউ বলেছেন :

تیرے محبوب کی یا رب شباہت لیکر آیا ہوں
حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لیکے آیا ہوں

'হে প্রভু! তোমার প্রিয়তমের সাদৃশ্য নিয়ে এসেছি।
তুমি তাকে হাকীকত বানিয়ে দাও। আমি সুরত নিয়ে এসেছি।'

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

---

১. মুসনাদে আহমাদ : হাদীছ নং ১৫৩৭৬

ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব ও কর্তব্য

'আজ ওলামায়ে কেরামের ওপর অনেক দায়িত্ব রয়েছে। জাতি আজ বড়ই পেরেশান। দেশ-বিদেশের অনেক বিষয় সামনে থাকা একান্ত জরুরি। কেন? ওলামায়ে কেরাম দীনের চিন্তা করবে না তো কারা করবে? এ চিন্তা তো তাঁরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে। দেশের অভ্যন্তরেও দীনবিরোধী অনেক ফেতনা মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি এ যাবৎ পৃথিবীর বেশ কয়েকটা দেশ ভ্রমণ করেছি। এবছর আমেরিকার ২২টা প্রদেশ ভ্রমণ করে এসেছি। আলহামদুলিল্লাহ! সেখানকার মুসলমানদের হাল দেখেছি। কিছু বিষয় এমন আছে, যা আপনাদেরও জানা প্রয়োজন।'

ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব ও কর্তব্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓءُ ـ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

আমার সৌভাগ্য

এটি ফকিরের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় যে, ওলামায়ে কেরাম ও নেককারদের প্রতিনিধিত্বকারী এই সম্মেলনে আমাকে ছাত্রসুলভ কিছু আরজ করার সুযোগ দান করা হয়েছে।

اُحِبُّ الصَّالِحِيْنَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ   لَعَلَّ اللّٰهَ يَرْزُقُنِىْ صَلَاحًا

আমি নেককারদের ভালোবাসি; তবে আমি তাদের কেউ নই
মোরে নেককার বানাবেন প্রভু আমার; বুক বাঁধি সেই আশাতেই।

ইল্‌মের ফজীলত

আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে ইল্‌মের ফজীলত এতই বেশি যে, হাদীছে পাকে ওলামায়ে কেরামকে নবীগণের ওয়ারিস বলা হয়েছে। এটি নবীদের উত্তরাধিকার। সৌভাগ্যশীল ব্যক্তিরাই কেবল এই উত্তরাধিকার লাভ করে। হাদীছে পাকে বর্ণিত হয়েছে :

اَلْعِلْمُ نُوْرٌ

'ইল্‌ম হলো নূর।'

এই নূর অর্জনের পরই আল্লাহ্ তা'আলার মারেফাত হাসিল হয়।

که بے علم نتواں خدا را شناخت

মূর্খ ও অজ্ঞ ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় লাভ করতে পারে না। কথিত আছে, রাস্তা জানা থাকলে ল্যাংড়া গাধাকেও মনযিলে পৌঁছানো যায়। হযরত হাসান বসরি (রহ.) বলতেন, যদি ওলামায়ে কেরাম না থাকতেন, তাহলে সাধারণ মানুষ জীব-জন্তুর মতো জীবন যাপন করত। উম্মতের প্রতি তাদের এটি বিরাট অনুগ্রহ যে, তারা ইল্‌মকে আপন বক্ষে সংরক্ষণ করে ধারাবাহিকভাবে তা সামনের দিকে পাঠিয়েছেন। তারা দায়িত্বমুক্ত হয়েছেন এবং ইল্‌ম আমাদের পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। ইল্‌মের গুরুত্ব এতই অধিক যে, বিজ্ঞজনেরা বলেছেন :

اُطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ اِلَى اللَّحْدِ

'তোমরা দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইল্‌ম তলব করো।'

মানুষ মৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে শিক্ষার্থী মনে করবে। হযরত সুফিয়ান সাওরি (রহ.) বলতেন, নিয়ত ভালো হলে শিক্ষার্থীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। একটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে :

عَلَيْكُمْ بِمُجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ وَاسْتِمَاعِ قَوْلِ الْحُكَمَاءِ

'তোমাদের কর্তব্য উলামায়ে কেরামের মজলিসে বসা এবং জ্ঞানীদের কথা শ্রবণ করা।'

فَاِنَّ اللهَ تَعَالٰى يُحْيِ الْقَلْبَ الْمَيِّتَ بِنُوْرِ الْحِكْمَةِ كَمَا يُحْيِ الْاَرْضَ الْمَيْتَةَ بِمَاءِ الْمَطَرِ

'কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা হেকমতের নূর দ্বারা অন্তরকে এমন জীবিত করেন, যেমন বৃষ্টির পানি দ্বারা মৃত জমিকে জীবিত করেন।'[১]

আমলের গুরুত্ব

যেখানে ইল্‌মের গুরুত্ব রয়েছে, সেখানে আমলেরও গুরুত্ব বিদ্যমান। জনৈক বুযুর্গ বলেন, ইল্‌ম আমলের দরজায় নক করতে থাকে। খুলে গেলে প্রবেশ করে; অন্যথায় চিরতরে বিদায় গ্রহণ করে। সুতরাং যার কাছে আমল নেই; শুধু ইল্‌ম আছে, তার জন্য সেই ইল্‌ম আপদ।

---

১. মাজমাউয যাওয়ায়িদ ১/১২৫

اَلْعِلْمُ بِلَا عَمَلٍ وَبَالٌ وَالْعَمَلُ بِلَا عِلْمٍ ضَلَالٌ

'আমলবিহীন ইল্‌ম আপদ আর ইল্‌মবিহীন আমল ভ্রষ্টতা।'

اَلْعِلْمُ بِلَا عَمَلٍ كَشَجَرٍ بِلَا ثَمَرٍ

'আমলবিহীন ইল্‌ম ফলবিহীন গাছের মতো।'

বাতি না জ্বললে যেমন আলো হয় না, তেমনি আমলবিহীন ইল্‌মও নূর ছড়ায় না। আমলবিহীন ইল্‌ম পরশপাথর। সে অন্যকে সোনা বানায় বটে; তবে নিজে পাথরই রয়ে যায়। ইল্‌ম হলো খোদাভীতির অপর নাম।

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

'আল্লাহর বান্দাগণের মধ্যে কেবল আলেমরা-ই আল্লাহকে ভয় করে।'[১]

একবার হযরত মুফতী শফী (রহ.) তাশরীফ আনলেন। ছাত্ররা হাজির হলো। তিনি জিজ্ঞাস করলেন, তোমরা ইল্‌ম বলতে কী বোঝ? কেউ বলল, পরিচয় লাভ করা। কেউ বলল, জানা। তিনি বললেন, না; আমাকে বুঝিয়ে দাও, ইল্‌ম কী জিনিস। ছাত্ররা আপন-আপন মতামত ব্যক্ত করতে লাগল। হযরত চুপ থাকলেন। শেষমেষ এক ছাত্র বলে উঠল, হযরত আপনিই বলে দিন, ইল্‌ম বলতে কী বোঝায়? এবার তিনি চমৎকার একটি কথা বললেন যে, ইল্‌ম এমন একটি নূর, যা হাসিল হলে আমল ব্যতীত শান্তি পাওয়া যায় না। আমল বিনে শান্তি মিলে গেলে বুঝতে হবে, এটি ইল্‌ম নয় – আপদ। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা আমলবিহীন সুফী-সাধকদেরকে কুকুরের সাথে তুলনা করেছেন। বালআম বাউরা বড় সুফী সাধক ছিল।

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ

'তার দৃষ্টান্ত কুকুরের মতো।'[২]

বনী ইসরাইলের আমলবিহীন আলেমদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا

---

১. সূরা ফাতির : আয়াত ২৮

২. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৭৬

'যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল, তারপর তারা তা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গাধার মতো।'[১]

ইল্‌মের পরই আমলের স্তর। ইল্‌ম আমল করার নিয়তে শিক্ষা করা উচিৎ। সাধারণ অভিজ্ঞতা হলো, যে ছাত্র ভাবে, আগে ইল্‌ম অর্জন করে পরে সব আমল একসাথে করে নিব, সেই ছাত্র আমল থেকে বঞ্চিত থাকে। পূর্বসূরীদের অভ্যাস ছিল, তাঁরা যে বিষয়টি জানতেন, সাথে-সাথেই তার ওপর আমল করতেন। ইল্‌মের পাশাপাশি আমলও এসে যেত। এজন্য ইল্‌মে নাফে'র জন্য দোআ করা হয়েছে, হে আল্লাহ আমাকে ইল্‌মে নাফে' দান করুন। অর্থাৎ– এমন ইল্‌ম দান করুন, যা উপকারে আসে।

'ইল্‌ম ও 'সাধারণ বিদ্যা'র মাঝে পার্থক্য

দেখুন, 'ইল্‌ম' ও 'সাধারণ বিদ্যা' উভয়টির মাঝে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। বিধর্মীরাও আরবি ভাষা শিক্ষা করে। বিদেশে আমি অনেক অমুসলিমকে দেখেছি, তারা এত চমৎকার আরবি বলতে পারে যে, তাদের সাথে আরবিতে কথা বলতে গেলে মানুষ অবাক হয়ে যায়। ইহুদি-খ্রিষ্টানরাও কুরআন শরীফের তাফসীর জানে এবং তরজমা পড়ে। যে লোকটি সর্বপ্রথম কুরআন শরীফের ইংরেজি অনুবাদ করেছে, সেই পিকথাল তখন অমুসলিম ছিল। আল্লাহর রহমতে সে পরে মুসলমান হয়েছে। কিন্তু কুরআনের অনুবাদকালে সে অমুসলিম ছিল। বহির্বিশ্বের ইউনিভার্সিটিগুলোতে ইহুদিরা কুরআন শরীফের পিছনে কী পরিমাণ সময় ব্যয় করে, তা কল্পনারও বাইরে। তারা কত-না সাধনা করে। তবে এগুলো হলো জ্ঞান – 'ইলম' নয়। কেননা,

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا ۙ وَّ يَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ؕ وَ مَا يُضِلُّ بِهٖۤ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ۟

'এই কুরআনের মাধ্যমেই বহু মানুষকে তিনি পথহারা করেন এবং বহু মানুষকে পথের দিশা দান করেন।'[২]

জ্ঞান ও ইল্‌ম সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَ اَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّ خَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَ قَلْبِهٖ وَ جَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۟

---

১. সূরা জুমুআ : আয়াত ৫

২. সূরা বাকারা : আয়াত ২৬

'আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে তার প্রবৃত্তিকে মাবুদ বানিয়েছে? ইল্ম থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাকে পথহারা করে দিয়েছেন এবং তার অন্তরে মহর মেরে দিয়েছেন। এবং তার চোখে পর্দা ঢেলে দিয়েছেন। আল্লাহ ব্যতীত তাকে আর কে হেদায়াত দান করবে? তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না?'[১]

ইল্ম ও আমলের বিরোধ

আগে ইল্ম পরে আমল। আমলবিহীন আলেমকে শকুনের সাথে তুলনা দেওয়া হয়েছে। শকুন শূন্যে উড়ে বেড়ায়; অথচ খায় মড়া। অনুরূপ জ্ঞানের পরিধিও সুরাইয়া তারকা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে; তবু হারামে লিপ্ত হয়। সন্তানাদি হারাম দ্বারা উদর পূর্ণ করে। যেসব ওলামায়ে কেরাম চাটাইয়ের ওপরও রাত কাটাননি, আজ তাদের সন্তানেরা কোমল বিছানায় রাত যাপন করে। যেসব ওলামায়ে কেরামের বাতির তেলের খরচ ছিল পানাহারের খরচের চেয়ে অধিক, আজ তাদের সন্তানেরা দুনিয়াদারির চক্রে আটকা পড়ে রয়েছে।

ইল্ম, আমল ও ইখলাস

আল্লাহ রব্বুল আলামীন যাকে ইল্ম ও আমল উভয়টি দান করেছেন, এখন কেবল তার তৃতীয় একটি জিনিসের প্রয়োজন, যাকে ইখলাস বলে।

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ

'জেনে রাখো, আল্লাহর জন্যই খাঁটি দীন।'[২]

ইখলাসপূর্ণ আমলই আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবুল হয়। ইখলাসবিহীন আমল আল্লাহর দরবারে কখনও কবুল হয় না।

مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

'এমন আমল, যা আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের সন্তুষ্টির জন্য নিষ্ঠার সাথে করে।'[৩]

اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ هَالِكُوْنَ اِلَّا الْعَالِمُوْنَ وَالْعَالِمُوْنَ كُلُّهُمْ هَالِكُوْنَ اِلَّا الْعَامِلُوْنَ وَالْعَامِلُوْنَ كُلُّهُمْ هَالِكُوْنَ اِلَّا الْمُخْلِصُوْنَ وَالْمُخْلِصُوْنَ عَلٰى خَطَرٍ عَظِيْمٍ

---

১. সূরা জাছিয়া : আয়াত ২৩

২. সূরা যুমার : আয়াত ৩

৩. সূরা বায়্যেনা : আয়াত ৫

'আলেমরা ব্যতীত সব মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত। আমলকারীরা ব্যতীত সব আলেমই ক্ষতিগ্রস্ত। মুখলিসরা ব্যতীত সকল আমলকারীরাই ক্ষতিগ্রস্ত।'

আর মুখলিসরাও বড় ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে যে, পাছে মৃত্যুর পূর্বে শয়তান কখনো ডাকাতি করে না বসে।

তাহলে এখানে তিনটি স্তর রয়েছে। ইল্‌ম, আমল ও ইখলাস। আমল সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হতে হবে।

ফকীহ আবুল্লাইস সমরকন্দী (রহ.) একটি চমৎকার ঘটনা লিখেছেন। বলেছেন, আমি রাখালের কাছ থেকে ইখলাস শিখেছি। কেউ প্রশ্ন করল, হযরত! রাখালের কাছ থেকে কীভাবে ইখলাস শিখলেন?

তিনি বললেন, রাখাল যখন বকরির পালের মাঝে বসে নামায আদায় করে, তখন তার অন্তরে রত্তি পরিমাণও ধারণা আসে না যে, এই বকরির পাল আমার প্রশংসা করবে। আমি এখান থেকে ইখলাস শিখেছি যে, মানুষ অন্যান্য মানুষের মাঝে বসে যখন ইবাদত করবে, তখন তার অন্তরে যেন তিলপরিমাণও ধারণা না আসে যে, এরা আমার প্রশংসা করবে। বকরির রাখাল যেমন বকরির পাল থেকে সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়েই নামায পড়ে, ঠিক তেমনি আল্লাহওয়ালারা লোকজনের মাঝে থেকেও সম্পূর্ণ অপরিচিতের মতো হয়ে যান। তাঁরা মাখলুকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ তা'আলার সাথে মিলিত হন। একথাটিই এভাবে বলা হয়েছে :

أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

'তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। যদি এমন অবস্থা সৃষ্টি না হয়, তাহলে ভাববে, তিনি তোমাকে দেখছেন।'[১]

এই অবস্থাটিকে ইহসান বলে, যার আলোচনা হাদীছে জিবরীলে বর্ণিত হয়েছে। এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

মুক্তার চেয়েও দামি আলেম

যখন কোনো ব্যক্তি ইল্‌ম অর্জন করে, তখন আমল-ইখলাসও তার ভাগ্যে জুটে যায়। তখন সে মুক্তার চেয়েও দামি হয়ে যায়। তখনই তাঁকে আলেম বলা যথার্থ হয়।

---

১. ছহীহ বোখারি : হাদীছ নং ৪৮

নবীজি বলেছেন :

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

'আলেমরা নবীগণের উত্তরাধিকারী।'[১]

এই ওয়ারিসগণকে কেয়ামত দিবসে নবীগণের কাতারের অবশিষ্ট আসনগুলোতে বসানো হবে। শুধু পার্থক্য এতটুকু থাকবে যে, তাঁদের মাথায় নবুওতের তাজ থাকবে না। অন্যথায় তারা একই সারিতে অবস্থান করবেন। সুবহানাল্লাহ! অবাক হওয়ার বিষয় যে, আল্লাহ তা'আলা কত মর্যাদা দান করেছেন। যে ব্যক্তি এই তিনটি বিষয় অর্জন করেছে, তার জাগ্রত থাকা তো ইবাদত বটেই; এমনকি আল্লাহ তার নিদ্রাকেও ইবাদতে পরিণত করে দিয়েছেন।

نَوْمُ الْعُلَمَاءِ عِبَادَةٌ

'আলেমদের ঘুম ইবাদত।'

ইল্‌ম একটি শক্তি

ইল্‌ম একটি শক্তি। এই শক্তির ব্যবহার আমরা জানি না। মানুষ যখন এই শক্তিকে ব্যবহার করে, তখন আল্লাহ তাকে দুনিয়াতে সম্মান দান করেন। দেখুন, হযরত ইউসুফ (আ.) – যাঁর ব্যপারে আল্লাহ কুরআনে ইরশাদ করেছেন :

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾

'সে যখন যৌবনে পদার্পণ করল, তখন আমি তাকে হেকমত ও ইল্‌ম দান করেছি। আর আমি নেককারদের এভাবেই বিনিময় দিয়ে থাকি।'[২]

হযরত ইউসুফ (আ.) ইল্‌ম ও হেকমত লাভ করলেন। পরীক্ষাও এসে গেল। কেমন পরীক্ষা? আল্লাহু আকবার! মিশরের প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী তাঁকে গুনাহের প্রস্তাব দিল। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করলেন। তারপর তিনি কয়েক বছর জেলখানায় পড়ে থাকলেন। জেলখানা থেকে মুক্ত হলে যে-নারী তাঁকে গুনাহের প্রস্তাব দিয়েছিল, সে বলল, অপরাধ আমারই ছিল। ইউসুফ

---

১. তিরমিযি : হাদীছ নং ২২৬০৬

২. সূরা ইউসুফ : আয়াত ২২

সত্যবাদী ও সিদ্দীক ছিলেন। তাই মিশরের প্রধানমন্ত্রী তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন :

إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ

'আজ তুমি আমাদের কাছে ক্ষমতাসম্পন্ন ও বিশ্বস্ত।'[১]

ইউসুফ (আ.) বললেন :

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ

'আপনি আমাকে খাদ্যভান্ডারের দায়িত্বে নিযুক্ত করুন।'[২]

إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

'আমি সংরক্ষক ও জ্ঞানী।'[৩]

তাঁকে খাদ্যভান্ডারের দায়িত্বে নিযুক্ত করা হলো। দেখুন, আল্লাহ তা'আলা কীভাবে তাঁকে সিংহাসনে বসালেন। (অনেক লম্বা আলোচনা। এগুলো পূর্ব থেকেই আপনাদের জানা আছে। বরং ভালো করেই জানা আছে। আমি তো ছাত্রসুলভ কয়েকটি কথা আরজ করছি) পরিশেষে সে-সময়টিও এল, যখন তার ভাইয়েরা এসে দরজায় দাঁড়াল। তারা যখন ভিতরে প্রবেশ করল, ভাবল, ইনিই মনে হয় মিশরের প্রধানমন্ত্রী।

তারা বলল–

يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ

' হে আযীয! আমরা ও আমাদের পরিবার বিপন্ন হয়ে পড়েছি।'[৪]

وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ

'আমরা তুচ্ছ পণ্য নিয়ে এসেছি। আপনি আমাদের পূর্ণ রসদ প্রদান করুন।'[৫]

---

১. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৫৪
২. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৫৫
৩. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৫৫
৪. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৮৮
৫. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৮৮

وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا

'আমাদের দান করুন।'[১]

إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ

'নিশ্চয় আল্লাহ দানকারীদের পুরস্কৃত করে থাকেন।'[২]

ইউসুফ (আ.) তার ভাইদের এ করুন পরিণতি দেখলেন। আজ আমি সিংহাসনে বসা আর তারা মেঝেতে দাঁড়ানো। আর 'আমাদের দান করুন' বলে ঝুলি পেতেছে আর বলছে, 'নিশ্চয় আল্লাহ দানকারীদের বিনিময় দেন'।

ইউসুফ (আ.) তাদের জিজ্ঞাসা করলেন,

مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ

'তোমরা ইউসুফের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করেছিলে?'[৩]

তারা বলল–

أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ

'তবে কি তুমিই ইউসুফ?'[৪]

তিনি বললেন :

أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَا أَخِي

'আমি হলাম ইউসুফ আর এ (বিনয়ামীন) হলো আমার ভাই।'[৫]

قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا

'আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।'[৬]

إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝

---

১. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৮৮
২. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৮৮
৩. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৮৯
৪. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৯০
৫. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৯০
৬. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৯০

'নিশ্চয় যে তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ সৎ কর্মশীলদের বিনিময় নষ্ট করেন না।'[১]

সর্বকালে ও সর্বযুগে যারা ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতাদের মতো জেনে-বুঝে গুনাহ করবে, আল্লাহ তাদের অপদস্থ করবেন। আর যারা ইউসুফ (আ.)-এর মতো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে, আল্লাহ তাদের সম্মানের আসনে আসীন করবেন।

মুমিনের হাতিয়ার

ইল্‌মের অপর নাম হলো শক্তি। যেসব আলেম এই শক্তি লাভ করেন, তারা আল্লাহর দরবারে হাত উঠালে আল্লাহ পৃথিবীর মানচিত্রই বদলে দেন। সুবহানাল্লাহ! মোল্লা জিউন (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে যে, সমকালীন বাদশাহ বিপদে পড়ে গেলেন। হযরত যখন জায়নামাযে বসলেন, বাদশাহ বলতে লাগলেন, হযরতের হাত যদি ওপরে উঠে যায়, তাহলে আমার বংশধর একেবারেই খতম হয়ে যাবে। এগুলো মুমিনের অস্ত্র।

اَلْوُضُوْءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ

'উজু মুমিনের হাতিয়ার।'

জায়নামায, তাসবীহ এসবই মুমিনের অস্ত্র। মিজাইল দ্বারা যে কাজ হয় না, এগুলো দ্বারা সেই কাজ হয়। তাদের হাত আসমানে উঠলে এমন পরিবর্তন সাধিত হয়, যা এটম বোমা দ্বারাও হয় না। ওলামায়ে কেরাম হলেন উম্মতের ইমাম। ইরশাদ হচ্ছে :

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً

'আর আমি তাদের কতিপয়কে ইমাম বানিয়েছি।'[২]

يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ۗ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ۝

'যারা আমার নির্দেশ মোতাবেক পথ প্রদর্শন করত। যখন তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল, তখন তারা আমার নিদর্শনাবলির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল।'[৩]

---

১. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৯০

২. সূরা সাজদা : আয়াত ২৪

৩. সূরা সাজদা : আয়াত ২৪

ইল্ম, আমল ও ইখলাসের শক্তি

ইল্ম, আমল ও ইখলাস এমন তিনটি জিনিস যে, এগুলো যখন অর্জিত হয়, তখন একটি শক্তিতে পরিণত হয়। হযরত সুলাইমান (আ.) যখন সংসদ অধিবেশন ডাকলেন, বললেন :

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ

'হে আমার পরিষদবর্গ!'[১]

দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন যুগের নবী হন, তখন তাঁর মন্ত্রিপরিষদও তেমনই হয়। তিনি বলছেন, হে আমার সংসদ সদস্যবর্গ!

أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ۝٣٨

'তোমাদের মাঝে এমন কে আছে, যে সে (বিলকিস) আমার নিকট অনুগত হয়ে হাজির হওয়ার পূর্বেই তার সিংহাসনটা আমার সামনে এনে হাজির করবে?'[২]

قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ

'শক্তিশালী এক জিন বলল।'[৩]

أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ

'আপনি আপনার স্থান হতে ওঠার পূর্বেই আমি তা এনে দেব।'[৪]

তিনি বললেন, এ তো দীর্ঘ সময়।

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ

'যার কাছে কিতাবের ইল্ম ছিল, সে বলল।'[৫]

أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ

---

১. সূরা নাম্‌ল : আয়াত ৩৮
২. সূরা নাম্‌ল : আয়াত ৩৮
৩. সূরা নাম্‌ল : আয়াত ৩৯
৪. সূরা নাম্‌ল : আয়াত ৩৯
৫. সূরা নাম্‌ল : আয়াত ৪০

'আপনি চোখের পলক ফেলার আগেই আমি তা আপনাকে এনে দেব।'[১]

فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ

'যখন তিনি সেটি তাঁর সামনে রক্ষিত অবস্থায় দেখলেন, বললেন, এ আমার প্রভুর অনুগ্রহ।'[২]

ইল্‌ম, আমল ও ইখলাস এ তিনটি গুণ যখন একত্র হয়, তখন ঈমানি শক্তি আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত হয়।

সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টান্ত

ইল্‌ম, আমল ও ইখলাস সাহাবায়ে কেরামের জীবনে আপনি এগুলোই দেখতে পাবেন। হযরত ওমর মদীনায় দাঁড়িয়ে বলছেন يَا سَارِيَةَ الْجَبَلَ (হে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে তাকাও) আর হাজার-হাজার মাইল দূরে নিয়ে বাতাস তার এ পয়গাম পৌঁছে দিল। কখনো এমন হতো যে, মদীনায় বসে আছেন আর ভূমিকম্প শুরু হলো। মাটিতে পদাঘাত করে বলছেন, 'হে জমিন! কাঁপছ কেন? ওমর কি তোমার ওপর ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেনি?' সাথে-সাথে ভূমিকম্প থেমে গেল। কখনো নীল দরিয়ার কাছে চিঠি পাঠানো হতো। নীল দরিয়া আজও বহমান। হযরত ওমর (রাযি.)-এর মর্যাদার সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছে। কখনো মদীনার দিকে আগুন ধেয়ে আসছিল আর এক সাহাবী গিয়ে ঝাড়ু দিয়ে পেটানোর মতো কাপড় দিয়ে আঘাত করে-করে আগুনকে গুহায় ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন।

এক সাহাবী কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। একটা বাঘ দেখে তাকে ডেকে বললেন, তুমি মানুষের ঘ্রাণ টের পাও; তুমি রাস্তা চিনতে পারবে। তুমি আমাকে আমার কাফেলায় পৌঁছিয়ে দাও। বাঘ লেজ নাড়িয়ে সামনে এল। সাহাবী তাতে অরোহণ করলেন এবং কাফেলায় পৌঁছে গেলেন। কোথাও সেনাপতি দরিয়া পাড়ি দিয়ে বলছেন, কারো কোনো কিছু পেছনে রয়ে যায়নি তো? এক সাহাবী বলে উঠলেন, আমার কাঠের একটা পেয়ালা রয়ে গেছে। দরিয়াকে নির্দেশ দিলেন। ফলে একটা ঢেউ এসে পেয়ালাটা ফেরৎ দিয়ে গেল। একটা যুগ এমন ছিল যে, তাঁদের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত আল্লাহর অনুগত ছিল। ফলে তাঁরা হাত তুললে আল্লাহ তাদের হাত

---

১. সূরা নাম্‌ল : আয়াত ৪০

২. সূরা নাম্‌ল : আয়াত ৪০

ফিরিয়ে দিতেন না। হাদীছে কুদসীতে আছে, আমার এমন কিছু বান্দা আছে, যাদের চুলগুলো এলোমেলো; কারো দরজায় গিয়ে দাঁড়ালে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিবে; কিন্তু আমার দরবারে তাদের অবস্থান হলো–

لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ

'যদি আল্লাহর নামে কোনো শপথ করে নেয়, তাহলে আল্লাহ তার কসম অবশ্যই পূর্ণ করে দেন।'[১]

আল্লাহর দরবারে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

مَنْ كَانَ لِلّٰهِ كَانَ اللهُ لَهُ

'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হয়ে যায়, আল্লাহ তার জন্য হয়ে যান।'

উপকরণবিহীন আল্লাহর সাহায্য

ইল্‌ম, আমল ও ইখলাস এই তিনটির সমষ্টি হলো শক্তি। ঈমানদারদের মধ্যে যখন এই শক্তি ছিল, তখন দুশমনের অন্তরে তার ভীতি সঞ্চারিত হতো। আল্লাহ তা'আলা কোনো উপকরণ ছাড়াই তাদের বিজয় দান করতেন। তিনি ইরশাদ করেন :

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ

'তোমরা দুর্বল হয়ো না, তোমরা চিন্তিত হয়ো না; তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হও।'[২]

আল্লাহ তো সাহায্যের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ বলছেন :

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْأَشْهَادُ

'আমি অবশ্যই আমার রাসূল ও ঈমানদারদের দুনিয়ার জীবনে এবং সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠার দিন সাহায্য করব।'[৩]

আল্লাহ তো সাহায্যের ওয়াদা করেই যাচ্ছেন বরং তিনি বলেছেন :

وَاللهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ

---

১. ছহীহ বোখারি : হাদীছ নং ২৫০৪

২. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৩৯

৩. সূরা মুমিন : আয়াত ৫১

'আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের সম্পর্কে অবগত আছেন।'[১]

তিনি অন্যত্র ইরশাদ করেছেন :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

'আল্লাহ কখনোই কাফেরদের জন্য মুমিনদের বিরুদ্ধে কোনো পথ রাখবেন না।'[২]

তাদের মধ্যখানে আল্লাহ অন্তরায় হয়ে যাবেন। আহযাবের যুদ্ধে কাফেররা একযোগে আক্রমণ করেছিল যে, মুসলমানদের চিরতরে খতম করে দিবে। কিন্তু আল্লাহ তাদের সাথে কিরূপ আচরণ করলেন? তিনি বলেন :

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا

'আল্লাহ কাফেরদের ক্রোধের অবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। তারা কোনো কল্যাণ লাভ করতে পারেনি।'[৩]

এভাবেই আল্লাহ তা'আলা উপকরণবিহীন এমন শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয় দান করেন। বনুকুরাইজা গোত্রের ইহুদিদের বড়-বড় দুর্গ ছিল। আমি তাদের কিছু নিদর্শন দেখেছি। দেওয়ালগুলোর প্রস্থ এক মিটার পুরু পাথরের তৈরী। মানুষের উচ্চতা থেকে বেশ উঁচু। তারা মনে করত, মুসলমানরা এসব দুর্গ জয় করতে পারবে না। তারা বলত, এসব দুর্গ আল্লাহর রাস্তায় বাধা হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এসব দুর্গ বিজয় করা অতি সহজ করে দিয়েছেন। অবস্থা এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ তাদের অন্তরে মুসলমানদের ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। তারা আপসে পরামর্শ করতে লাগল, মুসলমানরা যেখানেই যায় আক্রমণ করে বসে। পাছে আবার আমাদের ওপর আক্রমণ না করে বসে। তাই ভালো হবে নিজেরাই শহর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই। তারা আসবাবপত্র গুটিয়ে পালাতে লাগল। ঈমানদাররা বিষয়টি টের পেয়ে পলায়নে তাদের সহযোগিতা করলেন। সুবহানাল্লাহ! উক্ত বিষয়টি আল্লাহ চমৎকার ভঙ্গিতে ইরশাদ করেছেন।

هُوَ الَّذِي শব্দটির মাধ্যমে আল্লাহ আপন পরিচয় তুলে ধরেছেন।

---

১. সূরা নিসা : আয়াত ৪৫
২. সূরা নিসা : আয়াত ১৪১
৩. সূরা আহযাব : আয়াত ২৫

هُوَ الَّذِیۡۤ اَخۡرَجَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا مِنۡ اَهۡلِ الۡکِتٰبِ مِنۡ دِیَارِهِمۡ لِاَوَّلِ الۡحَشۡرِ ؕ مَا ظَنَنۡتُمۡ اَنۡ یَّخۡرُجُوۡا وَ ظَنُّوۡۤا اَنَّهُمۡ مَّانِعَتُهُمۡ حُصُوۡنُهُمۡ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنۡ حَیۡثُ لَمۡ یَحۡتَسِبُوۡا ٭ وَ قَذَفَ فِیۡ قُلُوۡبِهِمُ الرُّعۡبَ یُخۡرِبُوۡنَ بُیُوۡتَهُمۡ بِاَیۡدِیۡهِمۡ وَ اَیۡدِی الۡمُؤۡمِنِیۡنَ ٭ فَاعۡتَبِرُوۡا یٰۤاُولِی الۡاَبۡصَارِ ﴿۲﴾

'কিতাবীদের মধ্য থেকে যারা কাফের তিনিই তাদের প্রথম সমাবেশেই তাদের বাসভূমি থেকে বিতাড়িত করেছেন। তোমরা কল্পনাও করনি যে, তারা নির্বাসিত হবে। তারা ভেবেছিল, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু আল্লাহর শাস্তি এমন এক দিক হতে এল যে, তারা ধারণাও করতে পারেনি। তিনি তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চারিত করলেন। তারা নিজেদের হাতে ও মুমিনদের হাতে তাদের বাড়ি-ঘর ধ্বংস করে ফেলল। অতএব হে দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা! তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।'[১]

আল্লাহ যখন সাহায্য করতে আসেন, তখন উপকরণ ব্যতীতই বিজয় দান করেন। আল্লাহ বলছেন :

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مِنۡکُمۡ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَیَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِی الۡاَرۡضِ کَمَا اسۡتَخۡلَفَ الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ ۪

'আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে ওয়াদা করেছেন, তিনি অবশ্যই তাদের পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব দান করবেন যেমন দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের।'[২]

এ হলো আল্লাহর ওয়াদা।

وَمَنۡ أَصۡدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِیۡلًا

'আল্লাহর চেয়ে কথায় বেশি সত্যবাদী আর কে আছে?'[৩]

সুবহানাল্লাহ!

وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمۡ دِیۡنَهُمُ الَّذِی ارۡتَضٰی لَهُمۡ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ خَوۡفِهِمۡ اَمۡنًا ؕ یَعۡبُدُوۡنَنِیۡ لَا یُشۡرِکُوۡنَ بِیۡ شَیۡئًا ؕ وَ مَنۡ کَفَرَ بَعۡدَ ذٰلِکَ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الۡفٰسِقُوۡنَ ﴿۵۵﴾

---

১. সূরা হাশর : আয়াত ২

২. সূরা নূর : আয়াত ৫৫

৩. সূরা নিসা · আয়াত ১২২

'তিনি অবশ্যই তাদের দীনকে সুদৃঢ় করবেন, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে। আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। তারপরও যারা কুফরি করবে, তারা ফাসিক।'[১]

আল্লাহর সাহায্যের মূলনীতি

আল্লাহ তা'আলা বিজয় দানের মূলনীতি বলে দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা প্রথম দিকে এমন ছিল যে, বাতির মতো মিটমিট করে জ্বলছিল। কাফেররা বলত, আমরা যখন ইচ্ছা তখনই ফুঁ দিয়ে ওদের নিভিয়ে দেব। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يُرِيْدُونَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

'তারা চায় আল্লাহর নূরকে মুখের ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে; অথচ আল্লাহ তার দীনকে পরিপূর্ণ করবেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।'[২]

অন্যত্র বলেছেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। এক সময় তো এমন অবস্থা-ই ছিল। তারপর একটি সময় এমনও এল যে, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে এ আয়াতটিও নাযিল হয়েছে :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

'আজ আমি তোমাদের দীনকে পূর্ণ করে দিলাম।'[৩]

সেদিন এ আয়াতও নাযিল হলো–

اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ

'আজ কাফেররা তোমাদের দীনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছে।'[৪]

আজ তাদের অন্তরে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, মুসলমানরা লোহার তৈরী ছোলা, যা চিবানো অসম্ভব। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

---

১. সূরা নূর : আয়াত ৫৫
২. সূরা সফ : আয়াত ৮
৩. সূরা মায়েদা : আয়াত ৩
৪. সূরা মায়েদা : আয়াত ৩

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

‘অনেক ছোট দল বড় দলের ওপর বিজয় লাভ করেছে আল্লাহর ইচ্ছায়। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।’[১]

আমরা যদি ইল্‌ম ও ইখলাস হাসিল করতে পারি, তাহলে আল্লাহর সাহায্য আসবে। আল্লাহর সাহায্য এলে আমাদের তরী কূলে ভিড়ে যাবে। নৌকা আমাদের কখনো ঘূর্ণিপাকে আটকে থাকবে না। আল্লাহ চাইলে চড়ুইপাখি দ্বারা বাজ পাখিকেও বধ করতে পারেন। এ হলো আল্লাহর সাহায্য।

দীনের চিন্তা

আজ ওলামায়ে কেরামের ওপর অনেক দায়িত্ব রয়েছে। জাতি আজ বড়ই পেরেশান। দেশ-বিদেশের অনেক বিষয় সামনে থাকা একান্ত জরুরি। কেন? ওলামায়ে কেরাম দীনের চিন্তা করবে না তো কারা করবে? এ চিন্তা তো তাঁরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে। দেশের অভ্যন্তরেও দীনবিরোধী অনেক ফেতনা মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি এ যাবৎ পৃথিবীর বেশ কয়েকটা দেশ ভ্রমণ করেছি। এবছর আমেরিকার ২২টা প্রদেশ ভ্রমণ করে এসেছি। আলহামদুলিল্লাহ! সেখানকার মুসলমানদের হাল দেখেছি। কিছু বিষয় এমন আছে, যা আপনাদেরও জানা প্রয়োজন।

ইসলামের শত্রু

প্রথম কথা হলো, ইহুদি ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায় মুসলমানদের পাকা শত্রু। এরা হলো সাপ; সুযোগ পেলেই দংশন করে। এরা হলো বিচ্ছু; সুযোগ পেলেই কামড় মারে। কুরআন তো অনেক আগেই বলে দিয়েছে–

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

‘আর কখনোই ইহুদি ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায় আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না যাবৎ-না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন।’[২]

তাদের অনুসরণ ব্যতীত তারা সন্তুষ্ট হতে পারে না। তারা কেবল সেসব ওলামায়ে কেরামের ওপর সন্তুষ্ট হবে, যারা তাদের উদ্দেশ্য মোতাবেক কাজ

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ২৪৯

২. সূরা বাকারা : আয়াত ১২০

করবে। আর যেসব আলেম আল্লাহর দীনের জন্য কাজ করবেন, তাঁদের তারা শত্রু মনে করবে।

ওলামায়ে কেরামের ভূমিকা

যারা দীনের কাজ আঞ্জাম দেন, ইহুদি-খ্রিষ্টানরা তাদের জঙ্গী বলে আখ্যায়িত করেছে। তাদের মৌলবাদী বলে প্রচার করে দিয়েছে। এ হলো ওলামায়ে কেরামের ভূমিকার বিরুদ্ধে তাদের চক্রান্ত, যেন গোটা বিশ্ব থেকে তাঁদের কীর্তি বিলুপ্ত করে দিতে পারে।

ইসলামের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা

ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা প্রতিনিয়তই ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো-না-কোনো প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। জনগণকে তারা মূল বিষয়টি আঁচ করতেই দেয় না। যখনই সুযোগ পায়, তখনই ইসলামের বিরোধিতা করে। ইসলামী সংগঠনগুলোর গুরুত্বপূর্ণ পদে অর্থের বিনিময়ে এমন লোক বসিয়ে দেয় যে, তখন মুসলমানদের সংগঠন তাদের স্বার্থে কাজ করে যায়।

ইহুদিদের চক্রান্তসমূহ

ইহুদিরা নিজেদের ব্যাপারে খুবই অহংকার করে এবং বলে,

نَحۡنُ أَبۡنَٰٓؤُاْ ٱللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥ

'আমরা আল্লাহর সন্তান এবং তাঁর প্রিয়জন।'[১]

নিজেদের ব্যাপারে তাদের ধারণা হলো, আমরা রাজা আর সারাটা বিশ্ব আমাদের প্রজা। বনী ইসরাইলকে আল্লাহ তা'আলা যেসব নেয়ামত দান করেছিলেন, তারা ভাবে, এগুলো কেয়ামত পর্যন্ত আমাদেরই জন্য থাকবে। সুতরাং তাদের অন্তরে অহংকার বদ্ধমূল হয়ে গেছে। সম্পদের কর্তৃত্বও তাদের হাতে রয়েছে। অর্থের বিনিময়ে যে দেশে ইচ্ছা সে দেশেই বিপ্লব সাধন করে। যখন মন চায় সেখানকার রাজত্ব ছিনিয়ে নেয়। যে দেশে ইচ্ছা সে দেশেই দাঙ্গা লাগিয়ে দেয়। একটা সাধারণ দ্বন্দ্বকে সংঘাতময় বিপর্যয়ে পরিণত করে। ইহুদিরা যে ইসলামের কত মারাত্মক শত্রু, তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।

---

১. সূরা মায়েদা : আয়াত ১৮

বরকতের জায়গা

দেখুন, তারা কোথায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেছে। তারা বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে নিয়ে শাম পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। কুরআন বারবার বলেছে, আমি সেখানে বরকত রেখেছি। এমনও হতে পারে, আমাদের অনেকের কোনো খবরই নেই। তারা পবিত্র কুরআন পাঠ করে। তারা এটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছে। তাদের জানা আছে, কিছু জায়গা এমন রয়েছে, মুসলমানদের কিতাব বলে, আমি সেখানে বরকত রেখে দিয়েছি। এখন তারা সেই অঞ্চলগুলোর ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে। আল্লাহ বলেছেন :

سُبْحٰنَ الَّذِیْۤ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ

'পবিত্র সেই সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাকে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত নৈশ ভ্রমণ করিয়েছেন, যার আশপাশকে আমি বরকতময় করেছি।'[১]

দেখুন, তার আশপাশ বরকতময় হওয়ার কথাটি কুরআন কত স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছে। অন্যত্র ইরশাদ করেছেন :

وَلِسُلَیْمٰنَ الرِّیْحَ عَاصِفَةً تَجْرِیْ بِاَمْرِهٖۤ اِلَی الْاَرْضِ الَّتِیْ بٰرَكْنَا فِیْهَا ؕ وَكُنَّا بِكُلِّ شَیْءٍ عٰلِمِیْنَ ﴿۸۱﴾

'আর আমি সুলাইমানের জন্য বশীভূত করে দিয়েছিলাম উদ্যাম বায়ুকে, যা প্রবাহিত হতো তার আদেশে সেই ভূখণ্ডের দিকে, যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি। আমি তো প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কেই সম্যক অবগত।'[২]

বরকত সংক্রান্ত তৃতীয় আয়াত

وَنَجَّیْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَی الْاَرْضِ الَّتِیْ بٰرَكْنَا فِیْهَا لِلْعٰلَمِیْنَ ﴿۷۱﴾

আমি তাকে (ইবরাহীমকে) ও লূতকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলাম সেই ভূমির দিকে, যেখানে আমি বরকত রেখেছি বিশ্ববাসীর জন্য।'[৩]

---

১. সূরা বানী ইসরাঈল : আয়াত ১

২. সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৮১

৩. সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৭১

বরকত সংক্রান্ত চতুর্থ আয়াত

وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّ قَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِيَ وَ اَيَّامًا اٰمِنِيْنَ ﴿١٨﴾

'আর আমি তাদের এবং যেসব জনপদে বরকত নিহিত রেখেছিলাম, সেগুলোর অন্তর্বর্তী স্থানে দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং সেখানে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করেছিলাম এবং তাদের বলে দিয়েছিলাম, তোমরা এখানে ভ্রমণ করো রাতে ও দিনে নিরাপদে।'[১]

বরকত সংক্রান্ত পঞ্চম আয়াত

وَ اَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا

আর আমি উত্তরাধিকারী বানিয়েছি সেই সম্প্রদায়কে, যাদের দুর্বল বলে গণ্য করা হতো পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমের নানা অঞ্চলের, যাকে আমি বরকত দ্বারা ধন্য করেছি।'[২]

মোট পাঁচ স্থানে বরকত রয়েছে বলে কুরআন বলছে। তাই তারা আজ সেই স্থানগুলো দখল করে জমে বসে রয়েছে।

ফ্রান্সে ইহুদিদের রোযা রাখার ঘটনা

আমি ফ্রান্সে গেলাম। আমার এক বন্ধু বলল, রমজান মাস এসেছে। আমি আমার প্রফেসরকে বললাম, আমাকে ছুটি দিয়ে দিন। তিনি বললেন, কেন? আমি বললাম, আমাকে রোযা রাখতে হবে এবং তারাবীহ পড়তে হবে। তিনি বললেন, তোমার ছুটির প্রয়োজন কিসের? আমি বললাম, আমাকে অমুক জায়গায় গিয়ে তারাবীহ তে হবে। সেখান থেকে আমি প্রতিদিন আসতে পারব না। তিনি বললেন, আমি তোমাকে এখানেই এমন জায়গার সন্ধান দিচ্ছি। আমি বললাম, তাহলে তো বেশ ভালোই হয়। তিনি আমাকে ইউনিভার্সিটির একটা জায়গায় নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলাম, এক যুবক। মুখে কালো দাড়ি। মাথায় পাগড়ি। পরনে জুব্বা। মেসওয়াকসহ ওজু করছে। নামায পড়ছে। আজান দিচ্ছে। একজন সামনে

---

১. সূরা সাবা : আয়াত ১৮

২. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৩৭

গিয়ে কুরআন পড়ছে অন্যরা পিছনে থেকে শুনছে। মাসভর রোযা রাখছে। তারপর ইতিকাফও করেছে।

তিনি বললেন, আমি ঈদের নামায পড়ে এসে আমার প্রফেসরকে বললাম, স্যার, আপনি আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন। এমন কিছু ভালো মানুষের সন্ধান দিয়েছেন। আমার রমজান বেশ ভালোভাবেই কেটেছে। তিনি মুচকি হেসে বললেন, তুমি কি জান না, ওরা ইহুদি? আমি বললাম, তা তো জানি না। তিনি বললেন, তারা একটা প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে যে, ইসলামে মুসলমানদের যেভাবে রোযা রাখতে বলা হয়েছে, তোমরাও তাদের অনুরূপ এক মাস রোযা রেখে দেখো, এর মধ্যে কী কল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং কী অকল্যাণ রয়েছে। কল্যাণকর হলে আমরা অকপটে তা গ্রহণ করে নেব।

বর্তমানে বিশ্বে এসব কাজ হচ্ছে। আমাদের যুবকরা বহির্বিশ্বের যেসব ইউনিভার্সিটি থেকে ইসলামিয়াতের ওপর পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করে, সেখানকার ইসলামিয়াত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ইহুদি থাকে। এবার বলুন, বিশ্বে ইসলামবিরোধী কী-কী কর্মকাণ্ড হচ্ছে? আল্লাহু আকবার! বর্তমান পৃথিবীতে আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো ইহুদিরা। তারা প্রতিনিয়ত পরোক্ষভাবে ইসলামকে ক্ষতিগ্রস্ত করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

রাশিয়ায় ইহুদিদের চক্রান্তের ঘটনা

আমি একবার রাশিয়া সফর করছিলাম। মাওলানা আব্দুল্লাহ ও অন্যান্যরা আমার সফরসঙ্গী ছিলেন। রেলসফর করছিলাম। ইতিমধ্যে একব্যক্তি এসে আমার সাথে ও অন্যান্যদের সাথে সাক্ষাৎ করল। তার মুখে দাড়ি ছিল। তারপর সাথীদের সাথে কথা বলতে লাগল। লোকটি চলে গেলে আমি সাথীদের জিজ্ঞাসা করলাম, লোকটি কী বলছিল? সাথীরা বলল, আপনার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছিল, আপনি কে? আমরা বললাম, একজন আলেম ও পীর। সে বলল, কোথা থেকে এসেছেন? আমরা বললাম, পাকিস্তান থেকে। বলল, তোমরাও রাশিয়ান, আমিও রাশিয়ান; তোমরা তাকে ধোঁকা দাও। তাকে বাইরে-বাইরে ঘোরাতে থাকো এবং তার সব টাকা খরচ করিয়ে দাও। তারপর সে আপনা-আপনিই চলে যাবে। এসব লোক দিয়ে আমাদের লাভ কী? তাকে এখান থেকে মিথ্যা অজুহাত দিয়ে বের করে দাও, যাতে এখানে কেউ ইসলামের কাজ করতে না পারে।

এ ধরনের বাস্তব অভিজ্ঞতা আমার বেশ কয়েকবার হয়েছে। এবার আমার বুঝে এল, তাদের অন্তরে কী পরিমাণ ক্রোধ রয়েছে। আল্লাহ সত্যই বলেছেন :

قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ

'আপনি বলুন, তোমরা তোমাদের ক্রোধে মরে যাও।'[১]

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُوْنَ إِلَّا كَذِبًا

'তাদের মুখনিঃসৃত কথা বড়ই সাংঘাতিক। তারা কেবলই মিথ্যা বলে।'[২]

قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ

'তাদের মুখ থেকে শত্রুতা প্রকাশ পেয়েছে আর তাদের অন্তরে যা রয়েছে তা আরো মারাত্মক।'[৩]

মুখে ইসলামের কথা বলে; কিন্তু তাদের অন্তরে ইসলামের বিরুদ্ধে বহু ক্ষোভ ও ষড়যন্ত্র লুকায়িত রয়েছে।

আমেরিকায় 'টাইপরা আলেম'দের কাণ্ড

টাইপরা আলেমরাই আমেরিকায় মূল বিপদ ডেকে এনেছে। ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের পর সেখানকার টাইপরা আলেমরাই ইসলামের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে। তারা ওখানকার ইংরেজিজানা লোক, যারা প্রবন্ধ লিখেছে। এখন তারা ভাবে, আমরা তো দীনের ঠিকাদার হয়ে গেছি, যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ ও মুজাদ্দিদ বনে গেছি। তারপর ফাতাওয়া দিতে শুরু করে। তাদের কাজ হলো সব বিষয়ে ইজতিহাদ করা। সব ক্ষেত্রে নিজের মনগড়া সিদ্ধান্ত দেওয়া। তারা স্যুট-কোট-টাই পরিধান করে আসে। খালি মাথায় নামায পড়ে, বাজারে যায়। দাঁড়িয়ে খানা খায়, মহিলাদের সাথে আসা-যাওয়া, মেলামেশা হয়। তারা তথাকার ইমাম ও খতীব। ইংরেজিতে বেশ ভালো বক্তব্য প্রদান করে। আমি তাদের নাম দিয়েছি 'টাইপরা আলেম'। অপমানজনক নাম রাখা তো ঠিক হবে না। ইলমের সাথে তাদের কিছুটা হলেও সম্পর্ক রয়েছে। তাদের আলেম গণ্য করা হয়। কুরআন-হাদীছের তরজমা জানে। আমি ভাবলাম,

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১১৯

২. সূরা কাহ্ফ : আয়াত ৫

৩. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১১৮

তাদের কী নাম দেওয়া যায়? ভেবেচিন্তে নাম রাখলাম 'টাইপরা আলেম'। এই টাইপরা আলেমরা সেখানে দীনকে বিকৃত করে দিয়েছে।

'টাইপরা আলেম'দের মাসআলা

টাইপরা আলেমরা বেশ আশ্চর্য ধরনের মাসআলা দিয়ে থাকে। যেমন– কেয়ামত দিবসে মুসলমানদেরকে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। ইহুদি ও খ্রিষ্টানদেরকে তাদের ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। আমি এক টাইপরা আলেমকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কীভাবে একথা বলেন যে, তাদের আপন ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে? তখন উক্ত আয়াতটি পড়তে লাগল :

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَ النَّصٰرٰى وَ الصّٰبِئِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝٦٢

'নিশ্চয় যারা ঈমান আনয়ন করে, যারা ইহুদি হয়েছে এবং খ্রিষ্টান ও সাবিঈন যারাই আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং নেক আমল করে। তাদের জন্য তাদের প্রভুর নিকট রয়েছে বিনিময়। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না।'[১]

উক্ত আয়াত দ্বারা দলীল দিয়ে বলতে চায়, চাই ইহুদি হোক বা খ্রিষ্টান কিংবা সাবিঈ। তাদের কোনো ভয় নেই, চিন্তা নেই। সুতরাং তারা ঈমান না আনলেও চলবে বরং তারা তাদের ধর্মে অনড় থাকবে। আমি তখন বলেছি :

وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ ۝٨٥

'আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছুকে দীন হিসেবে কামনা করে কখনোই তা তাঁর কাছে গৃহীত হবে না'[২]

তাহলে আপনারা কি কুরআনের কেবল একটি পারাই পড়েছেন? বাকি কুরআন পড়েননি?

أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ

'তারা কি আল্লাহর দীনের পরিবর্তে অন্য দীন কামনা করে?'[৩]

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ৬২

২. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৮৫

৩. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৮৩

যখন আল্লাহ নিজেই বলে দিচ্ছেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং আমি তোমাদের ওপর আমার নেয়ামত পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।'[১]

বর্তমানে আমাদের উক্ত আয়াত অনুযায়ী আমল করা একান্ত জরুরি।

'টাইপরা আলেম'দের ফাতাওয়া

'টাইপরা আলেম'রা আরেকটা ফাতাওয়া দিয়েছে। তারা বলে, সব খ্রিষ্টানই আহলে কিতাব। অথচ বর্তমানে প্রায় সব খ্রিষ্টানই নাস্তিকতায় বিশ্বাসী। তারা বলে, তাদের জবাইকরা প্রাণী হালাল। কেউ কুরআনের আয়াত পড়ে বলল, তারা তো জবাইয়ের সময় বিসমিল্লাহ পড়ে না, তখন বলল, যদি এমন হয়, তাহলে এ জাতীয় জিনিস হাতে এলে বিসমিল্লাহ পড়ে নিলে হালাল হয়ে যাবে। দ্বিতীয় ফাতাওয়াটা দিয়েছে, মহিলাদের মুখ ঢেকে রাখার কথা কুরআনে কোথাও বলা হয়নি। তৃতীয় ফাতাওয়া হলো, আমেরিকার হালত এমন যে, এখানে মহিলাদের সাথে হাত মেলাতে হয়। অন্যথায় তারা মনঃক্ষুণ্ন হয়। আর কারো মনে কষ্ট দেওয়া কবীরা গুনাহ। তাই মহিলাদের সাথে হাত মেলানো যাবে।

দেখুন তাদের ফাতাওয়া! যদি কখনো বুধবারে ঈদ পড়ে যায়, তাহলে তারা বলে, ঈদের উদ্দেশ্য হলো মুসলমানরা আপসে মিলিত হওয়া, আনন্দ খুশি প্রকাশ করা। বুধবার দিন যেহেতু আমরা ব্যস্ত থাকি, তাই আমরা পরবর্তী রবিবারে ঈদের নামাযও পড়ব, আপসে মিলিত হব, আনন্দ উদযাপনও করব। এই হলো সেখানকার টাইপরা আলেমসমাজের কীর্তিকলাপ। কারণ, যেখানে হক থাকে না, সেখানে কোনো নূরও থাকে না। অন্ধকার সেখানে স্থান গেড়ে নেয়।

ইহুদি-খ্রিষ্টানদের পর টাইপরা আলেমরাই ইসলামের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে। তারা দীনের রূপরেখাকেই বিকৃত করে দিয়েছে। তারা বলে, দীন হলো সহজ। কাজেই তোমরা চার ইমামের যে কারো উক্তি সহজ মনে হলে গ্রহণ করতে পার; তাতে কোনো ক্ষতি নেই। যেখানে চার ইমামের মাযহাব

---

১. সূরা মায়েদা : আয়াত ৩

কঠিন মনে হয়, সেখানে নিজের পক্ষ থেকে সহজ বানিয়ে নেয়। অথচ যারা দীনের মধ্যে এভাবে সহজ তালাশ করে বেড়ায়, সারা বিশ্বের সকল অশ্লীলতা তাদের মধ্যে এসে একত্রিত হয়। একারণেই আলেমগণ বলেছেন :

مَنْ أَخَذَ بِنَوَادِرِ الْعُلَمَاءِ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ

'যে ব্যক্তি আলেমদের দুর্লভ মতামত গ্রহণ করল, সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গেল।'

তার মধ্যে দুনিয়ার সব অশ্লীলতা এসে জমা হবে। আপনারা আলেম; তাই আপনাদের সামনে কিছু দুর্লভ মতামত উল্লেখ করছি। এগুলোর ওপর ফাতাওয়া নয়।

আপনি লক্ষ করুন, ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে দাবা খেলা জায়েয। আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর-এর মতে সংগীত জায়েয। ইমাম কাসিম ইবনে মুহাম্মদ-এর মতে ছায়াবিহীন ফটো জায়েয। ইমাম মালেক (রহ.)-এর অনুসারী ইমাম সামনুন-এর মতে স্ত্রীর পিছনের রাস্তায় গমন করা বৈধ। ইমাম আ'মাশ-এর মতে রোযা শুরু হয় সূর্যোদয়ের পর থেকে। ইবনে হায্‌ম জাহেরীর মতে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এমন ছেলেমেয়ে একে অপরকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখতে পারবে, বরং তিনি বলেন, কোনো মহিলার যদি কারো সাথে পর্দা করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে যে বয়সেরই হোক-না কেন সে ওই পুরুষকে দুধ পান করাবে এমনকি তার স্তনের দুধ ওই পুরুষের মুখে ঢেলে দিলেও মহিলা ওই পুরুষের মাহরাম বলে গণ্য হবে। আতা ইবনে আবী রাবাহ বলেন, ঈদের দিনের জুমা ও যোহরের নামায সম্পূর্ণ মাফ। এবার বলুন, এই বিষয়গুলো একত্রিত করলে কী অবস্থা দাঁড়াবে? বর্তমানে সেখানকার টাইপরা আলেমরা এগুলোর ওপর আমল করছে এবং সাধারণ মানুষদেরও আমল করাচ্ছে।

দীনের ভাবনা

আমার বন্ধুগণ! নবীজি দোআ করেছেন :

نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ أَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا

'আল্লাহ তার চেহারাকে উজ্জ্বল করুন, যে আমার কথা শুনল এবং পরে তা সংরক্ষণ করল। তারপর তা হুবহু অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দিল।'[১]

---

১. মুসদারাকে হাকেম : হাদীছ নং ২৬৯ ২৬৯

আজ ওলামায়ে কেরামের মাথার ওপর একটি বোঝা রয়েছে। এই বোঝা থেকে মুক্তিলাভের জন্য তাদের জীবনকে অনেকটা গুটিয়ে রাখতে হবে। আমরা ছোট-ছোট বিরোধ-বিবাদে জড়িয়ে পড়ার পরিবর্তে লক্ষ করব, ইসলামের শত্রুরা আজ ইসলামের সাথে কিরূপ আচরণ করছে? বর্তমান পশ্চিমা দেশগুলোতে এমন কিছু এলাকা রয়েছে, যেখানে মুসলমানরা বাড়ি ভাড়া নিতে গেলে তারা তাদের ভাড়াও দিতে চায় না। অথচ একসময় তো এমন ছিল যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.)-এর প্রতিবেশী ছিল এক ইহুদি। ইহুদি বাড়িটি বিক্রি করতে চাইল। একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, মূল্য কত? সে বলল, দু-হাজার স্বর্ণমুদ্রা। ক্রেতা বলল, এ এলাকায় তো এই বাড়ির মূল্য সর্বোচ্চ এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা হতে পারে। ইহুদি বলল, এক হাজার দীনার তো আমার বাড়ির মূল্য আর এক হাজার দীনার হলো আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারকের প্রতিবেশিত্বের মূল্য।

একসময় মুসলমানদের পাশের জমির মূল্য বেশি হতো। আর বর্তমানে এমন সময় এসেছে যে, ইউরোপের কোনো-কোনো অঞ্চলে মুসলমানরা বাড়ি ভাড়া নিতে গেলে তাদের নিকট বাড়ি ভাড়া দিতেও তারা প্রস্তুত নয়।

সম্মানিত শ্রোতৃমণ্ডলী! এই দীন নিয়ে কারা ভাববে? আপনারা আলেম। আপনাদেরই ভাবতে হবে। স্মরণ রাখবেন, যখন ইংরেজরা দীনের মূলোৎপাটনের চেষ্টা চালিয়েছিল এবং গোটা জাতিকে দুনিয়াদারিতে মত্ত করে দিয়েছিল, তখন আপনারাই তো চাটাইয়ের ওপর বসে ছিলেন, জায়নামাযের সাথে লেপ্টে ছিলেন। আপনারাই তো ভাঙা ঘরে বসে ছিলেন। আপনারা আপনাদের জন্য দরিদ্রতা পছন্দ করে নিয়েছেন এবং আপনাদের সন্তানদের জন্যও দরিদ্রতাকে পছন্দ করে নিয়েছেন। কিন্তু দীনকে আপনারা আপন বুকে আগলে রেখেছেন। আপনাদের ধন্যবাদ জানাতে হয়। আমি ধন্যবাদ জানাই আপনাদের এই মূল্যবোধকে। আমি ধন্যবাদ জানাই আপনাদের তাকওয়া ও আপনাদের দীনের ওপর অবিচল থাকাকে। আপনারা দুনিয়ার পরিবর্তে দীনকেই বুকে জড়িয়ে রেখেছেন। জাতির কাছে দীন পৌঁছিয়েছেন।

আল্লাহ বলছেন :

إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلرَّبَّـٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا۟ مِن كِتَـٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُوا۟ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ ٤٤

'আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম, যাতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো, যার দ্বারা শাসন করত আমার অনুগত নবীগণ ইহুদিদের। আরও শাসন করত আল্লাহওওয়ালা ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ। কারণ, তাদের আল্লাহর কিতাবের রক্ষক বানানো হয়েছিল এবং তারা ছিল তার সাক্ষী।'[১]

আলেম ও নেককারদের দায়িত্ব দীনকে সংরক্ষণ করা, আল্লাহর কিতাবের হেফাজত করা। আলহামদুলিল্লাহ! চৌদ্দশত বছরেরও বেশি সময় অতিক্রম করেছে; এখনো দীন নিরাপদ আছে। অবুঝ লোকদের হাতে দীন যেতে দিবেন না। আমলহীনদের হাতে দীন যেতে দিবেন না।

দীনের জন্য ত্যাগ স্বীকার

সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম! এখানে ছাত্রদের তৈরি করুন, যেন এরা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে দীনের দূত হয়ে কাজ করে। তাহলে কেয়ামত দিবসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের দীনের খাতিরে জীবন-মরণ সব কিছু উৎসর্গ করার তাওফীক দান করুন।

قوت عشق ہر پست کو بالا کر دیا   دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے

প্রেমের শক্তি দিয়ে সব নিচুকে উঁচু করে দাও,
মুহাম্মাদের নাম দ্বারা পৃথিবীটা উজালা বানাও।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَآ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

১. সূরা মায়েদা : আয়াত ৪৪

নবীজির সুন্নাত ও আধুনিক বিজ্ঞান

‘যেখানে বিজ্ঞান সুন্নাতের বিরোধিতা করে, সেখানে মূল কারণ হলো, গবেষণা এখনো পূর্ণতায় পৌঁছেনি। বিজ্ঞানের গবেষণা যখনই চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাবে, তখন অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে, সুন্নাতের মধ্যেই উপকারিতা নিহিত রয়েছে।’

নবীজির সুন্নাত ও আধুনিক বিজ্ঞান

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا -

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

দুনিয়াটা পরীক্ষার হল

আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তার মাঝে ভালো ও মন্দ উভয়টির যোগ্যতা রেখে দিয়েছেন। শয়তান মানুষকে বিপথগামী করে আর নবীগণ কল্যাণের পথে আহ্বান করেন। তাই বলা হয়েছে, দুনিয়া হলো পরীক্ষার হল। এটা পর্যটনকেন্দ্র নয়। নয় খেল-তামাশার জায়গা। এটা পরীক্ষার হল। অথচ আমরা একে বিচরণক্ষেত্রে পরিণত করেছি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

'তিনি জীবন ও মৃত্যুকে এজন্য সৃষ্টি করেছেন, যেন তিনি পরীক্ষা করতে পারেন, কে তোমাদের মাঝে আমলে শ্রেষ্ঠ।'[১]

ইরশাদ করেন, আমি যখন মানুষ তৈরি করেছি, তখন

فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝٨

'আমি মানুষের মাঝে ভালো ও মন্দ উভয়টির যোগ্যতা দান করেছি।'[২]

শয়তান মন্দের দিকে আহ্বান করছে আর রহমান ডাকছেন কল্যাণের প্রতি। দেখার বিষয় হলো মানুষ কোন পথে চলে। যদি কল্যাণের পথে চলে, তাহলে সে সফল হবে। আর শয়তানের পথে চললে সে নিশ্চিতই ব্যর্থ হবে।

---

১. সূরা মুলক : আয়াত ২

২. সূরা আশ-শাম্‌স : আয়াত ৮

কালেমা ও এক অমুসলিমের ঘটনা

এক বিদেশি বলতে লাগল, শুধু কালেমা পড়লেই কি জান্নাতে যাওয়া যাবে? আমি বললাম, হ্যাঁ; ইনশাআল্লাহ কালেমা পড়লেই জান্নাতে যাবে। পাপী হলে সাজা ভোগ করে পরিশেষে জান্নাতে যাবে। সে বলল, কোনো ব্যক্তি যদি কালেমা না পড়ে? আমি বললাম, সে কখনও জান্নাত পাবে না। সে বলল, যদি কালেমা না পড়ে এবং বড় নেককার হয়? যেমন– সে বিদ্যুৎ আবিষ্কার করল, বাল্ব উদ্ভাবন করল। মেহমানখানা তৈরি করল এবং আরো অনেক ভালো কাজ করল। তবু কি সে জান্নাত পাবে না? আমি বললাম, না; তবুও সে জান্নাত পাবে না। সে বলল, দেখুন, এটা কত বড় বেইনসাফির কথা! ইসলামে কি তাহলে ইনসাফ নেই? আমি বললাম, কেন? বলল, একজন পাপী কালেমা পড়ায় তাকে জান্নাত দেওয়া হচ্ছে। অথচ একজন সৎকর্মশীল কেবল কালেমা না পড়ায় তাকে জাহান্নামে পাঠানো হচ্ছে।

আমি বললাম, হ্যাঁ ভাই! নিয়ম তো এমনই। সে বলল, এই নিয়ম প্রকৃতিবিরোধী। আমি বললাম, দেখুন, বর্তমানকালে আমরা যে গণিত শাস্ত্র পড়ি, যার ওপর বিজ্ঞানের ভিত্তি নির্ভরশীল, তার উদাহরণ নিন। মনে করুন, কোনো ব্যক্তি একটা এক লিখল। তারপর তার ডান পাশে একটা শূন্য দিল। এভাবে যতবার শূন্য দিবে, ততবার তার ভ্যালু বাড়তে থাকবে। কিন্তু যদি সে এক সংখ্যাটি না লেখে বা ভুলে যায় আর শূন্য লাগাতে থাকে এবং বলে, আমি তো দশ কোটি শূন্য লিখেছি; তবুও তার ভ্যালু শূন্যই থাকবে। এই শূন্যগুলোর ভ্যালু তো একের কারণে। এক না লিখে আপনি যত শূন্যই লিখবেন তার ভ্যালু শূন্যই থাকবে। তেমনি আপনি যতক্ষণ-না এক আল্লাহকে মেনে নেবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার সকল কাজের ভ্যালু শূন্যই হবে।

এবার সে বলতে লাগল, আপনি ঠিকই বলেছেন। এবার আমার বুঝে এসেছে। আমি বললাম, আরেকটি উদাহরণ নিন। যে ব্যক্তি কালেমা পড়ে নিল, সে কেমন যেন বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও মালিক এক আল্লাহকে স্বীকার করে নিল। ব্যাপারটি ঠিক এমন যেমন সে কোনো রাজ্যে অবস্থান করছে এবং সেখানকার রাজার রাজত্ব মেনে নিয়েছে। তবে সে অপরাধী, তখন বাদশাহ তাকে কম-বেশি শাস্তি প্রদান করে অথবা সতর্ক করে তাকে দেশে বসবাসের সুযোগ দেবেন। আরেক ব্যক্তি বাদশার সঙ্গে গাদ্দারি করে এবং বলে, আমি তার রাজত্ব মানি না, রাজা তাকে তার রাজ্যে বসবাস করার সুযোগ দেন না, বরং বলেন, তার শিরোচ্ছেদ করা উচিৎ। এ ব্যাপারটিও এমনই যে, আল্লাহ

আমাদেরকে কালেমার সম্পদ দান করেছেন। আল্লাহর ধ্যান ও কল্পনা অনেক বড় নেয়ামত।

ইউরোপীয়রা পাগল হওয়ার কারণ

ইউরোপে যদি কারো কায়কারবার ধ্বংস হয়ে যায়, তখন এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যে, সে তার হাত কামড়ায় আর বলে, আমি সঠিক সিদ্ধান্ত নেইনি। আমি এটা করিনি, ওটা করিনি। এভাবে সে সব ক্ষয়ক্ষতি নিজের মাথায় চাপিয়ে নেয়। সে যখন এই বোঝাগুলো আপন কাঁধে চাপিয়ে নেয়, তখন তার মস্তিষ্ক নষ্ট হবে না তো কী হবে? আপনি অবাক হবেন যে, নিউইয়র্কের এক শহরেই ১০০ এর বেশি পাগলাগারদ রয়েছে। অথচ আমাদের সারা দেশে কটা পাগলাগারদ রয়েছে আমরা তা জানিও না। কেন? কারণ, এখানকার লোক পাগল খুব কম হয়।

পাগল হওয়ার মূল কারণ

পাগল হওয়ার মূল কারণ হলো জীবনে যত পেরেশানি আসে, সবই নিজের ওপর চাপিয়ে নেওয়া। যেমন– স্ত্রী তালাক নিয়ে চলে গেল বা গাদ্দারি করল, তখন সে পাগল হয়ে যায়। কায়কারবার ধ্বংস হলো। তখন সে এমন চিন্তিত হয়ে পড়ে যে, সে পাগল হয়ে যায়।

আল্লাহর ওপর ঈমানের উপকারিতা

এক ব্যক্তি যখন আল্লাহ তা'আলার ওপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখে, তার ওপর যত বড় বিপদই আসুক-না কেন, সে বলবে, যা আল্লাহর সিদ্ধান্ত ছিল তা-ই হয়েছে। সে যখন আল্লাহর সিদ্ধান্তের কথা বলল, তখন তার মানসিক বোঝা খতম হয়ে গেল। যেমন– এক ব্যক্তির ঘরে আগুন লাগল, তার স্ত্রী-পরিজন আগুনে পুড়ে মারা গেল অথবা দুর্ঘটনায় কারো সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেল। তখন তার কাছে অন্যরা গিয়ে আফসোস করলে সে বলে, যা আল্লাহর সিদ্ধান্ত তা-ই হয়েছে। আল্লাহর সিদ্ধান্তের কথা বলে সে পুরো ব্যাপারটি আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করে দিল। ফলে পাগল হওয়া থেকে বেঁচে গেল। আল্লাহ তা'আলার সত্তার ধ্যান ও বিশ্বাসের উপকারিতা হলো, এর মধ্যে মানুষ একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপন করে। নফ্স ও শয়তানের খপ্পর থেকে বাঁচা–তার জন্য সহজ হয়ে যায়।

চমৎকার প্রশ্ন চমৎকার উত্তর

একব্যক্তি প্রশ্ন করল। প্রশ্নটি ছিল সমালোচনামূলক। লোকটি কমিউনিষ্ট ছিল। বলল, আপনারা শয়তান মানেন কেন?

আমরা যদি ভাবি, তাহলে বাহ্যত এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের বুঝে আসে না, আমরা শয়তান মানি কেন? শয়তান মানার প্রয়োজন কী? সে বলল, ভালো-মন্দ সব আমরা-ই তো করি; কিন্তু নাম দেই শয়তানের। ধরুন, আমি চাঁদে গেলাম। সেখানে গিয়ে আমি গুলকন্দ (গোলাপের পাপড়ি ও শর্করা দিয়ে তৈরী ওষুধ) দেখতে পেলাম। উক্ত গুলকন্দ দেখে আমি একটি ফলাফল তৈরি করব যে, এখানে চাঁদের দেশে কোথাও শুধু গোলাপের পাপড়ি রয়েছে আবার কোথাও-না-কোথাও কন্দ শর্করা রয়েছে। আর এ দুটি একত্রিত হওয়ার ফলে গুলকন্দ তৈরি হয়েছে। তাহলে গুলকন্দের অস্তিত্ব গুল ও কন্দ-এর অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে। কারণ, যেখানেই কোনো যৌগিক বস্তু পাওয়া যাবে, সেখানেই তার উপাদানসমূহের অস্তিত্বের দলীল বহন করবে।

এমনিভাবে যদি পানি পাওয়া যায়, তাহলে এখানে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন আছে বলে প্রমাণিত হয়। পানির অস্তিত্ব যেমন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অস্তিত্বের প্রমাণ, ঠিক তেমনি গুলকন্দের অস্তিত্ব একথার প্রমাণ বহন করে যে, এখানে কোথাও-না-কোথাও শুধু গুল এবং কোথাও-না-কোথাও শুধু কন্দ রয়েছে, যে-দুটির সমন্বয়ে গুলকন্দ তৈরি হয়েছে। সে বলল, এ তো সঠিক। আমি বললাম, যদি একটু ভাবেন, তাহলে দেখতে পাবেন, মানুষও ভালো-মন্দের সমষ্টি। মানুষের মধ্যে ভালোরও যোগ্যতা আছে, মন্দেরও যোগ্যতা আছে। মানুষ হলো ভালো ও মন্দের সমষ্টি। এই সমষ্টি একথার প্রমাণ যে, কোথাও এমন জিনিস রয়েছে, যা শুধু ভালো। আবার কোথাও এমন জিনিস রয়েছে, যা শুধু মন্দ। যা শুধু ভালো, তাকে আমরা ফেরেশতা বলি আর যা শুধু মন্দ, তাকে শয়তান বলি। আর এ দুটির সমষ্টিকে মানুষ বলি।

মনগড়া জীবন

মানুষ দেখতে পায়, পয়সা দ্বারাই তার জীবনের সব কাজ হয়। তাই সে জায়েয-নাজায়েয সব পন্থায় পয়সা সংগ্রহে লেগে যায়। সম্পদের লালসা ও মোহ এমন, যেমন কারও ক্লোরোফার্ম শুকিয়ে দেওয়া হলে সে মাতাল হয়ে যায়। সম্পদের ভালোবাসাও মানুষকে মাতাল বানিয়ে দেয়। ফলে সে আর

কিছুই বুঝতে পারে না। মালদার ব্যক্তির আওয়াজেও মালের ঝংকার থাকে। তারপর দেখতে পায়, জায়েয-নাজায়েয কাজ পয়সার মাধ্যমে হয়ে যায়। এজন্যই সে মাল অর্জনের পেছনে পড়ে যায়। তার আমিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রসিদ্ধি প্রয়োজন; তাই সে পদের পেছনে পড়ে যায়। সে তখন কামনা করে, তার বাংলো এমন হবে যে, অন্য কারো আর এমন বাংলো থাকবে না। একজন ভালো স্ত্রী মিলে যায়। আমার পোশাক এমন হওয়া চাই। আমার গাড়ি এমন হওয়া চাই। মানুষের মাঝে তখন এ ধরনের চাহিদার জন্ম হয়।

চাহিদাপূর্ণ জীবন

এখন দেখার বিষয় হলো, মানুষ তার চাহিদার পূরণ আল্লাহ্ তা'আলার বিধান মোতাবেক করে, নাকি আল্লাহর বিধানকে একদিকে রেখে দিয়ে চাহিদা পূরণের পিছনে দৌড়ায়। সাধারণত এমনই দেখা যায় যে, চাহিদা মানুষকে অন্ধ বানিয়ে দেয়, চোখে পট্টি বেঁধে দেয় এবং মানুষ বিবেক থাকা সত্ত্বেও বিপথগামী হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ

'আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে তার চাহিদাকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ্ ইল্‌ম থাকা সত্ত্বেও বিপথগামী করে দিয়েছেন।'[১]

ইল্‌ম থাকা সত্ত্বেও বিপথগামী হওয়া বলতে কী বোঝায়? দেখুন, একব্যক্তি ধূম পান করে। অথচ সে এর ক্ষতি সম্পর্কে অবগত! সেই ব্যক্তিই আবার বাচ্চাদের উপদেশ দেয়, আমরা একাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছি এবং আপারগ হয়ে গেছি; তবে তোমরা এমনটা করবে না। বোঝা গেল, লোকটা এর ক্ষতি সম্পর্কে অবগত। অন্যদের নিষেধ করছে, এমনকি সিগারেট কোম্পানী সিগারেটের গায়ে লিখেও দিচ্ছে,. 'ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর'। পানকারীও জানে, তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তারপরও তার মধ্যে এমন এক চাহিদা সৃষ্টি হয় যে, সে বাধ্য হয়ে ধূমপান শুরু করে। একেই বলে 'ইল্‌ম থাকা সত্ত্বেও বিপথগামী হওয়া'। মানুষ অনেক সময় মনের চাহিদার কাছে এমনভাবে বাধ্য হয় যে, সে মন্দ জেনেও কাজটা করে ফেলে। ভালো মানুষ ও মন্দ মানুষের মাঝে পার্থক্য এখানেই।

---

১. সূরা জাছিয়া : আয়াত ২৩

সুশৃঙ্খল জীবন

একজন ভালো মানুষ যখন দেখতে পায়, এই কাজটা মন্দ, তখন তাকে সেই কাজের প্রতি আহ্বান করা হলেও সে ওদিকে পা বাড়ায় না। আর যদি সে মনে করে, এদিকে পা বাড়ানো আমার জন্য কল্যাণকর, তাহলে শত অলসতা থাকা সত্ত্বেও সে সেদিকে পা বাড়ায়। কারণ, একজন দৃষ্টিসম্পন্ন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ধৈর্যের গুণ অর্জন করেন। কোনো ব্যক্তি যদি সৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়, তাহলে প্রথমে নিজের সত্তায় সৃঙ্খলা সৃষ্টি করে একাজে হাত দিতে হবে। সৃঙ্খলা এমন একটি জিনিস, যার পিছনে আজ পাশ্চাত্য জগত ছুটে পড়েছে। কারণ, এতে জীবন সুন্দরভাবে অতিবাহিত হয়।

এক আমেরিকান অমুসলিমের ঘটনা

আমার সঙ্গে একব্যক্তির সাক্ষাত হলো। বলল, আমি রোযা রাখি। লোকটি আমেরিকান অমুসলিম। আমি বললাম, কেন, তুমি তো অমুসলিম; তুমি কীভাবে রোযা রাখ? বলল, বছরে কিছুদিন অনাহারে কাটানো উচিৎ। আমরা যখন কিছুদিনের জন্য Digestive system (হজম প্রক্রিয়া)কে অবসর রাখি, তখন শরীরের মধ্যকার কিছু ক্ষতিকর তরল পদার্থ খতম হয়ে যায়। অনেক জটিল ব্যাধিও আরোগ্য হয়ে যায়। অনাহারে থাকায় হজমপ্রক্রিয়া পূর্বের তুলনায় শক্তিশালী হয় এবং উত্তমভাবে কাজ করার যোগ্য হয়ে যায়। আমি ও আমার স্ত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমরা বছরে এক মাস উপবাস কাটাব।

আমি বললাম, সুন্নাত হলো, মাসে আইয়্যামে বীজের তিন দিন রোযা রাখা; বিশেষ করে অবিবাহিতদের জন্য। তারা বেশি-বেশি রোযা রাখবে। অনাহারে থাকার দরুন মানুষের মাঝে এক ধরনের ধৈর্য ও সৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। অবিবাহিতদের বেশি রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন তাদের যৌনশক্তি নিয়ন্ত্রণে থাকে।

বর্তমানে অমুসলিমরা এর মাঝে জাগতিক উপকারিতা দেখে এগুলোকে আপন করার চেষ্টা করছে। আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের মধ্যে ১০০ এর বেশি এমন দৃষ্টান্ত দেখেছি, আধুনিক বিজ্ঞান যাকে হুবহু সমর্থন করছে।

সুন্নাত ও বিজ্ঞানের বিরোধের মূল কারণ

যেখানে বিজ্ঞান সুন্নাতের বিরোধিতা করে, সেখানে মূল কারণ হলো, গবেষণা এখনো পূর্ণতায় পৌছেনি। বিজ্ঞানের গবেষণা যখনই চূড়ান্ত পর্যায়ে

পৌঁছে যাবে, তখন অবশ্যই একথা স্বীকার করে নিতে হবে যে, সুন্নাতের মধ্যেই উপকারিতা নিহিত রয়েছে।

সুন্নাতে নববির চ্যালেঞ্জ

আমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে যারপরনাই কৃতজ্ঞ। কারণ, তিনি আমাদেরকে এমন একটি পদ্ধতি বুঝিয়ে দিয়েছেন, যা পৃথিবীতে জীবন যাপনের সর্বোত্তম পন্থা। এর চেয়ে ভালো কোনো পদ্ধতি হতে পারে না। যে পদ্ধতিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহার করেছেন, আহার করার জন্য পৃথিবীতে এর চেয়ে আর ভালো কোনো পদ্ধতি হতে পারে না। যেভাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি পান করেছেন, পান করার এর চেয়ে ভালো আর কোনো পদ্ধতি হতে পারে না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নিয়মে শয়ন করেছেন, পৃথিবীতে এর চেয়ে ভালো কোনো শয়নপদ্ধতি হতে পারে না। আমার উক্ত দাবিটি আমি পশ্চিমা বিশ্বের বড়-বড় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের সামনে পেশ করেছি এবং বলেছি, বলো দেখি, আমার নবীর কোনো একটি সুন্নাত এমন আছে কি, যার মধ্যে হেকমত নিহিত নেই?

আহারের সুন্নাত ও আধুনিক বিজ্ঞান

খানা খাওয়ার ক্ষেত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতসমূহ কতই-না উত্তম। এর প্রথম কথা হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই খানা খেতেন, পেটের কিছু অংশ খালি রেখে দিতেন। অর্থাৎ– তিনি এ পরিমাণ খানা কম খেয়েছেন যে, ঢেকুর আসবে না। আবার একটু ক্ষুধা বাকি থাকতেই খানা পরিহার করেছেন। বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞান বলে, একটা খেজুর মানুষের দেহে গিয়ে এ পরিমাণ ক্যালরি তৈরি করে যে, লোকটি তিন দিন পর্যন্ত অনাহারে থাকলেও মারা যাবে না। চিন্তা করে দেখুন, আমরা যে পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করি, তার মাত্র ১০% খাদ্য শরীরের অংশে পরিণত হয় আর ৯০% নিংড়ে বের করে দেয়। অর্থাৎ– আমরা তো গতানুগতিকভাবে পেটভরে আহার করি; কিন্তু দেহ নিংড়ে ৯০% বের করে দেয়। পুরো খাবারের মাত্র ১০% আমাদের দেহের অংশে পরিণত হয়। আমরা তো পাকস্থলিকে ভর্তি করে দিয়েছি। ফলে এ রোগ, সে রোগ, গ্যাসের সমস্যা, পেট বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি রোগ সৃষ্টি হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খানা খেতেন, তাঁর প্রথম নীতি ছিল,

তিনি ক্ষুধার তুলনায় একটু কম খেতেন। দ্বিতীয় নীতি ছিল, এক বেলায় তিনি এক প্রকারের খাবার খেতেন। দুই প্রকার বা তার বেশি খেতেন না। আর আমরা তো এক বেলায়ই চার পাঁচ প্রকার খাবার খেয়ে থাকি। আমি মাঝেমধ্যে ভাবি, আমরা যে ধরনের তৈলাক্ত খাবার তৈরি করে থাকি, আপনি এগুলো থেকে একটু-একটু করে নিয়ে একটা পাত্রে রেখে দেখুন, কী অবস্থা হয়? দেখতেই মনে চাইবে না।

পান করার সুন্নাতসমূহ ও আধুনিক বিজ্ঞান

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পান করার রীতি কেমন ছিল? তিনি স্বতন্ত্রভাবে খানা খেতেন এবং স্বতন্ত্রভাবে পানি পান করতেন। উদাহরণস্বরূপ ধরে নিন, নবীজি খানা খেয়েছেন তো পৃথকভাবে পানি পান করতেন। আজ আধুনিক বিজ্ঞান বলে, পানি পৃথকভাবে পান করলে দেহের ওপর এর ভিন্ন প্রভাব পড়ে। আর খাবারের সাথে মিলিয়ে পানি পান করলে তারও ভিন্ন প্রভাব পড়ে। দেখুন, কেবল খানাপিনার মধ্যেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত কত উত্তম!

সিরকা ও আধুনিক বিজ্ঞান

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবারে সিরকা ব্যবহার করতেন। আধুনিক বিজ্ঞান বলে, সিরকা ব্যবহারে মানুষের হজমশক্তি ভালো হয়ে যায়। অবাক হতে হয়, নবীজির এক একটি সুন্নাতের মধ্যে কী পরিমাণ উপকারিতা রয়েছে।

লোকমা বেশি চিবানো ও আধুনিক বিজ্ঞান

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খানা খেতেন, তখন ভালোভাবে চিবিয়ে-চিবিয়ে খানা খেতেন। সাধারণত দেখা যায়, আমরা চার পাঁচবার চিবিয়ে লোকমা গিলে ফেলি, যদি এর চেয়ে বেশি পরিমাণ চিবিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে পাকস্থলির ওপর চাপ কমে। এটি কতখানি বোঝার বিষয় যে, একজন ব্যক্তি মুখেই লোকমা বেশি চিবিয়ে নিবে, যেন পাকস্থলীকে কাজ কম করতে হয়।

কম চিবানো এবং ডাক্তারদের গবেষণা

যারা খাবার কম চিবায়, সাধারণত তাদের দাঁত বেশি নষ্ট হয়। তার কারণ হলো, দাঁতের জন্য ব্যায়াম আবশ্যক। সুতরাং যদি কেউ এক পাশ দিয়ে চিবাতে অভ্যস্ত হয়, তাহলে তার অপর পাশের দাঁতগুলো নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে ডাক্তাররা বলেন, কখনো এক পাশ দিয়ে চিবিয়ে খাও আবার কখনো অপর পাশ দিয়ে চিবাও; তাহলে তোমাদের দাঁতের ব্যায়াম হতে থাকবে। এবার বলুন, একটি সুন্নাতের ওপর আমলে কী পরিমাণ উপকারিতা আজ বুঝে আসছে।

শয়নের সুন্নাত ও আধুনিক বিজ্ঞান

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান পাশে কাত হয়ে শয়ন করতেন। আজ বিজ্ঞান বলে, বাম পাশে কাত হয়ে শয়ন করলে ঘুম গভীর এবং ভয়ানক স্বপ্ন দেখে। পক্ষান্তরে ডান পাশে শয়নকারীর ঘুম গভীর হয় বটে; তবে দ্রুত ঘুম পূর্ণ হয়ে যায়। অর্থাৎ– সে দ্রুত উঠতে পারে এবং শরীরও সতেজ হয়ে যায়।

মানুষ ভয়ানক স্বপ্ন কেন দেখে?

একটি নতুন গবেষণা সম্পর্কে আমি পড়ছিলাম, বাম কাতে শয়নকারীরা ভয়ানক স্বপ্ন বেশি দেখে এবং প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছে, বাম পাশে হার্ট থাকে; ফলে কিছু অন্ত্র হার্টের ওপর গিয়ে পড়ে হার্টের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। আর হার্টের ওপর চাপ পড়লে মানুষ ভয়ানক স্বপ্ন বেশি দেখে, যেন কেউ তার হার্ট ধরে রেখেছে এবং বেঁধে রেখেছে। দেখুন, এগুলো ছিল ডান দিকে শয়নের হেকমত। এ কারণে নবীজি ডান পাশে শয়ন করতেন।

অজুর হেকমত ও চোখের ছানি রোগের চিকিৎসা

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে যখন ঘুম থেকে উঠতেন, তখন অজু করতেন। আজ বিজ্ঞান বলে, চোখের ছানি পড়ার মৌলিক চিকিৎসা হলো ভোরে চোখে পানির ছিটা দেওয়া। যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের জন্য উঠল এবং অজু করে চোখে ভালোভাবে পানির ছিটা দিল, তার ছানি রোগের চিকিৎসা হয়ে গেল!

কান ও ডিস এন্টিনা

আল্লাহ তা'আলা আমাদের কান এমন ডিজাইনে তৈরি করেছেন, যেমন ডিজাইন ডিস এন্টিনার হয়ে থাকে। কান নিয়ে একজন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানী গবেষণা শুরু করলেন। পরিশেষে তিনি তার বইয়ে লিখেছেন, হে কানের স্রষ্টা! তুমি নিজে কীভাবে বধির হতে পার? অর্থাৎ– যিনি শ্রবণের জন্য কান তৈরি করেছেন – যা শ্রবণের সর্বোৎকৃষ্ট যন্ত্র – তিনি কীভাবে বধির হবেন! তিনি তো অবশ্যই শ্রবণকারী হবেন।

ওয়াশিংটনের ডাক্তার নামাযের প্রবক্তা

ওয়াশিংটনে একবার এক ডাক্তারের সাথে সাক্ষাত হলো। তিনি বললেন, আমার মন চায়, সারা দেশে নামায বাধ্যতামূলক করে দিই। আমি বললাম, কেন? বললেন, এর মধ্যে এত রহস্য লুকায়িত রয়েছে, যার কোনো সীমা নেই। তিনি ছিলেন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ। বললেন, আপনি তো ইঞ্জিনিয়ার; তাই বুঝতে পারবেন। আমি বললাম, ঠিক আছে বলুন। বললেন, যদি মানুষের দেহকে প্রাকৃতিক দৃষ্টিতে দেখা যায়, তাহলে মনে হয়, মানুষের হার্ট হলো পাম্পের মতো। তার input এবং out put উভয়টিই রয়েছে। সারা দেহেই তাজা রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে আবার ফিরে আসছে। মানুষ যখন দাঁড়িয়ে বা বসে থাকে, তখন তার দেহের নিম্নভাগে রক্তের চাপ তুলনামূলক বেশি থাকে আর উপরিভাগে তুলনামূলক কম থাকে। যেমন– তিন তলা বিশিষ্ট বিল্ডিং-এর নিচে পাম্প লাগানো আছে। তাহলে নিচে পানি বেশি হবে। দ্বিতীয় তলায়ও কিছু পানি পৌছবে। তবে তৃতীয় তলায় মোটেই পৌছবে না। অথচ একই পাম্প, যা প্রথম তলায় পূর্ণ পানি পৌছায় এবং দ্বিতীয় তলায় সামান্য পরিমাণ আর তৃতীয় তলায় মোটেও পৌছায় না।

উক্ত উদাহরণটিকে সামনে রেখে যদি ভাবেন, তাহলে দেখবেন, মানুষের হার্ট পাম্পের মতো রক্ত প্রবাহিত করছে। এই রক্ত নিচের অঙ্গগুলোতে পূর্ণ মাত্রায় পৌছে; কিন্তু উপরের অঙ্গগুলোতে এ পরিমাণ পৌছে না। যখন এমন কোনো অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, মানুষের মাথা নিচে থাকে, তাহলে মাথার মধ্যে রক্ত সঠিকভাবে পৌছে যায়। যেমন– মানুষ যখন সেজদায় যায়, তখন মনে হয় যেন চেহারাটা রক্তে ভরে গেছে। মানুষ যদি একটু লম্বা সেজদা করে, তাহলে মনে হয় যেন সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম শিরাগুলোতেও রক্ত পৌছে গেছে। তিনি বললেন, সাধারণত মানুষ বসে বা দাঁড়িয়ে থাকে অথবা শুয়ে থাকে। বসা,

শোওয়া ও দাঁড়ানো অবস্থায় মানুষের হার্ট নিচে থাকে আর মাথা উপরে থাকে। একটিমাত্র সুরত হলো, যখন মানুষ নামাযের সেজদায় যায়, তখন হার্ট উপরে থাকে আর মাথা নিচে থাকে। ফলে রক্ত ভালোভাবে চেহারার চামড়ায় পৌঁছে যায়।

স্থায়ী সৌন্দর্যের রহস্য

নামাযী ব্যক্তির চেহারায় বেশ সতেজতা থাকে। কারণ, নামায ও সেজদার কারণে তার সবগুলো শিরায় রক্ত পৌঁছে যায়। আর বেনামাযীর চেহারায় এক ধরনের শুষ্কতা ছেয়ে যায়। একারণে হাদীছে পাকে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি নামায পড়ে, তার চেহারায় নূর থাকে।

মহিলাদের নামাযের পরামর্শ

উক্ত ডাক্তার বললেন, বিশ্বাস করুন, যদি মহিলারা জানত, নামাযে লম্বা সেজদার ফলে চেহারার সতেজতা ও সৌন্দর্য কী পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহলে তারা সেজদা থেকে মাথা তুলতই না।

মেসওয়াকের সুন্নাত

বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলে, মানুষ যা-কিছু আহার করে, তার মুখে প্লাজমা (রক্তরস) তৈরি হয়। আর এ প্লাজমা কেবল কুলি করলে যায় না বরং মেসওয়াক বা ব্রাশ করা জরুরি হয়ে পড়ে। শোওয়া অবস্থায় দাঁত বেশি নষ্ট হয়। কারণ, ওই অবস্থায় মুখ বন্ধ থাকে। আর বন্ধ মুখে জীবাণুগুলোর ক্ষতিসাধন সহজ হয়। আর দিনের বেলায় কখনো মানুষ কথা বলে, কখনো খায় আবার কখনো পান করে। ফলে দিনের বেলায় মুখ নড়াচড়া করতে থাকে। এ কারণে প্লাজমাগুলো কাজ করার সুযোগ পায় না। রাতে যখন মুখ বন্ধ থাকে, তখন কাজ করতে সুযোগ পায়। এজন্যই রাতের বেলা দাঁত বেশি নষ্ট হয়। সকালে দাঁত মাজুন আর না মাজুন রাতে অবশ্যই মাজা উচিৎ।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ও দাঁত

আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের নবীর সুন্নাত হলো, তিনি রাতে উজু করে শয়ন করতেন এবং মেসওয়াকবিহীন উজু করতেন না। যখনই মানুষ খানা খাবে, তখনই উজু করবে এবং মেসওয়াক করবে। তাতে দাঁতের ক্ষতি থেকে

রক্ষা পাবে। বরং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহারের পূর্বে হাত ধুতেন এবং খাওয়ার পর কুলি করতেন। আর এখন মানুষ খানা খেয়ে ওভাবেই উঠে যায়। অথচ তার মুখে মিষ্টি জিনিস, খাদ্যের ক্রিয়া দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বাকি থাকে। যদি ওই সময় কুলি করার অভ্যাস হয়ে যায়, তাহলে অনেক উপকার হবে। তারপর দিনে পাঁচবার উজু করে। এতে মুখ বেশ পরিষ্কার থাকে।

ফ্রান্সের এক সার্জনের ঘটনা

তাবলীগ জামাতের এক বন্ধু ফ্রান্সে গেলেন। তিনি বলেন, আমি সেখানে অজু করছিলাম। একব্যক্তি দাঁড়িয়ে খুব গভীরভাবে দেখছিল। আমি বিষয়টি অনুভব করলাম। আমি উজু করতে থাকলাম। যখন উজু শেষ করলাম, তিনি আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে? আমি বললাম, আমি মুসলমান। জিজ্ঞাসা করলেন, কোথা থেকে এসেছেন? বললাম, পাকিস্তান থেকে। বললেন, পাকিস্তানে পাগলাগারদ কতগুলো আছে?

বড় আশ্চর্য ধরনের প্রশ্ন! আমি বললাম, দুই বা চারটা; আমি ঠিক জানি না। তিনি বললেন, তুমি জান না? আমি বললাম, আমি তো জানি না। তিনি বললেন, এখন তুমি এটা কী করলে? আমি বললাম, উজু করেছি। বললেন, দৈনিক কর? আমি বললাম, হ্যাঁ; বরং রোজ দিনে ও রাতে পাঁচবার উজু করি। তিনি বললেন, বাহ! আমি দেখেছি! আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই আপনার উদ্দেশ্য কী? তিনি বললেন, আমি এখানকার পাগলাগারদের সার্জন। আমি গবেষণা করছি, মানুষ পাগল হয় কেন? আমার গবেষণার ফলাফল হলো, মানুষের মস্তিষ্কের সিগন্যাল গোটা দেহে যায়। তখন আমাদের দেহের অঙ্গগুলো কাজ করে। মস্তিষ্ক থেকে কয়েকটা সূক্ষ্ম রগ আমাদের ঘাড় হয়ে সারা দেহে চলে গেছে। আমি গবেষণা করেছি, যদি চুল বেশি বড় করে দেওয়া হয় এবং ঘাড়ের পিছনের অংশকে বেশি শুষ্ক রাখা হয়, তাহলে রগগুলোর মাঝে শুষ্কতা সৃষ্টি হয় এবং সেগুলো সংকুচিত হয়ে যায়। ফলে মাঝেমধ্যে এমনও হয় যে, মানুষের মস্তিষ্ক কাজ করে না। এজন্য ডাক্তারগণ ভেবেছেন, এ জায়গাটাকে দিনে চারবার ভিজিয়ে রাখা উচিৎ। আমি দেখলাম, আপনি হাত-মুখ তো ধুয়ে নিলেন; কিন্তু গর্দানের পিছনের দিকেও কিছু করলেন। এরপর আপনারা কীভাবে পাগল হবেন?

চিন্তার বিষয়

এবার ভাবুন, একজন ডাক্তারের সারা জীবনের গবেষণা একটি মুস্তাহাব পর্যন্ত এসে শেষ হয়। যদি মুস্তাহাবের মধ্যে এত হেকমত লুকায়িত থাকে, তাহলে ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাতসমূহের মধ্যে কী পরিমাণ হেকমত লুকায়িত রয়েছে?

আমার ব্যক্তিগত ঘটনা ও সুন্নাতের উপকারিতা

একবার আমার একটি মিটিং ছিল। সেই মিটিংয়ে আমেরিকান কোম্পানীর তিনজন ডাইরেক্টর ও জেনারেল ম্যানেজার ছিল। আমরা এক টেবিলে বসে খানা খাচ্ছিলাম। আমি দেখলাম, দুজন আমেরিকান হাত দিয়ে খানা খায়। অথচ একপাশে ছুরি ও কাটা চামচ রাখা ছিল। আমি বেশ অবাক হলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা ছুরি-চামচ ব্যবহার করলেন না কেন? তারা বলল, আমরা হাত দিয়ে খেতে পছন্দ করি। আজ প্রথমবার দেখলাম, শেতাঙ্গরা ছুরি-চামচ বাদ দিয়ে আঙুল দিয়ে খানা খায়। আহারশেষে তারা পালাক্রমে সবগুলো আঙুল চেটে পরিষ্কার করল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা এটি কী করলে? তারা বলল, এটি একটি নতুন গবেষণা যে, আঙুল দিয়ে খানা খেলে আঙুলের পশমের গোড়ায় প্লাজমা (রক্তরস) বের হয়, যা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যেমে দেখা যায়। এ প্লাজমা খাবারের সাথে মুখে যায় এবং হজমে সহায়তা করে। তারা বলল, আমরা ছুরি-চামচের পরিবর্তে আঙুল দিয়ে খানা খেতে পছন্দ করি।

সফল জীবন

বন্ধুগণ! দুনিয়া যেদিকেই যাক-না কেন, কোনো একদিন তাদেরকে আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে উপস্থিত হতেই হবে। এ পৃথিবীকে একদিন পেরেশান হয়ে মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসতেই হবে। এ আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মুসলমান হওয়ার এবং সুন্নাত মোতাবেক আমল করার মতো দৌলত দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে অগ্রসর হওয়ার এবং সুন্নাত মোতাবেক জীবন যাপনের তাওফীক দান করুন। আমীন!

ہر کہ عشق مصطفے سامان اوست   بحر و بر در گوشہ دامان اوست

মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা যার সম্বল হয়, তার আঁচলকোণে ডাঙা ও স্থল সব কিছুই রয়।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

খুতুবাতে যুলফিকার

[দ্বিতীয় খণ্ড]

ইসলাম আমার প্রিয় ধর্ম কেন?

'পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, জাহিলিয়াতের যুগে আরব জাতি সকল অন্যায়-অপরাধের হোতা ছিল। প্রচণ্ড গরমের পর রহমতের বৃষ্টি অথবা আঁধার রাতের পর দীপ্তিমান সূর্য যেভাবে আগমন করে, ইসলামও ঠিক সেভাবেই এ ধরায় আগমন করেছে। অধুনা বিজ্ঞানের উন্নতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দূরত্বকে এমনভাবে সংকুচিত করে দিয়েছে, যেন গোটা বিশ্ব একটি আন্তর্জাতিক পল্লীতে (Global villge) পরিণত হয়েছে। যোগাযোগমাধ্যম পরস্পরের মনের কথা জানা ও শোনা অতি সহজ করে দিয়েছে। যুবসমাজ ইন্টারনেট (Internet) ইত্যাদির মাধ্যমে বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব পর্যন্ত পৌঁছতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সকল ধর্মের অনুসারীদের দাবি হলো, তাদের আঁচলে সততার ভান্ডার বিদ্যমান। অদ্যকার আলোচনায় বিভিন্ন ধর্মের শিক্ষার তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করে প্রমাণ করা হবে, ইসলাম আমার প্রিয় ধর্ম কেন?'

ইসলাম আমার প্রিয় ধর্ম কেন?

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

وَقَالَ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ : اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

দীন মানবিক প্রয়োজন

মানবদেহের জন্য বাতাস যেমন, মানুষের আত্মার জন্য দীন তেমন। মানুষ ধর্মের ছায়াতলেই জন্ম গ্রহণ করে।

فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

'এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার ওপর তিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন।'[১]

পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, জাহিলিয়াতের যুগে আরব জাতি সকল অন্যায়-অপরাধের হোতা ছিল। প্রচণ্ড গরমের পর রহমতের বৃষ্টি অথবা আঁধার রাতের পর দীপ্তিমান সূর্য যেভাবে আগমন করে, ইসলামও ঠিক সেভাবেই এ ধরায় আগমন করেছে। অধুনা বিজ্ঞানের উন্নতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দূরত্বকে এমনভাবে সংকুচিত করে দিয়েছে, যেন গোটা বিশ্ব একটি আন্তর্জাতিক পল্লীতে (Global villge) পরিণত হয়েছে। যোগাযোগমাধ্যম পরস্পরের মনের কথা জানা ও শোনা অতি সহজ করে দিয়েছে। যুবসমাজ ইন্টারনেট (Internet) ইত্যাদির মাধ্যমে বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব পর্যন্ত পৌঁছতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সকল ধর্মের অনুসারীদের দাবি হলো,

---

১. সূরা রূম : আয়াত ৩০

তাদের আঁচলে সততার ভান্ডার বিদ্যমান। অদ্যকার আলোচনায় বিভিন্ন ধর্মের শিক্ষার তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করে প্রমাণ করা হবে, ইসলাম আমার প্রিয় ধর্ম কেন?

ইসলামই প্রিয় ধর্ম

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ

'নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহর প্রিয় ধর্ম।'[১]

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন :

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

'আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম কামনা করবে, তার পক্ষ থেকে তা কখনই গৃহীত হবে না।'[২]

তারপর অন্য জায়গায় বলেছেন :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম।'[৩]

প্রথম দলিল : পৃথিবীর অন্য সকল ধর্মের ওপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব

পৃথিবীর বিভিন্ন আসমানি ধর্ম আপন-আপন সময়ে মহান রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে। সর্বশেষে এসেছে ইসলাম। কাজেই এটি সবচেয়ে বেশি পূর্ণাঙ্গ। সাধারণত পূর্বের ধর্মগুলোর নামকরণ করা হয়েছে কোনো ব্যক্তি বা গোত্রের নামে। যেমন– ইয়াহুদ একটি গোত্রের নাম আর এ নামেই ইহুদি ধর্ম প্রসিদ্ধি পায়। হযরত ঈসা (আ.)কে যিশুখ্রিষ্ট বলে, যার ফলে খ্রিষ্টান নামটি প্রসিদ্ধ হয়। জরথুস্ত্র ধর্ম তার প্রতিষ্ঠাতার নামেই নামকরণ হয়। বুদ্ধের নামে বৌদ্ধধর্মের নাম ছড়িয়ে পড়ে। অথচ এক্ষেত্রে

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৯
২. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৮৫
৩. সূরা মায়েদা : আয়াত ৩

ইসলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন ও ব্যতিক্রম। ইসলাম কোনো ব্যক্তি, গোত্র বা স্থানের নাম নয়। ইসলাম শব্দটির শাব্দিক অর্থ আনুগত্য। ইংরেজীতে বলে To Surrender অর্থাৎ কারো সামনে নিজের অস্ত্র ফেলে দেওয়া। যেলোক কালেমা পড়ে মুসলমান হয়, সে যেন আল্লাহ তা'আলার সামনে অস্ত্র ফেলে দেয়। সুতরাং ইসলাম নামের সম্পর্ক ও অর্থের দিক দিয়ে অন্য সকল ধর্মের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

দ্বিতীয় দলিল : আসমানি কিতাবসমূহের ঐতিহাসিক জরিপ

হাজার-হাজার নবী-রাসূল বনী ইসরাইলে অতিবাহিত হয়েছেন। তাদের অনেকের ওপর ইলহামি কিতাবও নাযিল হয়েছে। আসুন আমরা জরিপ করে দেখি, নবীগণের জীবনী ও তাদের কিতাবগুলো যথাসময়ে সংরক্ষণ হয়েছিল কি-না?

জাবুরে পরিবর্তন

হযরত দাউদ (আ.)-এর ওপর জাবুর অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু তা লিপিবদ্ধ হয়েছে তাঁর ইন্তেকালের পাঁচশত বছর পর। একশত কবির কবিতাও তাতে সংজোযন করা হয়েছে। যেমন– মনে করুন, মাওলানা রুমীর মছনবী, গুলিস্তা, বোস্তাঁ ইত্যাদির অনেক কবিতা অনেক উন্নত। তাই বলে তো তা কুরআনের মধ্যে গণ্য করা যায় না। কিন্তু তারা তৎকালীন একশত কবির নির্বাচিত কবিতা জাবুরে সংযোজন করে দিয়েছে।

তাওরাতে রদবদল

হযরত মূসা (আ.)-এর ওপর তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছে। বাবেল অধিবাসীরা হযরত ঈসা (আ.)-এর ছয়শত বছর পূর্বে বাইতুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করে। সে সময় তাওরাতের বোর্ডগুলোও ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর হযরত ঈসা (আ.)-এর পাঁচশত বছর পূর্বে তারা মুক্তি লাভ করে। তখন তারা নতুনভাবে তাওরাত লিপিবদ্ধ করে। কিন্তু আজও পর্যন্ত ইতিহাস প্রমাণ করতে পারেনি, পুরাতন তাওরাতের সঙ্গে নতুন তাওরাতের সম্পূর্ণ মিল রয়েছে।

- হযরত ঈসা (আ.)-এর ৮০০ বছর পূর্বে হযরত ইউনুস (আ.) নবী হয়েছেন। অথচ ঈসা (আ.)-এর মাত্র ৩০০ বছর পূর্বে এক ব্যক্তি তাঁর জীবনী রচনা করেছেন।

- হযরত ঈসা (আ.)-এর ৯৩৩ বছর আগে হযরত সুলাইমান (আ.) ইন্তেকাল করেন। অথচ হযরত সুলাইমান (আ.)-এর জীবনী ঈসা (আ.)-এর ২৫০ বছর পূর্বে লিখা হয়েছে।

- ৭০ খ্রিষ্টাব্দে এই কিতাবগুলো বাইতুল মুকাদ্দাস দ্বিতীয়বার বিধ্বস্ত হওয়ার সময় বিনষ্ট হয়ে যায়। তখন কেবল ইউনানি ভাষার অনুবাদই অবশিষ্ট থাকে। একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, অনুবাদ কখনোই মূল কিতাব হতে পারে না।

- এ বিষয়টি সর্বজনস্বীকৃত যে, বর্তমানে ইহুদি সম্প্রদায়ের নিকট তাওরাতের যে কপিগুলো রয়েছে, তার মধ্যে ৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে হিব্রু ভাষায় লিখিত কপিটি সর্বাধিক প্রাচীন।

- কৃষ্ণসাগর (Black Sea)-এর নিকটে অবস্থিত গারে কামরান থেকে যে সকল হিব্রু বোর্ড পাওয়া গেছে, সেগুলোও ঈসা (আ.)-এর একশত বা দুইশত বছর পূর্বের।

- সামেরীদের নিকট থাকা তাওরাতের কপিগুলোর মধ্য হতে ১১০০ খ্রিষ্টাব্দে লিখা কপিটি সর্বাধিক প্রাচীন।

Oral law এর বাস্তবতা

প্রাচীন আমলের লোকদের বানানো প্রবাদ বাক্যের প্রচলন যেমন আমাদের মাঝে রয়েছে, তেমনি ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রাচীন পুরুষদের কিছু প্রবাদ বাক্য তাদের মাঝে প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। এগুলোকে তারা Oral law বলে। ইহুদিদের এই প্রবাদ বাক্যগুলো ১৩০০ বছর পর্যন্ত অলিখিত ছিল এবং মৌখিকভাবে বর্ণিত হয়ে আসছিল। এবার বলুন, যে উক্তিগুলো ১৩০০ বছর যাবৎ মৌখিকভাবে বর্ণিত হয়, সেগুলো তো ব্যক্তিগত মতামতের পাহাড়ে পরিণত হয়। এ হলো তাদের Oral law এর বাস্তব চিত্র। ইংরেজী ২য় শতাব্দীতে আবু ইয়াহুদা ইবনে সামউন এগুলোকে Mishnah নামে পুস্তকের আকার দান করেন। ফিলিস্তিনি ইহুদিরা এর অনুবাদ করে Hqlakh নামে অভিহিত করেছে। বাবেলের ইহুদিরা যখন এর অনুবাদ করল, তখন তারা এর নাম রাখল Haggadah ব্যাপকহারে বিকৃত এই তিনটি পুস্তকের সমষ্টিকে ‘কালহুদ’ বলা হয়। আর এগুলোই হলো ইহুদিদের পুঁজি।

ইনজীলে বিকৃতিসাধন

হযরত ঈসা (আ.)-এর ভাষা ছিল সুরিয়ানি। হযরত ঈসা (আ.)কে প্রথমবার আসমানে তুলে নেওয়ার পর ইনজীল (বাইবেল) লেখা হয়েছে। তবে আরামি ভাষায় লেখা হয়েছে নাকি ইউনানি ভাষায় এ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। সুলাইমান (আ.)-এর ইন্তেকালের পর 'আমছালে সুলাইমান' নামে একটি কিতাব সংকলিত হয়। এই কিতাবগুলোকে পরবর্তীতে বাইতুল মুকাদ্দাসে সংরক্ষণ করা হয়েছে। তবে ৭০ খ্রিষ্টাব্দে বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরায় বিধ্বস্ত হলে এই কিতাবগুলো বিনষ্ট হয়ে যায়। ইউনানি ভাষার অনুবাদই কেবল অবশিষ্ট থেকে যায়।

খ্রিষ্টানদের নিরুত্তর করে দেওয়ার মতো কতিপয় প্রশ্ন

যদি খ্রিষ্টানদের জিজ্ঞেস করা হয়, New Testament এর ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ কে, কখন এবং কেন করেছে? এর ইতিহাস তাদের কাছে নেই। ইংরেজী চতুর্থ শতাব্দীতে এক খ্রিষ্টান পাদ্রী ভাবলেন, আমাদের কিতাবের হাজার-হাজার কপি একটির সাথে অপরটির অমিল রয়েছে। কাজেই আমাদেরকে কিছু করতে হবে। ফলে পোপের অনুমতিক্রমে ইনজীলের ৭০টি কপি একত্রিত করা হয়। কিন্তু খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় নেতৃবর্গ কেবল চারটিকে নির্বাচন করলেন। এমনটি কেন করলেন? কেয়ামত পর্যন্ত কোনো খ্রিষ্টান পোপ এর কোনো জবাব দিতে পারবেন না।

উক্ত চারটি কপির একটি হলো Sir king james version যা বর্তমান খ্রিষ্টজগতের কাছে সমাদৃত। version (ভারসন) কাকে বলে জানেন? কোনো কিতাবে সংযোজন-বিয়োজন করা হলে তার দ্বিতীয় সংস্করণকে version বলে। মোটকথা version শব্দটিই বলে দেয়, এই কিতাবে সংযোজন-বিয়োজন রয়েছে। বাস্তবতাও এমনই যে, পূর্বের কিতাবের সাথে নতুন কিতাবের পাঁচটি অধ্যায়ের পার্থক্য রয়েছে। পূর্বের কিতাবটির তুলনায় নতুন কিতাবটিতে পাঁচটি অধ্যায় কম রয়েছে। ওই পাঁচটি অধ্যায়কে কেন বাদ দেওয়া হলো? খ্রিষ্টজগতের কাছে এযাবৎ এর কোনো জবাব মেলেনি।

সুইডেনে এক খ্রিষ্টান মেয়ের সাথে কথোপোকথন

'আমি একবার সুইডেনের এক কলেজে 'ইসলাম' শিরোনামে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলাম, কুরআনই পৃথিবীর একমাত্র কিতাব, যা এখনও মূল

অবস্থায় বিদ্যমান। এক খ্রিষ্টান মেয়ে প্রশ্ন করল, তাহলে কি আমাদের কাছে মূল কিতাব নেই? আমি জিজ্ঞেস করলাম, বলো তো হযরত ঈসা (আ.)-এর ওপর ইনজীল কিতাবটি কোন ভাষায় নাযিল হয়েছিল? সে বলল, সুরিয়ানি ভাষায়! আমি বললাম, বর্তমানে কোন ভাষায় আছে? সে বলল, ইংরেজী ভাষায়। আমি বললাম, তাহলে বোঝা গেল, ইনজীল যে ভাষায় নাযিল হয়েছিল, বর্তমানে তোমাদের কাছে সেই ভাষায় নেই। মেয়েটি স্বীকার করল, হ্যাঁ; আমাদের কাছে তার ইংরেজী অনুবাদ রয়েছে। আমি বললাম, তাহলে তোমরা একে Words of God (আল্লাহর কালাম) বলতে পারবে না। সে ক্লাশের সকলের সামনে স্বীকার করে নিল, বাস্তবেই আমাদের কাছে মূল ইনজীল নেই।

ইনজীলের অনুবাদ কীভাবে করা হয়েছে

ইনজীলের অনুবাদ করতে গিয়ে খ্রিষ্টানরা একটি ব্যতিক্রম কাজ করেছে যে, তারা মানুষের নামেরও অনুবাদ করে দিয়েছে। অথচ যেকোনো ভাষায় অনুবাদ করতে গেলে নামের কোনো অনুবাদ হয় না। যেমন– ধরুন, এক ব্যক্তির নাম মি. ব্ল্যাক। আপনি বাংলায় অনুবাদকালে তাকে মিষ্টার কালো বলতে পারবেন না। মি. ব্রাউনকে আপনি মি. বাটা বলতে পারবেন না, মোটকথা, সর্বসম্মত বিধি হলো, যেকোনো ভাষায়ই অনুবাদ হোক-না কেন, মানুষের নামের কোনো অনুবাদ হয় না। ইনজীলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নাম আহমাদ নামে উল্লেখ ছিল। আহমাদ শব্দটির শাব্দিক অর্থ সর্বাধিক প্রশংসাকারী। ফলে খ্রিষ্টানরা এর অনুবাদ করেছে The Praised one এখন যদি কেউ Praised one শব্দটি বলে, তাহলে কোনো শ্রোতা কখনই বুঝতে সক্ষম হবে না, কার কথা বলা হচ্ছে। হ্যাঁ; যদি আহমাদ শব্দটি উচ্চারণ করে, তাহলে সবাই অনায়াসে বুঝে নিবে, আহমাদ বলতে আল্লাহর একজন নবীকে বোঝানো হয়েছে।

খ্রিষ্টানরা নামের অনুবাদ করেই কেবল ক্ষান্ত হয়নি; বরং তারা নামের বিকৃতি সাধনও করেছে। যেমন– তাদের নবী ছিলেন ঈসা (আ.)। একে তারা বানিয়েছে Esis (ইসিজ)। তারপর তাদের অভ্যাস অনুযায়ী শুরুতে J বর্ণটি বৃদ্ধি করে Jesis বানিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে (জেসিজ) বলে অভিহিত করে। এমনিভাবে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নামের শুরুতে J বর্ণটি যোগ করে Joseph (জোসেফ) বানিয়ে দিয়েছে। ইউহান্না নামক আরবি শব্দটিকে জোহন বানিয়েছে। ইয়াকুব (আ.)-এর নামের শুরুতে J বৃদ্ধি করে Jacob

(জেকুব) বানিয়েছে। সারকথা, খ্রিষ্টানরা অনেকগুলো নামের অনুবাদ করেছে এবং অনেক নামে অক্ষর বৃদ্ধি করে বিকৃত করে দিয়েছে। ভাববার বিষয় হলো, নামের সঙ্গে যখন তারা এই আচরণ করেছে; এমতাবস্থায় কিতাবগুলোর দশা কী হবে?

জরথুস্ত্র ধর্মের কিতাবসমূহের জরিপ

জরথুষ্ট ধর্মের প্রণেতার সঠিক জন্মতারিখই জানা নেই। আনুমানিক বাদশাহ ইসকান্দারের ইরান বিজয়ের ২৫০ বছর আগে তার জন্ম। তার কিতাব উস্তা বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। কিতাবটির ভাষাও বর্তমানে দুর্লভ। তার আদর্শ সম্পর্কে কেবল এতটুকু জানা যায় যে, তিনি ৪০ বছর বয়সে ধর্ম প্রচার করেন। তৎকালীন বাদশাহ তার ভক্ত হয়ে যান। ফলে জরথুষ্ট রাষ্ট্রধর্মে পরিণত হয় এবং পৃথিবীর কোনো-কোনো অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

বৌদ্ধধর্মের কিতাবাদির অবস্থা

বৌদ্ধধর্মের প্রণেতা কোনো কিতাব লেখেনওনি এবং লেখানওনি। তার ইন্তেকালের একশত বছর পর এক ব্যক্তি তার বাণী ও জীবনী সংকলন করেছে।

ইসলামের কুরআন সংরক্ষণ

এবার আসুন, পবিত্র কুরআন সংকলনের বিষয়টি অনুসন্ধান করি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে পবিত্র কুরআনকে চারভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

১. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যখন ওহী নাযিল হতো, তখন তিনি যেসব সাহাবীকে ডেকে নিজেই তা লিখিয়ে দিতেন, তাঁরা 'কাতেবীনে ওহী' তথা 'ওহী লেখক' হিসেবে খ্যাত ছিলেন। অদ্যাবধি তাদের নাম বিভিন্ন কিতাবে সংরক্ষিত আছে।

২. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই কুরআনের হাফেয ছিলেন। প্রতি বছর রমজান মাসে তিনি জিবরাইল (আ.)কে কুরআন শোনাতেন।

৩. কয়েক হাজার সাহাবী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো কুরআন শরীফ হিফজ করেছিলেন।

৪. এছাড়াও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কেউ চামড়ার ওপর, কেউ পাথরের ওপর, কেউ গাছের পাতায় লিখে কুরআনুল কারীমকে সংরক্ষণ করেছেন।

গাছের পাতায় লেখা কুরআন শরীফ

আমার একবার সমরকন্দ যাওয়ার সুযোগ হলো। সেখানকার এক লাইব্রেরীতে লোহার পাতের ওপর লেখা কুরআন শরীফ দেখতে পেলাম। লাইব্রেরীর দায়িত্বশীল মহিলা অপর একটি কপি আমাকে দেখিয়ে বলল, এটি একটি দুর্লভ বস্তু। আমি যখন সেটি দেখলাম, আপনি বিশ্বাস করুন, মনে হলো যেন পাতার শিরাগুলো এখনো স্পষ্ট দেখা যায়। লোহাকাঠ গাছের পাতায় যেমন শিরা-উপশিরার মতো দেখা যায়, ঠিক তেমন মনে হচ্ছিল। আমি হাত দ্বারা স্পর্শ করে দেখলাম। অবিকল গাছের পাতাকেই পুস্তকাকারে বাঁধাই করা হয়েছে। কোন আমলে লেখা হয়েছে, তা কারো জানা নেই। তবে এতটুকু নিশ্চিত বলা যায়, কাগজ আবিষ্কারের পূর্বে লেখা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ! আজ অবধি গাছের পাতায় লেখা পবিত্র কুরআন সংরক্ষিত আছে!

আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর যুগে কুরআন সংরক্ষণ

ইয়ামামার যুদ্ধে বহুসংখ্যক হাফেযে কুরআন শাহাদাতবরণ করলে সাইয়্যিদুনা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) হযরত ওমর (রাযি.)-এর পরামর্শক্রমে পবিত্র কুরআনের লিখিত অংশগুলো একত্রিত করান। হযরত জায়েদ ইবনে ছাবিত (রাযি.)-এর নেতৃত্বে হাফেযগণের একটি জামাত গঠন করে বলে দিলেন, গোটা কুরআন শরীফকে এমনভাবে একত্রিত করবে, যেন তার একটি অক্ষরও পরিবর্তন না হয়। যার ফলে সিদ্দীকে আকবার (রাযি.) কুরআন শরীফের সংকলক হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

হযরত ওসমান (রাযি.) কর্তৃক কপিবদ্ধ করা

সাইয়্যিদুনা হযরত ওসমান গনী (রাযি.) তাঁর খেলাফত আমলে পবিত্র কুরআনের একই ধরনের চারটি কপি তৈরি করেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন। আজও তার দুটি কপি সংরক্ষিত আছে। একটি তাশখন্দে অপরটি ইস্তাম্বুলে। তাশখন্দের কপিটি আমি স্বচক্ষে দেখেছি। ইতিহাসের কিতাবে পড়েছি, হযরত ওসমান (রাযি.)-এর শাহাদাতকালে তাঁর

সম্মুখে থাকা কুরআনে পাকের কপিটিতে রক্ত পড়েছিল। আমি উক্ত কপিটি প্রদর্শনকালে যখন

فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

'তাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।'[১]

আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলাম, ঠিক এখানে ধারণা করা হয় যে, এটি হযরত ওসমান (রাযি.)-এর রক্তের দাগ। আল্লাহর দরবারে অগণিত শোকর আদায় করছি যে, সাহাবায়ে কেরামের যুগের লেখা আজও সংরক্ষিত রয়েছে।

কুরআন সম্পর্কে শত্রুদের স্বীকারোক্তি

জার্মানিতে মিউনিখ ইউনিভার্সিটির একটি ধর্মীয় শাখা, যা ডিপার্টমেন্ট অফ থিওলোজি নামে খ্যাত, সেখানকার প্রফেসরগণ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলমানদের কিতাব (কুরআন শরীফ) একত্রিত করে এগুলোর মাঝে কোনো বৈপরীত্ব আছে কিনা তা যাচাইয়ের লক্ষ্যে মোটা অংকের অর্থ বরাদ্দ করল। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে চল্লিশ হাজার কুরআন শরীফ সংগ্রহ করা হলো। মিলিয়ে দেখা গেল, একটির সাথে অপরটির একটি অক্ষর তো দূরের কথা, একটি নুকতারও পার্থক্য নেই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

'উক্ত উপদেশ গ্রন্থ আমি নাযিল করেছি আর এর সংরক্ষণের দায়িত্বও আমার।'[২]

মোটকথা, কুরআনের বেলায় বিন্দুমাত্রও সন্দেহ পোষণ করার সুযোগ নেই। কাজেই নির্বিঘ্নে বলা যায়, ইহা Words of God বা আল্লাহর কালাম।

কুরআনের ভাষাও সংরক্ষিত আছে

আল্লাহর কালাম যেমন সংরক্ষিত, তেমনি যে ভাষায় সেটি নাযিল হয়েছে, সে ভাষাও সংরক্ষিত রয়েছে। কুরআন শরীফ নাযিল হওয়ার সময় আরবি ভাষা কেবল একটি রাষ্ট্রে চালু ছিল। বর্তমানে ২১টি রাষ্ট্রে আরবি ভাষা চালু আছে। এই কিতাবের ভাষা জীবন্ত। এই কিতাবও জীবন্ত। এর অনুসারীরাও

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ১৩৭

২. সূরা হিজর : আয়াত ৯

জীবন্ত। সুতরং প্রমাণিত হলো, ইসলামের আঁচলে থাকা আসমানি কিতাবটি আজও অবিকল সংরক্ষিত রয়েছে। অথচ ইহুদি-খ্রিষ্টানদের কাছে মূল আসমানি কিতাব নেই; বরং আছে তার বিকৃত ইংরেজি অনুবাদ।

তৃতীয় দলিল : নবীজির সীরাতও (আদর্শ) সংরক্ষিত!

যে নবী আমাদের নিকট ইসলাম ধর্ম পৌঁছে দিয়েছেন, তাঁর সীরাত সংরক্ষিত থাকাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এছাড়া তো তাঁর অনুসরণ করাও সম্ভব নয়। দুনিয়া উল্টে গেলেও ইহুদিরা আমাদেরকে হযরত মূসা (আ.)-এর সীরাত দেখাতে পারবে না। কিন্তু ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যার অনুসারীরা (মুসলমানরা) তাদের নবীর নবুওতকাল থেকে নিয়ে এই ধরা ত্যাগ করা পর্যন্ত তাঁর রাত-দিনের প্রতিটি কথা, কাজ, আচার, আচরণসহ সব কিছুর প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম।

চতুর্থ দলিল : ইসলাম স্বভাবজাত ধর্ম

হাদীছে পাকে বর্ণিত আছে–

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلٰى فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ

'প্রতিটি শিশু ইসলামি স্বভাব নিয়ে জন্মায়।'[১]

প্রতিজন সুস্থ স্বভাবের অধিকারী ব্যক্তির মাঝেই যেন ইসলামি বিধিবিধান জানার আগ্রহ বিদ্যমান। একজন সাধারণ ব্যক্তি যদি কোনো বিষয়ে ইসলামের বিধান জানতে চায়, তাহলে এর জন্য তার বক্ষমাঝেই মুফতী (সমাধান দানকারী) বিদ্যমান। হাদীছে রয়েছে–

اِسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ

'মানুষ ফাতওয়া দিলেও তুমি তোমার বিবেকের কাছে ফাতাওয়া চেয়ে নাও।'[২]

ইহুদি, খ্রিষ্টান, হিন্দু বা অন্য কেউ এই নেয়ামত অর্জন করতে পারেনি। খ্রিষ্টানরা বৈবাহিক জীবনকে আল্লাহ তা'আলার মারেফাত হাসিলের পথে অন্তরায় জ্ঞান করা ও নারীদের (Nuns) একক জীবন যাপনে উৎসাহিত করা সম্পূর্ণ মানবস্বভাবের পরিপন্থী। হিন্দুধর্মে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে আগুনের

---

১. ছহীহ বোখারি : হাদীছ নং ১২৯৬

২. দারেমি : হাদীছ নং ২৫৮৮

চিতায় গিয়ে জীবন্ত আত্মাহুতি দেওয়া মানবতাকে চপেটাঘাত করার শামিল। নবুওত কেবল বনী ইসরাইলের উত্তরাধিকার; অবশিষ্ট মানবতা তাদের দুয়ারের ভিক্ষুক ইহুদিদের এমন ধারণা সম্পূর্ণ বিবেকবর্জিত। মানবসমাজ থেকে সরে গিয়ে নির্জনতা অবলম্বন করা, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানসহ অন্যান্য প্রয়োজনাদি থেকে দূরে থাকার ভাবনা একেবারেই মানবস্বভাব বিরোধী।

৫ম দলিল : ইসলামি ইবাদতগুলো সাদাসিধে ও আমলযোগ্য

ইসলামি ইবাদতগুলো বিস্ময়কর রকম সাদাসিধা। আমরা নামাযের জন্য অজু করি। যেন আমরা সেই অঙ্গগুলোকে ধুয়ে পরিষ্কার করি, সাধারণত কাজ-কর্ম করতে গিয়ে যেগুলোকে খুলে রাখি। যেমন কনুইসহ দু-হাত, সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল, মাথার চুল, টাখনুসহ উভয় পা। এগুলোকে উজুর ফরজ সাব্যস্ত করা হয়েছে। অন্যান্যগুলো সুন্নাত। উজুর বিধান পালন করলে নিশ্চিত উপকার রয়েছে। ওজরের কারণে অক্ষম হলে ছাড় আছে। কোথাও পানি না পাওয়া গেলে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে নিবে। নামাযের সময়গুলোকে সুবহে সাদিকের উদয় ও সূর্যাস্তের সাথে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে পৃথিবীর সকল ধনী, গরিব, সুস্থ, অসুস্থ, শিক্ষিত, মূর্খ সকলেই সহজে বুঝতে পারে। নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ সকলেই যেন নির্ণয় করতে পারে। সূর্যোদয়ের আগে ফজর, সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যোহর, সূর্যাস্তের আগে আসর, সূর্যাস্তের সাথে-সাথে মাগরিব, সূর্যাস্তের পর আকাশের নক্ষত্রগুলো উজ্জ্বল হওয়ার পর এশা। এ সময়গুলো জানতে বিশেষ কোনো যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। মানুষ শহর, নগর, বন, প্রান্তর, পাহাড়ের চূড়া কিংবা সমুদ্রে যেখানেই থাকুক সর্বাবস্থায় আকাশের দিকে চোখ তোলামাত্রই নামাযের সময় নির্ণয় করতে পারে।

বাহ্যিক কোনো নাপাক না থাকলে সারা পৃথিবীর ভূমিকে নামাযের উপযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। কেবলা জানা না থাকলে মনের প্রবল ধারণা অনুসারে নির্ধারণ করে সেদিকে ফিরে নামায পড়ে নেবে। কেউ যদি চার রাকাত নামাযের নিয়ত করে পূর্ব দিকে ফিরে এক রাকাত আদায় করার পর প্রবল ধারণা হয়, কেবলা তো পশ্চিম দিকে, তাহলে সে পশ্চিম দিকে ফিরে যাবে। তৃতীয় রাকাতে আবার প্রবল ধারণা হলো, কেবলা দক্ষিণ দিকে, তাহলে দক্ষিণ দিকে ফিরে যাবে। চতুর্থ রাকাতে পুনরায় তার প্রবল ধারণা হলো, কেবলা উত্তর দিকে, তাহলে উত্তর দিকে ফিরে যাবে। এভাবে প্রতিটি রাকাত ভিন্ন-ভিন্ন দিকে ফিরে পড়া সত্ত্বেও তার নামায কবুল করা হবে।

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ

'তোমরা যে দিকেই মুখ কর সেদিকেই আল্লাহ রয়েছেন।'[১]

নামাযের জন্য সতর ঢাকা ফরজ করা হয়েছে। এতটুকু কাপড় তো নেহায়েত গরিব মানুষের কাছেও থাকে। যদি এমন জায়গা হয়, যেখানে মানুষ জন্মগতভাবেই উলঙ্গ এবং নিকটে সতর ঢাকার মতো কোনো গাছ-পালা, ঘাস-লতাও নেই, তাহলে বসে নামায পড়ে নিলে নামায আদায় হয়ে যাবে। অসুস্থতার দরুন দাঁড়িয়ে নামায পড়তে না পারলে বসে পড়বে। বসে পড়াও যদি সম্ভব না হয়, তাহলে শুয়ে পড়বে। নামাযে কোনো ভুল হলে সেজদা সাহুর মাধ্যমে তা সংশোধনের সুযোগ রয়েছে। ঘুম বা অন্য কোনো সমস্যার দরুন নামাযের ওয়াক্ত পার হয়ে গেলে কাজা করার সুযোগ রয়েছে।

মোটকথা ইবাদতগুলো এতই সহজ ও সাদাসিধা যে, পৃথিবীর কেউ এগুলোকে আমলের অযোগ্য সাব্যস্ত করতে পারবে না।

আসুন, এবার ইহুদিদের ইবাদতের জরিপ করি। ইহুদিধর্মে শনিবার দিন আগুন জ্বালানো বৈধ নয়। এবার বলুন, যাদের জীবিকার উপায়ই হলো আগুন, তারা কী করবে? অসুস্থ ব্যক্তির খাবার রান্নার প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে করণীয় কী? যে অঞ্চলে বিদ্যুৎ নেই এবং বাতি জ্বালাতে হয়, সেখানে বাতি নিভে গেলে কী উপায় হবে? এদিন কোনো কল-কারখানা চলতে পারবে না। আগুনের সাহায্য নিতে হয় এমন সব কাজ করা যাবে না। বলুন, এজাতীয় ইবাদত মানুষের জন্য কী পরিমাণ জটিলতা সৃষ্টি করবে?

এছাড়াও ইহুদিধর্মে শনিবার দিনে যানবাহনে আরোহণ করা যাবে না। জরুরি কোনো কাজে দূরে যেতে হলে কিংবা অসুস্থ বা দুর্বল হলে কী করবে? বিবেক বলে, এমন ইবাদত বেঁচে থাকাকেই হারাম করে দিয়েছে। খ্রিষ্টানধর্মে ইবাদত কেবল গির্জায় হতে পারে। কেউ যদি লোকালয় থেকে দূরে থাকে, সে তো Sunday prayer থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। এছাড়াও সপ্তাহের অন্য কোনো দিনে ইবাদত করতে চাইলে তাকে রবিবারের অপেক্ষায় থাকতে হয়। কেউ যদি কায়কারবারের ঝামেলার দরুন গির্জায় যেতে না পারে, তাহলে সে নিজঘরে ইবাদত করতে পারবে না। সমুদ্রে থাকা মাঝি-মাল্লারা বলবে, আমাদের কী অপরাধ যে, আমরা ইবাদত থেকে বঞ্চিত? পাহাড়ের চূড়ায় যারা বসবাস করে, তারা কীভাবে ইবাদত করবে?

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ১১৫

চলুন এবার ভিন্ন একটি বিষয় নিয়ে ভাবা যাক। কোনো খ্রিষ্টান যদি স্বীয় পাপ থেকে তাওবা করতে চায়, তাহলে তাকে পাদ্রীর সামনে গিয়ে পাপের স্বীকারোক্তি প্রদান করতে হবে। অন্যথায় তার তাওবা কবুল হবে না। কোনো ইহুদি তাওবা করতে হলে পাদ্রীর নিকট গিয়ে কান্নাকাটি করতে হয়। অথচ কোনো মুসলমান তাওবা করতে চাইলে তাকে কোথাও যেতে হয় না। কোনো টাকা-পয়সা খরচ করতে হয় না; বরং অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যতে আর পাপ না করার সংকল্প করলেই তাওবা কবুল হয়ে যাবে। হাদীছে আছে :

إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ

'দীন সহজ।'[১]

আল্লাহ বলছেন :

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য সহজ করতে চান – কঠিন করতে চান না।'[২]

নবীজি ইরশাদ করেছেন :

يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا

'তোমরা সহজ করো–কঠিন করো না।'[৩]

সুতরাং প্রমাণিত হলো, ইসলামে ইবাদত যত সহজ, ইহুদি ও খ্রিষ্টানধর্মে তত কঠিন।

ষষ্ঠ দলিল : ইসলাম গোটা বিশ্বজগতের ধর্ম

ইসলাম গোটা বিশ্বজগতের জন্য শান্তি ও ভালোবাসার পয়গাম নিয়ে এসেছে। ইসলামের নবী ঘোষণা দিয়েছেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

'হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সকলের জন্য রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।'[৪]

---

১. ছহীহ বোখারি : হাদীছ নং ৩৮
২. সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৫
৩. ছহীহ বোখারি : হাদীছ নং ৬৭
৪. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৫৮

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

'সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদানকারী ও সতর্ককারী হিসেবে এসেছেন।'[১]

রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রহমত সমগ্র জগতের মানুষের জন্য ব্যাপক। চাই সে পৃথিবীতে বসবাস করুক বা চাঁদে কিংবা মঙ্গলগ্রহে। এজন্যই বলা হয়েছে :

ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

'তোমরা সকলেই ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করো।'[২]

অন্যত্র বলা হয়েছে :

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا

'তোমরা সবাই আল্লাহর রশি দৃঢ়ভাবে ধারণ করো।'[৩]

ইসলামের ঐক্যের এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। ভাষা ও বর্ণের কোনো ভেদাভেদ নেই। এমন ঐক্য ও শান্তির দৃষ্টিভঙ্গি কেবল ইসলামই পেশ করেছে। পারসিকদের দাবি হলো, ইজাযের সন্তানেরাই কেবল নবুওতের সম্মান লাভ করেছে। বনী ইসরাইলের দাবি হলো, নবুওত কেবল তাদের উত্তরাধিকার। হিন্দু সম্প্রদায়ের দাবিমতে আকাশ দর্শনের অধিকার কেবল গঙ্গা ও যমুনায় স্নানকারীদের। চায়নাদের দাবি হলো, আসমানি সন্তান কেবল তারাই। কিন্তু এক্ষেত্রে كافة এবং جميعا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ইসলাম সব ভেদাভেদ দূর করে দিয়েছে।

সপ্তম দলিল : ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা

কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম।'[৪]

---

১. সূরা সাবা : আয়াত ২৮
২. সূরা বাকারা : আয়াত ২০৮
৩. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১০৩
৪. সূরা মায়েদা : আয়াত ৩

সুতরাং ইসলাম মানুষের জীবনের প্রতিটি শাখায় নির্দেশনা দান করে। ব্যক্তিগত জীবন, সমষ্টিগত জীবন, দাম্পত্যজীবন, রাজনৈতিক বিষয়াবলি, সামাজিক বিষয়াদি, আচার-ব্যবহার, ইবাদত-বন্দেগি, স্বভাব-চরিত্র, শান্তি-নিরাপত্তা, ক্রয়-বিক্রয় মোটকথা, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, তারপর মৃত্যু থেকে হাশরের মাঠে দণ্ডায়মান হওয়া পর্যন্ত এবং হিসাব-কিতাব থেকে নিয়ে জান্নাত বা জাহান্নামে প্রবেশ পর্যন্ত সকল বিষয়াদির বিশদ বিবরণ দান করা হয়েছে। ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মে কেবল স্বভাব-চরিত্র ও ইবাদত-বন্দেগি সম্পর্কে বলা হয়েছে। জীবনের অন্যান্য শাখাগুলোকে মানুষের দয়া-মায়ার ওপর ছেড়ে দিয়েছে। এ কারণেই পশ্চিমা বিশ্ব রাজনীতিকে দীন থেকে সম্পূর্ন আলাদা করে দিয়েছে। স্বীয় মনোবাঞ্ছা পূরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পন্থা আবিষ্কার করে নিয়েছে।

অষ্টম দলিল : ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দলিল-প্রমাণের পরিপোষক

ইসলাম জ্ঞানার্জনকে মহান উদ্দেশ্য বানিয়ে মানবতার সামনে পেশ করেছে। জ্ঞান আহরণের বিবরণ দিয়েই কুরআনের সূচনা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে اقرأ (পড়) দয়ার নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'কিতাব শিক্ষা দানকারী' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।'

বিজ্ঞজনেরা বলেছেন :

اُطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ اِلَى اللَّحْدِ

'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানার্জন করো।'

অর্থাৎ– মানবজীবনে এমন কোনো সময়ের আগমন কাম্য নয়, যখন সে নিজেকে জ্ঞানার্জন থেকে মুক্ত ভাববে।

- নবীজি ইরশাদ করেছেন, বিদ্বানের কলমের কালি শহীদের রক্ত অপেক্ষা অধিক মূল্যবান।[১]

- নবীজি ইরশাদ করেছেন, জ্ঞান আহরণ প্রতিটি মুসলমান নর-নারীর ওপর ফরজ।[২]

- কুরআন মজীদে প্রিয়নবীর দোআ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

---

১. কাশফুল খাফা : হাদীছ নং ২২৭৬

২. ইবনে মাজা : হাদীছ নং ২২০

قُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

'বলুন হে প্রভু! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন।'[১]

- পবিত্র কুরআনে ওলামায়ে কেরামের সম্মান ও মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে :

يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

'আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মধ্য থেকে ঈমানদার ও আলেমগণের মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন।'[২]

- ইসলাম প্রতিটি মুসলমানকে মৌমাছির মতো জ্ঞান আহরণের নির্দেশ দিয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :

هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا

'তোমাদের কাছে এমন কোনো জ্ঞান রয়েছে কি, যা তোমরা আমাদের কাছে প্রকাশ করবে?'[৩]

- ইসলাম বিবাদকালেও জ্ঞানগর্ভ দলিল কামনা করে। বলা হয়েছে :

قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ

'তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তাহলে তোমাদের দলিল উপস্থাপন করো।'[৪]

- জাহিলিয়াতের যুগে ইসলাম জগদ্বাসীকে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছে। সিবওয়াইহ, বুআলী, জুয়াম আরবি ভাষা ও ব্যাকরণের ইমাম ছিলেন। অথচ তারা আরব বংশীয় ছিলেন না। আরবি ভাষার অন্যতম ইমাম ইসমাইল ইবনে মুহাম্মাদ জাওহারি, মাযদুদ্দীন আবু তাহের মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব ফিরোজাবাদিও আরব বংশীয় ছিলেন না। মাল্টার অধিবাসী আবুল ফারায-এর আরবি ভাষায় বহু লিখনী রয়েছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বুরহানুদ্দীন ইরাকের মসুল শহরে জন্মগ্রহণ করেছেন। ইতিহাস ও দর্শনের আবিষ্কারক আল্লামা ইবনে খালদূন তিউনিসে জন্ম গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা

---

১. সূরা ত্বহা : আয়াত ১১৪
২. সূরা মুজাদালা : আয়াত ১১
৩. সূরা আনআম : আয়াত ১৪৮
৪. সূরা বাকারা : আয়াত ১১১

(রহ.) ছিলেন পারস্যের অধিবাসী। ইমাম বোখারি, ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিযি (রহ.) মধ্য এশিয়ার বাসিন্দা ছিলেন। ডাক্তারদের গুরু ইবনে সিনা চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে 'আল-কানূনু ফিল ইল্‌মি' রচনা করেছেন, যা আজও অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। এ্যালজাবরা তো আরবি শব্দ الجبرا থেকে নির্গত হয়েছে। গণিত শাস্ত্রের নতুন ভাবনা 'আল খাওয়ারিজম' মুহাম্মাদ ইবনে মুস'আব আল-খাওয়ারিজম থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। তাঁর রচিত কিতাব কিতাবুল মুখতাছার ফী হিসাবিল জাবরি ওয়াল মুকাবালা-এর লাতিনি অনুবাদের মাধ্যমেই ইউরোপে এ্যালজাবরা পরিচিতি লাভ করেছে। আবুল হুশাইম কিতাবুল মানাযির রচনা করে দৃশ্য বিজ্ঞানের শুভ সূচনা করেছেন। আলী ইবনে ঈসা 'তাযকেরাতুল কাহ্‌হালীন' রচনা করেন এবং ক্ষতস্থানে পট্টি ব্যবহারের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তাওরাত ও ইনজীলে জ্ঞানার্জনের এত গুরত্বারোপ নেই, যতটা গুরুত্বারোপ করেছে ইসলাম। এ হলো ইসলামের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

নবম দলিল : ইসলাম পূর্ণাঙ্গ ভ্রাতৃত্বপূর্ণ দীন

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

'নিঃসন্দেহে মুমিনরা পরস্পর ভাই-ভাই।'[১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

كُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا

'হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে যাও।'[২]

অন্তরে বর্বর যুগের আত্মসম্ভ্রমবোধ পোষণকারীদের ইসলাম এমন সবক দিয়েছে যে, শত্রু মিত্র হয়েছে, দুশমন দোস্তে পরিণত হয়েছে। কুরআন এ দৃশ্যটি এভাবে তুলে ধরেছে যে,

وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ إِخْوَانًا

---

১. সূরা হুজুরাত : আয়াত ১০

২. ছহীহ বোখারি : হাদীছ নং ৫৬০৪

'তোমরা তোমাদের ওপর দেওয়া আল্লাহর সেই নেয়ামতকে স্মরণ করো, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে আন্তরিকতা ঢেলে দিলেন। ফলে তোমরা পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে গেলে।'[১]

সাহাবায়ে কেরাম ভ্রাতৃত্বের এমন দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, ইতিহাস যার নজির পেশ করতে অক্ষম। হযরত বেলাল (রাযি.) হযরত ওমর (রাযি.)-এর সামনে এলে তিনি মুচকি হেসে বলতেন, আমাদের নেতা বেলাল এসে গেছেন। অন্য এক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সাইয়্যিদুনা আবুবকর (রাযি.) সাইয়্যিদুনা বেলাল (রাযি.)কে আযাদ করেছেন।

দশম দলিল : ইসলাম সাম্যের পৃষ্ঠপোষক ও আহ্বায়ক

মানুষ হওয়ার সুবাধে আমরা সকলেই আদম সন্তান। কাজেই কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর শ্বেতাঙ্গদের এবং অনারবদের ওপর আরবদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

'নিশ্চয় তোমাদের মধ্যকার সর্বাধিক মোত্তাকী ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত।'[২]

সুতরাং সম্মান ও মর্যাদা তাকওয়া ও পরহেযগারির ওপর নির্ভরশীল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে বলেছেন :

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعْظِيْمَهَا بِالْآبَاءِ النَّاسُ مِنْ اٰدَمَ وَاٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ

'হে কুরাইশ সম্প্রদায়! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের মূর্খ যুগের ও পিতৃপুরুষদের নিয়ে অহংকার করতে বারণ করেছেন। সকল মানুষ আদমের সন্তান আর আদম হলেন মাটির তৈরী।'[৩]

নবীজি সিংহাসনের পরিবর্তে সাদা মাটিতে আপন আসন স্থাপন করেছেন, যেন জমিনের অধিবাসীরা সবাই সমান সাব্যস্ত হয়। এর সুন্দর দৃষ্টান্ত নামাযের কাতার, যেখানে ধন-গরিব, ছোট-বড় সবাই এক হয়ে যায়।

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১০৩

২. সূরা হুজুরাত : আয়াত ১৩

৩. আখবারু মাক্কা : হাদীছ নং ৭১৩

آگیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز
قبلہ رو ہو کر زمیں بوس ہوئی قوم حجاز
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود وایاز
نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز
بندہ وہ صاحب و غنی ایک ہوئے
تیرے سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے

ঠিক যুদ্ধাবস্থায় যদি এসে যায় নামাযের সময়
কিবলামুখী হয়ে আরবজাতি সেজদাবনত হয়।
এক কাতারেই দাঁড়িয়ে গেল মাহমুদ ও আয়ায
রইল না কেউ গোলাম এবং কেউবা আবার মালিক।
গোলাম-মনিব ও ধনী-মহাজন সমান হলো সবে
তোমার দরবারে এসে একাকার হলো সব ভেদাভেদ ভুলে।

একাদশ দলিল : মানবরচিত আইন অপেক্ষা ইসলামি আইন শ্রেষ্ঠ

মানুষের বিবেক আপন দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে যেসব আইন প্রণয়ন করে, তা একেবারেই অস্থায়ী। অবস্থার সামান্য পরিবর্তন হলে আইনও পরিবর্তন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ কারণেই মানবরচিত আইন বিভিন্ন সময় সংশোধন ও পরিবর্তন করতে হয়। মানবরচিত আইন অপেক্ষা ইসলামি আইন তিন কারণে শ্রেষ্ঠ।

১. বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিবেচনা করলে ইসলামি আইন মানবরচিত আইন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে লেনদেন ও আচার-আচরণের যে নীতিমালা ইসলাম প্রণয়ন করেছে, ইনসাফ ও সততার দৃষ্টিতে দেখলে আজও তা সূর্যের মতো চমকায়। বিজ্ঞানের এ যুগেও মানবাধিকার, শান্তি, নিরাপত্তা, ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার ক্ষেত্রে ইউরোপ ইসলামি আইনেই শান্তি দেখতে পায়। আমেরিকা সুপ্রিম কোর্টের কেন্দ্রীয় ভবন নির্মাণ করেছে ওয়াশিংটনে। সেই ভবনে নবীজির কিছু বাণী ক্যালিওগ্রাফি আকারে ঝুলিয়ে দিয়েছে, যার উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানদের নবী ইনসাফ ও ন্যায়ের কথা এত বেশি বলেছেন যে, এ যুগের মানুষও তাঁকে শ্রদ্ধা না করে পারে না।

২. স্থান (পূর্ব পশ্চিম) বিবেচনায়ও ইসলামি আইন শ্রেষ্ঠ। কারণ ইসলামি আইন পৃথিবীর যেকোনো দেশেই প্রয়োগ যোগ্য। ভৌগোলিক অবস্থানের দূরত্ব এতে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না।

৩. জীবনযাত্রার মান (ধনী, দরিদ্র) বিবেচনা করলেও ইসলামি আইন মানবরচিত আইন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দ্বাদশ দলিল : মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে ইসলামের বৈশিষ্ট্য

মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রেও ইসলামের স্বাতন্ত্র্য রয়েছে।

১. **ধর্মীয় স্বাধীনতা :** ইসলাম ধর্মীয় ব্যাপারে কোনো ধরনের বাধ্যবাধকতার পরিবর্তে স্বাধীনতার পথ খুলে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ

'দীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই।'[১]

২. **চিন্তানৈতিক স্বাধীনতা :** সৃষ্টিজগত নিয়ে চিন্তা-ভাবনার ব্যাপারে ইসলাম স্বাধীনতা দান করেছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِى الْأَلْبَابِ ۝

'নিশ্চয় আসমান ও জমিনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে বহু নিদর্শন।'[২]

৩. **মতামতগত স্বাধীনতা :** ইসলামি সমাজব্যবস্থা প্রতিটি ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে মতামত প্রদানের অধিকার দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

'আর আপনি বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।'[৩]

ত্রয়োদশ দলিল : দাম্পত্যজীবনের নীতিমালা

ইসলাম মানবজীবনের প্রতিটি শাখায় নির্দেশনা দান করেছে। বিশেষত দাম্পত্যজীবনের সফলতার লক্ষ্যে সোনালি নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ২৫৬

২. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৯০

৩. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৫৯

বিবাহ, তালাক, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার, মাতাপিতার অধিকার, সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা, উত্তরাধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে এমন চমৎকার নীতিমালা প্রণয়ন করেছে, পৃথিবীর কোনো ধর্ম বা মতবাদ এর দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারবে না। আশ্চর্যের বিষয় হলো পার্থিব উন্নতি ও পর্যাপ্ত উপায় উপকরণের উপস্থিতি সত্ত্বেও ইউরোপে ৬০%-এর বেশি তালাকের ঘটনা ঘটছে। যার হার ইসলামি রাষ্ট্রগুলোতে ৬%ও নয়। এতদ্‌সত্ত্বেও ইসলামি রাষ্ট্রগুলোকে Thirdworld বলা হয়। কিছু বলার সুযোগ নেই।

চতুর্দশ দলিল : ইসলাম ও দাসপ্রথা

যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে উন্নত জাতিগুলোর চিন্তাধারাও বেশ কঠোর। বেশির ভাগ দেশেই যুদ্ধবন্দীরা কারাভোগের পাশাপাশি নানা ধরনের মানবিক চাপের সম্মুখীন হয়। কখনও খাদ্যে ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে তাদেরকে বিবেক প্রতিবন্ধীতে পরিণত করা হয়। যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে নূন্যতম ছাড় বরদাশত করা হয় না। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপীয়রা যুদ্ধবন্দীদের ওপর যে কঠোর নির্যাতন চালিয়েছিল, তার বিবরণ শুনলে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। ইসলামই কেবল গোটা বিশ্বদরবারে যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে সুষ্ঠু সমাধান পেশ করেছে। এর বিস্তারিত বিবরণ না জানার দরুন অনেকে মনে করে, ইসলাম মানুষ ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছে, যা কিনা মৌলিক অধিকার বিরোধী। বাস্তবতা হলো, মুসলমানদের ওপর কোনো বাহিনী যদি আক্রমণ করে এবং মুসলমানরা তাদের ওপর বিজয় লাভ করে, এক্ষেত্রে তারা যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নিবে? এর বেশ কয়েকটি পদ্ধতি হতে পারে–

১. ছেড়ে দেওয়া। কিন্তু এটা অযৌক্তিক এবং শত্রুপক্ষকে পুনঃআক্রমণের সুযোগ সৃষ্টি করার শামিল। এ হলো অপরাধীকে অপরাধের সুযোগ করে দেওয়া। কাজেই এটা কোনো সঠিক সমাধান নয়।

২. হত্যা করা। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে সঠিক হলেও এটা এ বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হতে পারে না। এতে ইসলামের উল্লেখযোগ্য কোনো লাভ নেই। কেবল শত্রুপক্ষের ক্ষতি রয়েছে। কাজেই এটাও কোনো সমাধান নয়।

৩. যুদ্ধবন্দীদের সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া, যাতে তারা অতি নিকট থেকে ইসলামি জীবন অবলোকন করে এবং ইসলাম গ্রহণের সুযোগ পায়। বন্দী পুরুষ হলে তাকে দাস আর নারী হলে তাকে দাসী বলা হবে। তাদের মর্যাদা কখনই স্বাধীন মুসলমানদের সমান হতে পারে না। তথাপি

ইসলাম তাদের খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র ইত্যাদির ব্যাপারে বলে দিয়েছে, তোমরা যা খাবে তোমাদের দাস-দাসীকেও তা-ই খাওয়াবে। তোমরা যা পরবে তোমাদের দাস-দাসীকেও তা-ই পরাবে এবং তাদের সাথে সদাচরণ করবে। যদি তাদের আযাদ করে দাও, তাহলে এটি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে মহান বিনিময় লাভের উপায় হবে।[১]

গোলাম যেহেতু তার মালিকের অধীন, সেহেতু তাকে দিয়ে বিভিন্ন কাজ-কর্ম করানোর অধিকার তার রয়েছে। কোনো মালিক যদি মনে করে, তার গোলামের প্রয়োজন নেই, তাহলে সে অপর কোনো মুসলমানের নিকট হতে টাকা বা মালামাল গ্রহণ করে মালিকানা হস্তান্তর করতে পারে। ইসলামি শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য ছিল বন্দীরা যেন মুসলমানদের স্বভাব-চরিত্র দেখে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। ইতিহাস সাক্ষী আছে, ইসলামি জগতে গোলামরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে বড়-বড় অবদান রেখেছে। নমুনা হিসেবে তার কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি।

হযরত সালেম (রাযি.) হযরত হুযায়ফা (রাযি.)-এর গোলাম ছিলেন। কিন্তু হিজরতের পথে মুসলমান মুহাজিরগণের ইমাম হয়েছেন। হযরত জায়েদ (রাযি.) গোলাম হওয়া সত্ত্বেও মূতার যুদ্ধে হযরত জাফর তায়্যার (রাযি.)-এর মতো মহান সাহাবীর আমীর নিযুক্ত হয়েছেন। সুহাইব রুমী (রাযি.) গোলাম ছিলেন। কিন্তু হযরত ওমর (রাযি.) মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁকে খলীফা নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের জন্য মসজিদে নব্বীর ইমাম নিযুক্ত করেছেন। হযরত ইকরিমা (রাযি.) ও কাতাদাহ (রাযি.) গোলাম ছিলেন। অথচ তাফসীরের কিতাবসমূহে তাদেরকে 'সাইয়্যিদুল মুফাসসিরীন' বলা হয়। হযরত হাসান বসরি (রহ.) দাসীর সন্তান ছিলেন। অথচ তিনি সুফীয়ায়ে কেরামের ইমাম হয়েছেন।

হযরত নাফে' (রহ.) গোলাম ছিলেন। অথচ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرٍ رضـ হাদীছের এই সনদটিকে سِلْسِلَةُ الذَّهَبِ (সোনার হার) আখ্যা দেওয়া হয়। ইমাম বোখারি (রহ.)-এর ভাষ্যমতে উক্ত সনদ আসমানের নিচে আর জমিনের উপরে সর্বাধিক বিশুদ্ধ। মাহমুদ সবুক্তগিন গোলামের পুত্র গোলাম ছিলেন। অথচ বাদশাহ হয়েছেন এবং সোমনাথ বিজয় করেছেন। আল-

১. ছহীহ মুসলিম : হাদীছ নং ৪২০৫

ইয়ামীন গোলাম ছিলেন। কিন্তু তিনি বাদশাহ্ হারুনুর রশীদের সেনাপ্রধান ছিলেন। কায়রো ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা জাওহারা গোলাম ছিলেন। স্পেনবিজেতা তারেক ইবনে যিয়াদও গোলাম ছিলেন। হিন্দুস্তানের প্রথম মুসলমান বাদশাহ্ আইবেক গিয়াসউদ্দীন ঘুরির গোলাম ছিলেন। এর মূল কারণ হলো ইসলামি শিক্ষার সৌন্দর্য ও পূর্ণতা। কেননা, ইসলাম মুসলমানদের দাস-দাসীদের সাথে সদাচরণের নির্দেশ প্রদান করেছে।

একদা নবীজির কোলে তাঁর নাতি হযরত হাসান (রাযি.) ও গোলাম হযরত যায়েদ (রাযি.)-এর পুত্র উসামা ছিলেন। নবীজি বললেন, 'হে পরওয়ারদেগার! আমি এই দুজনকে ভালোবাসি। যে এদের ভালোবাসবে, তুমিও তাদের ভালোবেসো।'[১]

সুবহানাল্লাহ্! আপন নাতি ও গোলামপুত্রের সাথে সাম্য ও ভালোবাসার এ রীতি দেখে গোটা বিশ্ব অবাক হবে না তো কী হবে? হযরত যায়েদ (রাযি.) নবীজির গোলাম ছিলেন অথচ তিনি আপন ফুফাত বোনকে তার সঙ্গে বিবাহ্ দিয়েছেন।

ইসলামি শরীয়তের এসব শিক্ষার ফলাফল এই দাঁড়াল যে, বেশির ভাগ যুদ্ধবন্দী মুসলমান হয়ে যেত। অনেক ক্ষেত্রে ইসলামি জ্ঞানে তারা বড় অবদান রাখত। খলীফা হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক হযরত আতা (রহ.)কে জিজ্ঞেস করলেন, বিভিন্ন ইসলামি শহরের ফকীহগণের মধ্যে যারা গোলাম, তাঁদের নাম বলুন। উত্তরে তিনি বললেন, মদীনায় হযরত নাফে' (রহ.), মক্কায় আতা ইবনে আবী রাবাহ, ইয়ামানে তাউস ইবনে কায়সান, ইয়ামামায় ইয়াহইয়া ইবনে কাছীর, শামে মাকহুল (রহ.), মোসিলে মাইমুন ইবনে মিহরান, খোরাসানে জাহ্হাক ইবনে মাযাহিম, বসরায় আতা আল-হাসান বসরি (রহ.) ও ইবনে সিরীন (রহ.) সবাই গোলাম ছিলেন। কেবল কুফায় ইবরাহীম নাখয়ী আরব বংশীয় ছিলেন।

পঞ্চদশ দলিল : ইসলাম কি তলোয়ারের জোরে বিস্তার লাভ করেছে?

ইসলামি শিক্ষার এমন সৌন্দর্য ও পূর্ণতা রয়েছে যে, যেকোনো বিবেকবান ব্যক্তি অনিচ্ছাকৃতভাবেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তার দয়ার আঁচলে সে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্বস্তি খুঁজে পায়। ইহুদি-খ্রিষ্টানরা ইসলামের প্রতি জঘন্য অপবাদ আরোপ করে বলে ইসলাম তরবারির জোরে বিস্তার লাভ

---

১. ছহীহ বোখারি : হাদীছ নং ৩৪৫৫

করেছে। অর্থাৎ– কিছুসংখ্যক যুদ্ধবাজ মুসলমানদের নবীর সাথে এসে একত্রিত হয়েছিল। তারাই বাহুবলে আরব ও আজমে ইসলাম ছড়িয়ে দিয়েছে। যখন প্রশ্ন করা হয়, সেই যোদ্ধারা কারা, মুসলমানদের নবীর পাশে জমায়েত হয়েছিল? তখন তাদের মুখে কথা ফোটে না ।

আসুন, কতিপয় দৃষ্টান্ত অবলোকন করা যাক-

- ইহুদি সম্প্রদায় থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযি.), খ্রিষ্টানদের মধ্য থেকে আদি ইবনে হাতিম (রাযি.), অগ্নিপূজকদের মধ্য থেকে সালমান ফারসি (রাযি.), হাবশা থেকে বেলাল (রাযি.), রোম থেকে সুহাইব (রাযি.), এশিয়া মহাদেশ থেকে আদাস (রাযি.), আফ্রিকা থেকে বাকুম (রাযি.) প্রমুখের ইসলাম গ্রহণ যেন ইসলামের সত্যতার প্রকাশ্য প্রমাণ।

- এবার রাজা-বাদশাহদের দৃশ্য দেখুন। দোমাতুল জান্দালের বাদশাহ উকাইদার, বাহরাইনের বাদশাহ জীফার, আবিসিনিয়ার বাদশাহ আসহামা (রাযি.) হিময়ারের বাদশাহ জুলকালা-এর মতো প্রভাবশালী বাদশাহগণকে আব্দুল্লাহ জুসসাজ্জাদাইন (রাযি.) আবুযর (রাযি.) ও মিকদাদ (রাযি.)-এর মতো হতদরিদ্র সাহাবীর পেছনে উপবিষ্ট দেখা যায়। আবার ইয়ামানের ভাইসরয় বাজান ও শামের ভাইসরয় ফারওয়া খুযায়ী দুজনই দূর থেকে দাসখত পেশ করছেন।

- ইবনে যুহাইরের মতো ভাষাবিদ, নাবেগার মতো সাহিত্যিক, কা'বের মতো গীতিকার, হাস্‌সান (রাযি.)-এর মতো বাস্তবতাপ্রিয় ব্যক্তিবর্গ, যাদের একটি কবিতার আবৃত্তি কখনো যুদ্ধের সূচনা করে, কখনোবা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রচনা করে। অথচ ইসলামের ছায়াতলে এসে সকল সাহিত্য ও ভাষালংকার ভুলে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকেন। আসহাবে সুফফার ডানে-বামে তাকালে ইরানবিজয়ী সাহাবী খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাযি.), শামবিজয়ী সাহাবী হযরত আবু উবায়দা (রাযি.), ইরানবিজয়ী সাহাবী হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযি.), মিসরবিজয়ী সাহাবী হযরত আমর ইবনুল 'আস (রাযি.)কে দেখতে পাবেন।

- হযরত ওমর নাঙ্গা তরবারি হাতে নিয়ে বের হয়ে কিছুক্ষণ পর কেন মাথাটা নত করে ফেললেন? কেউ বলতে পারবেন কি?

- বলাবাহুল্য, সাইয়্যিদুস শুহাদা হযরত হামযা (রাযি.)-এর কলিজা, গুর্দা যিনি চিবোলেন এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে হার বানিয়ে যিনি গলায়

পরিধান করলেন, সেই হিন্‌দা বিনতে উতবা ইবনে রবীয়া ইসলামকে কেন বুকে জড়িয়ে নিলেন?

- কেউ জবাব দিন, খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাযি.) কুরজী ইবনে জাবির কহরি (রাযি.), উয়াইনা ইবনে হুসাইন ফাযারি (রাযি.), সুহাইল ইবনে আমর কুরাইশি (রাযি.), ছুমামা ইবনে আছাল নজদি (রাযি.) ও আবু সুফিয়ান ইবনে হার্‌বের মতো ব্যক্তিবর্গকে কোন তরবারি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল?

- হাজারামাউত, বাহরাইন ও হাবশা এমন কতগুলো এলাকা, যেখানে কোনো মুসলিম সৈন্য প্রবেশ করেনি। তাহলে বলুন তো সেখানকার বাদশাহ মুসলমান হলেন কেন?

- তুর্কীদের ইতিহাসের প্রতি কেন দৃষ্টি দেন না যে, সপ্তম শতাব্দীর সূচনালগ্নে খেলাফতে আব্বাসিয়ার নাম-নিশানা মুছে দেওয়া হলো। অথচ মাত্র অর্ধ শতাব্দীকালের মধ্যেই পরাজিত (মুসলমান)দের দীন বিজয়ী (তুর্কি)দের অন্তর জয় করে নিল। তুর্কি জাতির ইসলাম গ্রহণ কি ইসলামের আকর্ষণশক্তির প্রমাণ নয়? সুতরাং ইসলামই এমন ধর্ম, যা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে পারে এবং ইসলামই আমার প্রিয় ধর্ম।

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا

‘আমি রব হিসেবে আল্লাহকে, রাসূল হিসেবে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং দীন হিসেবে ইসলামকে মেনে নিয়েছি।’

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

ইসলাম ও বিজ্ঞান

'আমরা বর্তমানে যে যুগে বসবাস করছি, এই যুগকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ বলা হয়। বর্তমানে মানুষ চাঁদে পা রেখেছে। সৃষ্টির এ বিশালতা যেন তাদের কাছে সংকুচিত হয়ে গেছে। মানুষ প্রতিটি জিনিষের Micro and macro detail (ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অংশসমূহ) জানতে আগ্রহী। বর্তমানে এটাই বিজ্ঞানের গবেষণার মেরুদণ্ডে পরিণত হয়েছে। প্রতিটি বস্তুর বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জানার তীব্র আগ্রহ মানুষের মাঝে বিরাজ করছে। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে আজকের এ-সভায় ইসলাম ও বিজ্ঞান শিরোনামে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ।'

ইসলাম ও বিজ্ঞান

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

وَقَالَ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ: اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَّمُسْلِمَةٍ

আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণার মেরুদণ্ড

সম্মানিত প্রিন্সিপাল সাহেব ও প্রফেসর মহোদয়গণ! আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ও প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা। আমরা বর্তমানে যে যুগে বসবাস করছি, এই যুগকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ বলা হয়। বর্তমানে মানুষ চাঁদে পা রেখেছে। সৃষ্টির এ বিশালতা যেন তাদের কাছে সংকুচিত হয়ে গেছে। মানুষ প্রতিটি জিনিষের Micro and macro detail (ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অংশসমূহ) জানতে আগ্রহী। বর্তমানে এটাই বিজ্ঞানের গবেষণার মেরুদণ্ডে পরিণত হয়েছে। প্রতিটি বস্তুর বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জানার তীব্র আগ্রহ মানুষের মাঝে বিরাজ করছে। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে আজকের এ সভায় ইসলাম ও বিজ্ঞান শিরোনামে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ।

কুরআনের দৃষ্টিতে জ্ঞানী

আমি যে আয়াতে কারীমা তেলাওয়াত করেছি, তাতে আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত ইরশাদ করেন :

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

'নিশ্চয় আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের বিবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।'[১]

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৯০

এই আয়াতে কারীমা আমাদের আহ্বান জানাচ্ছে, যারা আসমান ও জমিনের সৃষ্টি নিয়ে এবং রাত-দিনের গমনাগমন ও পরিবর্তন নিয়ে ভাবে, তারাই জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। সৃষ্টিবিষয়ে চিন্তা-গবেষণাকারীকে যেন নির্বাচিত ও উত্তম ব্যক্তি বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞান কী?

আল্লাহ্ রব্বুল ইয্যাত ইরশাদ করেছেন :

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا

'আর আল্লাহ্ হযরত আদমকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন।'[১]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দুনিয়ার সকল বস্তু ও তার গুণাগুণ। তাফসীরে কাশ্শাফের লেখক আল্লামা যমখশরি (রহ.) বলেছেন, علم الأسماء বলতে বস্তুরাজিকে বোঝানো হয়েছে। বর্তমান বস্তুর জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বলা হয়।

ইসলাম ও **Pharmacology** (চিকিৎসাবিজ্ঞান)

আপনি একটু ভাবলেই বুঝতে পারবেন, গাছপালা ও লতাপাতা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা এবং তার উপকার ও ক্ষতি সম্পর্কে অবগতি লাভ করাকে Parmacology (চিকিৎসাবিজ্ঞান) বলা হয়। একজন Pharmacist (ওষুধ প্রস্তুতকারী) কী করেন? বিভিন্ন ধরনের গাছপালা নিয়ে একটিকে অপরটির সাথে মিশ্রণ করেন। তবে মিশ্রণের ক্ষেত্রে যথাযথ পরিমাণের প্রতি লক্ষ রাখেন। কারণ, এ দুটি জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ– Properties (বৈশিষ্ট্য) কী এবং তার Quanteties (পরিমাণ) কতটুকু হওয়া চাই। Properties (বৈশিষ্ট্য) জানা এজন্য জরুরি যে, আমাদেরকে কোনো বস্তুর উপকার ও ক্ষতির অবগতি লাভ করতে হবে। এছাড়া তো আমরা বস্তুটিকে কাজে লাগাতে পারব না। আর Quanteties (পরিমাণ) জানা আবশ্যক এ কারণে যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন জগতের প্রতিটি বস্তুর একটি মাপকাঠি নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ৩১

তিনি পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন :

وَاِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ

'আমার নিকট সব কিছুরই ভান্ডার রয়েছে।'[১]

وَمَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ

'আমি তা এক নির্দিষ্ট পরিমাণে নাযিল করি।'[২]

পৃথিবীতে যা-কিছু রাখা হয়েছে, আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে তার নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। এজন্যই তিনি ইরশাদ করেছেন :

وَكُلُّ شَیْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ

'আর সব জিনিসই তার কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণে রয়েছে।'[৩]

কোনো জিনিস আপনি বেশি পরিমাণ নিলে তা আপনার ক্ষতি করবে। আবার একই জিনিস অল্প পরিমাণ নিলে তা উপকার করবে। আবার অনেক সময় অল্প পরিমাণে উপকার হয় না। বেশি পরিমাণে উপকার হয়। হিরা ও কয়লা উভয়টিই কার্বন। তবে একটি সুদৃশ্যপূর্ণ, উজ্জ্বল, মূল্যবান ও শক্ত। অথচ কয়লা কালো, কুৎসিত, সস্তা ও মলিন। এসব পরিমাণের কম-বেশির দরুন হয়ে থাকে।

Chemistry (রসায়ন) ও Physics (পদার্থবিদ্যা) কী?

পৃথিবীর সকল বস্তু যেসব অংশ ও উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত, তার বৈশিষ্ট্য ও কার্যকারিতা অনুসন্ধান করাকে Chemistry (রসায়নবিদ্যা) বলা হয়। এছাড়াও সৃষ্টিজগতের মাঝে কার্যকর যেসব শক্তি রয়েছে এগুলোর সুশৃঙ্খল অধ্যয়নকে Physics (পদার্থবিদ্যা) বলে। আল্লাহ তা'আলা নিজেই মানবজাতিকে আহ্বান করছেন যে,

اُنْظُرُوْا مَا ذَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

'আসমানসমূহ ও জমিনে কী আছে, তা তোমরা অনুধাবন করো।'[৪]

---

১. সূরা হিজর : আয়াত ২১
২. সূরা হিজর : আয়াত ২১
৩. সূরা র'দ : আয়াত ৮
৪. সূরা ইউনুস : আয়াত ১০১

আল্লাহ তা'আলা যখন নিজেই চিন্তা-ভাবনার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন, তখন কেউ যদি আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তাহলে সে কি ইসলামবিরোধী কোনো কাজ করছে? না; কক্ষনো না।

ইসলাম ও Zoology (প্রাণীবিদ্যা)

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ

'তারা কি উটের দিকে লক্ষ করে না যে, তাকে কী (বিচিত্র) রূপে সৃষ্টি করা হয়েছে?'[১]

বর্তমানে প্রাণীবিদ্যার ছাত্ররা তো এ নিয়েই পড়াশোনা করে যে, অমুক প্রাণীর সৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলার কী-কী নিদর্শন রয়েছে, এ জিনিসটি কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে, ওই জিনিসটি কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে। তবে কেউ যদি শুধু এগুলোকেই দীন মনে করে, তাহলে সে ভুলের মধ্যে রয়েছে। বরং এগুলো হলো দীনের একটি শাখা। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এমন এক বিশ্বজনীন ধর্ম দান করেছেন, যেখানে আসমান ও জমিনের প্রতি চোখ খুলে তাকানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা দেখছ না কেন? সুবহানাল্লাহ!

Technology (প্রযুক্তি) কাকে বলে?

বিজ্ঞান তো সকল বস্তু ও তার গুণাবলি সুবিন্যস্ত করে দিয়েছে। এবার এগুলো থেকে Practically (কার্যত) উপকৃত হওয়াকে Technology বা প্রযুক্তি বলে। যেমন– বিদ্যুৎ ও তার উপকারিতা লাভের পদ্ধতিকে Electrical Technolgy (বৈদ্যুতিক প্রযুক্তি) বলে। লোহা ও অন্যান্য ধাতু হতে উপকৃত হওয়ার পদ্ধতিকে Mechanical Technology (যান্ত্রিক প্রযুক্তি) বলে। বিল্ডিং ও তদ্‌সম্পর্কীয় শাখা-প্রশাখাগুলোকে Civil Engeneering (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং) বলে।

কুরআনের আলোকে প্রযুক্তি (Teclnology)

পবিত্র কুরআনের বেশ কয়েক জায়গায় এমন স্পষ্ট আলোচনা করা হয়েছে, যাতে প্রাকৃতিক নীতিমালাগুলো পরিষ্কার হয়ে যায়।

---

১. সূরা গাশিয়া : আয়াত ১৭

যেমন– আল্লাহ রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন :

وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

‘আর আমি লোহা অবতীর্ণ করেছি, যাতে বিশাল শক্তি ও মানুষের বহু কল্যাণ রয়েছে।’[১]

এইকথাটা যে যুগে বলা হয়েছে, সে যুগে মানুষ লোহার প্রকৃত কল্যাণাদি সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ছিল। কেবল তারা তরবারি ও অন্যান্য কিছু হাতিয়ার ব্যবহার করত। এর বেশি তাদের জানা ছিল না। কিন্তু বর্তমানে Steel Technology (ইস্পাত-প্রযুক্তি) সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। গোটা বিশ্ব ইস্পাতের মাধ্যমে যতটা উপকৃত হয়, অন্য কোনো জিনিস দ্বারা ততটা উপকৃত হয় না। বরং ইস্পাত-প্রযুক্তিতে যারা বেশি উন্নতি লাভ করেছে, তারাই পৃথিবীর ওপর রাজত্ব করছে।

Mechanical Engeneering (যান্ত্রিক প্রকৌশল)-এর দৃষ্টান্ত

আল্লাহ হযরত দাউদ (আ.)-এর জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছেন। আল্লাহ বলছেন :

وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ

‘আর আমি তার জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছি।’[২]

অন্যত্র ইরশাদ করেন :

وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ

‘এবং আমি তাকে তোমাদের জন্য বর্ম তৈরির কৌশল শিখিয়েছি।’[৩]

সুতরাং আল্লাহর একজন নবী যদি লোহার পাত দিয়ে বর্ম তৈরি করতে পারেন, তাহলে বর্তমান যুগে কোনো ইঞ্জিনিয়ার যদি মানুষের বিভিন্ন কল্যাণে ইস্পাত ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে তিনি কি কোনো অনৈসলামিক কাজ করছেন? না; কক্ষনো নয়। সুতরাং Mechanical Engeneering (যান্ত্রিক প্রকৌশল) কোনো অনৈসলামিক কাজ নয়।

---

১. সূরা হাদীদ : আয়াত ২৫

২. সূরা সাবা : আয়াত ১০

৩. সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৮০

Wood (কাঠ) Engeneering এর দৃষ্টান্ত

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)কে বলেছেন :

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا

'আর আপনি আমার তত্ত্বাবধানে নৌকা তৈরি করুন।'[১]

এক-একটি শব্দ যেন হিরা ও মুক্তার চেয়েও মূল্যবান।

وَوَحْيِنَا

'এবং আমার ওহী মোতাবেক।'[২]

মনে হচ্ছে, যেন কোনো কারিগর কাজ করছে আর সুপার ভাইজার তত্ত্বাবধান করছেন যে, কাজ ঠিকমতো হচ্ছে কি-না? ঠিক এমনি আল্লাহ রব্বুল আলামীন স্বীয় পয়গম্বরকে ইরশাদ করছেন :

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ

'আর আপনি নৌকা তৈরি করুন بِأَعْيُنِنَا আমার Supervision (তত্ত্বাবধানে) وَوَحْيِنَا এবং আমার Instructions (নির্দেশনা মোতাবেক)। এবার বলুন, আল্লাহ তা'আলা Instructions (নির্দেশনা) দান করছেন এবং Supervision (তত্ত্বাবধান) করছেন আর একজন নবী কাঠ দিয়ে নৌকা তৈরি করছেন। ঠিক এভাবে যদি বর্তমান যুগের কেউ জনকল্যাণে কাঠের কোনো কাজ করেন, তাহলে কি তিনি কোনো ইসলামবিরোধী কাজ করছেন? না; নিশ্চয় নয়। একেই বলে Wood Engineering বা কাষ্ঠশিল্প।

Civil Engineering (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং)-এর দৃষ্টান্ত

কোনো-কোনো বর্ণনামতে বাদশাহ জুলকারনাইন একজন নবী ছিলেন। তিনি পৃথিবীতে একটি প্রাচীর নির্মাণ করেছেন। পবিত্র কুরআনে যার বিবরণ রয়েছে যে, দুই পাহাড়ের মধ্যখানে একটা রাস্তা ছিল, যে রাস্তা দিয়ে ডাকাতরা এসে জনগণের মালামাল লুট করত। তিনি সেই অঞ্চলে পৌঁছলে এলাকাবাসী সমাধানের আবেদন জানাল। তিনি বললেন, আমি এখানে একটা

---

১. সূরা হূদ : আয়াত ৩৭

২. সূরা হূদ : আয়াত ৩৭

প্রাচীর নির্মাণ করে দেব। এ ছিল সেই যুগের কথা, যে যুগে প্রাচীর নির্মাণে ইট বা পাথর ব্যবহার করা হতো। কিন্তু তিনি ইস্পাত ব্যবহার করলেন। পবিত্র কুরআনে এসেছে, তিনি জনগণকে বললেন :

آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ

'তোমরা আমাকে লোহার টুকরা এনে দাও।'[১]

প্রাচীর নির্মাণে লোহার টুকরা ব্যবহার করছেন। বর্তমান যুগের Sivil Engineer কী করেন? লোহা ডিজাইন করে তাতে পাথরের খোয়া ঢালেন। একেই বলে Civil Engineering।

ইসলাম ও পর্যটনবিদ্যা

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

'হে নবী! আপনি বলে দিন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো। তারপর দেখো, মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।'[২]

তার মানে, আল্লাহর কুরআন আমাদেরকে উক্ত ভ্রমণবিধান, বস্তু ও History (ইতিহাস) থেকে শিক্ষা গ্রহণের নির্দেশ দিচ্ছে। মানুষ যদি আল্লাহ তা'আলার উক্ত নির্দেশ মোতাবেক পৃথিবী ভ্রমণ করে, তাহলে সে তো সম্পূর্ণ ইসলামি কাজই করছে।

ইবনে মুকিল নামক একজন মুসলিম পর্যটক ছিলেন, যিনি ২৮ বছর পর্যন্ত সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন। তারপর তিনি একটি কিতাব রচনা করেছেন। ইসলামি জগতে আজ তাকে 'সাহিবুল মাসালেক ওয়াল মামালিক ওয়াল মাগারিব ওয়াল মাহালিক' বলা হয়। এমনিভাবে আল্লামা ইবনে বতুতা গোটা দুনিয়া ভ্রমণ করেছেন এবং সফরনামা রচনা করে তার স্মৃতিচারণ করে গেছেন।

সৃষ্টিজগৎ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা ইসলামের নির্দেশ

এবার পৃথিবীর অন্যান্য জিনিস নিয়ে আলোচনা করা যাক।

---

১. সূরা কাহ্ফ : আয়াত ৯৬

২. সূরা আনআম : আয়াত ১১

আল্লাহ রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন :

اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ

'তারা কি আসমান-জমিনের রাজত্ব ও আল্লাহর সৃষ্টিতে লক্ষ করে না?'[১]

তিনি আরও ইরশাদ করেন :

وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ

'এবং কেন তারা আসমানের প্রতি লক্ষ করে না যে, কীভাবে তাকে উচ্চ করা হয়েছে।'[২]

وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ

'এবং পাহাড়ের প্রতি কেন লক্ষ করে না যে, কিরূপে তাকে দাঁড় করানো হয়েছে।'[৩]

وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

'এবং কেন ভাবে না জমিন নিয়ে যে, কীভাবে তাকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে?'[৪]

সুতরাং বর্তমানে যিনি আল্লাহ তা'আলার এসকল সৃষ্টি নিয়ে ভাবেন, তিনি মহান প্রভুর আদেশ পালনেই সাড়া দিচ্ছেন।

ইসলামের মানদণ্ডে বিজ্ঞান

একটি বিষয় খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে যে, কেউ যদি বিজ্ঞানের মানদণ্ডে ইসলামকে পরিমাপ করতে যায়, তাহলে নিশ্চিত সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ, বিজ্ঞানের Research (গবেষণা) প্রতিনিয়ত সামনে অগ্রসর হয়। বিজ্ঞানের মানদণ্ডে ইসলামকে মাপার দৃষ্টান্ত স্বর্ণকারের নিক্তিতে পাহাড় মাপার মতো। স্বর্ণকারের নিক্তি দিয়ে হিমালয় পর্বত মেপে দিতে বললে তা কি কখনো সম্ভব হবে? এটা কেউ মেপে দিতে পারবে না। ঠিক তেমনি বিজ্ঞানের পাল্লায় ইসলাম মাপা সম্ভব নয়। তবে বিজ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য করতে হবে যে,

১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৮৫
২. সূরা গাশিয়া : আয়াত ১৮
৩. সূরা গাশিয়া : আয়াত ১৯
৪. সূরা গাশিয়া : আয়াত ২০

সে তার Ultimate (শেষ) গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছে কিনা? তখন তাকে ইসলামের পাল্লায় তুলে মেপে দেখব। কেননা, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রব্বুল আলামীন সৃষ্টিজগতের সঠিক তথ্যগুলো বলে দিয়েছেন। আসুন, এর কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করি।

পানি জীবনের অপরিহার্য অংশ

আজ আমরা কুরআনে বিজ্ঞানের অনেক সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম বিষয় খুঁজে পাই। মানুষ ভেবে অবাক হয় যে, চৌদ্দশত বছর পূর্বে যখন বিজ্ঞান এত উন্নতি লাভ করেনি, তখন কীভাবে কুরআন এ জ্ঞানগর্ব বিষয়াদির বিবরণ দিয়েছে? এর মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের সত্যতার বিষয়টি আমাদের সম্মুখে দিবালোকের মতো প্রতিভাত হয়। যেমন– ইরশাদ হয়েছে :

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

'আর আমি পানি দ্বারা সব জিনিসকে জীবন দান করেছি।'[১]

আধুনিক বিজ্ঞানও ঠিক একথাই বলছে যে, যেখানে জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে, সেখানে পানি তার অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিদ্যমান। পানিবিহীন জীবনের অস্তিত্ব কল্পনাতীত ব্যাপার। সুবহানাল্লাহ! কুরআনের আলোকে Atam (পরমাণু) ও Molecule.(অণু)র অস্তিত্ব প্রমাণিত। মহান আল্লাহ অন্যত্র ইরশাদ করেছেন :

عَالِمِ الْغَيْبِ

'তিনি অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত।'[২]

لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ

'আসমানসমূহ ও জমিনের অণুপরিমাণ বস্তুও তাঁর অগোচরে নয়।'[৩]

وَلَا اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْبَرُ

'তার অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ বস্তুও নয়।'[৪]

---

১. সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৩০
২. সূরা সাবা : আয়াত ৩
৩. সূরা সাবা : আয়াত ৩
৪. সূরা সাবা : আয়াত ৩

বর্তমান যুগে কারো অজানা নয় যে, সৃষ্টিজগতের উপাদানের Buil Ding Block (মৌলিক অংশ) হলো Atam (পরমাণু)। তাহলে উক্ত مثقال ذرة বলতে কী বোঝায়? Atam (পরমাণু)কেই مثقال ذرة বলে। وَلَا أَكْبَرَ এবং তা অপেক্ষা ক্ষুদ্রে বস্তু বলতে কী বোঝায়? Electron, proton, ও Neutron কেই বোঝায়। কেননা, এই তিনটির সমষ্টি হলো Atam (পরমাণু) আর যদি Rays (আলোকরশ্মি)-এর উদাহরণ দেওয়া হয়, তাহলে ALPHA, Beta, game ও اصغر-এর দৃষ্টান্ত হতে পারে। সামনে বলা হয়েছে ولااكبر, (এবং তা অপেক্ষা বৃহৎ বস্তুও নয়)। এখানে اكبر (বৃহৎ) বলতে Molecale (অণু) উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা, Atam (পরমাণু)-এর সমষ্টিই হলো Molecule (অণু) অথবা اكبر (বৃহৎ) বলতে Metroits (উল্কাপিণ্ড)ও উদ্দেশ্য হতে পারে, যা পৃথিবীর ওপর বর্ষণ করা হয়। মোটকথা, পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ কোনো জিনিসই আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের বাইরে নয়।

মানব সংরক্ষণের প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনা

Metroits (উল্কাপিণ্ড)গুলো পৃথিবীর ওপর বৃষ্টির মতো বর্ষিত হয়। আপনি ভেবে অবাক হবেন, আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষ্যমতে মহাশূন্যে সর্বদাই Metroits (উল্কাপিণ্ডের) Bom bard ment (গোলাবর্ষণ) হতে থাকে। Metroits গুলো সাধারণত অতি ক্ষুদ্রাকৃতির হয়। আবার এগুলো কয়েক মিলিমিটারও হতে পারে। এগুলোর গতি কেমন? প্রতি সেকেন্ডে ১৫০ কিলোমিটার। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জমিন হতে ৮০ কিলোমিটার উপরে এমন একটি খোলা জায়গা বানিয়ে রেখেছেন, যেখানে আসামাত্রই এগুলো Evporate (বিক্ষিপ্ত) হয়ে যায়। মানুষ তো জানেই না, কেমন ভয়ানক জিনিসের হাত থেকে আল্লাহ তাদের রক্ষা করছেন। Genns book of world Recard লেখা আছে যে, প্রতিদিন Four Hundred Tonnes of Load অর্থাৎ– চারশত টন পরিমাণ Metroits পৃথিবীর ওপর বর্ষণ করা হয়।

বাংলাদেশে Metroits (উল্কা) বৃষ্টি

বাংলাদেশে একবার উল্কাবৃষ্টি হয়েছিল। আমি এক জাদুঘরে সেই পাথরগুলো স্বচক্ষে দেখেছি। আকারে বেশ বড়। অবাক হলাম, এত বড় উল্কাও আসতে পারে! রাশিয়ায় একবার একটা Metroits (উল্কা) মাটিতে পড়ে ২০০ মিটার গর্ত সৃষ্টি করেছে। প্রসঙ্গত কথাগুলো বলে ফেললাম।

ইসলাম ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সৃষ্টিজগতের পরিণাম

বিজ্ঞান বলে, একটি Big Bang (মহাধ্বংস)-এর কারণে জগৎ সৃজিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, আসমান, জমিন সৃষ্টির পূর্বে ধোঁয়া ছিল। সহজে বিষয়টি বোঝানোর লক্ষ্যে ধোঁয়া শব্দটি বলা হয়েছে, বর্তমান যুগে যাকে Gras (গ্যাস) বলে। তাহলে বলা যায়, এই আসমান ও জমিন পূর্বে গ্যাস আকারে ছিল। তারপর আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে Big Bang হলো এবং এই বিশ্বজগত সৃজিত হলো।

এখানে একটি মজার কথা বলব যে, ইদানিং নিউইয়র্কের এক Planitariumc এ একটি Documentary (বৈজ্ঞানিক ফিল্ম) প্রদর্শন করা হয়। যেখানে বড়-বড় ৭টা Interestiong question (মজাদার প্রশ্ন)র উত্তর বোঝানো হয়েছে। সেই প্রশ্নগুলোর একটি আজকের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। প্রশ্নটি হলো What is the fate of univers? (এ জগতের পরিণাম কী হবে?) আমেরিকার বিজ্ঞানীরা বর্তমানে একথা প্রমাণ করছেন যে, এ জগৎ Expard (প্রশস্ত) হচ্ছে। একটি সময় এমন আসবে যে, তার Expension (প্রশস্ত হওয়া) থেমে যাবে এবং তা পুনরায় Contaction (নির্মিত) হবে। ফলে আরেকটি মহাধ্বংস সংগঠিত হবে। তারা এর নাম রেখেছে An other Big Bang (দ্বিতীয় মহাধ্বংস) আর আমরা তো কেয়ামত কে An other Big Bang বলে থাকি।

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন :

إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ

'নিঃসন্দেহে কিয়ামতের কম্পন বড় ভয়ানক হবে।'[১]

রাখাল যেমন তার মেষকে তাড়িয়ে নিয়ে কোনো গন্তব্যে পৌঁছে দেয়, ঠিক তেমনি আল্লাহ্ রব্বুল ইয্যাত বিজ্ঞানীদের তাড়িয়ে নিয়ে এমন এক গন্তব্যে পৌঁছাবেন যে, তাদের নিকট তখন সত্য স্পষ্ট হয়ে যাবে। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ

'অচীরেই আমি তাদেরকে দিক-দিগন্তে ও তাদের সত্তায় আমার নিদর্শনাবলি দেখাব। এমনকি তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে, তিনিই সত্য।'[২]

---

১. সূরা হজ : আয়াত ১

২. সূরা হা-মীম আস-সাজদা : আয়াত ৫৩

তারপরও যদি তারা বশ্যতা স্বীকার না করে, তাহলে আমি এই জগতকে كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ লিখিত কাগজসমূহ গুটানোর মতো গুটিয়ে ফেলব।[১]

ইসলামি শিক্ষায় Black Hole এর অস্তিত্ব

Black Hole বলতে কী বোঝায়? এটি বর্তমান কালের একটি মজার বিষয়। বিজ্ঞান জগতে এ নিয়ে বেশ Discussions (আলোচনা) চলছে। বহু গবেষণা হচ্ছে। Smithsonian space museum ওয়াশিংটনে একটি মিউজিয়াম রয়েছে। সেখানে তারা একটি পৃথক কক্ষ বরাদ্দ করেছে এ উদ্দেশ্যে যে, পৃথিবীতে Black Hole সম্পর্কে নিত্যনতুন যেসব গবেষণা হচ্ছে, তারা সেগুলো এখানে Display (বর্ণনা) করবে, যাতে Black Hole সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য মানুষ জানতে পারে। কিছুদিন আগের কথা। আমি বিজ্ঞানের একটি বই পড়তে গিয়ে Black Hole বিষয়ে পড়তে লাগলাম যে, এ Univers (জগতে) এমন কিছু জায়গা রয়েছে, যা একেবারে অন্ধকার। এতই অন্ধকার যে, যদি Light Photon (আলোর কণা)ও তার দিকে নিক্ষেপ করা হয়, তবে সে তাকে Absorb (আকর্ষণ) করে নেয়। যে জিনিসটি Light photon (আলোর কণা) কে Absorb (আকর্ষণ) করে নেয়, তার Gravita tional Force (আকর্ষণশক্তি) কত বেশি হবে? যদি সারা পৃথিবীকে সংকুচিত করে একটা ডিমতুল্য করা হয়, তাহলে তার Gravi Tational Force যতটুকু হবে, তার চেয়েও Black Hole এর Gravitational Force অনেক বেশি।

তাহলে বোঝা গেল Black Hole এজগতের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, কোনো জিনিস Black Hole এর মধ্যে প্রবেশ করলে It will vanish into nothingness তা ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি বিজ্ঞান বইয়ে প্রথমবার Nathingness শব্দটি দেখতে পেলাম, তখন আমার মন বলতে লাগল, এ যাবৎ তো বিজ্ঞান বলত Matter can meither be created nar be destroyed it can only change its state কোনো মূল ধাতু কখনো তৈরি করা যায় না এবং ধ্বংসও করা যায় না। কেবল তার অবস্থা পরিবর্তন হতে পারে। তাহলে বিজ্ঞান কেন Nothing ness শব্দ বলতে শুরু করল? একে তো আমরা ধ্বংস বলি। তখন সামনে এগিয়ে লেখা দেখতে পেলাম, Laws of physies and chemistry become

---

১. সূরা আম্বিয়া : আয়াত ১০৪

void there (সেখানে গিয়ে পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যার নিয়মাবলী শেষ হয়ে যায়।) একথা পড়ে তো আমার অন্তরে আরো আগ্রহের সৃষ্টি হলো যে, এটা আবার কী? কাজেই আমি এব্যাপারে আরো জ্ঞান লাভ করলাম। অনেক লিখনী, প্রবন্ধ পড়ে আমি জানতে পারলাম, আমাদের Galaxy (ছায়াপথ) এবং Solar system (সৌরজগৎ) একটি Equilibrium তথা ভারসাম্যপূর্ণ শৃঙ্খলার মধ্যে কাজ করছে। এর পেছনে অনেক বড় বড় Factors (কারণ) রয়েছে Black Hole ও তার একটি কারণ তা আমাদের সকল কক্ষগুলোর ভারসাম্য বজায় রেখেছে। Black Hole না থাকলে কক্ষগুলোর Eauilibrium ভারসাম্য ধ্বংস হয়ে যেত। এর কারণেই মূলত কক্ষগুলো আপন-আপন গতিপথে কাজ করছে। সুবহানাল্লাহ!

আমার ইমাম নববি (রহ.)-এর একটি কিতাব রিয়াদুস সালেহীন-এর একটি হাদীছ মনে পড়ল। কিতাবটি আমি কলেজে অধ্যয়নকালে পড়েছিলাম। একদা এক সাহাবী নবীজির খেদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী! চন্দ্র-সূর্য যদি আল্লাহ তা'আলার হুকুম অমান্য করে, তাহলে কী হবে? কত সাদাসিধেভাবে চমৎকার একটি প্রশ্ন করলেন। নবীজি তাঁর মেধানুপাতে জবাব দিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্তুসমূহের মধ্যে থেকে কোনো একটাকে তার ওপর চড়াও করে দিবেন, যা তাকে গ্রাস করে নিবে। অর্থাৎ– সেটা এত বড় হবে যে, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রগুলো তার মাত্র একটা গ্রাস হবে। নবীজির উত্তরে সাহাবী অবাক হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই জন্তুগুলো এখন কোথায়? উত্তরে নবীজি ইরশাদ করলেন, আল্লাহ তা'আলার কোনো চারণভূমিতে চরে বেড়াচ্ছে।

সুবহানাল্লাহ! দেখুন, কথাগুলো কোন যুগে বলা হচ্ছে আর কোন যুগে এসে বিজ্ঞান জানতে সক্ষম হয়েছে, মহাশূন্যে এমন কিছু জায়গা আছে, যা আমাদের গ্রহগুলোর ভারসাম্য বজায় রেখেছে। কোনো গ্রহ যদি আপন গতিপথ থেকে বেরিয়ে পড়ে, তাহলে সে কোনো-না-কোনো Black Hole এর মুখে গিয়ে পড়বে আর Black Hole তাকে গ্রাস করে নিবে। আজ মুসলমানদের কর্তব্য হলো, কুরআন ও হাদীছ সামনে রেখে বস্তু ও বস্তুর নামের জ্ঞান অর্জন করা এবং তা থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করা।

বর্তমান যুগ অত্যন্ত গতিশীল

বর্তমান যুগে মানুষের জীবনযাত্রা বেশ এগিয়ে গেছে। যেমন– প্রতিটি কম্পিউটারে Moth processor ব্যবহৃত হয়। আজ যদি ২৮৬ নং ব্যবহৃত

হয়, সকালে উঠে জানা যায়, ৩৮৬নং ব্যবহৃত হচ্ছে। তার পরদিন ৪৮৬ নং ব্যবহার হতে শুরু করে। কিছুদিন পর ৫৮৬ নং বাজারে এসে পড়ে। এত দ্রুত গবেষণা হচ্ছে যে, প্রতিদিনই পৃথিবীতে পরিবর্তন আসছে, যা অনুমান করাও কঠিন ব্যাপার।

চাঁদ দেখার ব্যাপারে ইসলাম ও বিজ্ঞানের অবস্থান

আমেরিকায় একবার চাঁদ দেখার সুযোগ হলো। আমি একদিন আগেই Space museum (মহাশূন্য প্রদর্শনশালা)-এ ফোন করে বললাম, অমুক দিন আমি চাঁদ দেখতে চাই। বলুন আমেরিকার কোন্ এলাকায় চাঁদ দেখা যাবে? আমার উদ্দেশ্য ছিল, Most modern science.(অত্যাধুনিক বিজ্ঞান) দ্বারা উপকৃত হওয়া এবং একদিন পূর্বেই সংবাদ পেয়ে যাওয়া। সে বলল, আপনি Naval observatory (সমুদ্র গবেষণাকেন্দ্র)-এ যোগাযোগ করুন। সে আমাকে ফোন নম্বর দিল। আমি Naval observatory এ ফোন করলাম। তারা বলল, আমরা আপনাকে কম্পিউটার বিভাগের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছি। তারা আমাকে কম্পিউটার বিভাগের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিল। সেখানে কর্মরত মেয়েটি আমাকে বলল, চাঁদ যখন তার Orbit (গতিপথে) চলে, তখন আমরা তার লাইনের প্রতিটি ইঞ্চি সম্পর্কে অবগত হই।

আমি বললাম, আমি আগামী কাল এখানে চাঁদ দেখতে চাই; দেখা সম্ভব হবে কি? সে বলল, আমি আপনাকে Possibilities (সম্ভাবনাসমূহ) বলতে পারব যে, অমুক-অমুক স্থানে চাঁদ দেখা যেতে পারে। তবে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারব না। আমি বললাম, এখন তো মানুষ চাঁদে পা রেখেছে; তাহলে এখনও কি আমরা বলতে পারব না, চাঁদ কোথায় দেখা যাবে আর কোথায় দেখা যাবে না? সে বলল, বলতে পারব; তবে শতভাগ নিশ্চয়তা দিতে পারব না। আমি বললাম, কারণ কী? সে বলল কারণ হলো, চাঁদের Motion (গতি) বুঝতে Mathe matical Equation (গাণিতিক সমীকরণ)-এর একটি সেট বানানো হয়েছে, যাকে Simulator বলে। উক্ত Simulator এর মধ্যে Six thousand varialdes (৬০০০ চলক) রয়েছে। প্রিয় ছাত্ররা! তোমরা অবগত আছ, Equations (সমীকরণ)-এর মধ্যে কিছু Contants (ধ্রুবক) এবং কিছু variables (চলক) থাকে। কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার মেয়েটি বলতে লাগল; ওই ছয় হাজার চলকের মধ্য হতে কোনো একটিও যদি পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে চাঁদের অবস্থানও বদলে যায়। তাই আমি আপনাকে কীভাবে

বলব, ঠিক এখানেই চাঁদ দেখা যাবে। যেহেতু যেকোনো চলক পরিবর্তন হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, সেহেতু শতভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায় না, এখানেই চাঁদ দেখা যাবে। তার একথা শুনে নবীজির একটি হাদীছ আমার মনে পড়ে গেল। তিনি বলেছেন, হে আমার উম্মত!

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهٖ

'তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখো।'

وَافْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهٖ

'এবং চাঁদ দেখে ইফতার করবে।'[১]

আজ বিজ্ঞান এত গবেষণা করেও নিশ্চিত করে বলতে পারে না, চাঁদ দেখা যাবে কি-না? কাজেই সর্বোত্তম পন্থা হলো চাঁদ দেখে রোযা রাখবে এবং চাঁদ দেখে ইফতার (ঈদ) করবে।

প্রযুক্তির উন্নতিসাধনে ইসলামের মজবুত দলিল

প্রথম দলিল : প্রযুক্তির উন্নতিসাধনে ইসলামে কোনো শিক্ষা রয়েছে কী? হ্যাঁ; প্রযুক্তির উন্নতি সাধনে কুরআন ও সুন্নায় আমরা বেশ কিছু প্রমাণ খুঁজে পাই। দেখুন, আমাদের নবী সারা জীবনে কখনো ভ্রমণ করেননি। কোনো জলযুদ্ধ তিনি কখনো করেননি। কেবল কয়েকটি স্থলযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তবে তিনি জানতেন, ইসলামের দৃঢ়তা ও উন্নতির জন্য স্থলযুদ্ধের মতো জলযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। এ কারণেই তিনি ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে যে সর্বপ্রথম জলযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে, তাকে আমি জান্নাতের শুভ সংবাদ দিচ্ছি।[২]

স্থলভাগে আল্লাহর নাম প্রতিষ্ঠার জন্য যদি লড়াই করতে হয়, ঠিক তেমনি জলভাগেও আল্লাহ তা'আলার নাম প্রতিষ্ঠায় লড়াইয়ের অপরিহার্যতা রয়েছে।

দ্বিতীয় দলিল : এক সাহাবী নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুসাফাহা করলেন। তাঁর হাত ছিল বেশ শক্ত। নবীজি প্রশ্ন করলেন, এমন কেন? সাহাবী বললেন, আমি পাথর ভাঙার কাজ করি; তাই আমার হাতের গোস্ত শক্ত হয়ে গেছে।

---

১. ছহীহ বোখারি : হাদীছ নং ১৭৭৬

২. ছহীহ বোখারি : হাদীছ নং ২৭৮৮

নবীজি বললেন :

الْكَاسِبُ حَبِيْبُ اللهِ

'হাতে উপার্জনকারী আল্লাহর বন্ধু।'[১]

বর্তমান যুগেও যদি কেউ হাতে উপার্জন করে, তাহলে তাও হবে ইসলামি বিষয়। আল্লাহ তা'আলা তাকেও বিনিময় দান করবেন।

তৃতীয় দলিল : এক সাহাবী একটি চমকদার তরবারি নিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখে নবীজি বললেন, তোমার হাতে এটা কী? তিনি বললেন, তরবারি। একটি কাফেলা অমুক জায়গায় তরবারি নিয়ে এসেছে। আমি তাদের নিকট থেকে এটি ক্রয় করেছি। নবীজি বললেন, তুমি যদি স্বহস্তে নির্মিত তরবারি দিয়ে যুদ্ধ করতে, তাহলে আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুণ বিনিময় দান করতেন।

আপন প্রযুক্তি ও Resources (উপকরণ)কে promote (উন্নত) করতে বলা হচ্ছে।

চতুর্থ দলিল : প্রথম দিকে সাহাবায়ে কেরাম ইবরানি ভাষা জানতেন না। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের রাজা-বাদশাদের নিকট এ ভাষায় চিঠি লেখা হতো। সাহাবায়ে কেরাম কেবল আরবি জানতেন বিধায় ইহুদিদের মাধ্যমে চিঠিগুলো লেখানো হতো। একদা এক সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কী লিখে দেয়, তা আমরা বুঝব কীভাবে? অনুমতি হলে আমি ইবরানি ভাষা শিখে আসব। নবীজি তাঁকে অনুমতি দিলেন। ফলে উক্ত সাহাবী গিয়ে মাত্র পনেরো দিনে ভাষাটি শিখে ফিরে এলেন।

মুহাম্মাদ ইবনে কাসিমের মহান কীর্তি

ইসলামি শিক্ষার ফলে মানুষের গুণাবলি দীপ্তিমান হয়। ইসলামি বিশ্বে সবচেয়ে কম বয়সী সেনাপতি হলেন হযরত উসামা ইবনে যায়েদ আর মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম। ১৭ বছর বয়সে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে ১৭ বছর বয়সের একটা ছেলে একটা পরিবারও চালাতে সক্ষম হয় না। অথচ ১৭ বছরের ছেলে সেনাপতি হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। ইসলাম এসব উঠতি বয়সের যুবকদের এমন গুণ দান করেছে যে, তারা একটি সেনাবাহিনী পরিচালনা করে দেখিয়ে দিয়েছেন।

---

১. শারহু আসমায়িল হুসনা ১/২৪৬

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)

বহু ওলামায়ে কেরাম অতি অল্প বয়সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসংখ্য পেয়ালা পান করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর জীবনীতে লেখা আছে, মাত্র ১৩ বছর বয়সে তিনি 'ইমাম শাফেয়ী' হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। এ বয়সেই তিনি কুরআন শিক্ষা দিতে শুরু করেন। তখনও তাঁর দরসে চুল-দাড়ি পাকা বৃদ্ধরাও অংশগ্রহণ করতেন। একদা তিনি কুরআন শিক্ষা দিচ্ছিলেন। ইত্যবসরে দুটা চড়ুইপাখি ঝগড়া করতে-করতে তার কাছে এসে পড়ে গেল। অমনি তিনি তার মাথার পাগড়িটি খুলে পাখি দুটাকে চাপা দিলেন। কুরআন শিক্ষা চলাকালে এমন কাজ করায় বৃদ্ধ ব্যক্তিরা বিষয়টিকে অপছন্দ করলেন এবং কাজটিকে অভদ্র আচরণ মনে করলেন। ফলে তিনি পাগড়িটি মাথায় রাখলেন এবং বললেন :

اَلصَّبِيُّ صَبِيٌّ وَلَوْ كَانَ اِبْنَ نَبِيٍّ

'শিশু শিশুই; যদিও হোক সে কোনো নবীর সন্তান।'

ফলে বৃদ্ধদের বুঝে এল, বয়সের স্বল্পতার দরুন এমন হতে পারে।

মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান

ইসলামের এ উন্নতিতে সুফি-সাধকদের যেমন অবদান রয়েছে, তেমনি যারা এ জাতির পার্থিব কল্যাণে কাজ করেছেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উৎকর্ষ সাধনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং বড়-বড় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, তাদেরও অবদান রয়েছে। ডাক্তারদের গুরু বুআলী সীনা-এর 'আল-কানূন ফিত্তিব্' নামক চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থটি হাজার বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও অধুনা বিজ্ঞানের যুগেও তাকে নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়।

- ইবনে রুশ্‌দ প্রথমবারের মতো আবিষ্কার করলেন, কারো একবার বসন্ত হলে জীবনে পুনরায় আর বসন্ত হয় না।

- নাসির উদ্দীন তুসি গণিত শাস্ত্রে জ্যামিতির মৌলিক বিষয়াবলির ব্যাখ্যা রচনা করেছেন।

- দৃশ্যবিজ্ঞানে আবুল হুসাইন 'কিতাবুল মানাজির' রচনা করেছেন।

- আলী ইবনে ঈসা 'তাযকেরাতুল কাহ্‌হালাইন' রচনা করেছেন এবং সার্জারি বিদ্যায় পট্টি ব্যবহার করার রীতি প্রবর্তন করেছেন।

বিজ্ঞানে হাকীম তিরমিযি (রহ.)-এর অবদান

হাকীম তিরমিযি (রহ.) একজন বিজ্ঞ আলেম ও মুহাদ্দিছ হওয়ার পাশাপাশি একজন বিজ্ঞ ডাক্তারও ছিলেন। আমার তিরমিয শহরে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেখানে তার নির্মিত হাসপাতাল দেখেছি। এটি ছিল আমার দারুন এক অভিজ্ঞতা। সেকালেও তিনি অপারেশনের জন্য Underground (ভূগর্ভে) এ স্থান নির্মাণ করেছেন। তোমরা অবাক হবে, তারা ভূগর্ভে এমন জায়গা নির্মাণ করেছেন, যা সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত ছিল। মনে হচ্ছিল, এ যেন এক নতুন পৃথিবী। বর্তমান যুগে অপারেশন থিয়েটার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা এবং বিভিন্ন গবেষণাগার স্থাপন করা আমাদের পূর্বসূরীদেরই অবদান।

মির্জা আলেগ বেগ এবং মহাকাশ ভ্রমণের ভাবনা

একবার আমার সমরকন্দ যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে তারা Space Ladoratory (মহাকাশ গবেষণাগার) নির্মাণ করেছে। ওই গবেষণাগারটি ছিল একজন মুসলিম বিজ্ঞানীর নির্মিত। রাশিয়া যখন সর্বপ্রথম মহাকাশযান পাঠায়, তখন তাদের Documetary (বৈজ্ঞানিক ফিল্ম) স্বীকার করেছে, এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য আমরা মুসলিম বিজ্ঞানী মির্জা আলেগ বেগ-এর Ladoratory (গবেষণাগার) হতে সংগ্রহ করেছি। মির্জা আলেগ বেগ ছিলেন শহরে বসবাসকারী একজন রাজপুত্র। আল্লাহ তাকে গবেষণার এমন যোগ্যতা দান করেছেন যে, তার গবেষণার ওপর ভিত্তি করে রাশিয়া সর্বপ্রথম মহাকাশে যান প্রেরণ করেছিল।

বিজ্ঞানে মুহাম্মাদ ইবনে মুসা আল-খাওয়ারিযমীর অবদান

খাওয়ারিযম হলো উজবেকিস্তানের একটি বড় শহর। বুখারা থেকে আনুমানিক দশ ঘণ্টার পাহাড়ি পথ। খানিক ব্যতিক্রমধর্মী শহর। এ শহরে বড়-বড় অনেক মনীষীর জন্ম হয়েছে। অ্যালজেব্রার (বীজগণিত) প্রবর্তক মুহাম্মাদ ইবনে মুসা আল খাওয়ারিযমী উক্ত শহরের অধিবাসি ছিলেন। অ্যালজেব্রা মূলত আরবি ভাষার শব্দ। আমরা অ্যালজেব্রায় যে, Alogrithm পড়ে থাকি, এটা তার উদ্ভাবন। অজানা বিষয়ের ক্ষেত্রে পুরাচিত্র ব্যবহার তিনিই প্রবর্তন করেছেন। অ্যালজেব্রায় বিয়োগ চিহ্ন ব্যবহারের সূচনা তিনিই করেছেন। অ্যালজেব্রা বিষয়ে তিনি একটি পুস্তক রচনা করেছেন, যা

'কিতাবুল মুখতাসার ফিল জাবরি ওয়াল মুকাবিলা' নামে খ্যাত ছিল। পুস্তকটি লাতিন ভাষায় অনূদিত হওয়ার পরই ইউরোপে সর্বপ্রথম অ্যালজেব্রা শিক্ষার শুভ সূচনা হয়।

মুসলিম বিজ্ঞানীদের স্বীকৃতি না পাওয়ার কারণ

প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! আমাদের ধর্মে জাবির ইবনে হাইয়ান, মুহাম্মাদ ইবনে মূসা আল-খাওয়ারিযমী, ইবনুল হাইশাম, আলবেরুনী, ইবনে সিনা, ইবনে নাফীস ও আবু হানীফা দিনওয়ারির মতো এত বড়-বড় বিজ্ঞানী ছিলেন যে, তাদের মর্যাদা গ্যালিলিও, নিউটন, আইনস্টাইন, জন ওয়াল্টন অপেক্ষা কোনো অংশে কম নয়। তবে মূল সমস্যা হলো, তাদের গবেষণা ছিল ব্যক্তিগত উদ্যোগে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ছিল না। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা থাকলে তাদের গবেষণাগুলো মূলনীতি হিসেবে তাদের সাথে খ্যাতি লাভ করত।

ইতিহাসের পাতা থেকে দীনি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব

কোনো এক Musium (জাদুঘর)-এ Preserve (রক্ষিত) একটি চিঠি সম্পর্কে বলা হয়েছে, চিঠিটি ছিল সে সময়কার যখন কুরতুবা, স্পেন, উন্দুলুস ও বাগদাদে মুসলমানদের বড়-বড় ভার্সিটি ছিল। বৃটেনের তৎকালীন বাদশাহ মুসলমান বাদশাহকে পত্র লিখলেন, আপনাদের দেশে মেয়েদের শিক্ষার জন্য ভালো-ভালো প্রতিষ্ঠান রয়েছে। আমি আমার বোনকে সেই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাতে আগ্রহী। আপনি অনুগ্রহপূর্বক তাকে ভর্তি করে নিন।

আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের ওয়াদা

মহান আল্লাহ বলেন-

إِنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ

'নিশ্চয় আমি তোমাদের নারী কিংবা পুরুষ কারো শ্রম বৃথা যেতে দেবো না।'[১]

চেষ্টা ও সাধনার ময়দান অতি প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের পুর্বসূরীরা বহু চেষ্টা-সাধনা করেছেন। আজ সারা পৃথিবী তাদের দ্বারা উপকৃত

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৯৫

হচ্ছে। আমরাও যদি চেষ্টা-সাধনা করি, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সাধনাকে সাদরে গ্রহণ করবেন। তিনি অন্যত্র ইরশাদ করেছেন :

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى

'মানুষ যারই সাধনা করে, তা-ই সে লাভ করে।'[১]

এখানে এমন বলা হয়নি যে, মুসলমানরা যা সাধনা করবে, তা-ই পাবে। বরং এখানে মানুষের কথা বলা হয়েছে। মুসলমান, অমুসলমান উভয়েরই কথা বলা হয়েছে। ফলে পৃথিবীতে অমুসলমানরা যখন কোনো সাধনা করেছে, আল্লাহ এ পৃথিবীতেই তাদেরকে তাদের শ্রমের প্রতিদান দিয়েছেন।

মুসলিম বিজ্ঞানীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কতিপয় মুসলিম বিজ্ঞানীর বিবরণ শুনে তাদেরকে জীবনপথের মশাল বানিয়ে নাও।

১. বুআলী সীনার (৯৮০ খ্রি.-১০৩৭ খ্রি.) উপাধি হলো মুসলিম জাহানের এরিষ্টটল। তিনি বিজ্ঞ ডাক্তার ও মহা চিন্তাবিদ ছিলেন।

২. মুহাম্মাদ ইবনে মূসা আল-খাওয়ারিযমি (৭৫০ খ্রি.-৭৮০ খ্রি) মুসলিম বীজগণিতবিশারদ ছিলেন। তিনি লিখনপ্রণালি আবিষ্কার করেছেন, অ্যালজেব্রায় বিয়োগ চিহ্নের ব্যবহার চালু করেছেন এবং গণনা আবিষ্কার করেছেন।

৩. ইয়াকুব আলকিন্দী (৭৭৮ খ্রি.-৮৪০ খ্রি.)। মুসলিম অংকবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন।

৪. আল-ফারাবি (৮৩২ খ্রি.-৯০৩ খ্রি.) মুসলিম গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন।

৫. যাকারিয়া রাযি (৮২৫ খ্রি.-৯২৫ খ্রি.) মুসলিম ডাক্তার এবং বিখ্যাত রসায়নবিদ ছিলেন।

৬. ইবনে মাসকূয়াহ (৯৫০ খ্রি.-১০৩০ খ্রি.)। সুপ্রসিদ্ধ রসায়নবিদ ছিলেন।

৭. ওমর খাইয়াম (১০৩৯ খ্রি.-১১২৪ খ্রি.) বিখ্যাত কবি ও অংকবিদ ছিলেন।

---

১. সূরা নাজম : আয়াত ৩৯

৮. ইবনে তোফায়েল (১১০০ খ্রি.–১১৮৫ খ্রি.)। মহান দার্শনিক ও ডাক্তার ছিলেন।

৯. ইবনে বীতার (১১৮১ খ্রি.–১২৪৮ খ্রি.) বিখ্যাত উদ্ভিদবিদ ছিলেন।

১০. নারীরাও এ ময়দানে পিছিয়ে ছিল না। যেমন– উম্মুল হাসান বিনতে আবু জাফর বিজ্ঞ ডাক্তার ছিলেন। ডা. জয়নাব চক্ষু চিকিৎসায় সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। উলাইয়্যাহ বিনতে মাহ্দি, আয়েশা বিনতে আহমাদ ও দিলাওয়াহ বিনতে খলীফা খ্যাতনামা কবি ছিলেন।

ভাবনার বিষয়

প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! আজ তো আমরা 'আমার পিতা বাদশাহ ছিলেন' স্লোগান দেই। বলে বেড়াই, আমাদের পূর্বপুরুষ বিরাট সম্মানের অধিকারী ছিলেন। এও তো খুব মন্দ ব্যাপার যে, তাদের সন্তানেরা কত নিম্ন ও হীন পর্যায়ের। আমাদের উচিৎ যেন আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের রেখে-যাওয়া-পুঁজি আরো বৃদ্ধি করি এবং গোটা পৃথিবীকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করি।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

আমাদের প্রতিপালক

'শব্দটি অতি সংক্ষিপ্ত হলেও অর্থে এতই ব্যাপকতা ও গভীরতা রয়েছে যে, জীবনভর সাধনার পরই কেবল এর একিন অন্তরে বদ্ধমূল হয়। এর শাব্দিক অর্থ হলো লালনকর্তা, পালনকর্তা, বিধানদাতা। যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করেন। আমাদের শারীরিক খোরাক তিনিই জোগান দেন এবং আত্মিক খোরাকও তিনিই ব্যবস্থা করেন। কুলমাখলুকাতের স্রষ্টা ও রিযিকদাতা তিনিই। পবিত্র কুরআনে 'রব' শব্দটি অধিকহারে ব্যবহৃত হয়েছে। মনে হয় যেন কয়েক আয়াত পর-পর শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।'

আমাদের প্রতিপালক

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

রব শব্দটির শাব্দিক অর্থ

আল্লাহ্ রব্বুল ইয্যাতের একটি গুণবাচক নাম 'রব'। যেমন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র জাহানের রব।'[১]

শব্দটি অতি সংক্ষিপ্ত হলেও অর্থে এতই ব্যাপকতা ও গভীরতা রয়েছে যে, জীবনভর সাধনার পরই কেবল এর একিন অন্তরে বদ্ধমূল হয়। এর শাব্দিক অর্থ হলো লালনকর্তা, পালনকর্তা, বিধানদাতা। যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করেন। আমাদের শারীরিক খোরাক তিনিই জোগান দেন এবং আত্মিক খোরাকও তিনিই ব্যবস্থা করেন।

কুলমাখলুকাতের স্রষ্টা ও রিযিকদাতা তিনিই। পবিত্র কুরআনে 'রব' শব্দটি অধিকহারে ব্যবহৃত হয়েছে। মনে হয় যেন কয়েক আয়াত পর-পর শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

রূহজগতে আল্লাহকে রব বলে স্বীকারোক্তি

আমরা যখন রূহজগতে ছিলাম, তখন আল্লাহ আমাদের রূহগুলোর থেকে একটি স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেছিলেন।

---

১. সূরা ফাতেহা : আয়াত ১

তিনি জিজ্ঞেস করেছেন :

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

'আমি কি তোমাদের রব নই?'

قَالُوْا بَلٰى

'সবাই এক বাক্যে বলল, হ্যাঁ।'[১]

তখন চাইলে আল্লাহ এই স্বীকারোক্তিও নিতে পারতেন যে, আমি কি তোমাদের স্রষ্টা নই? আমি কি তোমাদের মালিক নই? কিন্তু তিনি রব হওয়ার স্বীকারোক্তি নিয়েছেন। এখানে ছাত্রসুলভ একটি প্রশ্ন মনে জাগে যে, স্বীকারোক্তি কেন গ্রহণ করলেন? উত্তর হলো, আমরা সেখানে সর্বদাই আল্লাহকে স্মরণ করতাম। ইরশাদ হচ্ছে :

وَ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ مَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَ لَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ۚ﴿۱۹﴾ يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ﴿۲۰﴾

'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে, সবার অধিকর্তা একমাত্র তিনি। আর যারা তাঁর সান্নিধ্যে আছে, তাঁর এবাদত থেকে তারা বিমুখও হয় না এবং শ্রান্তিও বোধ করে না। দিন-রাত সারাক্ষণ তারা তার মহিমা ঘোষণা করে এবং তাতে তারা কোনোরকম শৈথিল্য করে না।'[২]

রূহজগতে কোনো অলসতা ছিল না। আল্লাহর স্মরণই ছিল কেবল। তথাপি স্বীকারোক্তি গ্রহণ করে আল্লাহ আমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন যে, দেখি, ওখানে গিয়েও তারা আমাকে রব বলে স্বীকার করে নাকি অন্য কাউকে রব সাব্যস্ত করে নেয়?

মানুষের সৃষ্টি ও 'রব'

রূহজগতেও রব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে আবার যেখানে মানুষের সৃষ্টিবিষয়ক আলোচনা করা হয়েছে, সেখানেও রব শব্দের ব্যবহার হয়েছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۚ ﴿۱﴾

---

১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৭২

২. সূরা আম্বিয়া : আয়াত ১৯, ২০

'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো। যিনি তোমাদের এক প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং উক্ত জোড়া থেকে বহু নারী-পুরুষ ছড়িয়ে দিয়েছেন।'[১]

এখানেও রব শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

যে আয়াত দাহ্রিয়াদের নিরুত্তর করে দেয়

বক্ষমান আয়াতটিতে মানুষসৃষ্টির তিনটি পদ্ধতি বলা হয়েছে-

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ

'তোমাদেরকে এক প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন।'

আর উক্ত প্রাণ থেকেই তার সন্তানাদির ধারা শুরু হয়েছে। এটি সৃষ্টির এক পদ্ধতি। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো-

وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

'এবং তা থেকে তার জোড়া তৈরি করেছেন।'

অর্থাৎ- হযরত আদম (আ.)-এর বাম পাঁজরের হাড় হতে আম্মাজান হযরত হাওয়া (আ.)কে সৃষ্টি করেছেন।

তারপর তৃতীয় পদ্ধতি-

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً

'এবং উক্ত জোড়া থেকে বহু নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করেছেন।'

যেন এখানে মানুষসৃষ্টির তিনটি পদ্ধতি আলোচনা করেছেন। অর্থগত দিক দিয়ে আয়াতটি এত গভীর যে, আমি অনেক দাহরিয়া ব্যক্তির[২] নিকট উক্ত আয়াতের তাফসীর পেশ করে জিজ্ঞেস করেছি, বলুন তো আল্লাহ ব্যতীত কে আছে, যিনি এই কায়েনাতকে সৃষ্টি করেছেন? কিন্তু তাদের কোনো জবাব ছিল না।

---

১. সূরা নিসা : আয়াত ১

২. একটা বস্তুবাদী সম্প্রদায়, যারা কাল ও প্রকৃতিকে জগতের সৃষ্টিকর্তা বলে বিশ্বাস করে এবং পৃথিবীকে অক্ষয় ও চিরস্থায়ী বলে মনে করে।

আল্লাহর ওপর হযরত ইমরানের স্ত্রী ও তাঁর মেয়ের আস্থা

ইমরান (আ.)-এর স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। কুরআনের ভাষ্য মোতাবেক তিনি দোআ করলেন :

اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ

'আর যখন ইমরানের স্ত্রী বলল, হে প্রভু! আমার গর্ভের সন্তানকে আমি তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম। আমার পক্ষ থেকে তুমি তা কবুল করে নাও।'[১]

চিন্তা করে দেখুন, একজন নবীর স্ত্রী খালেক বা মালেক শব্দ ব্যবহারের পরিবর্তে রব শব্দ ব্যবহার করে দোআ করছেন। আল্লাহর কুদরতে মেয়ে সন্তান জন্মাল।

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَاۤ اُنْثٰی

'তারপর যখন সে কন্যাসন্তান প্রসব করল, বলতে লাগল, হে প্রভু! আমি কন্যাসন্তান প্রসব করেছি।'[২]

وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰی

'আর পুত্র তো কন্যার মতো হয় না।'[৩]

وَاِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ

'আর আমি তার নাম রেখেছি মারয়াম।'[৪]

وَاِنِّیْۤ اُعِیْذُهَا بِكَ وَذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ﴿۳۶﴾

'আর আমি তার ও তার সন্তানাদির ব্যাপারে তোমার নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'[৫]

তার এই দোআর প্রতি-উত্তরে আল্লাহও রব শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে :

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَّكَفَّلَهَا زَكَرِیَّا

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৩৫
২. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৩৬
৩. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৩৬
৪. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৩৬
৫. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৩৬

'তারপর মহান প্রভু তাকে সাদরে গ্রহণ করলেন, তাকে উত্তমরূপে বড় করে তুললেন এবং হযরত যাকারিয়া (আ.)কে তার দায়ভার প্রদান করলেন।'[১]

রব কিরূপে কবুল করলেন? মারয়াম একদা একা ছিলেন। এদিকে হযরত যাকারিয়া (আ.) কোথাও দীনপ্রচারের কাজে চলে গেলেন। ফিরতে বেশ দেরি হলো। তিনি ভেবে পেরেশান হচ্ছিলেন, খাওয়ার তো কিছু নেই; মারয়াম হয়ত অনাহারে রয়েছে। হয়তবা ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনি যখন হুজরায় প্রবেশ করলেন, দেখতে পেলেন, মারয়াম মেহরাবে বসে অমৌসুমি ফল খাচ্ছে। ইরশাদ হচ্ছে :

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ

'যখন যাকারিয়া (আ.) তার নিকট মেহরাবে প্রবেশ করল।'[২]

وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا

'তখন তার নিকট রিযিক দেখতে পেল।'[৩]

قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا

'(অবাক হয়ে) বলতে লাগল, মারয়াম! এগুলো কোথা থেকে এল?[৪]

قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

'সে জবাব দিল, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে (এসেছে)।'[৫]

إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

'নিশ্চয় আল্লাহ যাকে চান অফুরন্ত রিযিক দান করেন।'[৬]

হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর দোআ

একথা শুনে হযরত যাকারিয়া (আ.)ও আল্লাহর নিকট দোআ করলেন।

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৩৭
২. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৩৭
৩. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৩৭
৪. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৩৭
৫. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৩৭
৬. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৩৭

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ

'তখন যাকারিয়া আপন প্রভুর নিকট দোআ করল।'[১]

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً

'হে প্রভু! আমাকে আপনার পক্ষ থেকে পবিত্র সন্তান দান করুন।'[২]

এভাবে দোআ করলেন কেন? কারণ, সন্তান লাভ করা যেমন আনন্দের ব্যাপার, সন্তান সৎ ও চরিত্রবান হওয়া তার চেয়েও বেশি আনন্দের ব্যাপার। তাই তিনি পবিত্র সন্তান প্রার্থনা করলেন। সুবহানাল্লাহ! কেননা, তিনি জানতেন, আল্লাহ মারয়ামকে অমৌসুমে ফল দান করতে পারেন। আমি বার্ধক্যে উপনীত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়লেও এবং আমার মাথার চুল পেকে গেলেও তিনি আমাকে অমৌসুমে ফল দান করতে পারেন। এই বার্ধক্যেও তিনি আমাকে সন্তান দান করতে সক্ষম।

আল্লাহর প্রতি হযরত হাজেরা (আ.)-এর আস্থা

হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বীয় স্ত্রী-পরিজনকে হারাম শরীফের নিকট 'ফসলাদিবিহীন জনপদে' রেখে চলে যাচ্ছেন। হযরত হাজেরা (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমাদের রেখে যাচ্ছেন কেন? হযরত ইবরাহীম (আ.) চুপ থাকলেন। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, কেন রেখে যাচ্ছেন? তিনি এবারও নীরব। হযরত হাজেরা (আ.) ব্যাপারটা বুঝে ফেললেন। তাই তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আমাদেরকে আল্লাহর নির্দেশে রেখে যাচ্ছেন? ইবরাহীম (আ.) বললেন হ্যাঁ। আমি মহান আল্লাহর নির্দেশেই তোমাদেরকে এখানে রেখে যাচ্ছি। হযরত হাজেরা (আ.) বললেন, আপনি যখন আমাদের আল্লাহর নির্দেশে রেখে যাচ্ছেন, তখন তিনি আমাদের ধ্বংস করবেন না।

আল্লাহর প্রতি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আস্থা

ইবরাহীম (আ.) সেখান থেকে এসে পরিবারের জন্য দোআ করছেন :

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৩৮

২. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৩৮

'হে আমাদের রব! আমি আমার সন্তানদের তোমার সম্মানিত গৃহের নিকট ফসলাদিশূন্য জনপদে রেখে এসেছি। হে প্রভু! যেন তারা নামায কায়েম করে।'[১]

فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْ اِلَيْهِمْ

'সুতরাং তুমি মানুষের অন্তর তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও।'[২]

وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ

'আর তাদেরকে ফলমূল থেকে রিযিক প্রদান করো।'[৩]

শিশুদের চাহিদা কে পূরণ করেন?

ছোট বাচ্চা। নিজে উঠতে পারে না। আপন পোশাক পরিধান করতে পারে না। দুধ পান করতে পারে না। পার্শ্ব পরিবর্তন করতে পারে না। এতই দুর্বল যে, তার নিজস্ব কোনো ঘর, বাড়ি, টাকা, কড়ি, ধনসম্পদ, পোশাক, পরিচ্ছদ, শক্তি, সামর্থ্য কিছুই নেই। কেবল রয়েছে একজন প্রতিপালক। তিনি মাতাপিতার অন্তরে তার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন। ফলে মাতাপিতা তার জন্য উৎসর্গিত হয়ে যান। মা সন্তানের জন্য স্বীয় কলিজা কেটে দিতেও প্রস্তুত থাকেন। বাচ্চার ঘুম আসছে না; মা জেগে থাকেন। কোনো মা কি এমন রয়েছেন, যিনি বাচ্চাকে কাঁদতে দেখেও শুয়ে থাকেন? না; এমন কোনো মা নেই। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা মা-বাবার অন্তরে সন্তানের ভালোবাসা ঢেলে দেন। ফলে এই ভালোবাসার টানেই তারা বাচ্চাকে লালনপালন করে থাকেন।

আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটির গুরুত্ব

জাগতিক বিবেচনায় বাচ্চার নিকট কিছুই নেই। তবে একটি জিনিস রয়েছে। সেটি হলো কান্নাকাটি। ক্ষুধা পেলে কাঁদতে শুরু করে; দুধের ব্যবস্থা হয়ে যায়। পিপাসা লাগলে কাঁদতে আরম্ভ করে; পানির ব্যবস্থা হয়ে যায়। ঘুমের প্রয়োজন হলে কান্নাকাটি করে; বিছানার ব্যবস্থা হয়ে যায়। পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন হলে কাঁদে; ফলে ব্যবস্থা হয়ে যায়। এক কথায় কোনো প্রয়োজন দেখা দিলেই কান্না শুরু করে আর আল্লাহ্ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। এরই ভিত্তিতে কোনো আরেফ বলেন, হে মানুষ! যতদিন তুমি কাঁদতে

---

১. সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৩৭

২. সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৩৭

৩. সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৩৭

জানতে ততদিন আল্লাহ্ তোমার সকল প্রয়োজন পূরণ করতেন। যখন থেকে তুমি কান্না ভুলে গেছ, তখন থেকে তোমার কাজ কঠিন করে দিয়েছেন।

মাতাপিতা শারীরিক প্রতিপালক

মাতাপিতা সন্তানের লালনপালন করেন। কেন? এ কারণে যে, তারাও সন্তানের প্রতিপালক। 'রব' শব্দটির অর্থ অতি ব্যাপক। শব্দটি মানুষের ক্ষেত্রে যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনি মহান আল্লাহ্র ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। তবে মানুষ ও আল্লাহ্র প্রতিপালনের মাঝে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। মাতাপিতা সুনির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত প্রতিপালন করেন আর আল্লাহ্ সর্বদা প্রতিপালন করেন। মাতাপিতা কেবল আপন সন্তানাদির প্রতিপালক। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ কুলকায়েনাতের প্রতিপালক। মাতাপিতা কেবল দৈহিক প্রতিপালক আর আল্লাহ্ দৈহিক ও আত্মিক উভয়ের প্রতিপালক। প্রতিপালনের গুণটি আল্লাহ্র সত্তাগত আর মানুষের প্রতিপালনের গুণটি আল্লাহকর্তৃক প্রদত্ত। পবিত্র কুরআনে মাতাপিতার ক্ষেত্রে রব শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

'হে প্রভু! তারা দুজন আমাকে শিশুকালে যেভাবে লালনপালন করেছেন, তুমিও তাদের সেভাবে লালনপালন করো।'[১]

আল্লাহ্ তা'আলা-ই সকলের প্রয়োজন মিটান

শিশুর প্রয়োজন বাহ্যত মাতাপিতা পূরণ করেন। কিন্তু মূলত সকল প্রয়োজন আল্লাহ তা'আলাই পূরণ করেন। বাচ্চা যে খাবার খায়, তা কার? আল্লাহ্র দেওয়া। বাচ্চার পোশাক কার? আল্লাহ্প্রদত্ত। এ মানুষটিই যখন বড় হয়ে যায়, তখন সে বলে,

أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ

'আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় রব!'[২]

হে মানুষ! তুমি ভাবছ না কেন? তোমার চোখ কেন মাথায় উঠে যায়? তুমি তোমার জন্মলগ্নের কথা ভুলে গেলে কেন? সংকীর্ণ পথটা তোমার জন্য কে প্রশস্ত করে দিলেন?

---

১. সূরা বানী ইসরাঈল : আয়াত ২৪

২. সূরা নাযিয়াত : আয়াত ২৪

আল্লাহ্ বলেন :

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۝ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۝ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۝

'মানুষ যেন তার খাবারের প্রতি লক্ষ করে যে, আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছি। তারপর আমি জমিনকে বিদীর্ণ করে দিয়েছি।'[১]

ভেবে দেখুন, বাচ্চা জন্মদানকালে একজন মহিলা কতই-না কষ্ট করে। তেমনি মাটি থেকে চারা গজানোর সময় যেন মাটিরও বাচ্চা হয়। চিন্তা করে দেখুন, তারও কী পরিমাণ কষ্ট হয়। মানুষের বাচ্চার প্রতিপালন সবচেয়ে বেশি কষ্টকর। ছাগলছানা দেখুন। জন্মের কয়েক মিনিট পর ছোটাছুটি করে বেড়ায়। মহিষের বাছুর দেখুন। জন্মের ক্ষণিক পরই দুধ পান করে। নিজে-নিজেই চলাফেরা করে। কেবল মানুষের বাচ্চার লালনপালনই কঠিন। কয়েক বছর যাবৎ মা-বাবাকে নিদারুন কষ্ট ও পেরেশানি পোহাতে হয়।

আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য বাতাসের ব্যবস্থা করেছেন। পানির ব্যবস্থা করেছেন। ব্যবস্থা করেছেন ফলমূল, অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদির। মায়ের বুকে দুধের ঝরনা প্রবাহিত করে দিয়েছেন। জন্মের পূর্ব থেকেই তার জন্য ব্যবস্থাপনা শুরু হয়েছে। জন্মের সাথে-সাথেই দুধের ঝরনা চালু হয়ে গেল। দাঁত ছিল না। একটু বড় হতেই দাঁত গজাতে শুরু করল। চলাফেরার প্রয়োজন দেখা দিলে আল্লাহ্ তাকে শক্তি দান করলেন। যে শিশুটি একসময় নিজে দাঁড়াতে সক্ষম ছিল না, যৌবনে সে কয়েক মন ওজনের বোঝাও অনায়াসে বহন করে। বীর-বাহাদুরে পরিণত হয়। সে প্রাথমিক অবস্থায় কত দুর্বল ছিল! এখন দেখুন, আল্লাহ্ তাকে কেমন সবল বানিয়েছেন।

হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতিপালনের বিস্ময়কর ঘটনা

হযরত মূসা (আ.)-এর জন্মের পূর্বেই গণকরা ফেরাউনকে বলে দিয়েছিল, তোমার রাজ্যে এমন এক শিশুর জন্ম হবে, যে তোমার রাজত্ব ছিনিয়ে নিবে। সে বলল, আচ্ছা; আমিও ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। পরবর্তী দু-বছর পর্যন্ত বনী ইসরাইলের নবজাতক শিশুদের হত্যা করতে লাগল। কোনো শিশুর জন্ম হলেই তাকে হত্যা করত। নারীদের জন্য ভিন্ন বাগান তৈরি করে দিল, যেন তারা এখানেই খাওয়া-দাওয়া করে, খেলাধুলা করে ও ঘুমায়। পুরুষদের জন্য পৃথক বাগান বানিয়ে দিল, যেন তারা সেখানেই পানাহার করে এবং ঘুমায়।

---

১. সূরা আবাসা : আয়াত ২৪-২৬

বনী ইসরাইলের নারী-পুরুষের মিলন নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। দু-বছর যাবৎ কোনো স্বামী তার স্ত্রীর নিকট গমন করতে পারবে না। উদ্দেশ্য ছিল, মাতাপিতার মিলন না ঘটলে বাচ্চা জন্ম হবে না। তারপরও যদি কোনো শিশু জন্ম গ্রহণ করে, তাকে হত্যা করে ফেলব।

কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটল। ওই সকল পুরুষদের একজন বড় অফিসার এবং নারীদের একজন বড় অফিসার, যারা স্বামী-স্ত্রী ছিলেন, ফেরাউনের দরবারে যাবতীয় তথ্য সরবাহের কাজে নিয়োজিত ছিল। তারা দরবারেই রাতযাপন করত। তাদের মেলামেশারও সুযোগ হতো। তাদের একজন হলেন হযরত মূসা (আ.)-এর পিতা, অপরজন মূসা (আ.)-এর মাতা। হযরত মূসা (আ.) মাতৃগর্ভে লালিত-পালিত হচ্ছেন। ভূমিষ্ঠ হলে তাঁর জননী ভয় পেলেন, না জানি এই শিশুকেও হত্যা করা হয়। আল্লাহ বলেন :

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ

'আর আমি মূসার মায়ের নিকট ওহী পাঠালাম, তুমি তাকে দুধপান করাও।'[১]

فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ

'যখন তুমি তার ব্যাপারে আশঙ্কা করবে যে, ফেরাউনের সৈন্যরা তাকে নিয়ে যাবে, তখন তাকে একটা সিন্দুকে ভরে নদীতে ফেলে দিবে।'[২]

فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ

'তারপর ঢেউ তাকে কূলে নিয়ে যাবে।'[৩]

তাকে গ্রহণ করবে কে?

يَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّىْ وَعَدُوٌّ لَّهٗ

'আমার ও তার শত্রু (ফেরাউন) তাকে গ্রহণ করবে।'[৪]

মূসা (আ.)-এর জননীর বিবেক বলছিল, হে খোদা! তোমার প্রতিশ্রুতি বড়ই বিস্ময়কর। তুমি বাচ্চাটিকে বাঁচাতে চাইলে আমি তাকে নির্জন কোনো

১. সূরা কাসাস : আয়াত ৭
২. সূরা কাসাস : আয়াত ৭
৩. সূরা ত্বহা : আয়াত ৩৯
৪. সূরা ত্বহা : আয়াত ৩৯

স্থানে রেখে দিব, যাতে পুলিশ বাহিনী তাকে দেখতে না পায় অথবা সেখানে প্রবেশ করতে না পারে। তুমি বাঁচানোর প্রতিশ্রুতি দিলে কতই-না আজব কায়দায় যে, তাকে সিন্দুকে ভরে নদীতে ফেলে দাও।

এবার ভাবুন, সিন্দুকে বাতাস প্রবেশের জন্য ছিদ্র রাখা আবশ্যক। আবার ছিদ্র রাখলে ভেতরে পানি ঢুকে পড়বে। খুবই জটিল সমস্যা। যা-ই হোক, মূসাজননী বিবেকের কথা আমলে না নিয়ে ভীত মনে স্বীয় কলিজার টুকরা সন্তানকে সিন্দুকে ভরে নদীতে ফেলে দিলেন। তিনি জানতেন, এ মহান প্রভু আল্লাহর প্রতিশ্রুতি, যিনি আমার ও বাচ্চার প্রতিপালক। তিনি বাচ্চার প্রতিপালনের ব্যবস্থা করবেন। ফল কী হলো? বাচ্চাটিকে ফেরাউন ও তার স্ত্রী গ্রহণ করল। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي

'আমি আমার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছি।'[১]

ফলে ফেরাউনের স্ত্রী বাচ্চাটিকে দেখে খুব পছন্দ করল এবং বলল,

لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا

'তোমরা একে হত্যা করো না। এ হয়ত আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা একে সন্তান বানিয়ে নেব।'[২]

শাহী নির্দেশ জারি হলে ধাত্রীরা আসতে লাগল। কিন্তু বাচ্চা দুধ পান করে না। এতে ফেরাউন বেশ চিন্তিত হলো। তার বিবেক অন্ধ হয়ে গেল। প্রজাদের বহু সন্তান নিধনকারী ফেরাউন বুঝতেই পারল না, মহান আল্লাহ আলোচিত সেই শিশুটি তার হাতেই লালনপালন করাচ্ছেন। এদিকে মূসাজননীর অবস্থাও ছিল অদ্ভুত।

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا ۖ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾

'সকালে মূসাজননীর হৃদয় অস্থির হয়ে পড়েছিল। যাতে সে আস্থাশীল হয়, তার জন্য যদি আমি তার হৃদয়কে দৃঢ় না করে দিতাম, তা হলে সে নিজের পরিচয় প্রকাশ করে দিত।'[৩]

---

১. সূরা ত্বহা : আয়াত ৩৯

২. সূরা কাসাস : আয়াত ৯

৩. সূরা কাসাস : আয়াত ১০

কিন্তু আল্লাহ তাকে আত্মনিয়ন্ত্রণশক্তি দান করলেন। ফলে তিনি মেয়েকে পাঠালেন যে, দেখো তো ফেরাউনের বাড়িতে কী হচ্ছে? সে ফেরাউনের ঘরে গিয়ে দেখল, বাচ্চা দুধ পান করছে না। মেয়েটি ফেরাউনকে বলল, আমি কি আপনাদের এমন লোকদের সন্ধান দেব না, যারা বাচ্চাটির লালন-পালনের পাশাপাশি তার হিতাকাঙ্ক্ষী হবে? মুফাসসিরগণ লিখেছেন, মেয়েটির কথা শুনে ফেরাউনের মনে ভাবনা জাগল, হিতাকাঙ্ক্ষীদের কথা বলতে আবার কে এল? তাই সে তাকে জিজ্ঞাস করল, তার হিতাকাঙ্ক্ষী কে? মেয়েটি এতই বুদ্ধিমতী ছিল যে, সে বলল, সকল প্রজা-ই আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী। যে দুধ পান করাবে, সে-ই হিতাকাঙ্ক্ষী। তার কথায় ফেরাউন শান্ত হলো। মেয়েটি ঘরে ফিরে মায়ের কাছে অবস্থার বিবরণ দিল।

আজ আমরা অফিস, দোকান-পাট ও ধন-সম্পদকে রব মনে করে নিয়েছি। বহুসংখ্যক মানুষ এই বিশাল ধোঁকায় নিপতিত। বলে, কী করব হুজুর! নিজের জন্য তো ঘুষ নেই না; বিবি বাচ্চার জন্য নেই। হে আল্লাহর বান্দা! মনে রাখবে, যিনি তোমাকে খাওয়াতে পারেন, তিনি তোমার বিবি-বাচ্চাকেও খাওয়াতে পারবেন।

وَاِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهٗ

'সব কিছুর ভান্ডার আমার নিকট রয়েছে।'[১]

وَمَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ

'আমি সুনির্দিষ্ট পরিমাণে তা নাযিল করি।'[২]

যে আল্লাহর হয়ে যায়, আল্লাহ তার হয়ে যান

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে এ বিষয়টি বদ্ধমূল করে দিয়েছেন যে, রব একমাত্র আল্লাহকে মানতে হবে। তাই তাদের সকল চাওয়া-পাওয়া আল্লাহ তা'আলার সত্তার কাছে ছিল। এক সাহাবির জমি চাষ করতে হবে। তিনি জমিতে গিয়ে দু-রাকাত নামায পড়ে দোআ করলেন, হে আল্লাহ! আমার জমির এই অংশটুকু চাষ করতে পানির প্রয়োজন। কিন্তু কোথাও পানির ব্যবস্থা নেই। তুমি আসমান থেকে পানি

---

১. সূরা হিজর : আয়াত ২১

২. সূরা হিজর : আয়াত ২১

গ্রহণ করলেন বটে; কিন্তু ঘরে নিয়ে রেখে দিলেন। কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হযরত! অমুক তো আপনাকে অনেক দামী জুতা হাদিয়া দিয়েছিল। এলাকার অনেকেই এমন জুতা পরিধান করে। জুতাজোড়া দেখতেও বেশ সুন্দর ছিল।

তিনি বললেন, আমি তার মনঃতুষ্টির জন্য জুতাজোড়া গ্রহণ করেছি; কিন্তু পরিধান করিনি। কারণ, আমি ভাবলাম, আমার মনিবের পবিত্র রওজার গম্বুজের রং সবুজ। তাহলে এ রঙের জুতা আমি কীভাবে পায়ে পরিধান করতে পারি?

তিনি মদীনায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন। অত্যন্ত শৌখিন মানুষ ছিলেন। এক ব্যক্তি দেখতে পেল, তিনি খালি পায়ে মদীনার অলি-গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর তাঁর পা থেকে রক্ত ঝরছে। কেউ তাঁকে বলল, হযরত! জুতা পরিধান করে নিলেই তো হতো। তিনি বললেন, জুতা তো পরিধান করতাম; কিন্তু যখন ভাবি, এই ভূমিতে আমার মাহবুব প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিচরণ করতেন, তখন আমার দিল সেই ভূমিতে জুতা পরে চলতে সায় দেয় না।

কেমন প্রেমিক ছিলেন!

ওলামায়ে দেওবন্দের অতুলনীয় বিশ্বাস

ওলামায়ে দেওবন্দ তাঁদের আকিদা-বিশ্বাস সম্পর্কে লিখেছেন। একটু অন্তরের কান দিয়ে শ্রবণ করুন; তাহলে অনুমান করতে পারবেন, যারা তাদের অপবাদ দেয়, তারা কতখানি ভুলের মধ্যে রয়েছে। ওলামায়ে দেওবন্দের আকিদা হলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর মোবারকের মাটি আল্লাহ তা'আলার আরশের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহি (রহ.)-এর নবীপ্রেম

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহি (রহ.) যুগের বিখ্যাত ফকীহ ছিলেন। একব্যক্তি হজ থেকে ফিরে আসার সময় একটি কাপড় কিনে আনল এবং সেটি হযরতের খেদমতে পেশ করল। হযরত কাপড়টি হাতে নিয়ে চুমু খেলেন এবং মাথার ওপর রাখলেন। মনে হলো, অনেক দামী জিনিস। ছাত্ররা সামনেই বসা ছিল। আরজ করল, হযরত! এ তো অমুক দেশের তৈরী কাপড়; মদীনার লোকেরা কিনে এনে তা বিক্রি করে। তিনি বললেন, একথা

আমি স্বীকার করছি যে, এটি মদীনার তৈরী কাপড় নয়; তবে আমি একে এজন্য সম্মান করছি যে, তাতে মদীনার বাতাস লেগেছে।

একব্যক্তি হজ থেকে এসে হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহি (রহ.)-এর খেদমতে তিনটি খেজুর পাঠিয়ে দিল। তিনি যখন খেজুরগুলো পেলেন, এমনভাবে হাতে নিলেন, যেন পৃথিবীর মহাদৌলত তাঁর হাতে এসেছে। একছাত্রকে ডেকে বললেন, আমার নিকটতম যত আত্মীয়স্বজন আছে, সকলের তালিকা তৈরি করো। সে সবার তালিকা তৈরি করল। তাতে ৫০-এরও অধিক নাম ছিল। হযরত বললেন, এই খেজুরগুলোকে নামের সংখ্যা অনুযায়ী ভাগ করো। আদেশ মোতাবেক ভাগ করা হলো। ভাগগুলো ছিল একেবারেই ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র। এবার বললেন, এক-একটি টুকরা এক-একজন বন্ধুকে দিয়ে দাও। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, যেন তিনি কিছু মণি-মুক্তা পেয়েছেন, যা কিনা সকল বন্ধুকে ভাগ করে দিচ্ছেন। একছাত্র বলল, হযরত এত ছোট-ছোট টুকরা দিলে কী লাভ হবে? ছাত্রের কথা শুনে তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেল এবং বলতে লাগলেন, মদীনার খেজুরের টুকরাকে তুমি ছোট মনে করছ কীভাবে? এই রাগে তিনি বেশ কিছুদিন তার সাথে কথা-ই বলেননি।

মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি (রহ.)-এর নবীপ্রেম

হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি (রহ.) দারুল উলূম দেওবন্দে শিক্ষকতা করতেন। মাসিক ভাতা এতই স্বল্প ছিল যে, অতি কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করতেন। যা কিছু পেতেন, তা পারিবারিক প্রয়োজনেই ব্যয় হয়ে যেত। এ কারণে হজও করতে পারেননি। কিন্তু মনে বড় আশা ছিল হজ করার। কোনো-কোনো কিতাবে আছে, হজের মৌসুম এলে তিনি অস্থির হয়ে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতেন। এমনকি দস্তরখানে বসে মনে পড়লে বলতেন, 'জানি না প্রেমিকরা কী করছে'। তিনি হাজীদের 'প্রেমিক' বলতেন। এমন ভাবনা উদ্রেক হওয়ামাত্রই খানা-দানা বাদ দিয়ে আফসোস করতে থাকতেন আর বলতেন, হায়! যদি এমন কোনো দিন আসত, যেদিন হুসাইন আহমাদেরও ওই জায়গার জিয়ারত নসিব হতো।

একবার রাতে হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি উঠে বসে পড়লেন। নানা চিন্তায় আর ঘুম এল না। এমতাবস্থায় তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে দোআ করতে লাগলেন, হে আল্লাহ! জানি না, তোমার প্রেমিকরা এখন কী

করছে। আমাকেও যদি তুমি তাদের মধ্যে গণ্য করে নিতে! জিলহজ মাসের দশ দিন তাঁর মোটেও স্বস্তি হতো না। দোআ আর কান্নাকাটিতে মশগুল থাকতেন।

একপর্যায়ে মহান আল্লাহ তাঁর এই ভালোবাসা কবুল করে নিলেন। হারাম শরীফের দরজা তাঁর জন্য এমনভাবে খুলে দিলেন যে, দীর্ঘ ১৮ বছর যাবৎ রওজা শরীফের পাশে বসে হাদীছের দরস দান করলেন। মূলত খাঁটি প্রেমিকের জন্যই এমনটি সম্ভব—অন্যের জন্য নয়।

তিনি হাদীছ শরীফের দরস দানকালে রওজা শরীফের দিকে মুখ করে বসতেন, আর

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

এর পরিবর্তে

قَالَ هٰذَا الرَّسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

বলতেন। দরস শেষে এশার নামাযের পর অথবা তাহাজ্জুদের আগে আপন দাড়ি মোবারকের মাধ্যমে রওজা শরীফের নিকটবর্তী স্থানসমূহ ঝাড় করতেন। বিষয়টি অনেকেই প্রত্যক্ষ করেছেন। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ আমাদেরও এমন প্রেম, ভালোবাসা ও আদব নসিব করুন।

এক কবি কতই-না চমৎকার বলেছেন :

نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے
یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے
اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو
طیبہ کے راستے کے کانٹا بھی پھول ہے

'যে সৌন্দর্য নিয়ে গর্ব সে তো আমার প্রিয়নবীর
এ ছায়াপথ তো তাহারই চরণ ধূলির।
মাথায় ভর করে চলো হে কাফেলা প্রেমের,
মদীনার পথের কাঁটাও যেন ফুল সমমানের।

প্রেমিকের পরিচয়

জান, প্রেমিকের পরিচয় কী? প্রেমিক তো তাকেই বলে যে, ভালোবাসার দাবির পাশাপাশি প্রতিটি কাজ নবীর হুকুম মোতাবেক সম্পাদন করে। নবীর নির্দেশ যদি মনঃপুত না হয়, তাহলে বুঝতে হবে, প্রেমিকের দাবিদারই কেবল – বাস্তব প্রেমিক নয়।

কোনো এক প্রেমিক বলেন :

وہی سمجھا جائیگا شیدائے جمال مصطفے
جس کا حال حال مصطفے ہو جس کا قال قال مصطفے

'তাকেই বলব নবীর প্রকৃত প্রেমিক,
যার চলা-বলা সব তব সুন্নাতমাফিক।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাচ্চা প্রেমিক হিসেবে কাকে গণ্য করা হবে? যার কথাবার্তা হবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম মোতাবেক এবং যার কাজকর্ম হবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল ও সুন্নাত মোতাবেক। আল্লাহ তা'আলা ওলামায়ে দেওবন্দের কবরে লক্ষ-কোটি রহমত নাযিল করুন, যাঁরা প্রিয়নবীর প্রতিটি সুন্নাতের ওপর ঘর বেঁধেছেন এবং সংরক্ষণ করেছেন।

নবীপ্রেমের একটি বিরল ঘটনা

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসার আরেকটি ঘটনা শুনিয়ে দিচ্ছি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বাণীর সারমর্ম হলো– আমার গোটা উম্মতের হিসাব-নিকাশ না হওয়া পর্যন্ত আমি জান্নাতে প্রবেশ করব না। এক ব্যক্তি হাতে একটা থলে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। থলেটায় কিছু টাকা-পয়সাও ছিল। একচোর দৌড়ে এসে তার হাত থেকে থলেটা ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

কিছুদূর যেতে-না-যেতেই সে অন্ধ হয়ে গেল। সেখানে বসেই সে চেঁচামেচি ও কান্নাকাটি শুরু করে দিল। বলতে লাগল, লোকসকল! আমি অমুক জায়গা থেকে এক ব্যক্তির টাকার থলে ছিনতাই করে নিয়ে এসেছি। আমাকে সেখানে নিয়ে চলো; আমি তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব, যেন আমি

পুনরায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাই। লোকেরা যখন তাকে সেখানে নিয়ে গেল ততক্ষণে থলের মালিক সেখান থেকে চলে গেছেন।

পাশেই ছিল এক নাপিত। তাকে জিজ্ঞেস করল, আমি অমুক ব্যক্তির টাকার থলে ছিনতাই করেছি; তুমি তাকে চেন কি? সে বলল, চিনি বটে; তিনি তো নামায পড়তে এ দিকে আসেন। সম্ভবত পরবর্তী নামাযের সময় এখান দিয়ে অতিক্রম করবেন। এলে আমি তোমাকে বলে দেব। তাকে সেখানে বসিয়ে দেওয়া হলো।

কিছুক্ষণ পর লোকটি সেখান দিয়ে যেতে শুরু করলেন। নাপিত বলল, এই তো তিনি যাচ্ছেন। চোর তার পায়ে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল। লোকটি বলতে লাগলেন, আরে ভাই! আমি তো তোমাকে তখনই ক্ষমা করে দিয়েছি। চোর অবাক হয়ে বলল, তখনই আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কারণ, আমি ভাবলাম, তুমি আমার থলে চুরি করে অন্যায় করেছ। এ কারণে কেয়ামত দিবসে তোমার নামে মামলা দায়ের হবে। তারপর হিসাব-নিকাশ হবে। ফলে এ কারণে নবীজির জান্নাতে প্রবেশ করতে খানিক দেরি হয়ে যাবে। তাই আমি তোমাকে তখনই ক্ষমা করে দিয়েছি, যাতে মামলা দায়ের না হয় এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও জান্নাতে প্রবেশে বিলম্ব না হয়।

প্রেমিক ফকিরের ঘটনা

দিল্লির জামে মসজিদের দরজায় এক প্রতিবন্ধী ভিক্ষা করত। এক ইংরেজ মসজিদটি দেখতে এল। ইংরেজরা দিল্লীর জামে মসজিদ দেখতে আসত এটা আমিও দেখেছি। ওই ইংরেজ উচ্চপদস্থ লোক ছিল। সে যখন ফকিরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিল, কিছু পাওয়ার আশায় সে তাকে স্যালুট করল। ইংরেজ তাকে কিছু টাকা দিল। ইংরেজরা এসে মসজিদের জুতা রাখার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকত। ভিতরে প্রবেশ করত না। মসজিদের কারুকাজ ও মর্যাদা এতই ছিল যে, আল্লাহর ঘরের সামনে দাঁড়িয়েই তাদের প্রশান্তি মিলত।

ইংরেজ মসজিদ দেখে চলে গেল। বাসায় গিয়ে টের পেল, যে থলে থেকে ভিক্ষুককে টাকা দিয়েছে, সেই থলেটা পকেটে নেই। টাকার পরিমাণও অনেক ছিল। এদিকে থলেটা কোথায় যে পড়ল তাও জানা নেই।

মোটকথা, বিষয়টি এ পর্যন্তই ক্ষান্ত রইল। এক সপ্তাহ পর ছুটি পেলে স্ত্রী বলল, তুমি মসজিদ দেখেছ; আমাকেও দেখাতে হবে। সে ছুটির দিন স্ত্রীকে

নিয়ে মসজিদ দেখতে এল। ইংরেজ লোকটি ফকিরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাকে দেখামাত্রই সে দাঁড়িয়ে গেল এবং বলল, স্যার! বিগত সপ্তাহে আপনি মসজিদ দেখতে এসে আমাকে টাকা দিয়েছিলেন। তারপর টাকার থলেটা পকেটে রাখতে গেলে বাইরে পড়ে যায়। তখন আমি সেটা তুলে রাখি। আপনার এই থলেটা আমার কাছে আমানত। এখন আমি সেটা আপনার নিকট হস্তান্তর করছি।

থলেটা হাতে নিয়ে ইংরেজ দেখল, তাতে যা ছিল, সবই আছে। অবাক হয়ে বলতে লাগল, কিছু টাকা রেখে দিয়েও তো থলেটা ফেরত দিতে পারতে। সব টাকাই হুবহু ফেরত দিলে কেন? কী কারণে তুমি একটি টাকাও রাখলে না? প্রতিবন্ধী ভিক্ষুক বলল, ব্যাপার হলো, কেয়ামত দিবসে সকল মানুষ আপন-আপন নবীর পিছনে থাকবে। তারা দলবদ্ধভাবে নবীগণের পেছনে চলবে। থলেটা তুলে নেওয়ার সময় আমারও মন চাচ্ছিল, টাকাগুলো নিয়ে নিই। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম, সব কাজই তো আল্লাহ তা'আলার সামনে পেশ করা হবে। যদি আমি টাকাগুলো নিয়ে নিই আর কেয়ামত দিবসে নবীজির পিছনে দাঁড়াই আর আপনি হযরত ঈসা (আ.)-এর পিছনে দাঁড়ান, সে সময় যেন আমার নবীর ব্যাপারে আপনার নবী এই অভিযোগ করতে না পারে যে, আপনার উম্মত আমার উম্মতের টাকা নিয়েছিল। একথা ভেবে আমি খেয়ানত করিনি। আপনার টাকাগুলো হুবহু ফেরত দিয়েছি। হায়! আমাদের অন্তরে দিল্লির ওই প্রতিবন্ধী ভিক্ষুকের মতোও নবীজির ভালোবাসা থাকত যদি!

قوت عشق سے ہر پست کو بالا کردے
دہر میں اسم محمد سے اجالا کردے

প্রেমের শক্তি দিয়ে সব নিচুকে উঁচু করে দাও।
মুহাম্মাদের নাম দ্বারা ভুবনটাকে উজ্জ্বালা বানাও।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

প্রেমের জ্বালা ও জ্ঞানের নেশা

‘প্রেমের জ্বালা ও জ্ঞানের নেশা হাসিলের জন্য এমন অদম্য স্পৃহা ও খাঁটি আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। প্রেমের জ্বালা শেখাবার লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলা নবীগণকে পাঠিয়েছেন। আর জ্ঞানের নেশা সৃষ্টির জন্য কিতাব দান করেছেন। অর্থাৎ– কিতাবুল্লাহ আর রিজালুল্লাহ পাঠিয়েছেন। রিজালুল্লাহর মাধ্যমে প্রেমের জ্বালার সাধ পূরণ হবে। আর কিতাবুল্লাহর মাধ্যমে জ্ঞানের নেশার সাধ পূরণ হবে। অথবা এভাবে বুঝে নিন যে, প্রেমের জ্বালা মেটাতে সুন্নাতে রাসূল আর জ্ঞানের নেশা কাটাতে কুরআন শরীফ দিলেন।’

প্রেমের জ্বালা ও জ্ঞানের নেশা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ اَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۭ قَالُوْا بَلٰى ۚ شَهِدْنَا ۚ

আদম-সন্তানের দুটি দল

হাদীছে আছে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)কে তৈরি করে তাঁর পৃষ্ঠদেশে আঘাত করলেন। তবে তাঁর হাতকে আমাদের হাতের সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। সেটি ছিল কুদরতি হাত। আল্লাহ তা'আলা যখন স্বীয় ডান হাত দ্বারা আদম (আ.)-এর পৃষ্ঠদেশে আঘাত করলেন, তখন আদম (আ.) থেকে একদল সন্তান বেরিয়ে পড়ল, যাদের দেহ অবিকল মানুষের মতো। চোখ, মুখ ও অন্যান্য সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গই ছিল। তবে দেহ ছিল আকারে অতিক্ষুদ্র। তাদের চেহারা ছিল আলোকোজ্জ্বল। তারপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বাম হাত দ্বারা পুনরায় তাঁর পৃষ্ঠে আঘাত করলে আরেক দল সন্তান বেরিয়ে পড়ল। আকার-আকৃতিতে এরাও পূর্ববর্তীদের মতো ছিল। তবে চেহারা ছিল কালো। হযরত আদম (আ.) যখন তাদের দিকে তাকালেন, জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রভু! এরা কারা? বলা হলো, এরা তোমার সন্তান। সন্তান কথাটি শুনে আদম (আ.) তাদের দিকে পুনরায় তাকালেন। প্রথম দৃষ্টি ছিল অপরিচিত হিসেবে আর দ্বিতীয় দৃষ্টি ছিল আপন ও পরিচিত হিসেবে। দ্বিতীয়বার তাকিয়ে তিনি কিছু চেহারা উজ্জ্বল আর কিছু চেহারা কালো দেখতে পেলেন। যেহেতু সকল পিতাই আশা করেন, তার সব সন্তান যেন পূর্ণতার অধিকারী হয়। এ কারণে আদম (আ.) কিছু চেহারা উজ্জ্বল ও কিছু চেহারা কালো দেখে আরজ করলেন :

لَوْلَا سَوَّيْتَ يَارَبِّ

'হে প্রভু! তুমি সবাইকে সমান কেন বানালে না?'

উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বললেন :

أَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ

'আমার পরিচিত হওয়ার সাধ জেগেছে।'

এ যেন কুরআনে পাকের এই আয়াতেরই মর্মার্থ–

فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ

'একদল (উজ্জ্বল চেহারার অধিকারীরা) জান্নাতে আর অপর দল (কালো চেহারার অধিকারীরা) জাহান্নামে যাবে।'[১]

উদ্দেশ্য ছিল, আদম-সন্তানের পরীক্ষা নেওয়া। যারা এ পরীক্ষা পাশ করার ছিল, তারা সৌভাগ্যবান এবং তাদের চেহারা উজ্জ্বল ছিল। আর যারা এই পরীক্ষা ফেল করার ছিল, তারা ছিল হতভাগা এবং তাদের চেহারা কালো ছিল।

এ ছিল আদম-সন্তানের দুটি দল।

আল্লাহর সাথে আদম-সন্তানের প্রথম কথোপকোথন

তারপর আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত আদম সন্তানের সাথে কথা বলেছেন। হাদীছ শরীফে আছে :

كَلَّمَهُ عَيَانًا

'তিনি তাদের সাথে সরাসরি কথা বলেছেন।'

সেই কথোপোকথনের সময় তিনি জিজ্ঞেস করেছেন :

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

'আমি কি তোমাদের রব নই?'[২]

সবাই চুপ হয়ে গেল। কারণ, ইতোপূর্বে তারা কখনো প্রশ্নের সম্মুখিন হয়নি। তাই তারা অবাক হলো, আমাদের সাথে এ কেমন কথা হলো? সে সময় মানবতার শিক্ষক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন :

---

১. সূরা শূরা : আয়াত ৭

২. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৭২

بَلٰى يَا رَبِّ

'হ্যাঁ হে প্রভু! আপনি-ই তো আমাদের রব।'

নবীজির জবাব শুনে আদম-সন্তানও এই জবাবের পুনরাবৃত্তি করল। এ কারণেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশ্বমানবতার শিক্ষক বলা হয়। তখনও তিনি নবুওতপ্রাপ্ত ছিলেন। হাদীছে পাকে এসেছে, আল্লাহর রাসূল ইরশাদ করেছেন :

كُنْتُ نَبِيًّا وَّاٰدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ

'আদম যখন পানির আকারে ছিলেন, আমি তখনও নবী ছিলাম।'

মানবতার জন্য দুটি মহামূল্যবান উপহার

সেই কথোপোকথনকালে মানুষকে দুটি উপহার দেওয়া হয়েছে। একটি হলো, আল্লাহ তা'আলা আপন সৌন্দর্য দেখিয়ে প্রেমের জ্বালা দান করেছেন। অপরটি প্রশ্ন করে জ্ঞানের নেশা দান করেছেন। এই দুটি বিষয় অনেক বড় নেয়ামত। এর অর্থ এই নয় যে, আর কোনো নেয়ামত দেওয়া হয়নি, বরং এত নেয়ামত দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ তা গণনা করে শেষ করতে পারবে না। দেখুন! যখন বৃষ্টি হয়, কেউ কি বৃষ্টির ফোঁটা গণনা করতে পারে? পারে না। কেউ কি সমুদ্রের পানির ফোঁটা গণনা করতে পারে? পারে না। কেউ কি আকাশের তারকা গণনা করতে পারে? পারে না। এমন কি কেউ আছে, যে পৃথিবীর বালিকণাগুলো গুণতে পারে? পারে না। কোনো মানুষ কি সারা পৃথিবীর গাছের পাতাগুলো গুণতে পারে? পারে না।

অন্তরের কান দিয়ে শুনুন, তার পরও আমি বলব, বৃষ্টির ফোঁটা গণনা করা সম্ভব, সমুদ্রের পানির ফোঁটা গণনা করা সম্ভব, সারা পৃথিবীর সব বালিকণা গণনা করা সম্ভব, গাছের সব পাতা ও আকাশের সব তারকা গণনা করা সম্ভব; কিন্তু আল্লাহর নেয়ামতরাজি গণনা করা কখনোই সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন :

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا

'আর যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গণনা করতে চাও, তাহলে তা গণনা করে শেষ করতে পারবে না।'[১]

মোটকথা, নেয়ামত তো অগণিত। তার মধ্যে দুটি হলো বৃহৎ। একটি হলো প্রেমের জ্বলন, অপরটি জ্ঞানের নেশা।

---

১. সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৩৪

মন ও মস্তিষ্কের খাদ্য

আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত প্রেমের জ্বালার জন্য দান করেছেন কম্পিত হৃদয় আর জ্ঞানের নেশার জন্য দিয়েছেন অস্থির মস্তিষ্ক। মানবদেহে এই দুটির পাত্রও তৈরি করলেন। মনের খাদ্য প্রেম আর মস্তিষ্কের খাদ্য জ্ঞান। শুধু পাত্র তৈরি করে খাদ্য তৈরি না করলে সেটা অন্যায় ও জুলুম। অথচ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيْدِ

'আর আমি আমার বান্দাদের প্রতি জুলুম করি না।'[১]

যেমন– আল্লাহ পেট বানিয়েছেন। এ কারণে পৃথিবীতে পাঠানোর আগেই তার প্রয়োজন মেটাতে ফল, মূল ও অন্যান্য রকমারি খাদ্যের ব্যবস্থা করে রেখেছেন এবং জমিনকে বিছানা বানিয়ে দিলেন। মোটকথা, তিনি পেটের ক্ষুধা নিবারণে যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

ঠিক তেমনি ক্ষুধার্ত মন ও মস্তিষ্কেরও খাদ্যের প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি আপন সৌন্দর্য প্রদর্শন করে মনের খোরাক হিসেবে প্রেমের জ্বালা দান করলেন এবং প্রশ্ন উত্থাপন করে মস্তিষ্কের খোরাক তথা জ্ঞানের নেশা প্রদান করলেন। প্রেমের নিবাস হলো অন্তর। প্রেমের আগুন অন্তরে থাকে আর তার ধোঁয়া মুখে আলোচনা আকারে নির্গত হয়। এ কারণেই মনের খোরাক হলো রবের স্মরণ আর মস্তিষ্কের খোরাক রবের জ্ঞান।

প্রেমের জ্বালা ও জ্ঞানের নেশার বাস্তবতা

প্রেমের জ্বালা ও জ্ঞানের নেশা এই দুটি বিষয়ের মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারলেই মানবজীবন সফলভাবে পরিচালিত হয়। পৃথিবীতে বহু চিন্তাবিদ বহু নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। শেষ পর্যন্ত সেগুলো তাদের আপন অস্তিত্বের মতো একদিন বিলীন হয়ে গেছে। কারণ, ওইসব নীতিমালায় জ্ঞানের নেশা বিদ্যমান থাকলেও প্রেমের জ্বালা ছিল অনুপস্থিত। ঢাক-ঢোল বাজিয়ে বলা যায়, পৃথিবীর কোনো ব্যবস্থাপনাই এই দু-রঙে রঙিন না হয়ে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে পারে না। আল্লাহ আমাদের যে জীবনব্যবস্থা দান করেছেন, তাতে প্রেমের জ্বালা ও জ্ঞানের নেশা উভয়টিই বিদ্যমান। নবীজি পৃথিবীতে তাশরীফ এনে স্বীয় আগমনের দুটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন।

---

১. সূরা কাফ : আয়াত ২৯

একটি হলো–

إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا

'আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।'[১]

বলেননি, আমি ছাত্র হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। কারণ, ছাত্রের তুলনায় শিক্ষকের মর্যাদা অনেক বেশি। যেন বক্ষ্যমাণ হাদীছটিতে জ্ঞানের নেশার বিষয়টি পরিষ্কার করা হয়েছে যে, আমি মানবতাকে জ্ঞানের অলংকারে সুসজ্জিত করতে প্রেরিত হয়েছি।

অপরটি হলো :

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

'আমি সচ্চরিত্রকে পূর্ণতাদানের জন্য প্রেরিত হয়েছি।'[২]

এই সচ্চরিত্রেরই অপর নাম প্রেমের জ্বালা। লক্ষ করার বিষয় হলো, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এই দায়িত্ব বাস্তবায়নে কতখানি সফল হয়েছেন? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজের ভাষণটি এই প্রশ্নের চমৎকার জবাব। কারণ, তিনি সেই ভাষণে গোটা উম্মতের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলেন, আমি আমার প্রেরণের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পেরেছি কি? সবাই একবাক্যে দৃঢ় কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন, আপনি নিশ্চিতরূপে আপনার প্রেরণের উদ্দেশ্য পূর্ণ করেছেন। নবীজি তখন বললেন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন, আমাকে প্রেরণের উদ্দেশ্য আমি পূর্ণ করে দিয়েছি।[৩]

এখানে কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ করার সাক্ষ্য দেওয়া হলো? প্রেমের জ্বালা ও জ্ঞানের নেশাসংক্রান্ত উদ্দেশ্যের সাক্ষ্য দেওয়া হলো। পৃথিবীর বহু চিন্তাবিদ অনেক চেষ্টা-সাধনা করেও এই দুটি বিষয়কে একত্রিত করতে সক্ষম হয়নি।

دعوت فکر و عمل روز نئی ملتی ہے
پھر بھی دنیا تیرے پیغام سے لگے نہ بڑھی

'নিত্য দিনে পাই কর্ম ও ভাবনার নতুন-নতুন আহ্বান,
তবু পৃথিবী আজও ছাড়িয়ে যায়নি তোমারি পয়গাম।

---

১. রওজাতুল মুহাদ্দিছীন : হাদীছ নং ৪৯২৬

২. মুসনাদুশ শিহাব : হাদীছ নং ১০৮০

৩. ছহীহ বোখারি : হাদীছ নং ১৭৩৯

মোটকথা, ১৪০০ বছর পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও শাহে মদীনার জীবনব্যবস্থা-ই সফল প্রমাণিত, যাতে রয়েছে প্রেমের জ্বালা ও জ্ঞানের নেশা।

বিবেক অপেক্ষা অন্তর শ্রেষ্ঠ

সকল নবী-রাসূল পৃথিবীতে এসে অন্তরকেই তাদের মেহনতের ক্ষেত্র বানিয়েছেন। এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে। তাহলো জ্ঞানের সম্পর্ক জাহেরের সাথে আর প্রেমের সম্পর্ক বাতেনের সাথে। আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের ভালোবাসা যেহেতু অদৃশ্য জগতের বিষয়, সেহেতু অন্তরকে বিবেকের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কুরআন পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছে–

لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا

'হায়! যদি তাদের অন্তর থাকত, যা দ্বারা তারা বুঝতে পারত!'[১]

কারণ, বিবেক নিজেও অন্তরের অনুগামী। এ কারণেই নবীগণ পৃথিবীতে তাশরীফ এনে মানুষের অন্তরকে তাঁদের মেহনতের ক্ষেত্র বানিয়েছেন। একথা কোথাও বলা হয়নি যে, আমরা বিবেককে পরিবর্তন করে দিয়েছি। কেননা, এ ক্ষেত্রে বিবেকের পা অচল। প্রত্যক্ষ করা তো অন্তরের কাজ। ঈমানের সম্পর্ক অন্তরের সাথে। গায়েব বা অদৃশ্যের সম্পর্ক অন্তরের সাথে। জ্ঞান যেহেতু জাহেরের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়, সেহেতু ইসলামে অন্তরকে বিবেকের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

প্রেম ও জ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক

যেখানে প্রেমের জ্বালা আবশ্যক, সেখানে জ্ঞানের নেশাও আবশ্যক। দেহের সাথে পোশাক যেমন জড়িত, এই দুটির একটি অপরটির সঙ্গে ঠিক তেমনি জড়িত। শুধু প্রেম থাকলে মানুষ বিদ'আতে জড়িয়ে পড়ে। শুধু জ্ঞান থাকলে অহংকার সৃষ্টি হয়। জ্ঞান প্রেমের ভারসাম্য বজায় রাখে আর প্রেম জ্ঞানের মাঝে বিনয় সৃষ্টি করে। উভয়টি-ই আবশ্যক। যেকোনো একটি হলে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

---

১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৭৯

শুধু প্রেম বিদ'আতের উৎস

শুধু প্রেম মানুষকে বিদ'আতে লিপ্ত করে দেয়। এ কারণেই দেখবেন, যারা অধিক প্রেমের দাবিদার, তারা বলে, জ্ঞানের কথা একটু বাদ দাও তো বন্ধু! কারণ, জ্ঞানের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

আসতাগ্‌ফিরুল্লাহ! একেই বলে অন্ধ প্রেম, যা মানুষকে কবরে সেজদা করতে উদ্বুদ্ধ করে। পীরের বড়-বড় ছবি ঘরে ঝুলিয়ে রাখে আর সকালবেলা উঠেই তাতে ভক্তি জানায় ও প্রার্থনা করে। এমনটা হলো কেন? কারণ, সে খানিক প্রেম লাভ করেছে – জ্ঞান লাভ করেনি। এ কারণেই সে এমন উল্টা-পাল্টা কথা বলে। অথচ কামেল সুফী তাকেই বলে, যার কাছে প্রেম ও জ্ঞান উভয়টিই থাকে।

শুধু জ্ঞান অহংকার সৃষ্টি করে

শুধু জ্ঞান মানুষকে অহংকারী বানিয়ে দেয়। একপর্যায়ে মানুষ প্রবৃত্তির পুজারি হয়ে পড়ে। এ কারণেই আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন :

أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ

'আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে?'[১]

একটু সামনে গিয়ে বলেন :

وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ

'জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে পথহারা করে দিয়েছেন।'[২]

এখানে ইল্‌ম তথা জ্ঞানের আলোচনা এজন্য করা হয়েছে যে, শুধু জ্ঞান মানুষকে প্রবৃত্তির পূজারি বানায় এবং সে আপন ইচ্ছায় গবেষণা করতে থাকে। শয়তান বড় জ্ঞানী ছিল। আল্লাহ যখন আদম (আ.)কে সেজদা করতে নির্দেশ দিলেন, তখন ফেরেশতারা সেজদা করল; কিন্তু শয়তান সেজদা করল না।

أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

'সে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল আর কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।'[৩]

---

১. সূরা জাছিয়া : আয়াত ২৩
২. সূরা জাছিয়া : আয়াত ২৩
৩. সূরা বাকারা : আয়াত ৩৪

আল্লাহ শয়তানকে জিজ্ঞেস করলেন, সেজদা করলে না কেন? জ্ঞান থাকায় সে দলিল পেশ করতে লাগল,

أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ

'আমি তার থেকে শ্রেষ্ঠ।'[১]

কেন?

خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ

'আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।'[২]

আর আগুনের গতি উপরের দিকে।

وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ

'আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা।'[৩]

মাটিতে বিনয় রয়েছে। কাজেই আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। একদিকে সে Logic (দলিল) পেশ করল, অপর দিকে আল্লাহ তাকে স্বীয় দরবার থেকে বিতাড়িত করলেন। বন্ধুগণ! কথাগুলো হৃদয়ে গেঁথে রাখুন যে, শয়তান আলেম (জ্ঞানী) ছিল। আমেল (আমলকারী) ছিল, আবেদ (ইবাদতকারী) ছিল; কিন্তু আশেক (প্রেমিক) ছিল না, যার দরুন সে ধোঁকা খেয়েছে। হায়! যদি সে আশেক (প্রেমিক)ও হতো, তাহলে কেউ তাকে সেজদা করা থেকে বিরত রাখতে পারত না।

আহ্‌লে ইল্‌ম (জ্ঞানী)দের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ

এ কারণেই আহলে ইল্‌ম (জ্ঞানী) দের খেদমতে আরজ করব। আসুন একটু নিজেকে বিলীন করে দেখুন।

এক কবি কতইনা চমৎকার বলেছেন :

قال را بگزار مرد حال شو   پیش مرد کامل پامال شو

তুমি তোমার সমস্ত বিদ্যা-বুদ্ধি কোনো আল্লাহওয়ালার পায়ে লুটিয়ে দাও। কোনো কামেল ব্যক্তির সামনে নিজেকে বিলীন করে দাও। তার পর দেখতে পাবে, সৌভাগ্য কীভাবে তোমার পদচুম্বন করে। তবে এ কাজটি

---

১. সূরা ছোয়াদ : আয়াত ৭৬

২. সূরা ছোয়াদ : আয়াত ৭৬

৩. সূরা ছোয়াদ : আয়াত ৭৬

বছর পূর্ণ হলে দেখা গেল, পিঁপড়া যা বলেছিল, তার চেয়েও কম খেয়েছে। সুলাইমান (আ.) পিঁপড়ার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, তোমার যা-কিছু আবেদন আছে করতে পার। তাঁর রাজত্ব ছিল মানব, দানব, পশু, পাখি, জল ও স্থলের সকল সৃষ্টিজীবের ওপর।

পিঁপড়াটি বলল–

زِدْنِىْ رِزْقًا وَّ عُمُرًا

(পারলে) আমার রিযিক ও আয়ু বৃদ্ধি করে দিন।'

সুলাইমান (আ.) বললেন, এসব তো আমার কব্জায় নেই। এগুলো তো আল্লাহ তা'আলার হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা তার বয়স-রিযিক বৃদ্ধি করে দেন।

বদ্ধ পাথরের মধ্যে রুজি

আমার এক বন্ধু ভ্রমণের উদ্দেশে সাওয়াত গেলেন। স্ত্রী-সন্তানরাও সাথে ছিল। কোনো এক পাহাড়ে গিয়ে চমৎকার গোলাকৃতির একটা পাথর পেলেন। হাতে নিয়ে দেখলেন, পাথরটা বেশ মসৃণ ও পরিচ্ছন্ন। রং ও বেশ চমৎকার। বাচ্চারা পাথরটা বাসায় নিয়ে আসতে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। পিতা ভাবলেন, নিয়ে নেওয়া যাক; ডেকোরেশনে কাজে লাগবে, আবার সফরস্মৃতিও হবে। তাই নিয়েই নিলেন।

তিনি পাথরটা এনে ঘরে সাজিয়ে রাখলেন। বছরদুয়েক পর একদিন পাথরটা হাতে নিয়ে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! তুমি কেমন চমৎকার পাথর বানিয়েছ! ইত্যবসরে পাথরটা হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল। তিনি আফসোস করতে লাগলেন। ইতিমধ্যেই দেখতে পেলেন, পাথরটার ঠিক মাঝখানে একটা ছিদ্র। সেখান থেকে একটা পোকা বেরিয়ে চলে যেতে লাগল। দৃশ্যটা দেখে তিনি খুব অবাক হলেন।

বলুন তো, বদ্ধ পাথরের মধ্যে পোকা-মাকড়কে কে রিযিক প্রদান করেন? নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা-ই প্রদান করেন। সুতরাং সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক।

আল্লাহর ওপর ভরসাকারী এক উকিলের শিক্ষণীয় ঘটনা

এবার আমি আপনাদের এমন একটি ঘটনা শোনাব, যার ফলে সবগুলো কথা সহজে বুঝে নিতে পারবেন। আমার এক বন্ধু ছিলেন উকিল। পেশাটি এমন যে, ভুরিভুরি মিথ্যা বলতে হয়। এক কবি তো এমনও বলেছেন :

پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا
لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے

'উকিলের জন্ম হলে কহিল শয়তান,
নাও; আজ আমরাও সন্তানের জনক হলাম।'

কিন্তু বিশ্বাস করুন, তিনি ওকালতি পেশাটিও ধরে রাখলেন এবং জীবনের গতিও পরিবর্তন করলেন। তার স্ত্রী ছিল মহিলা ডাক্তার। উকিল সাহেব যখন আহলুল্লাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলেন, আল্লাহ তা'আলা তার মনের গতি পাল্টে দিলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন, জীবনে আর কখনও মিথ্যা বলব না। সত্যবাদিতার মাধ্যমেই আল্লাহ আমাকে রিযিক দান করবেন। লোকেরা বলতে লাগল, আপনার মাথাটা কি ঠিক আছে? সত্য বললে ওকালতি চলবে নাকি? তিনি বললেন, চলুক বা না চলুক আমার সত্যবাদিতা অবশ্যই চলবে। আমি এখন নীতিগতভাবে সিদ্ধান্তটি চূড়ান্ত করেছি।

উকিল সাহেব একদিন চেম্বারে গেলেন এবং বললেন, আজ আমি কেবল সত্য মামলাই গ্রহণ করব। লোকজনকে বলে দিলেন, তোমরা মিথ্যাবাদী হলে এখনই বলে দাও; নতুবা আমি শুনানি চলাকালে বিষয়টি আঁচ করতে পারলে তোমাদের বিরোধিতা করব আর সত্য হলে জোরালোভাবে তোমাদের সহায়তা করব। লোকেরা বলল, আল্লাহ হেফাজত করুন। সবাই অন্য উকিলদের নিকট চলে গেল। উকিল সাহেবের চেম্বার একেবারেই শূন্য হয়ে গেল। দিনভর আর কোনো কাজ এল না। এভাবেই পেরিয়ে গেল কয়েক মাস।

বিষয়টি জনমনে আলোচনার ঝড় তুলল। কেউ তাকে পাগল আবার কেউ বোকা বলতে লাগল। কেউ বলল, মৌলভী সাহেবরা লোকটির বিবেক নষ্ট করে ফেলেছে। লোকটি বেশ ভালোই একজন উকিল ছিল। মস্তিষ্ক বিগড়ে দিয়েছে। কিন্তু আল্লাহর বান্দা সততায় অনড় ছিল। সে বলল, মিথ্যা বলে উপার্জন করার আমার কোনো প্রয়োজন নেই। মহান আল্লাহ আমাকে সত্যবাদিতার মাধ্যমেই রিযিক দান করবেন।

এভাবেই একটি বছর কেটে গেল যে, হাতে কোনো কাজ এল না। তার স্ত্রী মহিলা ডাক্তার থাকায় তার উপার্জন দিয়ে সংসার চলছিল। স্ত্রী ছিল বেশ বুদ্ধিমতী। একদা সে উকিল সাহেবকে বলতে লাগল, আপনি যেহেতু মিথ্যা বলা পরিহার করেছেন সেহেতু ওকালতি পেশা বাদ দিয়ে ব্যাবসা করুন। আপনি সত্যই বলবেন আর আল্লাহ্ তা'আলা তাতেই বরকত দান করবেন। উকিল সাহেব বললেন, না, তা হবে না। সত্য কথাও বলব এবং ওকালতি পেশাও ধরে রাখব।

স্ত্রী বলল, বেশ ভালো কথা করতে থাকুন; আমার দোআ ও সার্বিক সহযোগিতা সদা আপনার সঙ্গে রইল। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সফল করবেন। উকিল সাহেব এক বছর যাবৎ কেবল চেম্বারে এসে ফ্যানের বাতাস খেতেন আর পত্রিকা পড়ে ঘরে ফিরে যেতেন।

একবার জজ সাহেবদের সামনে আলোচনা উঠল, অমুক উকিল মিথ্যা মামলা গ্রহণ করে না। দরিদ্রতার কষাঘাত সহ্য করে যাচ্ছেন; তবুও তার বক্তব্য হলো জীবন গেলেও সত্য পরিহার করব না। জজ সাহেবরা তার এই বক্তব্য শুনে বেশ প্রভাবিত হলেন। ধীরে-ধীরে জনমনে তার প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও সম্মান সৃষ্টি হলো। তিনি বলেন, এক বছর তো ছিল পরীক্ষার। পরবর্তী বছরটা যখন শুরু হলো, তখন তাবলীগ জামাতের সাথীরা, হক্কানী পীরের মুরীদরা, মাদরাসাওয়ালারা ভাবল, অমুক উকিল তো সত্য মামলা গ্রহণ করেন আর আমাদের মামলাও তো সত্য; আমাদের তো আর এত টাকা-পয়সা নেই। কম-বেশ যা দেওয়ার দেব। তাতে তারও কোনো রকম দিন চলবে। সুতরাং তারা আসতে শুরু করল। যারাই আসে সত্য মামলা নিয়ে আসে। উকিল সাহেব মামলাটি আদালতে উপস্থাপন করেন আর তার পক্ষে রায় হয়ে যায়। দ্বিতীয় মামলায়ও তার পক্ষে রায় হলো। তৃতীয় মামলায়ও তার পক্ষে রায় হলো।

কিছুদিন পর জজ সাহেবরা একত্র হয়ে বলতে লাগলেন, এ উকিল সাহেব যে মামলা-ই নিয়ে আসেন, সেটি-ই সত্য হয়; কাজেই এখন থেকে তাকে আর বেশি জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন নেই। ফলে উকিল সাহেব মামলা নিয়ে যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার পক্ষে রায় হয়ে যেতে শুরু করল। এবার বড়-বড় ধনীরা ভাবতে লাগল, আমাদের মামলা যখন সত্য, তখন

আমরা মামলাটি তাকে দেব না কেন? এভাবে যখন ধনীরা আসতে লাগল, প্রচুর টাকা-পায়সাও উপার্জন হতে লাগল। উকিল সাহেব যখন সত্য-মিথ্যা বলতেন, তখন মাসে ২০,০০০ (বিশ হাজার) কামাই করতেন। আর সত্য বলা শুরু করার পর মাসে চল্লিশ হাজার কামাতে লাগলেন।

সত্যবাদিতার দরুন আল্লাহ তা'আলা দ্বিগুণ রিযিক দান করলেন। এই অল্প কদিন আগে জজ নিয়ুক্তির জন্য কয়েকজন উকিলের পরীক্ষা হলো। তাতে আমার সেই বন্ধুই উত্তীর্ণ হলেন এবং জজ নিযুক্ত হলেন।

একসময় এই মানুষটিই উকিলের স্থানে দাঁড়িয়ে মিথ্যা বলতেন। যখন সত্য বলা শুরু করলেন, তখন আল্লাহ তাকে বিচারপতির আসনে বসিয়ে দিলেন। ইতিপূর্বে তিনি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে স্যার-স্যার বলতেন। এখন কেবল সিংহাসনে বসে ফরমান জারি করেন।

বন্ধুরা আমার! তাহলে প্রমাণিত হলো, যে সত্য বলবে, আল্লাহ তাকে গাছতলা থেকে তুলে নিয়ে রাজসিংহাসনে বসিয়ে দেন। আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করতে হবে। তাঁর ওপর পূর্ণ ভরসা থাকলে জমি-জমার দ্বন্দ্ব আর থাকবে না। অফিস-আদালতে ঘুষ থাকবে না। দোকানে ভেজাল থাকবে না। মিথ্যা বলে আর ধোঁকা দিয়ে কেউ উপার্জন করবে না। এগুলো আপনা-আপনিই খতম হয়ে যাবে। আদালতে আর মামলা থাকবে না। আদালত প্রাঙ্গণ জনশূন্য হয়ে যাবে।

পৃথিবীবাসীর প্রতি চ্যালেঞ্জ

বন্ধুগণ! আসুন, আমরা সব কিছু থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এক আল্লাহর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। বর্তমানে কোনো মাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার ছেলে কী হবে? উত্তরে বলে, ডাক্তার হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে, পাইলট হবে। এমন কোনো মা আছে কি, সে বলবে, আমার ছেলে মুহাদ্দিছ হবে, মুফাস্সির হবে, মুজাহিদ হবে। আমি আপনাদের একটি প্রশ্ন করব। গভীর মনযোগ দিয়ে শুনবেন। পরে যেন একথা বলতে না হয় যে, কেউ তো কিছু বোঝায়নি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বরে বসা। আল্লাহর কিতাব আমার হাতে রয়েছে। আল্লাহর ঘরে বসা আছি। একটি কথা আমাকে বলবেন যে, আপনারা কি কখনও এমন কোনো আমলদার আলেমকে

দেখেছেন, যিনি ক্ষুধার তাড়নায় ছটফট করতে-করতে মৃত্যুবরণ করেছেন? অথচ পি.এইচ.ডি. ডিগ্রিধারী, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিধারী অনেককে ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করতে-করতে মৃত্যুবরণ করতে দেখা গেছে। আমার ছেলে আলেম হলে আল্লাহ নবীগণকে যেখান থেকে রিযিক দিতেন, তাকে সেখান থেকে রিযিক দান করবেন। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ

'আর যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।'[১]

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

---

১. সূরা তালাক : আয়াত ৩

নবীপ্রেম

'হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নবুওতের দাবি করলেন, তখন কেউ জানত না, অদূর ভবিষ্যতে এই ধর্ম মহা কাননে পরিণত হবে। তিনি ইরশাদ করেছেন, আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম এর দোআর ফসল, ঈসার সুসংবাদ আর আমার মা আমেনার স্বপ্ন।

ইবরাহীম দোআ করেছিলেন, ঈসা আমার আগমনের সুসংবাদ দান করেছেন আর আমার মা আমেনা স্বপ্নে দেখেছেন, আমার দেহ থেকে একটি আলো বেরিয়ে গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।'

নবীপ্রেম

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

مَنْ يُّطِيْعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ـ

وَقَالَ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ : وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ـ

وَقَالَ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ : اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ـ

وَقَالَ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ : اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা

রবিউল আউয়াল মাসের নামে আয়োজিত অদ্যকার মাহফিল সাইয়্যিদুল আওয়ালীন ওয়াল আখিরীন রহমাতুল্লিল আলামীন মুহাম্মাদ মুস্তফা আহমাদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেম-ভালোবাসা সম্পর্কে কিছু কথা আরজ করব। বুযুর্গানে দীন বলেন :

مَنْ اَحَبَّ شَيْئًا اَكْثَرَ ذِكْرَهٗ

'যে যা ভালোবাসে, সে তার আলোচনা বেশি করে।'

আজকের এই কথাগুলোও সেই মালারই একটি মুক্তা।

নবীজির বরকতময় আলোচনা তো স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই পবিত্র কুরআনে বারবার করেছেন। যে পবিত্র ও বরকতময় সত্তার নামে আল্লাহ তা'আলা অনেক শপথ করেছেন, প্রভাত ও রাতের (وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ) তার

জীবনের (لَعَمْرُكَ) এবং তাঁর শহরের (لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ) এবং ইরশাদ করেছেন وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (আর আমি আপনার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি) সেখানে আমি এক দুর্বল ও নগণ্য বান্দা কী আলোচনা করতে পারি। তাঁর অবস্থান তো এমন যে, আদবের দরুন জিহ্বা নির্বাক হয়ে পড়ে। কোনো বক্তা তো এমনও বলেছেন,

ہزار بار بشویم دہن بمشک وگلاب
ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی ست

'যদিও হাজারবার মেশক, গোলাপ দ্বারা ধুই মোর মুখখানি
তবুও যেন তব নাম উচ্চারণ করা চরম বেআদবি।'

তথাপি আপন মনিবের বরকতময় আলোচনা যেকোনো গোলামের জন্য পরম সৌভাগ্যজনক, যে ভাগ্যবানদের তালিকায় অন্তর্ভুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রতিটি মুমিনের অন্তরে সদা জাগ্রত থাকে। বুকভরা সেই আশাটুকু নিয়ে আজ এই শিরোনামে কিছু কথা আলোচনা করব।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব

পৃথিবীতে অনেক বড়-বড় পথপ্রদর্শক, জেনারেল, দার্শনিক ও বক্তা অতীত হয়েছেন। তাঁদের জীবনী অধ্যয়ন করলে সবার বেলায় একটি বিষয় একই রকম দেখা যায় যে, তাদের মৃত্যুর পর লোকেরা বলেছে, মরহুম অমুক জীবনে বহু কিছু করেছেন। যদি আরো কিছুদিন বাঁচতেন, তাহলে তিনি এ বিষয়টিকে আরো উঁচু পর্যায়ে পৌঁছাতে পারতেন। বড়-বড় অনেক কবি-সাহিত্যিক বিগত হয়েছেন। তাঁদেরও মৃত্যুর পর বহুজন লিখেছেন, তিনি একজন ভালো কবি ছিলেন; হায়! যদি আরো কিছুদিন বাঁচতেন, তাহলে আরো অনেক ভালো-ভালো কবিতা উপহার দিতেন। বড়-বড় জেনারেলদের জীবনী পড়েও এমনই দেখা গেছে যে, বিভিন্নজন বলেছেন, তিনি যদি আর এত বছর বেঁচে থাকতেন, তাহলে গোটা বিশ্ব জয় করতেন।

মোটকথা, বড়-বড় কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, জেনারেল ও বক্তাদের জীবনী পর্যালোচনা করলে আমরা তাঁদের জীবনকে অসম্পূর্ণ দেখতে পাই। সম্মানিত শ্রোতৃমণ্ডলী! গোটা বিশ্বভুবনে কেবল একজন ব্যক্তিই এমন রয়েছেন, যিনি স্বজ্ঞানে দিবালোকে তাঁর অনুসারী ও ভক্তদের মাহফিলে

দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিয়েছেন, হে লোকসকল! আমি পৃথিবীতে যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তার পূর্ণতা বিধান করেছি। লোকেরা বলল, আপনি সত্য বলেছেন। তিনি তখন আকাশের দিকে আঙুল তুলে ইশারা করে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো।[১]

এটি নবীজির এমন একটি গুণ, যাতে আর অন্য কেউ তার অংশীদার হতে পারে না। এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন আল্লাহ তা'আলা নবীজিকে দান করেছেন। আমি ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকায় অনেকের সামনেই উক্ত পয়েন্টটি উত্থাপন করে বলেছি, দেখুন, আপনারা যাদের নেতা হিসেবে মান্য করেন, তাদের জীবনে তো এমন-এমন ত্রুটি রয়েছে। অথচ আমরা যাকে আমাদের জীবনপথের দিশারী মান্য করি, তাঁর জীবনের কোনো একটি ব্যাপারেও কারো আঙুল উঠানোর সুযোগ নেই।

এটি এমন একটি মজবুত বিষয় যে, এখানে অনেক বড়-বড় বিরোধী ব্যক্তিরও হাঁটু ভেঙে যায়। নবীজির জীবনের প্রতিটি দিকই এক-একটি শিরোনাম, যার কোনো একটি শিরোনামের অধীনে যদি অনেকগুলো গ্রন্থও রচনা করা হয়, তবু তার যথাযথ হক আদায় হবে না। চৌদ্দশত বছর যাবৎ উম্মত নবীজির সীরাত বিষয়ে বেশুমার কিতাব রচনা করে আসছে। তথাপি এ যাবৎ কেউ এমন দাবি করেননি যে, আমি তাঁর সীরাত রচনার হক আদায় করতে সক্ষম হয়েছি। বরং উল্টো বলেছেন :

لَایُمْکِنُ الثَّنَاءُ کَمَا کَانَ حَقُّهٗ * بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

'যথাযোগ্য প্রশংসা করা সম্ভব নয় কভু আপনার
সংক্ষেপে বলি আল্লাহর পর আপনিই হলেন শ্রেষ্ঠ সবার।'

কোনো-কোনো লেখক তো দীর্ঘ রচনার পর একথাও লিখেছে যে,

مَا اِنْ مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِیْ وَلٰکِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِیْ بِمُحَمَّدٍ

'প্রবন্ধের মাধ্যমে যদি আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করতে যাই, তখন আমার প্রবন্ধই তাঁর প্রশংসা করে।

---

১. ছহীহ বোখারি : হাদীছ নং ১৭৩৯

রাসূলপ্রেম

নবীজিকে মনে-প্রাণে ভালোবাসতেন এমন লক্ষ-কোটি মানুষ এ ধরা অতিক্রম করেছে। কালেমার স্বীকারোক্তি প্রদানকারী প্রতিটি মুসলমানের অন্তরে নবীজির সাচ্চা প্রেম ও ভালোবাসা থাকা অপরিহার্য।

محمد کی محبت دین حق کی شرط اوّل ہے
اگر اس میں رہے خامی تو ایمان نامکمل

'সত্য দীনের প্রথম শর্ত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা
এক্ষেত্রে ত্রুটি ও বিচ্যুতি ঈমানেরই অপূর্ণতা।'

হযরত মির্জা মাজহার জানে জানা (রহ.) একজন বিখ্যাত বুযুর্গ ছিলেন। তিনি ফারসি ভাষায় নিম্নোক্ত কবিতাগুলো রচনা করেছেন :

خدا در انتظار حمد ما نیست　محمد چشم بر راہ ثنا نیست

'আল্লাহ আমাদের প্রশংসার অপেক্ষায় নন
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের
গুণকীর্তনের প্রতীক্ষায় নন।'

خدا مدح آفرین مصطفٰے بس　محمد حامد حمد خدا بس

'মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আর আল্লাহর প্রশংসার জন্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই যথেষ্ট।'

مناجاتے اگر باید بیاں کرد　بہ بیتے ہم قناعت می تواں کرد
محمد از تو می خواہم خدا را　خدا یا از تو عشق مصطفٰے را

প্রভুর দরবারে প্রার্থনা কভু করতে হলে,
কবিতার একটি পঙ্‌ক্তিও যথেষ্ট তাতে।
হে মুহাম্মাদ! তব কাছে করি খোদাকে কামনা,
খোদা তোমার দরবারে করি নবীপ্রেমের বাসনা।

মোটকথা, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা প্রতিজন ঈমানদারের জীবনপথের পাথেয়।

ہر کہ عشق مصطفٰے سامان اوست

بحر و بر گوشہ دامان اوست

'নবীপ্রেম জীবনপথের পাথেয়

যার জল ও স্থল সবই যেন আঁচলে তাঁর।

নবীপ্রেম সংক্রান্ত এ কথাগুলো প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র শিরোনামে আলোচনাযোগ্য। তথাপিও সালেকদের উদ্দেশে অতি প্রয়োজনীয় কিছু বিষয় আলোচনা করলাম, যেন তারা তাদের পূর্বসূরীদের কথাগুলো সামনে রেখে আপন অন্তরে নবীপ্রেমের ছিটে-ফোঁটাও আছে কিনা অনুমান করতে পারে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপাদমস্তক

নবীজির বরকতময় দেহ সম্পর্কে বিভিন্ন কিতাবে বিষদ বিবরণ রয়েছে। ইবনে মাসলামা নামক এক তাবেয়ী এক সাহাবীকে বললেন, 'আপনি নবীজি সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন। তিনি অত্যন্ত হৃদ্যতার সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপাদমস্তকের বিবরণ দিলেন যে, তাঁর বরকতময় ললাট অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ছিল। তাঁর চেহারা মোবারক লালিমা ও শুভ্রতামিশ্রিত এবং বেশ প্রশস্ত ছিল। তাঁর চোখের ভুরু ছিল নয়নাভিরাম। তাঁর বক্ষ ছিল বেশ বড়। দুই স্কন্ধের মাঝে ছিল মহরে নবুওত। হাতের তালুদ্বয় ছিল গোশতে ভরা। তাঁর দেহ মোবারক এতই নরম ছিল যে, হযরত আনাস (রাযি.) বলতেন, আমি জীবনে রেশমও স্পর্শ করেছি এবং নবীজির পবিত্র দেহও স্পর্শ করেছি।

'আমার নিকট নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ মোবারককেই বেশি কোমল অনুভূত হয়েছে। তিনি বলেন, নবীজি যখন বেরিয়ে আসতেন, মনে হতো, তিনি কোনো পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছেন। তিনি যখন হাঁটতেন, মনে হতো, উচুঁ ভূমি থেকে নিম্নভূমি পানে নেমে আসছেন। তিনি বলতেন, আমার ভাই ইউসুফ ছিলেন সাবীহ (শুভ্রোজ্জ্বল) আর আমি হলাম মালীহ (লাবণ্যময়)। চেহারায় শুভ্রতা প্রবল হলে 'সাবাহাত' বলে। আর চেহারা যদি এমন হয় যে, দেখামাত্রই প্রভাবিত ও আকৃষ্ট হতে হয়, তাকে 'মালীহ' বলে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৌন্দর্য বলে শেষ করার মতো নয়।'

বিশ্ববরেণ্য কবি শেখ সাদীর ভাষায়-

بَلَغَ الْعُلٰى بِكَمَالِهٖ كَشَفَ الدُّجٰى بِجَمَالِهٖ

حَسُنَتْ جَمِيْعُ خِصَالِهٖ صَلُّوْا عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ

'গুণাবলিতে সবার শীর্ষে পৌঁছেছেন তিনি,
আপন রূপে আলোকিত করেছেন আঁধার রজনী।
সৌন্দর্যমণ্ডিত তাঁর আদর্শাবলি।
পরিজনসহ তাঁর নামে পড়ো দুরুদ সকলে মিলি।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখের লালা

নবীজির লালা মোবারকে এতই প্রভাব ছিল যে, খায়বার দিবসে হযরত আলী (রাযি.)-এর চোখে ব্যথা করছিল। নবীজি তাতে আপন লালা মোবারক লাগিয়ে দিলেন আর অমনি ভালো হয়ে গেল। মুসেলবিজয়ী সাহাবী হযরত উতবা ইবনে খারকাদ (রাযি.) বলেন, আমার দেহে বিচি দেখা দিলে নবীজি তাতে তাঁর মুখের লালা মোবারক লাগিয়ে দিলেন। তাতে বিচি তো ভালো হলোই, আজীবন আমার দেহ থেকে সুঘ্রাণ বিচ্ছুরিত হতো। ফলে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম তার দেহের উক্ত সুঘ্রাণ শুঁকতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘাম

তাঁর ঘাম মোবারক এতই সুগন্ধিময় ছিল যে, সাহাবায়ে কেরাম বলেন, আমরা কখনো নবীজির সন্ধানে বের হলে রাস্তায় সুঘ্রাণ শুঁকে বুঝে ফেলতাম, নবীজি এপথ দিয়ে অতিক্রম করেছেন। এক মহিলা সাহাবী তাঁর বাচ্চাকে একটি শিশি নিয়ে দ্বিপ্রহরে পাঠাতেন, যেন দুপুরের বিশ্রামের সময় নবীজির দেহ মোবারক থেকে নির্গত ঘাম সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। তিনি বলেন, যে আতরে নবীজির ঘাম মোবারক মিশ্রণ করা হতো, তার সুঘ্রাণ অনেক বেড়ে যেত। এক দরিদ্র সাহাবী নবীজির খেদমতে হাজির হয়ে আপন কন্যার বিয়ের জন্য দোআর আবেদন জানালেন। নবীজি দোআ করে দিলেন এবং তাঁকে বললেন, তোমার কাছে তো নববধূর সুগন্ধি নেই। তারপর তিনি তাঁকে কয়েক ফোঁটা ঘাম মোবারক দিলেন।

সাহাবী ঘাম মোবারক নিয়ে চলে গেলেন। তাঁর পরিবারের সকল সদস্য তা ব্যবহার করল। ওই পরিবারের সদস্যবর্গের দেহ থেকে এত সুঘ্রাণ ছড়াত যে, সেই ঘরের নাম بيت المطيبين বা সুগন্ধিওয়ালাদের ঘর হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে গেল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পর্শ

হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাযি.) – যিনি মহান বদরী সাহাবী ছিলেন – বলেন, একদা আমি হযরত আনাস (রাযি.)-এর ঘরে দাওয়াতে গেলাম। তাঁর এক বাঁদী আমাকে একটা তোয়ালে এনে দিল, যা অনেক ময়লাযুক্ত ছিল। হযরত আনাস (রাযি.) বললেন, তোয়ালেটা পরিষ্কার করে আনো। বাঁদী তোয়ালেটা নিয়ে গিয়ে জ্বলন্ত চুলার আগুনে ফেলে পুনরায় তুলে আনল। আমি দেখতে পেলাম, তোয়ালেটা একেবারেই পরিচ্ছন্ন। আমি অবাক হয়ে আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম, এর রহস্য কী? তিনি বললেন, একদা নবীজি আমার ঘরে তাশরীফ রাখলেন। আমি তাঁর হাত মোবারক ধোওয়ানোর পর মোছার জন্য তোয়ালেটা পেশ করলাম। নবীজি তাতে হাত মোবারক মুছে নিলেন। সেদিন থেকে তোয়ালেটা আর আগুনে জ্বলে না। এটি ময়লা হলে আমরা আগুনে নিক্ষেপ করি আর আগুন ময়লাগুলো জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে দিলে আমরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তোয়ালেটা বের করে নেই।

সাইয়্যেদা ফাতেমা (রাযি.) রুটি তৈরি করছিলেন। নবীজিও গোটাকয়েক রুটি তৈরি করে দিলেন। বেশ খানিক পর সবগুলো রুটি যখন হয়ে গেল, তখনও গোটাকয়েক রুটি কাঁচা রয়ে গেল। তিনি আবাক হলেন। নবীজি বললেন, কী হয়েছে মা? বললেন, কয়েকটা রুটি শত চেষ্টার পরও কাঁচা-ই রয়ে গেছে। ইরশাদ করলেন, যে রুটিগুলোতে তোমার আব্বাজানের হাত লেগেছে, সেগুলোই আগুনের ক্রিয়া থেকে মুক্ত রয়েছে।

মোটকথা, নবীজি কোনো জিনিস স্পর্শ করলে তাতে এমনই ব্যতিক্রম প্রভাব পরিলক্ষিত হতো। মানুষ খেজুর গাছ লাগালে কয়েক বছর পর তাতে ফল ধরত আর নবীজি লাগালে ওই বছরই ফল ধরা শুরু করত। নবীজির ছোঁয়ার এমনই প্রভাব ছিল।

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি.) জিহাদে যাচ্ছিলেন। নবীজি দেখতে পেলেন, তার উটটা খুবই ধীরগতিতে চলছে। তিনি আপন লাঠি মোবারক উটটার গায়ে লাগানোমাত্রই তার গতি এত বেড়ে গেল যে, অন্যান্য

উটগুলোকে পেছনে ফেলে সে এগিয়ে যেতে লাগল। উম্মে আম্মারা (রাযি.) নাম্নী এক মহিলা হুদায়বিয়ার সন্ধি চলাকালে নবীজি আপন চুল মোবারক বণ্টন করলে তিনিও একাংশ লাভ করেছিলেন। তিনি চুলগুলো ধুয়ে অসুস্থ ব্যক্তিদের তার পানি পান করাতেন আর তারা আরোগ্য লাভ করত। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাযি.) কয়েকখানা চুল মোবারক নিজের টুপিতে লাগিয়ে রাখতেন এবং বলতেন, আমি এই টুপি পরিধান করে যেকোনো কাজে গেলে আল্লাহ তাতে আমাকে সাফল্য দান করেন। সুবহানাল্লাহ!

নবীজির বংশগত পবিত্রতা

নবীজি থেকে নিয়ে হযরত আদম (আ.) পর্যন্ত আত্মীয়তার কোনো একটি সূত্রও অবৈধভাবে স্থাপিত হয়নি। তিনি ইরশাদ করেন, আদম থেকে নিয়ে আমার পিতৃপুরুষ পর্যন্ত সকল বীর্য হালালভাবেই স্থানান্তরিত হয়েছে।[১]

নবুওতের সর্বশ্রেষ্ঠ দলিল

আল্লাহ তা'আলা নবীজিকে এমন জীবন দান করেছেন যে, যারা তাঁর প্রাণের দুশমন ছিল, তারাও বলতে বাধ্য হয়েছে, আমরা কখনও তাঁকে মিথ্যা বলতে শুনিনি। কিন্তু তিনি নবুওতের ঘোষণা দিলে এই লোকগুলোই তাঁর নবুওতের প্রমাণ তলব করল।

তাই জবাবে তিনি ঘোষণা দিলেন—

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ

'আমি তো এই দাবির আগে তোমাদের মাঝেই জীবন যাপন করেছি।'[২]

কাজেই আমার যৌবন তোমাদের কাছে ফুলের চেয়ে পবিত্র মনে হলে তোমরা আমার নবুওত স্বীকার করে নাও। সুবহাল্লাহ! একজন ব্যক্তি তাঁর অতীত জীবনকে বিশেষত যৌবনকে আদর্শ হিসেবে পেশ করতে পারা কোনো মামুলি ব্যাপার নয়। আঙুল উঁচিয়ে কথা বলার সাহস কারুরই হলো না। শত্রুরা নবীজির বিরুদ্ধে এমন কথাও বলেছে যে, তিনি (নাউযুবিল্লাহ) জাদুকর। এমন মন্তব্যও করেছে যে, তিনি (নাউজুবিল্লাহ) মিথ্যা দাবি করেছেন। কিন্তু তাঁর চরিত্রে কোনো কলঙ্ক আছে বলে দাবি করতে পারেনি।

---

১. দালায়িলুন্নুবুওয়া ১/১৭৪

২. সূরা ইউনুস : আয়াত ১৬

میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا
صداقت ذات تھی جس کی امانت نام تھا جس کا
وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کردی
کلی اغاز تھا جس کا چمن انجام تھا جس کا

আমার নেতা তিনি জীবন যাঁর সুসংবাদ
সত্যবাদী ছিলেন যিনি আমানত যাঁর অপর নাম।
ধীরে-ধীরে যিনি জাতিকে দিলেন গৌরব ও সম্মান
কলিরূপে সূচনা যাঁর ফুল ছিল তাঁর শেষ পরিণাম।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নবুওতের দাবি করলেন, তখন কেউ জানত না, অদূর ভবিষ্যতে এই ধর্ম মহা কাননে পরিণত হবে। তিনি ইরশাদ করেছেন, আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম এর দোআর ফসল, ঈসার সুসংবাদ আর আমার মা আমেনার স্বপ্ন।[১]

ইবরাহীম দোআ করেছিলেন, ঈসা আমার আগমনের সুসংবাদ দান করেছেন আর আমার মা আমেনা স্বপ্নে দেখেছেন, আমার দেহ থেকে একটি আলো বেরিয়ে গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।

নবীজি সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য রহমত

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

'আর আমি আপনাকে সমগ্র জগতের জন্য রহমত হিসেবে পাঠিয়েছি।'[২]

তাহলে নবীজি গোটা সৃষ্টিজগতের জন্যই রহমত সাব্যস্ত হয়েছেন।

মানুষের জন্য রহমত

নবীজির রহমতের মাধ্যমে মানুষ সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছে। তিনি দোআ করেছেন, হে আল্লাহ! আমার পরে গুনাহের দরুন আমার উম্মতের চেহারা যেন বিকৃত না করা হয়।

---

১. আল-মু'জামুল কাবীর : হাদীছ নং ১৫০৩৩
২. সূরা আম্বিয়া : আয়াত ১০৭

আল্লাহ তা'আলা দোআ কবুল করলেন। আজ আমরা যারা আপন আকৃতি নিয়ে বেঁচে আছি, তা কেবল নবীজির দোআর বদৌলতেই হয়েছে। অন্যথায় পূর্ববর্তী উম্মতের মতো শাস্তির বিধান বহাল থাকলে শতকরা একজন হয়ত আপন আকৃতি নিয়ে বেঁচে থাকত।

পশুদের জন্য রহমত

নবীজির রহমত থেকে পশুরাও একাংশ লাভ করেছে। একদা তিনি কোনো এক বাগানে তাশরীফ নিয়ে গেলে একটা উট আনচান করতে করতে তাঁর পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল। তিনি তার মালিককে ডেকে বললেন, এরা অবলা প্রাণী; তাই এদের সাথে সদয় অচরণ করা উচিত। সে তো অভিযোগ করছে, তুমি তাকে অধিক পরিশ্রম করাও; অথচ সেই হারে খাবার কম দাও।[১]

সুবহানাল্লাহ! পশুরা পর্যন্ত নবীজির দরবারে এসে আপন কষ্টের কথা ব্যক্ত করত। একবার নবীজি মদীনার বাইরে কোথাও যাচ্ছিলেন। এক ইহুদি একটা হরিণী শিকার করেছিল। নবীজি যখন তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, হরিণী তাকে বলল, হে আল্লাহর নবী! সে আমাকে শিকার করে এনেছে; সামনের এই পাহাড়েই আমার বাচ্চা রয়েছে এবং তাদের দুধপানের সময় হয়েছে। বাচ্চাগুলোকে দুধ পান করাতে আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কিছুক্ষণের জন্য আপনি আমাকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

নবীজি তার বক্তব্য শুনে ইহুদিকে ডেকে বললেন, সামান্য সময়ের জন্য হরিণীকে ছেড়ে দাও; সে তার বাচ্চাদের দুধ পান করিয়ে আবার এসে পড়বে। সে বলল, অনেক কষ্টে তাকে শিকার করেছি, তাহলে তার জিম্মা কি আপনি গ্রহণ করবেন? নবীজি বললেন, আমি তার দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। তারপর হরিণীকে ছেড়ে দেওয়া হলো। সে লাফাতে-লাফাতে পাহাড়ের দিকে ছুটে গেল এবং নবীজি সেখানে থাকতেই পুনরায় ফিরে এল। ইহুদি হরিণীর এমন আনুগত্য দেখে বিস্মিত হলো এবং কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল।

নারীদের জন্য রহমত

নবীজির রহমত দ্বারা নারীরাও উপকৃত হয়েছে। আপনি হয়ত বলবেন, তা কীভাবে? তাহলে দেখুন তো নবীজির আগমনের পূর্বে সমাজে নারীর অবস্থান কোথায় ছিল? মেয়ের জন্মকেই মানুষ কলঙ্কের বিষয় মনে করত এবং

---

১. ইবনে হিব্বান : হাদীছ নং ৫৪৬

জীবন্ত কবর দিত। পিতা আপন কন্যাকে স্নেহের নজরে দেখত না। কিন্তু নবীজি আগমন করে বললেন, যার ঘরে দুটি কন্যাসন্তান রয়েছে আর সে তাদেরকে লালনপালন করত বিবাহ দেয়, সে জান্নাতে আমার সাথে দুটি আঙুলের মতো কাছাকাছি থাকবে।[১]

উক্ত হাদীছটি পড়ার পর কোনো ঈমানদার কি তার কন্যাকে অবজ্ঞার নজরে দেখতে পারে? না; পারে না। বরং সে মনে করবে, আমার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে গেছে। নবীজির আগমনের পূর্বে স্ত্রীদের প্রতি অনেক জুলুম-অত্যাচার করা হতো। তাঁর আগমনের পর আয়াত নাযিল হলো–

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

'তোমারা তাদের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করো।'[২]

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

তারা তোমাদের পোশাক আর তোমরা তাদের পোশাক।'[৩]

পোশাকবিহীন একজন মানুষ যেমন উলঙ্গ থাকে, তেমনি বৈবাহিক জীবন যাপন না করলে তোমরা সর্বদা শঙ্কিত থাকবে।

বৃদ্ধদের জন্য রহমত

নবীর আগমনে বৃদ্ধরাও সম্মান লাভ করেছে। আগে তাদেরকে তেমন সম্মান করা হতো না। নবীজি ইরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি চুল-দাড়িপাকা একজন মুসলমানকে সম্মান করল, সে যেন আল্লাহকে সম্মান করল।[৪]

শ্রমিকদের জন্য রহমত

এক সাহাবী নবীজির সাথে মুসাফাহা করলেন। নবীজির কাছে তাঁর হাত বেশ শক্ত অনুভব হলো। কারণ জানতে চাইলে তিনি জানালেন, হে আল্লাহর নবী! আমি পাহাড়ে বসবাস করি এবং পাথর ভাঙার কাজ করে জীবিকা উপার্জন করি।

---

১. ছহীহ মুসলিম : হাদীছ নং ২৬৩১
২. সূরা নিসা : আয়াত ১৯
৩. সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৭
৪. মেশকাত : হাদীছ নং ৫৯৭১

নবীজি তার দিকে তাকিয়ে বললেন,

اَلْكَاسِبُ حَبِيْبُ اللهِ

'হাতে উপার্জনকারী আল্লাহর বন্ধু।'[১]

(তার আগমনে) শ্রমিকরাও সম্মান পেল।

শিশুদের জন্য রহমত

নবীজির মাধ্যমে শিশুরাও তাদের মর্যাদা লাভ করেছে। ইরশাদ করেন, যারা ছোটদের স্নেহ করে না, তারা আমার উম্মত নয়। মোটকথা, শিশুরাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রহমতের অংশ লাভ করেছে।

ফেরেশতাদের জন্য রহমত

নবীজি একদা জিবরীল (আ.)কে জিজ্ঞেস করলেন, জিবরীল, আপনিও কি আমার রহমতের অংশ লাভ করেছেন? আরজ করলেন, হ্যাঁ; আপনার আগমনের পূর্বে আমি আমার পরিণাম নিয়ে চিন্তিত ছিলাম। আপনার আগমনে যখন এ আয়াত নাযিল হলো,

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۝ ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ۝

'নিঃসন্দেহে এই কুরআন সম্মানিত রাসূলের আনীত বাণী, যা প্রবল শক্তির অধিকারী এবং আরশের অধিপতির কাছে মর্যাদাসম্পন্ন।'[২]

তখন আমার স্বীয় পরিণামের ব্যাপারে প্রশান্তি লাভ হলো।

শত্রুদের জন্য রহমত

নবীজি মক্কা বিজয়কালে ইচ্ছা করলে কুরাইশদের জুলুম-অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি বললেন, আজ আমি তা-ই বলব, যা ইউসুফ তাঁর ভাইদের বলেছিল–

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ

'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই।'[৩]

---

১. শরহুল আসমায়িল হুসনা ১/২৪৬

২. সূরা তাকবীর : আয়াত ১৯-২০

৩. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৯২

এভাবে তিনি শত্রুদের জন্যও রহমত সাব্যস্ত হলেন।

جو عاصی کو کملی میں اپنے چھپا لے
جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے
اسے اور کیا نام دے گا زمانہ
وہ رحمت نہیں تو پھر اور کیا ہے

পাপীকে যিনি আপন কম্বলে আশ্রয় দেন,
ক্ষত-বিক্ষত হয়েও যিনি শত্রুর কল্যাণ চান।
যুগ তাঁকে আর কোন নামে করবে স্মরণ?
তিনি রহমত বৈ আর কি-ইবা হবেন?

সুতরাং নবীজির رَحْمَةٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ সত্তাকে ভালোবাসা ঈমানের লক্ষণ।

পাথরকর্তৃক নবীজির নবুওতের সাক্ষ্যদান

একদা আবু জাহ্‌ল নবীজির দরবারে এল। তার মুঠোয় ছিল কতগুলো পাথরের টুকরা। সে বলতে লাগল, মুহাম্মাদ! আমার হাতের মুঠোয় কী আছে বলতে পারলে আমি মুসলমান হয়ে যাব। নবীজি তার হাতের দিকে ইশারা করামাত্রই মুঠোর মধ্যে থাকা পাথরগুলো কালেমা পড়তে লাগল। কিন্তু তার অন্তর পাথরের চেয়েও অধিক শক্ত হওয়ায় সে ওয়াদা রক্ষা করল না। একটা পাথর এমন ছিল যে, নবীজি কখনও তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে সে তাঁকে সালাম করত। নবীজি ইরশাদ করলেন, পাথরটা আমার অনেক পুরনো পরিচিত। সে আমাকে নবুওতের পূর্বেও সালাম করত, এখনও সালাম করে।[১]

নবীজির প্রতি হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর ভালোবাসা

নবীজির প্রতি সাহাবীগণের অগাধ ভালোবাসা ছিল। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলতেন, হে জুলায়খা! তুমি হযরত ইউসুফ (আ.)কে দেখে বিমোহিত হয়ে আঙুল কেটে ফেলেছ। যদি আমার প্রেমাস্পদ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে, তাহলে কলিজাটা টুকরা-টুকরা করে ফেলতে।

---

১. ছহীহ মুসলিম : হাদীছ নং ২২৭৭

নবীজির সৌন্দর্যের মোকাবেলায় চাঁদের সৌন্দর্য

এক সাহাবী নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারতের উদ্দেশ্যে পূর্ণিমার রাতে হাজির হলেন। চাঁদটি ষোল কলায় পূর্ণ ছিল। চাঁদের সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর নজর পড়ল। ইত্যবসরে নবীজি তাশরীফ নিয়ে এলেন। এবার তিনি কখনও চাঁদের দিকে আবার কখনো নবীজির চেহারা মোবারকের দিকে তাকাচ্ছিলেন। এভাবে অনেক সময় ধরে তিনি কখনো চাঁদের দিকে আবার কখনো নবীজির বরকতময় চেহারার দিকে তাকাচ্ছিলেন। পরিশেষে সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, হে চাঁদ! তোমার সৌন্দর্যের তুলনায় আমার প্রিয়নবীর চেহারা মোবারক বেশি সুন্দর।

چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے

چاند پر ہیں چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے

'চাঁদের সাথে তুলনা করা এ কেমন ইনসাফ হয়?

চাঁদে কলঙ্ক রয়েছে নবীর চেহারায় আদৌ নয়।

হযরত উম্মে হাবীবা (রাযি.)-এর নবীপ্রেম

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রাযি.) আপন ঘরে উপস্থিত ছিলেন। তার পিতা আবু সুফিয়ান তখনও মুসলমান হননি। কোনো কাজে মদীনায় এসেছিলেন। ভাবলেন, মেয়ের সাথে দেখা করে যাই। তার ঘরে এসে যখন চৌকিতে বসতে লাগলেন, তখন চৌকিতে যে চাদরটি বিছানো ছিল, হযরত উম্মে হাবীবা (রাযি.) দৌড়ে এসে সেটি গুটিয়ে ফেললেন এবং বলতে লাগলেন, আপনি আমার পিতা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তথাপি এই বিছানা আল্লাহর নবীর হওয়ায় কোনো কাফির কিংবা মুশরিকের এখানে বসা আমার পছন্দ নয়।[১]

হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযি.)-এর নবীপ্রেম

সাহাবীগণ সকলেই নবীপ্রেমিক ছিলেন। তাঁদের সবার শীর্ষে ছিলেন হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)। হাফিজ ইবনে হাজার (রহ.) বর্ণনা করেছেন, কোনো এক মাহফিলে নবীজি ইরশাদ করলেন, আমার কাছে তিনটি জিনিস সর্বাধিক প্রিয়। সুগন্ধী, নেককার স্ত্রী আর নামায হলো আমার

১. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২/২২৩

চোখের শীতলতা। হযরত আবু বরক সিদ্দীক (রাযি.) তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, ওগো আল্লাহর নবী! আমার কাছেও তিনটি জিনিস বেশি প্রিয়। আপনার নূরানী চেহারা দেখতে থাকা, আপনার ওপর আমার সম্পদ ব্যয় করা, আমার কন্যা আপনার বিবাহে থাকা।[১]

এবার তিনটি জিনিস নিয়ে একটু ভেবে দেখুন, এগুলোর কেন্দ্র কোথায়? সবগুলোর কেন্দ্রবিন্দু হলো নবীজির পবিত্র সত্তা।

হিজরতের আদেশ প্রাপ্ত হয়ে নবীজি যখন হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর দরজায় নক করলেন, সাথে-সাথেই তিনি দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। নবীজি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আবুবকর! তুমি কি তাহলে সজাগ ছিলে? আরজ করলেন, হ্যাঁ। কিছু দিন যাবৎ আমার অন্তর সাড়া দিচ্ছে, খুব কাছাকাছি সময়ের মধ্যেই আপনার হিজরত হবে। তখন অবশ্যই আপনি আমাকে আপনার সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য লাভে ধন্য করবেন। ফলে আমি সেদিন হতে রাতের ঘুম পরিহার করেছি, যেন আপনি আমার দুয়ারে তাশরীফ আনার পর আমার জাগ্রত হতে দেরি না হয়ে যায়।[২]

তাবুক যুদ্ধের সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদের জন্য সম্পদ ব্যয় করতে আদেশ করলেন। হযরত ওমর (রাযি.) ঘরের অর্ধেক মাল উপস্থিত করলেন আর মনে-মনে ভাবলেন, আজ আমি আবুবকরের তুলনায় এগিয়ে থাকব। কিন্তু যখন হযরত আবুবকর (রাযি.) তাশরীফ আনলেন, তখন নবীজি জিজ্ঞেস করলেন, আবুবকর! স্ত্রী-পরিজনের জন্য ঘরে কী রেখে এসেছ? আরজ করলেন, স্ত্রী-পরিজনের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।[৩]

پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس
صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس

‘পোকা-মাকড়ের জন্য বাতি আর বুলবুলির জন্য ফুল যথেষ্ট
সিদ্দীকের জন্য কেবল আল্লাহর রাসূলই যথেষ্ট।

---

১. কিতাবুল আছার : হাদীছ নং ২৮৩
২. ছহীহ বোখারি : হাদীছ নং ৩৯০৫
৩. তিরমিযি : হাদীছ নং ৩৬৭৫

নবীজি যখন এই ধরা ত্যাগ করলেন, তখন হযরত আবুবকর (রাযি.) তাঁর বিরহ-যাতনা নিম্নোক্ত শব্দে ব্যক্ত করলেন–

لَمَّا رَأَيْتُ نَبِيَّنَا مُتَجِدِّلًا ضَاقَتْ عَلَيَّ بِمَرَضِهِنَّ الْأَرْضُ

أُوهَيْتُ قَلْبِيْ عِنْدَ ذٰلِكَ بِهَلْكِهِ وَالْعَظْمُ مِنِّيْ مَا حَيِيْتُ كَسِيْرُ

يَا لَيْتَنِيْ مِنْ قَبْلِ مَهْلَكِ صَاحِبِيْ غُيِّبْتُ فِيْ جَدَثٍ عَلَيَّ صُخُوْرٌ

'আমি যখন আমাদের নবীকে মৃতাবস্থায় দেখতে পেলাম, তখন পৃথিবীটা প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও যেন সংকুচিত হয়ে গেল।

তাঁর মৃত্যুতে আমার অন্তর কেঁদে উঠল এবং আজীবন আমার কোমরটা ভাঙা থাকবে।

হায়! আমার মনিবের ইন্তেকালের পূর্বেই যদি আমাকে দাফন করে দেওয়া হতো এবং পাথরচাপা দেওয়া হতো!

হযরত ওমর (রাযি.)-এর নবীপ্রেম

নবীজি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু হযরত ওমর (রাযি.) একথা বিশ্বাস করতেই রাজি নন যে, আমার প্রিয়নবী আমার অন্তরে বিচ্ছেদের দাগ দিয়ে চলে যাবেন। তাই তিনি খোলা তরবারি হাতে নিয়ে বলতে লাগলেন, যে বলবে, নবীজি ইন্তেকাল করেছেন, আমি তার শিরচ্ছেদ করে দেব। এতই গভীর ভালোবাসা ছিল যে, প্রেমাস্পদ সম্পর্কে এটুকু কথা শ্রবণ করাও সহ্য করতেন না।[১]

হযরত ওসমান (রাযি.)-এর নবীপ্রেম

সায়্যিদুনা হযরত ওসমান যিন্নুরাইন (রাযি.)-এর অন্তর নবীপ্রেমে বিভোর ছিল। একদা তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আপনার বন্ধুদের নিয়ে আমার ঘরে তাশরীফ আনুন। নবীজি যখন হাঁটতে শুরু করলেন, তখন হযরত ওসমান (রাযি.) পিছনে-পিছনে হাঁটতে লাগলেন আর নবীজির প্রতিটি পদক্ষেপ গণনা করতে লাগলেন। নবীজি প্রশ্ন করলেন, ওসমান! কদম গুণছ কেন? আরজ

---

১. ছহীহ বোখারি : হাদীছ নং ৩৬৬৭

করলেন, আমার মন চায়, আমার ঘর পর্যন্ত আপনার যতগুলো কদম হবে, সেই পরিমাণ গোলাম আমি আযাদ করে দেব।

হুদায়বিয়ার ঘটনা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। নবীজি হযরত ওসমান (রাযি.)কে আপন দূত বানিয়ে মক্কায় পাঠালেন। মুশরিকরা হযরত ওসমান (রাযি.)কে বলল, আপনি যখন মক্কায় এসে পড়েছেন, মন চাইলে তাওয়াফ করতে পারেন। কিন্তু আমরা মুহাম্মাদ ও তাঁর অন্যান্য সহচরবর্গকে অনুমতি দেব না। তাঁর নবীপ্রেম এটা বরদাশত করতে পারল না। তিনি বলে উঠলেন–

مَا كُنْتُ لِاَفْعَلَ حَتّٰى يَطُوْفَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ

'আল্লাহর রাসূল তাওয়াফ না করা পর্যন্ত আমি তাওয়াফ করব না।'[১]

হযরত আলী (রাযি.)-এর নবীপ্রেম

হিজরতে গমনকালে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাযি.)কে আপন বিছানায় শুইয়ে দিলেন। হযরত আলী (রাযি.)ও নির্ভয়ে নবীর বিছানায় শুয়ে পড়লেন। অথচ তিনি জানতেন, শত্রুরা এই বিছানাকে টার্গেট করেই বাইরে ঘেরাও করে আছে। কিন্তু নবীপ্রেম এসব কিছুর কোনো পরওয়াই করল না।

একবার নবীজির কিছু প্রয়োজন দেখা দিল। হযরত আলী কীভাবে যেন তা জানতে পেরে কোনো কাজের সন্ধানে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন, যেন নবীজির খেদমতে কিছু পেশ করা যায়। তিনি এক ইহুদির বাগানে গিয়ে পৌঁছলেন এবং এক বালতি পানি তুলে দেওয়ার পরিবর্তে একটা খেজুর নির্ধারণ করলেন। হযরত আলী ১৭ বালতি পানি তুলে দিয়ে ১৭টা খেজুর গ্রহণ করলেন। খেজুরগুলো এনে নবীজির খেদমতে পেশ করলেন। নবীজি জিজ্ঞেস করলে বিষয়টি খুলে বললেন যে, খেজুরগুলো কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে লাভ করেছি। নবীজি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এসব তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসার টানে করেছ, নাকি অন্য কোনো কারণে? তিনি উত্তর দিলেন, কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসার টানেই করেছি।

হুদায়বিয়ার সন্ধি চলাকালে নবীজি হযরত আলী (রাযি.)কে সন্ধিপত্র লিখতে নির্দেশ দিলেন।

---

১. মুসনাদে আহমাদ : হাদীছ নং ১৮৯১০

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই সন্ধিপত্র লেখাচ্ছিলেন এবং বললেন, লেখো :

هٰذَا مَا قَضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'এটি ওই চুক্তিপত্র, যা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পাদন করেছেন।'

এতে মুশরিকরা ক্ষিপ্ত হয়ে বলতে লাগল, আমরা তোমাকে রাসূল মানলে আর বিরোধ কিসের? কাজেই 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর পরিবর্তে 'মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ' লিখতে হবে। কিন্তু হযরত আলী কোনোক্রমেই নবীজির নাম মোবারক মুছতে রাজি হলেন না। যে নামের বরকতে গোটা পৃথিবীতে হেদায়াতের আলো ছড়িয়েছে, সেই বরকতময় নামটি কীভাবে মোছা যায়?

হযরত হাস্‌সান ইবনে ছাবিত (রাযি.)-এর নবীপ্রেম

হযরত হাস্‌সান (রাযি.) নবীজির কবি হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তিনি প্রেম-ভালোবাসার দৃষ্টিতে নবীজিকে দেখতেন এবং তাঁর প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি করতেন। তিনি বলেন :

وَاَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِيْ ۞ وَاَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ

خُلِقْتَ مُبَرَّاً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ ۞ كَاَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

'হে রাসূল! আপনার চেয়ে সুন্দর আর কাউকে আমার দু-নয়ন কখনো দেখেনি। আপনার চেয়ে অধিক সুশ্রী সন্তান কোনো মা প্রসব করেনি। সকল দোষত্রুটি হতে মুক্ত করে আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

মনে হয়, যেন আপনাকে আপনার মনের মতো করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

হযরত হুযায়ফা (রাযি.)-এর নবীপ্রেম

খন্দকের যুদ্ধের সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুপক্ষের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত হওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন। হযরত হুযায়ফা (রাযি.) নবীজির নিকটেই ছিলেন। তাঁর কাছে যুদ্ধাস্ত্র ও শীতবস্ত্র কোনোটাই ছিল না। নবীজি বললেন, যাও হুযায়ফা! শত্রুদের তাঁবুতে গিয়ে তাদের খবরাখবর সংগ্রহ করে আনো। হযরত হুযায়ফা (রাযি.) নবীজির নির্দেশ পেয়ে প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করেই প্রস্তুতি নিলেন। নবীজি তাঁকে দোআ করে

পাঠিয়ে দিলেন। হযরত হুযায়ফা (রাযি.) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোআর বরকতে আমার ভয় ও শীত সব দূর হয়ে গেল।[১]

হ্যাঁ; একেই বলে প্রেম-ভালোবাসা, যা তাঁকে নবীর আনুগত্যে অনুপ্রাণিত করেছে।

এক মহিলা সাহাবীর নবীপ্রেম

উহুদের যুদ্ধের সময় মদীনায় সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল, নবীজি শহীদ হয়ে গেছেন। এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে-সাথেই মদীনায় হৈচৈ পড়ে গেল। মহিলারা কাঁদতে-কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এক আনসারী মহিলা বলল, এই সংবাদের সত্যতা যাচাই না করা পর্যন্ত আমি তা মানব না। ফলে সে একটি বাহনে চড়ে উহুদ পাহাড়ের দিকে ছুটল। পাহাড়ের অনেকটা নিকটে এসে এক সাহাবীর সাথে সাক্ষাত হলো। জিজ্ঞেস করলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খবর কী? তিনি বললেন, আমি বলতে পারব না। তবে অমুক জায়গায় তোমার পুত্রের লাশ পড়ে থাকতে দেখেছি।

যুবক ছেলের শাহাদাতের খবরে মহিলা সামান্যও বিচলিত হলেন না। তাঁর অন্তর নবীপ্রেমে এতটাই উতলা ছিল যে, ছেলের শাহাদাতের সংবাদের কোনো পরওয়া না করেই সামনে এগিয়ে গেলেন। আরেকজন সাহাবীর সাথে সাক্ষাত হলে জিজ্ঞেস করলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খবর কী? তিনি উত্তর দিলেন, আমার তো জানা নেই। তবে অমুক স্থানে তোমার স্বামীর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছি।

এতেও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে সামনে চললেন। আরেকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খবর কী? উত্তর দিলেন, আমি জানি না। তবে তোমার পুত্রের মরদেহ অমুক জায়গায় পড়ে থাকতে দেখেছি। এতেও তিনি বিচলিত হননি। সামনে গিয়ে আরেক সাহাবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে বললেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খবর কী? জবাব দিলেন, আমার জানা নেই। তবে তোমার ভাইয়ের লাশ অমুক জায়গায় পড়ে থাকতে দেখেছি।

মহিলা এবারও বিচলিত হলেন না। সামনে গিয়ে এক সাহাবীকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর রাসূলের খবর কী? তিনি জবাব দিলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু

---

১. দালায়িলুন্নুবুওয়া লিল-বায়হাকী : হাদীছ নং ৪৪৭

আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুক স্থানে রয়েছেন। ফলে তিনি বাহনটা ঘুরিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বাহন থেকে নেমে তাঁর চাদর মোবারকের একটি কোণ টেনে ধরে বলে উঠলেন–

كُلُّ مُصِيْبَةٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ سَهْلٌ

'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাওয়ার পর আমার সব বিপদ সহজ হয়ে গেছে।'[১]

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহল্লায় রাত যাপন

রাতের বেলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হুজরা মোবারকে বিশ্রাম করতেন, তখন অনেক সাহাবী ঘর ছেড়ে এসে নবীজির হুজরা মোবারকের পাশে ঘণ্টায়-পর-ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতেন আর ভাবতেন, এ তো সেই জায়গা, যেখানে আমাদের প্রেমাস্পদ শুয়ে রয়েছেন।

عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ

ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا

শাহে মদীনার প্রেম অতি বিরল দৌলত,
এটাই সোপান পাড়ি দিতে প্রকৃত প্রেমের পথ।
এই প্রেমে সমৃদ্ধ হয়েছে বক্ষ যাহার,
জীবন-মরণ শোভা পায় কেবলই তাহার।

একদা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, জিহাদে যেতে কে-কে প্রস্তুত আছ? হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযি.) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা স্বজ্ঞানে ও সুস্থ মস্তিষ্কে কালেমা পড়েছি। আল্লাহর শপথ! আপনি হুকুম দিলে পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে জীবন দিয়ে দেব এবং আপনার আদেশে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতেও কুণ্ঠা বোধ করব না।

জীবনের শেষ বাসনা

উহুদের যুদ্ধে এক সাহাবী মারাত্মকভাবে আহত হলেন। অতিমাত্রায় রক্তক্ষরণের দরুন মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছেন। আারেক সাহাবী তাঁর নিকটে এসে

---

১. দালায়িলুন্নুবুওয়া লিল-বায়হাকী : হাদীছ নং ৩০২

জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কোনো বাসনা আছে কি? আরজ করলেন, হ্যাঁ; আছে। বললেন, তা কী? উত্তর দিলেন, জীবনের শেষ মুহূর্তে নবীজিকে একনজর দেখতে চাই। তিনি আহত সাহাবীকে কাঁধে তুলে নিয়ে নবীজির কাছে দ্রুত ছুটে গেলেন। তাঁকে কাঁধ থেকে নামিয়ে বললেন, এই তো তোমার প্রেমাস্পদ তোমার সম্মুখে আছেন। নবীজির নাম শোনামাত্র বিদ্যুদ্‌গতিতে কোথা হতে যেন তাঁর শরীরে শক্তি এসে পড়ল। তিনি চেহারাটা নবীজির দিকে ফিরালেন। নবীজির চেহারা মোবারক দেখামাত্রই তাঁর অবস্থা বদলে গেল। তিনি আপন মালিকের হাতে প্রাণ সোপর্দ করে দিলেন।

نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے
یہی دل کی حسرت یہی ارزو ہے
تیرے معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا
میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا

প্রাণ বায়ু বের হয় যেন তব কদমতলে,
এ কামনা-বাসনাই কেবল পুষি মনে-মনে।
লাওহ, কলমে পৌঁছা তব মেরাজ,
তব কদমে পৌঁছা অধমের মেরাজ।

সবচেয়ে বড় সুসংবাদ

এক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একটি বিষয় নিয়ে খুবই চিন্তিত যে, এখানে তো আমাদের অন্তরে আপনার ভালোবাসার জোয়ার বইতে থাকে, আপনার দরবারে উপস্থিত হয়ে আমরা আপনার দিদারে মন-প্রাণ জুড়াই। কিন্তু জান্নাতে আপনি অনেক উঁচু স্থানে থাকবেন আর আমরা তো অনেক নিচে থাকব। সেখানে যদি আপনার দেখা না পাই, তাহলে জান্নাতের কোনো সাধই পাব না। ঠিক তখনই জিবরীল (আ.) ওহী নিয়ে এলেন। নবীজি তাঁকে ডেকে জানিয়ে দিলেন :

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ

'দুনিয়াতে যে যাকে ভালোবাসে, জান্নাতে সে তার সাথেই থাকবে।'[১]

---

১. ছহীহ বোখারি : হাদীছ নং ৫৭০২

সাহাবাগণ বলেন, জীবনে এই হাদীছ শুনে আমরা যতখানি আনন্দিত হয়েছি, অন্য কোনো হাদীছ শুনে তত আনন্দিত হইনি। কেননা, এর মাধ্যমে নিশ্চিত হতে পেরেছেন, আখেরাতে তাঁরা নবীজির সঙ্গ লাভ করবেন।

সাহাবায়ে কেরাম নবীজিকে এমনই ভালোবাসতেন।

নবীপ্রেমে খেজুরগাছের কাণ্ডের কান্নাকাটি করা

খেজুরগাছের একটা কাণ্ড নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুব ভালোবাসত। নবীজি যখন মসজিদে নববী নির্মাণ করলেন, তখন সেখানে কোনো মিম্বর ছিল না। মসজিদের ভিতরে খেজুরগাছের একটা কাণ্ড ছিল। নবীজি তার ওপর ভর করে খুতবা দিতেন। কিছুদিন পর সাহাবী হযরত তামীমদারী (রাযি.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনুমতি পেলে একটি মিম্বর তৈরি করতাম। নবীজি তাকে অনুমতি দিলেন। সুতরাং তিনি একটি মিম্বর তৈরি করে আনলেন। এবার যখন খুতবা দেওয়ার সময় হলো, নবীজি মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং খুতবা দিতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর খেজুরবৃক্ষের কাণ্ড হতে এমনভাবে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল, যেন কোনো বাচ্চা ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। উপস্থিত সবাই অবাক হয়ে কাণ্ডটির দিকে তাকিয়ে রইল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর থেকে নেমে এসে কাণ্ডটির কাছে গেলেন এবং তার গায়ে নিজের স্নেহমাখা হাত বুলিয়ে দিলেন।[১]

হাদীছের বিভিন্ন কিতাবের ভাষ্য মোতাবেক নবীজি কাণ্ডটিকে আপন গলার সঙ্গে মিলালেন। তখন কাণ্ডটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে শান্ত হলো, যেমন কোনো শিশু মায়ের কোলে গিয়ে নিঃশ্বাস ছেড়ে শান্ত হয়। খেজুরবৃক্ষের কাণ্ডের নবীর প্রতি এমনই ভালোবাসা ছিল! হায়! যদি ওই খেজুরবৃক্ষের কাণ্ডের মতো নবীজির প্রতি আমাদের ভালোবাসা তৈরি হতো!

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাযি.)-এর নবীপ্রেম

কোনো-কোনো সাহাবী সুবহে সাদিকের সাথে-সাথেই নবীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চলে আসতেন। তাঁরা এই মর্মে শপথ করতেন যে, সকালে ঘুম থেকে উঠে নবীজির চেহারা মোবারক দেখার পূর্বে অন্য কারো চেহারা দেখব না। এ কারণেই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাযি.) নবীজির ইন্তেকালের পর অন্ধ হওয়ার জন্য দোআ করতেন।

---

১. মুসনাদে আহমাদ : হাদীছ নং ১৩৩৬৩

নবীজির প্রতি হযরত শিবলি (রহ.)-এর ভালোবাসা

শিবলি (রহ.) নামক এক বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর যখন মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হলো, তখন তিনি তার সাথীদের অজু করিয়ে দিতে বললেন। অসুস্থতার দরুন খুবই দুর্বল হওয়ায় সাথীরা তাকে অনেক কষ্টে অজু করালেন। অজুর পর স্মরণ হলো, খিলাল করানো হয়নি। অথচ তা একটি সুন্নাত আমল। তাই তিনি অত্যন্ত পেরেশান হলেন এবং বললেন, আমাকে পুনরায় অজু করাও। সাথীরা বললেন, হযরত আপনি মাজুর ও অসুস্থ; নাড়াচাড়া করলে কষ্ট পান। কাজেই এভাবেই থাকুক। তিনি বললেন, আমার মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে। শীঘ্রই আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। আমি চাই না, এমন অজু নিয়ে আমার প্রেমাস্পদের সাথে সাক্ষাৎ করতে, যে অজুতে তাঁর কোনো সুন্নাত বাদ পড়েছে। একেই বলে খাঁটি প্রেম।

ওলামায়ে দেওবন্দের নবীপ্রেম

আপনারা হয়ত বলবেন, জনাব কেবল সাহাবায়ে কেরামের কথা বলছেন; পারলে পরবর্তী জামানার কারো কথা বলুন। তাই আসুন, এবার আপনাদের আমার রূহানী পিতৃপুরুষদের জীবনী শোনাই, যারা দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা ও মানসসন্তান ছিলেন। তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন, নবীর প্রতি তাদের প্রেম-ভালোবাসা কেমন ছিল।

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবি (রহ.)-এর রাসূলপ্রেম

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবি (রহ.) যে জ্ঞানের চন্দ্র ও সূর্যতুল্য ছিলেন একথা কার অজানা আছে? ইংরেজরা তাঁর ঘোর শত্রু ছিল। তাঁকে তারা হত্যা করার ষড়যন্ত্র আঁটল। তিনিও বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হলেন।

আত্মীয়-স্বজনরা বলল, হযরত! আপনি কোথাও আত্মগোপন করুন। তিনি তাদের কথায় আত্মগোপন করলেন। তিন দিন পর আবারও জনসম্মুখে এসে পড়লেন। কেউ তাঁকে বলল, হযরত! জীবন-মরণের ব্যাপার; কাজেই আপনার জন্য আত্মগোপন করাই উচিৎ।

তিনি বললেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছের প্রতি লক্ষ্য করে দেখেছি, তিনি সারা জীবনে কেবল তিন দিন গুহায় আত্মগোপনে ছিলেন। আমি সেই সুন্নাতটির ওপর আমল করেছি। এবার বাইরে এসে পড়েছি। এখন আমার জীবন চলে গেলেও কোনো আপত্তি নেই।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা তোমাদের বিধবাদের বিবাহ দিয়ে দাও। পবিত্র কুরআনেও বিষয়টি বর্ণিত

হয়েছে। হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবি (রহ.)-এর একবোন ৯০ বছর বয়সে বিধবা হলেন। তিনি জানতে পেরে তার কাছে গেলেন।

কিছুদিন পর আবারো বোনের নিকট গিয়ে বলতে লাগলেন, বোন! আমি তোমার নিকট একটি কথা বলতে এসেছি। বোন বললেন, কী বলতে চান বলুন।

হযরত বলতে লাগলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ হলো, তোমরা বিধবাদের বিবাহ দিয়ে দাও। আপনি আমার এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করুন এবং বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হোন। আমি জানি, এ বয়সে আপনার দাম্পত্যজীবনের কোনো প্রয়োজন নেই। তবে এতে কাসেম নানুতবির জন্য নবীজির একটি হাদিছের ওপর আমলের সুযোগ হয়ে যাবে।

বোন কাঁদতে শুরু করলেন। তিনি তাঁর পাগড়ি মোবারক খুলে বোনের পায়ের ওপর রেখে দিয়ে বললেন, তোমার মাধ্যমে আমার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীছের ওপর আমল করার সুযোগ হতে পারে। তিনি ৯০ বছর বয়সে তার বোনকে আরেকটি বিবাহ দিলেন। কেমন ভালোবাসা ছিল নবীর প্রতি!

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবি (রহ.) যখন হজ করতে গিয়েছিলেন, পথে নবীর ভালোবাসার কিছু কবিতা লিখলেন। আমি আপনাদেরকে সেগুলোও শুনিয়ে দিচ্ছি।

امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ
کہ ہو سگان مدینہ میں میرا شمار
جیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیری پھروں
مروں تو کھائیں مجھکو مدینہ کے مور و مار

'ওগো আল্লাহর নবী! জীবনে মুক্তির বহু আশা;
তবে সবচেয়ে বড় আশা হলো
যেন আমি মদীনার কুকুরদের মধ্যে গণ্য হই।
জীবনে বেঁচে থাকলে যেন মদীনার কুকুরদের সাথে ঘুরে বেড়াই,
আর মরে গেলে মদীনার পোকা-মাকড় যেন আমাকে খেয়ে নেয়।'

নবীর প্রতি অন্তরে এমনই গভীর ভালোবাসা ছিল তাঁর। একব্যক্তি তাঁর খেদমতে এসে সবুজ রঙের এক জোড়া জুতা হাদিয়া দিল। তিনি জুতাজোড়া

গ্রহণ করলেন বটে; কিন্তু ঘরে নিয়ে রেখে দিলেন। কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হযরত! অমুক তো আপনাকে অনেক দামী জুতা হাদিয়া দিয়েছিল। এলাকার অনেকেই এমন জুতা পরিধান করে। জুতাজোড়া দেখতেও বেশ সুন্দর ছিল।

তিনি বললেন, আমি তার মনঃতুষ্টির জন্য জুতাজোড়া গ্রহণ করেছি; কিন্তু পরিধান করিনি। কারণ, আমি ভাবলাম, আমার মনিবের পবিত্র রওজার গম্বুজের রং সবুজ। তাহলে এ রঙের জুতা আমি কীভাবে পায়ে পরিধান করতে পারি?

তিনি মদীনায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন। অত্যন্ত শৌখিন মানুষ ছিলেন। এক ব্যক্তি দেখতে পেল, তিনি খালি পায়ে মদীনার অলি-গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর তাঁর পা থেকে রক্ত ঝরছে। কেউ তাঁকে বলল, হযরত! জুতা পরিধান করে নিলেই তো হতো। তিনি বললেন, জুতা তো পরিধান করতাম; কিন্তু যখন ভাবি, এই ভূমিতে আমার মাহবুব প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিচরণ করতেন, তখন আমার দিল সেই ভূমিতে জুতা পরে চলতে সায় দেয় না।

কেমন প্রেমিক ছিলেন!

ওলামায়ে দেওবন্দের অতুলনীয় বিশ্বাস

ওলামায়ে দেওবন্দ তাঁদের আকিদা-বিশ্বাস সম্পর্কে লিখেছেন। একটু অন্তরের কান দিয়ে শ্রবণ করুন; তাহলে অনুমান করতে পারবেন, যারা তাদের অপবাদ দেয়, তারা কতখানি ভুলের মধ্যে রয়েছে। ওলামায়ে দেওবন্দের আকিদা হলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর মোবারকের মাটি আল্লাহ তা'আলার আরশের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহি (রহ.)-এর নবীপ্রেম

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহি (রহ.) যুগের বিখ্যাত ফকীহ ছিলেন। একব্যক্তি হজ থেকে ফিরে আসার সময় একটি কাপড় কিনে আনল এবং সেটি হযরতের খেদমতে পেশ করল। হযরত কাপড়টি হাতে নিয়ে চুমু খেলেন এবং মাথার ওপর রাখলেন। মনে হলো, অনেক দামী জিনিস। ছাত্ররা সামনেই বসা ছিল। আরজ করল, হযরত! এ তো অমুক দেশের তৈরী কাপড়; মদীনার লোকেরা কিনে এনে তা বিক্রি করে। তিনি বললেন, একথা

আমি স্বীকার করছি যে, এটি মদীনার তৈরী কাপড় নয়; তবে আমি একে এজন্য সম্মান করছি যে, তাতে মদীনার বাতাস লেগেছে।

একব্যক্তি হজ থেকে এসে হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহি (রহ.)-এর খেদমতে তিনটি খেজুর পাঠিয়ে দিল। তিনি যখন খেজুরগুলো পেলেন, এমনভাবে হাতে নিলেন, যেন পৃথিবীর মহাদৌলত তাঁর হাতে এসেছে। একছাত্রকে ডেকে বললেন, আমার নিকটতম যত আত্মীয়স্বজন আছে, সকলের তালিকা তৈরি করো। সে সবার তালিকা তৈরি করল। তাতে ৫০-এরও অধিক নাম ছিল। হযরত বললেন, এই খেজুরগুলোকে নামের সংখ্যা অনুযায়ী ভাগ করো। আদেশ মোতাবেক ভাগ করা হলো। ভাগগুলো ছিল একেবারেই ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র। এবার বললেন, এক-একটি টুকরা এক-একজন বন্ধুকে দিয়ে দাও। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, যেন তিনি কিছু মণি-মুক্তা পেয়েছেন, যা কিনা সকল বন্ধুকে ভাগ করে দিচ্ছেন। একছাত্র বলল, হযরত এত ছোট-ছোট টুকরা দিলে কী লাভ হবে? ছাত্রের কথা শুনে তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেল এবং বলতে লাগলেন, মদীনার খেজুরের টুকরাকে তুমি ছোট মনে করছ কীভাবে? এই রাগে তিনি বেশ কিছুদিন তার সাথে কথা-ই বলেননি।

মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি (রহ.)-এর নবীপ্রেম

হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি (রহ.) দারুল উলূম দেওবন্দে শিক্ষকতা করতেন। মাসিক ভাতা এতই স্বল্প ছিল যে, অতি কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করতেন। যা কিছু পেতেন, তা পারিবারিক প্রয়োজনেই ব্যয় হয়ে যেত। এ কারণে হজও করতে পারেননি। কিন্তু মনে বড় আশা ছিল হজ করার। কোনো-কোনো কিতাবে আছে, হজের মৌসুম এলে তিনি অস্থির হয়ে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতেন। এমনকি দস্তরখানে বসে মনে পড়লে বলতেন, 'জানি না প্রেমিকরা কী করছে'। তিনি হাজীদের 'প্রেমিক' বলতেন। এমন ভাবনা উদ্রেক হওয়ামাত্রই খানা-দানা বাদ দিয়ে আফসোস করতে থাকতেন আর বলতেন, হায়! যদি এমন কোনো দিন আসত, যেদিন হুসাইন আহমাদেরও ওই জায়গার জিয়ারত নসিব হতো।

একবার রাতে হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি উঠে বসে পড়লেন। নানা চিন্তায় আর ঘুম এল না। এমতাবস্থায় তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে দোআ করতে লাগলেন, হে আল্লাহ! জানি না, তোমার প্রেমিকরা এখন কী

করছে। আমাকেও যদি তুমি তাদের মধ্যে গণ্য করে নিতে! জিলহজ মাসের দশ দিন তাঁর মোটেও স্বস্তি হতো না। দোআ আর কান্নাকাটিতে মশগুল থাকতেন।

একপর্যায়ে মহান আল্লাহ তাঁর এই ভালোবাসা কবুল করে নিলেন। হারাম শরীফের দরজা তাঁর জন্য এমনভাবে খুলে দিলেন যে, দীর্ঘ ১৮ বছর যাবৎ রওজা শরীফের পাশে বসে হাদীছের দরস দান করলেন। মূলত খাঁটি প্রেমিকের জন্যই এমনটি সম্ভব—অন্যের জন্য নয়।

তিনি হাদীছ শরীফের দরস দানকালে রওজা শরীফের দিকে মুখ করে বসতেন, আর

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

এর পরিবর্তে

قَالَ هٰذَا الرَّسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

বলতেন। দরস শেষে এশার নামাযের পর অথবা তাহাজ্জুদের আগে আপন দাড়ি মোবারকের মাধ্যমে রওজা শরীফের নিকটবর্তী স্থানসমূহ ঝাড় করতেন। বিষয়টি অনেকেই প্রত্যক্ষ করেছেন। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ আমাদেরও এমন প্রেম, ভালোবাসা ও আদব নসিব করুন।

এক কবি কতই-না চমৎকার বলেছেন :

نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے
یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے
اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو
طیبہ کے راستے کے کانٹا بھی پھول ہے

‘যে সৌন্দর্য নিয়ে গর্ব সে তো আমার প্রিয়নবীর
এ ছায়াপথ তো তাহারই চরণ ধূলির।
মাথায় ভর করে চলো হে কাফেলা প্রেমের,
মদীনার পথের কাঁটাও যেন ফুল সমমানের।

প্রেমিকের পরিচয়

জান, প্রেমিকের পরিচয় কী? প্রেমিক তো তাকেই বলে যে, ভালোবাসার দাবির পাশাপাশি প্রতিটি কাজ নবীর হুকুম মোতাবেক সম্পাদন করে। নবীর নির্দেশ যদি মনঃপুত না হয়, তাহলে বুঝতে হবে, প্রেমিকের দাবিদারই কেবল – বাস্তব প্রেমিক নয়।

কোনো এক প্রেমিক বলেন :

وہی سمجھا جائیگا شیدائے جمال مصطفےٰ

جس کا حال حال مصطفےٰ ہو جس کا قال قال مصطفےٰ

'তাকেই বলব নবীর প্রকৃত প্রেমিক,

যার চলা-বলা সব তব সুন্নাতমাফিক।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাচ্চা প্রেমিক হিসেবে কাকে গণ্য করা হবে? যার কথাবার্তা হবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম মোতাবেক এবং যার কাজকর্ম হবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল ও সুন্নাত মোতাবেক। আল্লাহ তা'আলা ওলামায়ে দেওবন্দের কবরে লক্ষ-কোটি রহমত নাযিল করুন, যাঁরা প্রিয়নবীর প্রতিটি সুন্নাতের ওপর ঘর বেঁধেছেন এবং সংরক্ষণ করেছেন।

নবীপ্রেমের একটি বিরল ঘটনা

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসার আরেকটি ঘটনা শুনিয়ে দিচ্ছি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বাণীর সারমর্ম হলো– আমার গোটা উম্মতের হিসাব-নিকাশ না হওয়া পর্যন্ত আমি জান্নাতে প্রবেশ করব না। এক ব্যক্তি হাতে একটা থলে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। থলেটায় কিছু টাকা-পয়সাও ছিল। একচোর দৌড়ে এসে তার হাত থেকে থলেটা ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

কিছুদূর যেতে-না-যেতেই সে অন্ধ হয়ে গেল। সেখানে বসেই সে চেঁচামেচি ও কান্নাকাটি শুরু করে দিল। বলতে লাগল, লোকসকল! আমি অমুক জায়গা থেকে এক ব্যক্তির টাকার থলে ছিনতাই করে নিয়ে এসেছি। আমাকে সেখানে নিয়ে চলো; আমি তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব, যেন আমি

পুনরায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাই। লোকেরা যখন তাকে সেখানে নিয়ে গেল ততক্ষণে থলের মালিক সেখান থেকে চলে গেছেন।

পাশেই ছিল এক নাপিত। তাকে জিজ্ঞেস করল, আমি অমুক ব্যক্তির টাকার থলে ছিনতাই করেছি; তুমি তাকে চেন কি? সে বলল, চিনি বটে; তিনি তো নামায পড়তে এ দিকে আসেন। সম্ভবত পরবর্তী নামাযের সময় এখান দিয়ে অতিক্রম করবেন। এলে আমি তোমাকে বলে দেব। তাকে সেখানে বসিয়ে দেওয়া হলো।

কিছুক্ষণ পর লোকটি সেখান দিয়ে যেতে শুরু করলেন। নাপিত বলল, এই তো তিনি যাচ্ছেন। চোর তার পায়ে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল। লোকটি বলতে লাগলেন, আরে ভাই! আমি তো তোমাকে তখনই ক্ষমা করে দিয়েছি। চোর অবাক হয়ে বলল, তখনই আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কারণ, আমি ভাবলাম, তুমি আমার থলে চুরি করে অন্যায় করেছ। এ কারণে কেয়ামত দিবসে তোমার নামে মামলা দায়ের হবে। তারপর হিসাব-নিকাশ হবে। ফলে এ কারণে নবীজির জান্নাতে প্রবেশ করতে খানিক দেরি হয়ে যাবে। তাই আমি তোমাকে তখনই ক্ষমা করে দিয়েছি, যাতে মামলা দায়ের না হয় এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও জান্নাতে প্রবেশে বিলম্ব না হয়।

প্রেমিক ফকিরের ঘটনা

দিল্লির জামে মসজিদের দরজায় এক প্রতিবন্ধী ভিক্ষা করত। এক ইংরেজ মসজিদটি দেখতে এল। ইংরেজরা দিল্লীর জামে মসজিদ দেখতে আসত এটা আমিও দেখেছি। ওই ইংরেজ উচ্চপদস্থ লোক ছিল। সে যখন ফকিরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিল, কিছু পাওয়ার আশায় সে তাকে স্যালুট করল। ইংরেজ তাকে কিছু টাকা দিল। ইংরেজরা এসে মসজিদের জুতা রাখার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকত। ভিতরে প্রবেশ করত না। মসজিদের কারুকাজ ও মর্যাদা এতই ছিল যে, আল্লাহর ঘরের সামনে দাঁড়িয়েই তাদের প্রশান্তি মিলত।

ইংরেজ মসজিদ দেখে চলে গেল। বাসায় গিয়ে টের পেল, যে থলে থেকে ভিক্ষুককে টাকা দিয়েছে, সেই থলেটা পকেটে নেই। টাকার পরিমাণও অনেক ছিল। এদিকে থলেটা কোথায় যে পড়ল তাও জানা নেই।

মোটকথা, বিষয়টি এ পর্যন্তই ক্ষান্ত রইল। এক সপ্তাহ পর ছুটি পেলে স্ত্রী বলল, তুমি মসজিদ দেখেছ; আমাকেও দেখাতে হবে। সে ছুটির দিন স্ত্রীকে

নিয়ে মসজিদ দেখতে এল। ইংরেজ লোকটি ফকিরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাকে দেখামাত্রই সে দাঁড়িয়ে গেল এবং বলল, স্যার! বিগত সপ্তাহে আপনি মসজিদ দেখতে এসে আমাকে টাকা দিয়েছিলেন। তারপর টাকার থলেটা পকেটে রাখতে গেলে বাইরে পড়ে যায়। তখন আমি সেটা তুলে রাখি। আপনার এই থলেটা আমার কাছে আমানত। এখন আমি সেটা আপনার নিকট হস্তান্তর করছি।

থলেটা হাতে নিয়ে ইংরেজ দেখল, তাতে যা ছিল, সবই আছে। অবাক হয়ে বলতে লাগল, কিছু টাকা রেখে দিয়েও তো থলেটা ফেরত দিতে পারতে। সব টাকাই হুবহু ফেরত দিলে কেন? কী কারণে তুমি একটি টাকাও রাখলে না? প্রতিবন্ধী ভিক্ষুক বলল, ব্যাপার হলো, কেয়ামত দিবসে সকল মানুষ আপন-আপন নবীর পিছনে থাকবে। তারা দলবদ্ধভাবে নবীগণের পেছনে চলবে। থলেটা তুলে নেওয়ার সময় আমারও মন চাচ্ছিল, টাকাগুলো নিয়ে নিই। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম, সব কাজই তো আল্লাহ তা'আলার সামনে পেশ করা হবে। যদি আমি টাকাগুলো নিয়ে নিই আর কেয়ামত দিবসে নবীজির পিছনে দাঁড়াই আর আপনি হযরত ঈসা (আ.)-এর পিছনে দাঁড়ান, সে সময় যেন আমার নবীর ব্যাপারে আপনার নবী এই অভিযোগ করতে না পারে যে, আপনার উম্মত আমার উম্মতের টাকা নিয়েছিল। একথা ভেবে আমি খেয়ানত করিনি। আপনার টাকাগুলো হুবহু ফেরত দিয়েছি। হায়! আমাদের অন্তরে দিল্লির ওই প্রতিবন্ধী ভিক্ষুকের মতোও নবীজির ভালোবাসা থাকত যদি!

قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے
دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے

প্রেমের শক্তি দিয়ে সব নিচুকে উঁচু করে দাও।
মুহাম্মাদের নাম দ্বারা ভুবনটাকে উজ্জ্বালা বানাও।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

প্রেমের জ্বালা ও জ্ঞানের নেশা

'প্রেমের জ্বালা ও জ্ঞানের নেশা হাসিলের জন্য এমন অদম্য স্পৃহা ও খাঁটি আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। প্রেমের জ্বালা শেখাবার লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণকে পাঠিয়েছেন। আর জ্ঞানের নেশা সৃষ্টির জন্য কিতাব দান করেছেন। অর্থাৎ– কিতাবুল্লাহ্ আর রিজালুল্লাহ্ পাঠিয়েছেন। রিজালুল্লাহর মাধ্যমে প্রেমের জ্বালার সাধ পূরণ হবে। আর কিতাবুল্লাহর মাধ্যমে জ্ঞানের নেশার সাধ পূরণ হবে। অথবা এভাবে বুঝে নিন যে, প্রেমের জ্বালা মেটাতে সুন্নাতে রাসূল আর জ্ঞানের নেশা কাটাতে কুরআন শরীফ দিলেন।'

প্রেমের জ্বালা ও জ্ঞানের নেশা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ اَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى ۚ شَهِدْنَا ۚ

আদম-সন্তানের দুটি দল

হাদীছে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ.)কে তৈরি করে তাঁর পৃষ্ঠদেশে আঘাত করলেন। তবে তাঁর হাতকে আমাদের হাতের সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। সেটি ছিল কুদরতি হাত। আল্লাহ্ তা'আলা যখন স্বীয় ডান হাত দ্বারা আদম (আ.)-এর পৃষ্ঠদেশে আঘাত করলেন, তখন আদম (আ.) থেকে একদল সন্তান বেরিয়ে পড়ল, যাদের দেহ অবিকল মানুষের মতো। চোখ, মুখ ও অন্যান্য সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গই ছিল। তবে দেহ ছিল আকারে অতিক্ষুদ্র। তাদের চেহারা ছিল আলোকোজ্জ্বল। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বাম হাত দ্বারা পুনরায় তাঁর পৃষ্ঠে আঘাত করলে আরেক দল সন্তান বেরিয়ে পড়ল। আকার-আকৃতিতে এরাও পূর্ববর্তীদের মতো ছিল। তবে চেহারা ছিল কালো। হযরত আদম (আ.) যখন তাদের দিকে তাকালেন, জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রভু! এরা কারা? বলা হলো, এরা তোমার সন্তান। সন্তান কথাটি শুনে আদম (আ.) তাদের দিকে পুনরায় তাকালেন। প্রথম দৃষ্টি ছিল অপরিচিত হিসেবে আর দ্বিতীয় দৃষ্টি ছিল আপন ও পরিচিত হিসেবে। দ্বিতীয়বার তাকিয়ে তিনি কিছু চেহারা উজ্জ্বল আর কিছু চেহারা কালো দেখতে পেলেন। যেহেতু সকল পিতাই আশা করেন, তার সব সন্তান যেন পূর্ণতার অধিকারী হয়। এ কারণে আদম (আ.) কিছু চেহারা উজ্জ্বল ও কিছু চেহারা কালো দেখে আরজ করলেন :

لَوْلَا سَوَّيْتَ يَارَبِّ

'হে প্রভু! তুমি সবাইকে সমান কেন বানালে না?'

উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বললেন :

اَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ

'আমার পরিচিত হওয়ার সাধ জেগেছে।'

এ যেন কুরআনে পাকের এই আয়াতেরই মর্মার্থ–

فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ

'একদল (উজ্জ্বল চেহারার অধিকারীরা) জান্নাতে আর অপর দল (কালো চেহারার অধিকারীরা) জাহান্নামে যাবে।'[১]

উদ্দেশ্য ছিল, আদম-সন্তানের পরীক্ষা নেওয়া। যারা এ পরীক্ষা পাশ করার ছিল, তারা সৌভাগ্যবান এবং তাদের চেহারা উজ্জ্বল ছিল। আর যারা এই পরীক্ষা ফেল করার ছিল, তারা ছিল হতভাগা এবং তাদের চেহারা কালো ছিল।

এ ছিল আদম-সন্তানের দুটি দল।

আল্লাহর সাথে আদম-সন্তানের প্রথম কথোপকোথন

তারপর আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত আদম সন্তানের সাথে কথা বলেছেন। হাদীছ শরীফে আছে :

كَلَّمَهُ عَيَانًا

'তিনি তাদের সাথে সরাসরি কথা বলেছেন।'

সেই কথোপোকথনের সময় তিনি জিজ্ঞেস করেছেন :

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

'আমি কি তোমাদের রব নই?'[২]

সবাই চুপ হয়ে গেল। কারণ, ইতোপূর্বে তারা কখনো প্রশ্নের সম্মুখিন হয়নি। তাই তারা অবাক হলো, আমাদের সাথে এ কেমন কথা হলো? সে সময় মানবতার শিক্ষক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন :

---

১. সূরা শূরা : আয়াত ৭

২. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৭২

بَلٰى يَا رَبِّ

'হ্যাঁ হে প্রভু! আপনি-ই তো আমাদের রব।'

নবীজির জবাব শুনে আদম-সন্তানও এই জবাবের পুনরাবৃত্তি করল। এ কারণেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশ্বমানবতার শিক্ষক বলা হয়। তখনও তিনি নবুওতপ্রাপ্ত ছিলেন। হাদীছে পাকে এসেছে, আল্লাহর রাসূল ইরশাদ করেছেন :

كُنْتُ نَبِيًّا وَّاٰدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ

'আদম যখন পানির আকারে ছিলেন, আমি তখনও নবী ছিলাম।'

মানবতার জন্য দুটি মহামূল্যবান উপহার

সেই কথোপোকথনকালে মানুষকে দুটি উপহার দেওয়া হয়েছে। একটি হলো, আল্লাহ তা'আলা আপন সৌন্দর্য দেখিয়ে প্রেমের জ্বালা দান করেছেন। অপরটি প্রশ্ন করে জ্ঞানের নেশা দান করেছেন। এই দুটি বিষয় অনেক বড় নেয়ামত। এর অর্থ এই নয় যে, আর কোনো নেয়ামত দেওয়া হয়নি, বরং এত নেয়ামত দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ তা গণনা করে শেষ করতে পারবে না। দেখুন! যখন বৃষ্টি হয়, কেউ কি বৃষ্টির ফোঁটা গণনা করতে পারে? পারে না। কেউ কি সমুদ্রের পানির ফোঁটা গণনা করতে পারে? পারে না। কেউ কি আকাশের তারকা গণনা করতে পারে? পারে না। এমন কি কেউ আছে, যে পৃথিবীর বালিকণাগুলো গুণতে পারে? পারে না। কোনো মানুষ কি সারা পৃথিবীর গাছের পাতাগুলো গুণতে পারে? পারে না।

অন্তরের কান দিয়ে শুনুন, তার পরও আমি বলব, বৃষ্টির ফোঁটা গণনা করা সম্ভব, সমুদ্রের পানির ফোঁটা গণনা করা সম্ভব, সারা পৃথিবীর সব বালিকণা গণনা করা সম্ভব, গাছের সব পাতা ও আকাশের সব তারকা গণনা করা সম্ভব; কিন্তু আল্লাহর নেয়ামতরাজি গণনা করা কখনোই সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন :

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا

'আর যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গণনা করতে চাও, তাহলে তা গণনা করে শেষ করতে পারবে না।'[১]

মোটকথা, নেয়ামত তো অগণিত। তার মধ্যে দুটি হলো বৃহৎ। একটি হলো প্রেমের জ্বলন, অপরটি জ্ঞানের নেশা।

---

১. সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৩৪

মন ও মস্তিষ্কের খাদ্য

আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত প্রেমের জ্বালার জন্য দান করেছেন কম্পিত হৃদয় আর জ্ঞানের নেশার জন্য দিয়েছেন অস্থির মস্তিষ্ক। মানবদেহে এই দুটির পাত্রও তৈরি করলেন। মনের খাদ্য প্রেম আর মস্তিষ্কের খাদ্য জ্ঞান। শুধু পাত্র তৈরি করে খাদ্য তৈরি না করলে সেটা অন্যায় ও জুলুম। অথচ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

'আর আমি আমার বান্দাদের প্রতি জুলুম করি না।'[১]

যেমন– আল্লাহ পেট বানিয়েছেন। এ কারণে পৃথিবীতে পাঠানোর আগেই তার প্রয়োজন মেটাতে ফল, মূল ও অন্যান্য রকমারি খাদ্যের ব্যবস্থা করে রেখেছেন এবং জমিনকে বিছানা বানিয়ে দিলেন। মোটকথা, তিনি পেটের ক্ষুধা নিবারণে যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

ঠিক তেমনি ক্ষুধার্ত মন ও মস্তিষ্কেরও খাদ্যের প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি আপন সৌন্দর্য প্রদর্শন করে মনের খোরাক হিসেবে প্রেমের জ্বালা দান করলেন এবং প্রশ্ন উত্থাপন করে মস্তিষ্কের খোরাক তথা জ্ঞানের নেশা প্রদান করলেন। প্রেমের নিবাস হলো অন্তর। প্রেমের আগুন অন্তরে থাকে আর তার ধোঁয়া মুখে আলোচনা আকারে নির্গত হয়। এ কারণেই মনের খোরাক হলো রবের স্মরণ আর মস্তিষ্কের খোরাক রবের জ্ঞান।

প্রেমের জ্বালা ও জ্ঞানের নেশার বাস্তবতা

প্রেমের জ্বালা ও জ্ঞানের নেশা এই দুটি বিষয়ের মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারলেই মানবজীবন সফলভাবে পরিচালিত হয়। পৃথিবীতে বহু চিন্তাবিদ বহু নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। শেষ পর্যন্ত সেগুলো তাদের আপন অস্তিত্বের মতো একদিন বিলীন হয়ে গেছে। কারণ, ওইসব নীতিমালায় জ্ঞানের নেশা বিদ্যমান থাকলেও প্রেমের জ্বালা ছিল অনুপস্থিত। ঢাক-ঢোল বাজিয়ে বলা যায়, পৃথিবীর কোনো ব্যবস্থাপনাই এই দু-রঙে রঙিন না হয়ে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে পারে না। আল্লাহ আমাদের যে জীবনব্যবস্থা দান করেছেন, তাতে প্রেমের জ্বালা ও জ্ঞানের নেশা উভয়টিই বিদ্যমান। নবীজি পৃথিবীতে তাশরীফ এনে স্বীয় আগমনের দুটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন।

---

১. সূরা কাফ : আয়াত ২৯

একটি হলো–

إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا

'আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।'[১]

বলেননি, আমি ছাত্র হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। কারণ, ছাত্রের তুলনায় শিক্ষকের মর্যাদা অনেক বেশি। যেন বক্ষ্যমাণ হাদীছটিতে জ্ঞানের নেশার বিষয়টি পরিষ্কার করা হয়েছে যে, আমি মানবতাকে জ্ঞানের অলংকারে সুসজ্জিত করতে প্রেরিত হয়েছি।

অপরটি হলো :

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ

'আমি সচ্চরিত্রকে পূর্ণতাদানের জন্য প্রেরিত হয়েছি।'[২]

এই সচ্চরিত্রেরই অপর নাম প্রেমের জ্বালা। লক্ষ করার বিষয় হলো, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এই দায়িত্ব বাস্তবায়নে কতখানি সফল হয়েছেন? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজের ভাষণটি এই প্রশ্নের চমৎকার জবাব। কারণ, তিনি সেই ভাষণে গোটা উম্মতের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলেন, আমি আমার প্রেরণের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পেরেছি কি? সবাই একবাক্যে দৃঢ় কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন, আপনি নিশ্চিতরূপে আপনার প্রেরণের উদ্দেশ্য পূর্ণ করেছেন। নবীজি তখন বললেন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন, আমাকে প্রেরণের উদ্দেশ্য আমি পূর্ণ করে দিয়েছি।[৩]

এখানে কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ করার সাক্ষ্য দেওয়া হলো? প্রেমের জ্বালা ও জ্ঞানের নেশাসংক্রান্ত উদ্দেশ্যের সাক্ষ্য দেওয়া হলো। পৃথিবীর বহু চিন্তাবিদ অনেক চেষ্টা-সাধনা করেও এই দুটি বিষয়কে একত্রিত করতে সক্ষম হয়নি।

دعوت فکر و عمل روز نئی ملتی ہے
پھر بھی دنیا تیرے پیغام سے لگے نہ بڑھی

'নিত্য দিনে পাই কর্ম ও ভাবনার নতুন-নতুন আহ্বান,
তবু পৃথিবী আজও ছাড়িয়ে যায়নি তোমারি পয়গাম।

---

১. রওজাতুল মুহাদ্দিছীন : হাদীছ নং ৪৯২৬

২. মুসনাদুশ শিহাব : হাদীছ নং ১০৮০

৩. ছহীহ বোখারি : হাদীছ নং ১৭৩৯

মোটকথা, ১৪০০ বছর পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও শাহে মদীনার জীবনব্যবস্থা-ই সফল প্রমাণিত, যাতে রয়েছে প্রেমের জ্বালা ও জ্ঞানের নেশা।

বিবেক অপেক্ষা অন্তর শ্রেষ্ঠ

সকল নবী-রাসূল পৃথিবীতে এসে অন্তরকেই তাদের মেহনতের ক্ষেত্র বানিয়েছেন। এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে। তাহলো জ্ঞানের সম্পর্ক জাহেরের সাথে আর প্রেমের সম্পর্ক বাতেনের সাথে। আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের ভালোবাসা যেহেতু অদৃশ্য জগতের বিষয়, সেহেতু অন্তরকে বিবেকের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কুরআন পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছে–

لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا

'হায়! যদি তাদের অন্তর থাকত, যা দ্বারা তারা বুঝতে পারত!'[১]

কারণ, বিবেক নিজেও অন্তরের অনুগামী। এ কারণেই নবীগণ পৃথিবীতে তাশরীফ এনে মানুষের অন্তরকে তাঁদের মেহনতের ক্ষেত্র বানিয়েছেন। একথা কোথাও বলা হয়নি যে, আমরা বিবেককে পরিবর্তন করে দিয়েছি। কেননা, এ ক্ষেত্রে বিবেকের পা অচল। প্রত্যক্ষ করা তো অন্তরের কাজ। ঈমানের সম্পর্ক অন্তরের সাথে। গায়েব বা অদৃশ্যের সম্পর্ক অন্তরের সাথে। জ্ঞান যেহেতু জাহেরের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়, সেহেতু ইসলামে অন্তরকে বিবেকের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

প্রেম ও জ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক

যেখানে প্রেমের জ্বালা আবশ্যক, সেখানে জ্ঞানের নেশাও আবশ্যক। দেহের সাথে পোশাক যেমন জড়িত, এই দুটির একটি অপরটির সঙ্গে ঠিক তেমনি জড়িত। শুধু প্রেম থাকলে মানুষ বিদ'আতে জড়িয়ে পড়ে। শুধু জ্ঞান থাকলে অহংকার সৃষ্টি হয়। জ্ঞান প্রেমের ভারসাম্য বজায় রাখে আর প্রেম জ্ঞানের মাঝে বিনয় সৃষ্টি করে। উভয়টি-ই আবশ্যক। যেকোনো একটি হলে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

---

১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৭৯

শুধু প্রেম বিদ‘আতের উৎস

শুধু প্রেম মানুষকে বিদ‘আতে লিপ্ত করে দেয়। এ কারণেই দেখবেন, যারা অধিক প্রেমের দাবিদার, তারা বলে, জ্ঞানের কথা একটু বাদ দাও তো বন্ধু! কারণ, জ্ঞানের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

আসতাগ্‌ফিরুল্লাহ! একেই বলে অন্ধ প্রেম, যা মানুষকে কবরে সেজদা করতে উদ্বুদ্ধ করে। পীরের বড়-বড় ছবি ঘরে ঝুলিয়ে রাখে আর সকালবেলা উঠেই তাতে ভক্তি জানায় ও প্রার্থনা করে। এমনটা হলো কেন? কারণ, সে খানিক প্রেম লাভ করেছে – জ্ঞান লাভ করেনি। এ কারণেই সে এমন উল্টা-পাল্টা কথা বলে। অথচ কামেল সুফী তাকেই বলে, যার কাছে প্রেম ও জ্ঞান উভয়টিই থাকে।

শুধু জ্ঞান অহংকার সৃষ্টি করে

শুধু জ্ঞান মানুষকে অহংকারী বানিয়ে দেয়। একপর্যায়ে মানুষ প্রবৃত্তির পুজারি হয়ে পড়ে। এ কারণেই আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন :

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ

‘আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে?’[১]

একটু সামনে গিয়ে বলেন :

وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ

‘জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে পথহারা করে দিয়েছেন।’[২]

এখানে ইল্‌ম তথা জ্ঞানের আলোচনা এজন্য করা হয়েছে যে, শুধু জ্ঞান মানুষকে প্রবৃত্তির পূজারি বানায় এবং সে আপন ইচ্ছায় গবেষণা করতে থাকে। শয়তান বড় জ্ঞানী ছিল। আল্লাহ যখন আদম (আ.)কে সেজদা করতে নির্দেশ দিলেন, তখন ফেরেশতারা সেজদা করল; কিন্তু শয়তান সেজদা করল না।

اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ

‘সে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল আর কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।’[৩]

---

১. সূরা জাছিয়া : আয়াত ২৩

২. সূরা জাছিয়া : আয়াত ২৩

৩. সূরা বাকারা : আয়াত ৩৪

আল্লাহ শয়তানকে জিজ্ঞেস করলেন, সেজদা করলে না কেন? জ্ঞান থাকায় সে দলিল পেশ করতে লাগল,

أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ

'আমি তার থেকে শ্রেষ্ঠ।'[১]

কেন?

خَلَقْتَنِيْ مِن نَّارٍ

'আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।'[২]

আর আগুনের গতি উপরের দিকে।

وَخَلَقْتَهُ مِن طِيْنٍ

'আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা।'[৩]

মাটিতে বিনয় রয়েছে। কাজেই আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। একদিকে সে Logic (দলিল) পেশ করল, অপর দিকে আল্লাহ তাকে স্বীয় দরবার থেকে বিতাড়িত করলেন। বন্ধুগণ! কথাগুলো হৃদয়ে গেঁথে রাখুন যে, শয়তান আলেম (জ্ঞানী) ছিল। আমেল (আমলকারী) ছিল, আবেদ (ইবাদতকারী) ছিল; কিন্তু আশেক (প্রেমিক) ছিল না, যার দরুন সে ধোঁকা খেয়েছে। হায়! যদি সে আশেক (প্রেমিক)ও হতো, তাহলে কেউ তাকে সেজদা করা থেকে বিরত রাখতে পারত না।

আহ্‌লে ইল্‌ম (জ্ঞানী)দের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ

এ কারণেই আহলে ইল্‌ম (জ্ঞানী) দের খেদমতে আরজ করব। আসুন একটু নিজেকে বিলীন করে দেখুন।

এক কবি কতইনা চমৎকার বলেছেন :

قال را بگزار مرد حال شو　پیش مرد کامل پامال شو

তুমি তোমার সমস্ত বিদ্যা-বুদ্ধি কোনো আল্লাহওয়ালার পায়ে লুটিয়ে দাও। কোনো কামেল ব্যক্তির সামনে নিজেকে বিলীন করে দাও। তার পর দেখতে পাবে, সৌভাগ্য কীভাবে তোমার পদচুম্বন করে। তবে এ কাজটি

---

১. সূরা ছোয়াদ : আয়াত ৭৬

২. সূরা ছোয়াদ : আয়াত ৭৬

৩. সূরা ছোয়াদ : আয়াত ৭৬

একেবারে সহজ নয়। কারণ, নফস স্বাধীনতা চায়। স্বীয় মতের পক্ষে প্রমাণ খাড়া করে। নিজের ওপর কোনো প্রকার কর্তৃত্ব সহ্য করতে পারে না। অথচ এই নফসকে বিলীন করার মাঝেই রয়েছে মানুষের প্রশান্তি। বিনয়ের মধ্যেই রয়েছে মানুষের মর্যাদা। আল্লাহর নবী ইরশাদ করেছেন :

مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللهُ

'যে আল্লাহর জন্য বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে উঁচু মর্যাদা দান করেন।'[১]

اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں
صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ

'গুণীজন তারা-ই যারা সদা অবনত,
কলসি তার পাত্র ভরে করে মাথা নত।
কলসি মাথা না ঝোঁকালে কি তার পাত্র ভরতে পারবে?'
পারবে না, পাত্র ভরতে হলে তাকে অবশ্যই মাথা নত করতে হবে।

এজন্যই কোনো কবি বলেছেন :

تواضع کا طریق سیکھ لو تو صراحی سے
کہ جاری فیض بھی ہے اور جھک جاتی ہے گردن بھی

'কলসির কাছ থেকে শিখে নাও বিনয়ের পদ্ধতি।
মস্তক অবনত করতে হবে প্রবাহের পাশাপাশি।

যে তার মস্তক অবনত করে, আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেন। আপনিও আল্লাহর সামনে মাথাটা নত করে দেখুন। একজন আরেফ বিল্লাহর (বুযুর্গের) সামনে নিজেকে বিলীন করে দিন। দেখবেন, আল্লাহ কীভাবে আপনার মূল্যায়ন করেন। কবি বলেন :

صد کتاب و صد ورق در نار کن
جان و دل را جانب دلدار کن

'শত কিতাব-পত্র সব আগুনে ফেলে দাও।
মন-দিল সব প্রেমাস্পদের হাতে সঁপে দাও।'

---

১. সহীহ ইবনে হিব্বান : হাদীছ নং ৫৬৭৮

তারপরই তুমি প্রকৃত প্রেমাস্পদের সাথে মিলিত হওয়ার অমীয় সুধা পানে ধন্য হবে।

مٹادے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے
کہ دانا خاک میں مل کر گل وگلزار بنتا ہے

'কিছু মর্যাদা পেতে হলে আপন অস্তিত্ব বিলিয়ে দাও।
বীজ মাটিতে বিলীন হয়েই ফুল ও ফুলবাগান হয়।'

মাটির মতো হয়ে থাকার মর্যাদা

মানুষ মাটির তৈরী। তাই তাকে মাটিরই মতো হয়ে থাকা উচিৎ। দেখুন, মাটিকে আল্লাহ্ তা'আলা কেমন মর্যাদা দান করেছেন যে, মাটি হতে ফল, মূল ও খাদ্যশষ্য ইত্যাদি উৎপাদিত হয়। আগুন থেকে কি কখনো কোনো ফল উৎপাদিত হয়েছে? না কখনো হয়নি। সে তো উল্টা ফলমূল জ্বালিয়ে দেয়। তবে মনে রাখবেন, মাটি যতক্ষণ পর্যন্ত পায়ের নিচে থাকে, ততক্ষণই কেবল তার মূল্যায়ন থাকে। পায়ের নিচ থেকে উঠে যদি কারো কাপড়ে লাগে, তখন সবাই ঝেড়ে ফেলে দেয়। কাপড়ে মাটি লাগা কেউ সহ্য করে না। চোখে পড়লে সকলে চোখ কচলে বের করে দেয়। অন্য কোনো জিনিসের ওপর পড়বে বলে ঝেড়ে ফেলে দাও।

দেখলেন তো, পায়ের নিচ থেকে উপরে ওঠায় কেমন অবমূল্যায়ন হলো? মাটি যেমন উড়ে গিয়ে আপন অবস্থান থেকে সামনে অগ্রসর হলে সবাই তাকে ঘৃণার চোখে দেখে, ঠিক তেমনি মানুষ তার অবস্থান থেকে অগ্রসর হতে চাইলে সমাজ তাকে সম্মানের নজরে দেখবে না। আল্লাহ্ রব্বুল ইয্যাত আমাদেরকে মাটি দ্বারা বানিয়েছেন। আমাদের সৃষ্টিতেই রয়েছে বিনয়। তাই আমরা বিনয়ী হয়েই থাকব। এক কবি কতই-না সুন্দর বলেছেন :

زمیں کی طرح جس نے عاجزی وانکساری کی
خدا کی رحمتوں نے اس کو ڈھانپا آسماں ہو کر

'জমিনের মতো যে বিনয় ও ভদ্রতা অবলম্বন করেছেন,
খোদার করুণা আচ্ছাদিত করে তাকে হয়ে গগন।

আগুনের মতো হয়ে থাকা নিন্দনীয়

এর বিপরীতে আগুনকে দেখুন। কোথাও যদি একটু আগুন লাগে, সবাই বলে পালাও-পালাও। এই হতভাগাকে নেভাও।

মোটকথা, আগুনের উত্থান কারুরই পছন্দ নয়। তারপরও কিছু মানুষ মাটির মতো না হয়ে আগুনের মতো হয়ে থাকতে চায়। একব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে বলল, জনাব! একটু আগুন প্রয়োজন। সে বলল, আমার কাছে নেই। আবারও বলল, জনাব! একটু আগুন নিতে এসেছি। লোকটি রেগে বলল, আরে! তুমি কি কানে শোন না? বলল, জনাব! আমি তো ধোঁয়া উড়তে দেখতে পাচ্ছি। বলল, তুমি আসলেই নির্বোধ; তুমি কি আমার কথা বুঝছ না? বলল, জনাব! এখন তো স্ফুলিঙ্গ বের হতে দেখছি। সে বলল, তুমি এখান থেকে বের হও। লোকটি বলল, জনাব! এই তো সেই আগুন, আমি যার সন্ধান দিতে এসেছি।

মূলত রাগ হলো আগুন। রাগ যখন সামান্য থাকে, তখন ধোঁয়ার আকারে থাকে। মাত্রা বাড়লে আগুনে পরিণত হয়। আর পূর্ণমাত্রায় রাগ হলে আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলতে থাকে। যে খুব বেশি রেগে যায়, সে আগুন-প্রকৃতির হয়ে যায়, যার ধারা গিয়ে শয়তানের সাথে মিলিত হয়। আল্লাহর দরবারে তাওবা করে নাও, যেন তিনি তোমাদেরকে তার সাথে যুক্ত না করে দেন।

সাহাবায়ে কেরামের প্রেমের জ্বালা ও জ্ঞানের নেশা

একজন মানুষকে প্রেমের জ্বালা ও জ্ঞানের নেশা উভয়টি হাসিল করতে হবে। সাহাবায়ে কেরামের জীবনের দিকে তাকালে এ দুটি বিষয় পরিষ্কারভাবেই দৃষ্টিগোচর হয়। এক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের জীবনকে مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ দুই সমুদ্রের মোহনার সাথে তুলনা করা যায়। তাদের মাঝে খোদাপ্রেমের স্পৃহা যেমন ছিল, তেমনি প্রভুর জ্ঞানের আগ্রহও ছিল। তাদের বক্ষ একদিকে প্রভুর পরিচয়ে পূর্ণ হলো, অপর দিকে প্রভুর প্রেমেও বিদগ্ধ ছিল।

মোটকথা, তাঁদের বক্ষ ছিল দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থল। এই সম্পদদুটি তাঁরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে লাভ করেছেন। আল্লাহ তা'আলাও মানুষের কাছ থেকে এমন জীবনই কামনা করেন, যে জীবনে প্রেমের জ্বালা ও জ্ঞানের নেশা এই দুয়ের সমন্বয় থাকবে।

প্রেমের জ্বালায় উন্মাদ হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)

সাইয়্যিদুনা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর অন্তর নবীপ্রেমের ঘাঁটি ছিল। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আল্লাহ তাঁকে অনেক উঁচু মাকাম দান করেছেন। সকালবেলা সূর্য উদিত হলে সর্বপ্রথম উঁচু ভবনেই তার কিরণ লাগে। ঠিক তেমনি নবুওতের সূর্য উদিত হলে সবার আগে তার কিরণ লেগেছে এ উম্মতের সর্বোচ্চ ও সর্বসেরা ব্যক্তির ওপর, যিনি হলেন সায়্যিদুনা হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযি.)। তিনিই হলেন আমাদের সেলসেলায়ে নকশবন্দিয়ার মহান ইমাম। তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই মহান নিসবত অর্জন করেছেন। যেমন হাদীছ শরীফে আছে–

مَا صَبَّ اللّٰهُ فِيْ صَدْرِيْ اِلاَّ وَقَدْ صَبَبْتُهٗ فِيْ صَدْرِ اَبِيْ بَكْرٍ

'আল্লাহ তা'আলা আমার বক্ষে যা কিছু ঢেলে দিয়েছেন, আমি তা আবুবকরের বক্ষে ঢেলে দিয়েছি।'[১]

বন্ধুগণ! এটি ছিল বাতেনি ইল্‌ম ও মারেফাত। এটি ছিল এমন এক নূর, যা নবীজির বক্ষ থেকে হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর বক্ষে স্থানান্তরিত হয়েছিল, যার ফলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার সকল উম্মতের ঈমান একত্রে এক পাল্লায় রাখলে আর অপর পাল্লায় আবুবকরের ঈমান রাখলে আবুবকরের ঈমানের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। কেন? কারণ, তিনি অসীম প্রেমের জ্বালার অধিকারী ছিলেন।

আমি তাঁর প্রেমের জ্বালাসম্বলিত কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি, যাতে প্রমাণিত হয়ে যায়, তিনি বাস্তবেই নবীপ্রেমে উন্মাদ ছিলেন।

১নং উহাহরণ : একবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনে বললেন, তোমাদের এ পৃথিবীতে মাত্র তিনটি জিনিস আমার প্রিয়।

১. সুগন্ধি।

২. নেককার স্ত্রী।

৩. নামায আমার চোখের শীতলতা।[২]

---

১. কাশফুল খাফা ১/৩১৯

২. মুসনাদে আহমাদ : হাদীছ নং ১২২৯৩

নবীজির পবিত্র জবান থেকে এই শব্দগুলো বের হওয়ার সাথে-সাথেই তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। এবার তাঁরও নিজের পছন্দের বিষয় প্রকাশের সুযোগ হলো। তিনি নিজের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পেয়ে গেলেন। বলে উঠলেন, হে আল্লাহর নবী! আমার নিকটও তিনটি জিনিস পছন্দনীয়। ১. আপনার নুরানি চেহারা মোবারক দর্শন করা। ২. আপনার পেছনে আমার সম্পদ ব্যয় করা। ৩. আমার কন্যা আপনার বিবাহে থাকা।

দেখুন, তিনটি জিনিসেরই মূল কেন্দ্র হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তা। একেই বলে খাঁটি প্রেম।

২নং উদাহরণ : একদা হযরত আবুবকর (রাযি.) আপন ঘরে বসে দোআ ও কান্নাকাটি করছিলেন। দোআর মাঝে মনে পড়ল, হে আল্লাহ আপনি আমাকে সম্পদ দান করেছেন। আমার সমস্ত সম্পদ আমি নবীজির খেদমতে পেশ করতে চাই। তবে দানকারীর হাত উপরে থাকে আর গ্রহণকারীর হাত নিচে থাকে। আমি যখন আপনার হাবীবকে সম্পদ দান করব, তখন তাঁর সাথে এতটুকু বেয়াদবিও আমি বরদাশত করতে পারব না। তাই আপনি নবীজির অন্তরে এ কথা ঢেলে দিন, যেন তিনি নিজের সম্পদের মতোই আমার সম্পদ ব্যয় করেন।

হাদীছে পাকে বর্ণিত আছে, তার পর থেকেই নবীজি হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর সম্পদ নিজের সম্পদের মতো ব্যয় করতেন।

৩নং উদাহরণ : হিজরতের সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর দরজায় এসে পৌঁছলেন। মৃধু আওয়াজে সালাম দিলেন। সাথে-সাথে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) বেরিয়ে এলেন। মনে হলো, তিনি পূর্ব থেকেই সজাগ ছিলেন। অথচ তখন রাত বেশ গভীর। নবীজি ইরশাদ করলেন, আবুবকর! লোকেরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে আর তুমি কি জাগ্রত ছিলে? উত্তরে হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযি.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিছুদিন ধরে আমার মন সাড়া দিচ্ছিল, আপনি হিজরতের আদেশ প্রাপ্ত হবেন। আবার একথাও মনে-মনে ভাবছিলাম, হিজরতকালে আপনি এই গোলামকে সঙ্গে নিবেন। আবার অন্তরে ভাবনা এল, এ নির্দেশ যদি রাতের বেলায় হয়, তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দুয়ারে তাশরীফ এনে আমাকে জাগাতে কষ্ট করতে হবে। তাই যেদিন থেকে মনে এ ভাবনার উদয় হয়েছে, সেদিন থেকেই আবুবকর রাতের বেলা ঘুমানো ছেড়ে দিয়েছে, যেন আমার প্রেমাস্পদকে আবুবকরের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়ে থাকতে না হয়।

৪নং উদাহরণ : হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.) একবার স্বপ্নে দেখলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। যেখানে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদম মোবারক রয়েছে, ঠিক সেই বরাবর হযরত আবুবকরের মাথা। বৃষ্টির পানি নবীজির শরীর হয়ে আবুবকরের শরীরে গিয়ে পড়ছে। হযরত ওমর (রাযি.) নিজেকে হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর অদূরেই দেখতে পেলেন। তাঁর শরীরেও পানির ছিটা এসে পড়ছিল।

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, ওগো আল্লাহ নবী! আমি এমন স্বপ্ন দেখেছি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটি নববী ইল্ম (জ্ঞান)-এর বর্ষণ। পূর্ণ আনুগত্যের দরুন আবুবকর বেশি অংশ লাভ করেছে। আর আবুবকরের সাথে মিল থাকায় তুমিও তার অংশবিশেষ লাভ করেছ।

সেলসেলায়ে আলিয়ায়ে নকশবন্দিয়ায় উলূমে নবুওত (নববী জ্ঞান)-এর ধারা

সেই উলূমে নুবওত তথা নববী জ্ঞানের স্রোতধারা আজও পর্যন্ত সেলসেলায়ে আলিয়ায়ে নকশবন্দিয়ায় প্রবহমান রয়েছে। আমাদের সেলসেলায় কারামাত খুব বেশি দেখা যাবে না। আমাদের সেলসেলায় অনাহারে থাকার মুজাহাদা খুব বেশি দেখতে পাবে না। খুব বেশি চিল্লা দেওয়া দৃষ্টিগোচর হবে না। অন্যান্য সেলসেলার বুযুর্গগণ সকলেই কামেল। আমরা তাঁদের প্রতি যথেষ্ট ভক্তি-ভালোবাসা পোষণ করি। তাঁদের বক্তব্য হলো, আমরা রিয়াজত ও সাধনার মাধ্যমে সুলূক (রাস্তা) অতিক্রম করাই। পক্ষান্তরে আমাদের মাশায়েখগণ সুন্নাতের অনুসরণের মাধ্যমে সুলূক (রাস্তা) অতিক্রম করান। দেখলেন, এটি মূলত হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযি.)-এর বিশেষ অবদান, যা আল্লাহ তা'আলা এই সেলসেলায় জারি করে দিয়েছেন।

অনাগ্রহের নিন্দা

সায়্যিদুনা হযরত আবুবকর (রাযি.) প্রেমের জ্বালাও জ্ঞানের নেশার মাধ্যমেই লাভ করেছেন। আজ আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নিকট এই দুটি নেয়ামত প্রার্থনা করতে হবে। এই সম্পদ তারই হস্তগত হয়, যার মধ্যে অদম্য স্পৃহা থাকে। বন্ধুগণ! নববী যুগেও তো যাদের আগ্রহ ছিল না, তারা

কিছুই লাভ করতে পারেনি। তাহলে নবুওতের ১৪০০ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর আগ্রহবিহীন কি কিছু আশা করা যায়? এর জন্য অদম্য স্পৃহা ও খাঁটি আগ্রহ থাকতে হবে। আজ মানুষ বায়াত হয় বটে; কিন্তু শায়খের সাথে গভীর কোনো সম্পর্ক সৃষ্টি হয় না।

শায়খের সাথে সম্পর্ক বলতে কী বোঝায়?

জিজ্ঞেস করবেন, শায়খের সাথে সম্পর্ক বলতে কী বোঝায়? এটি একটি নেয়ামত, যা আল্লাহ তা'আলা পীর ও মুরীদের অন্তরে সৃষ্টি করে দেন; ফলে এমন মহব্বত সৃষ্টি হয় যে, মানুষ তার উষ্ণতা অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুভব করতে পারে। বিষয়টি তার নিয়ন্ত্রণে থাকে না। উক্ত মহব্বত অনিচ্ছাকৃতভাবেই তাদের পরস্পরের অন্তরকে এক সূত্রে আবদ্ধ করে দেয়। হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযি.)-এর নবীজির সাথে আন্তরিক সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি ছিল। তিনি সর্বদা নবীপ্রেমে ডুবে থাকতেন। এ কারণেই নববী জ্ঞানের সর্ববৃহৎ অংশ তিনিই লাভ করেছেন। একেই বলে শায়খের সাথে সম্পর্ক। যে মুরীদ শায়খের সাথে এমন গভীর সম্পর্ক বজায় রাখবে, সে শায়খের ওপর আগত সকল অনুগ্রহলাভে ধন্য হবে। এমন অদম্য স্পৃহা থাকলে আল্লাহর পক্ষ থেকেও তাকে বহু কিছু দান করা হয়।

হযরত আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহি (রহ.)-এর নাতীর অদম্য স্পৃহা

হযরত আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গহি (রহ.)-এর নাতীর মতো স্পৃহা থাকা চাই। খাজা আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গহি (রহ.)-এর কয়েকজন খলীফা ছিলেন। তাঁরই এক নাতী প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছল। তখন তার দাদী জীবিত ছিলেন। তিনি বললেন, আরে বেটা! তোমার দাদার নিকট একটি নেয়ামত ছিল। তুমি যদি তা পেতে চাও, তাহলে খাঁটি আগ্রহ নিয়ে তোমার দাদার খলীফাদের নিকট যাও; তাহলে তা লাভ করতে পারবে। যুবক উৎসাহিত হলো। দাদী তাকে তার দাদার কোনো একজন খলীফার খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন। যখন খলীফা বুঝতে পারলেন, আমার শায়খের নাতী আসছে, তিনি তখন দলবল নিয়ে শহরের বাইরে এসে তাকে স্বাগত জানাতে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে তাকে স্বাগত জানালেন। তিন দিন যাবৎ মেহমানদারি করলেন। তার পর জিজ্ঞেস করলেন, জনাব কী উদ্দেশ্যে এসেছেন। আরজ করলেন, আপনার কাছে একটি নেয়ামত আছে; তা হাসিল করার লক্ষ্যে হাজির হয়েছি। বললেন, আর অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে কী?

পীর সেজে কি ওই নেয়ামত মিলবে? তা তো মুরীদ হয়ে হাসিল করতে হবে। সুতরাং উন্নত মানের গদি, বিছানা, সবই গেল। বলে দিলেন, খালি চাটাইয়ের ওপর থাকতে হবে আর এই কাজগুলো করতে হবে।

নাতী বলল, খুব ভালো কথা। হযরত (রহ.) তাকে কয়েক প্রকারের কাজের দায়িত্ব দিলেন। তাকে রিয়াজত ও মুজাহাদার কাজে লাগিয়ে দিলেন। যুবক কাজে লেগে গেল। কিছুদিন পর শায়খ (রহ.) যখন অবস্থার কিছুটা উন্নতি বুঝতে পারলেন, তখন ভাবলেন, একটু পরীক্ষা করে দেখি, কেমন পাকা হয়েছে? কিছুলোক শিকার করতে যাচ্ছিল। শায়খ নিজেও শিকার করতে যাওয়ার প্রোগ্রাম করলেন। তৎকালীন যুগে কুকুর দিয়ে শিকার করা হতো। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের শিকার শরীয়তে বৈধ। হযরত তাঁর সাথে বড়-বড় পোষা কুকুর নিয়ে নিলেন। যুবককে বললেন, এই কুকুরগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তোমাকে। তিনি বললেন, ঠিক আছে।

যুবক মুজাহাদা করতে-করতে ইতোপূর্বেই কঙ্কালে পরিণত হয়েছে। এবার শায়খ তাকে কুকুর নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দিলেন। শায়খ বিভিন্ন সময় পরীক্ষা করে থাকেন। কখনও কষ্ট দিয়েও পরীক্ষা করেন। এতে শায়খ বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারেন যদিও মুরিদ তা টের পায় না। যাহোক যুবক রশিগুলো কোমরে মজুবত করে বেঁধে নিল এবং শক্ত করে ধরে রাখল। কুকুরগুলো শিকার দেখে ছোটাছুটি শুরু করে দিল। কুকুরগুলো পোষা হওয়ায় বেশ মোটা-তাজা ছিল। এ দিকে যুবক একা ও দুর্বল হওয়ায় কুকুরগুলো তাকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। সে নাছোড় হয়ে ধরে রাখল। কুকুরগুলো আরো দ্রুতগতিতে তাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলল। সারাটা দেহ তার ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছিল। তথাপি শায়খের নির্দেশের দরুন রশি ছাড়ল না। জীবন গেলেও রশি ছাড়া সম্ভব নয়।

একেই বলে অদম্য স্পৃহা ও খাঁটি আগ্রহ। সারাটা দেহ তার ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। শায়খ সবই দেখলেন। ইত্যবসরে কাশ্‌ফের মাধ্যমে শায়খের সাথে খাজা আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহি (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। খাজা সাহেব (রহ.) বললেন, খলীফা! আমি তো আপনাকে এত কঠিন পরিশ্রম করাইনি! সাথে-সাথেই শায়খ যুবককে বুকে জড়িলে ধরলেন এবং সেই কাঙ্ক্ষিত নেয়ামত তাকে দান করলেন।

প্রেমের কুঠারে নদীর গতি পরিবর্তন

হযরত মুরশিদে আলম (রহ.) সাধু ফাতাহ আলীর একটি ঘটনা প্রায়শই শোনাতেন। হযরত খাজা সিরাজুদ্দীন (রহ.)-এর খানকায় ফাত্তু নামে এক ব্যক্তি ছিল। একেবারেই মূর্খ ছিল। কুরআন শরীফও পড়তে জানত না। কিন্তু হযরত (রহ.)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করে যেন বিক্রয় হয়ে গেল। নিজেকে শায়খের হাতে সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দিলেন। এ কাজটি বড়ই কঠিন। হযরতের খেদমতে থাকতে লাগলেন। সেখানে হযরতের কয়েক একর জমি ছিল। পাহাড়ি ঢল এসে জমিগুলো তলিয়ে যেত। চাষাবাদ করা যেত না। ফাত্তু বলল, হযরত! অমুক জায়গা দিয়ে পাহাড় কেটে দিলে নদীর গতি পাল্টে যাবে এবং আপনার জমিগুলো চাষাবাদের যোগ্য হয়ে যাবে। হযরত (রহ.) বললেন, কাজটা বেশ কঠিন। সে বলল, হযরত! আপনি কেবল অনুমতি দিন।

হযরত (রহ.) ফাত্তুর আগ্রহ দেখে অনুমতি দিয়ে দিলেন। অনুমতি পেয়ে ফাত্তু এবার কোদাল নিয়ে পাহাড়ের পাথর কাটতে শুরু করল। লোকজন এসে জিজ্ঞেস করত, কী করছ ফাত্তু? সে বলত, পাহাড় কেটে নদীর গতি পরিবর্তন করতে চাই। মানুষ হেসে চলে যেত আর বলত, মানুষ কি এমনিতেই বলে, বেওকুফটা মরেছে! ফাত্তু কারো কথায় কান না দিয়ে আপন গতিতে কাজ করে যেত। বন্ধুগণ! পাহাড় কাটা সহজ ব্যাপার নয়। নদীর গতি পরিবর্তন করা মামুলি বিষয় নয়। কিন্তু প্রেমের শক্তি সঙ্গ নিলে পাহাড়ও মোমে পরিণত হয়। আল্লাহও রাস্তা খুলে দেন। কবির ভাষায়–

ہر ضرب تیشہ ساغر کیف وصال دوست

'কুঠারের প্রতিটি আঘাত এমন হয়ে যায়, যেন বন্ধুর মিলন শরাব পান করছে।'

সে তো কুঠারাঘাত করছিল আর প্রেমের স্বাদ ভোগ করছিল। একদিন সে পাহাড় কেটে নদীর গতি পরিবর্তন করে দিল এবং হযরতের জমি আবাদযোগ্য হয়ে উঠল। হযরত মুরশিদে আলম (রহ.) অধমকে সেখানে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে বলেছিলেন, এই সেই জায়গা, ফাত্তু প্রেমের কুঠারাঘাতে যা খনন করেছে। আমি সেখানে গিয়ে প্রেমের বিজয় ও সফলতা স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছি। আমি তখন বললাম, ফাত্তু! আমি তোমার এই প্রেমকে সালাম জানাই এবং সালাম জানাই তোমার মর্যাদাকে, যে প্রেমে উন্মাদ হয়ে তুমি ইতিহাসে অম্লান স্মৃতিচারণ করেছ, তাকেও জানাই শত সালাম।

ফাত্তুর খাঁটি আগ্রহের ফলাফল

এ ঘটনার কিছুদিন পর হযরত (রহ.)-এর ঘর নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিল। কারণ, খানকায় লোকজন খুব বেশি আসতে লাগল। থাকার ব্যবস্থা ছিল খুব কম। তিনি ঘর নির্মাণের কাজে মিস্ত্রী লাগিয়ে দিলেন। দুপুরবেলো মিস্ত্রীরা বিশ্রাম করত। কিন্তু ফাত্তু ভাবত, মিস্ত্রী যখন আসবে, তখন যদি আমি মসলা তৈরি করি, তাহলে সময় নষ্ট হবে। মিস্ত্রী অপেক্ষায় বসে থাকবে। এই কাজটি তো আমার শায়খের। ফলে মিস্ত্রী যখন বিশ্রামে যেত, ফাত্তু মসলা তৈরি করত। কেউ বিষয়টি টের পেত না। হ্যাঁ; প্রেম মূলত প্রকাশ চায় না – চায় কেবলই গোপনীয়তা।

وہ جن کا عشق صادق ہو وہ کب فریاد کرتے

لبوں پر مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں

'প্রকৃত প্রেমিক ফরিয়াদ করে কভু নাহি ফিরে।

ঠোঁট তালাবদ্ধ হলেও অন্তর কেঁদে মরে।

মোটকথা, ফাত্তু এভাবেই নিয়মিত মসলা তৈরি করতে লাগল। হযরত খাজা সাহেব (রহ.) একদিন দুপুরে বেলকনিতে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকালেন। রোদের তীব্রতায় লোকজন সব শুয়ে রয়েছে আর প্রেমিক ফাত্তু একা মসলা বানাচ্ছে। সারাটা শরীর তার ঘামে ভিজে গেছে; তবু হৃদ্যতার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। হযরত (রহ.) তার অদম্য স্পৃহা ও খাঁটি আগ্রহ বুঝতে পারলেন। তাই লোকমারফত ফাত্তুকে ডেকে পাঠালেন। ফাত্তু শুনে ভয় পেয়ে গেল, না জানি আমার কোনো ক্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে। সে বলল, তাহলে আমি গোসল করে কাপড় পরে নিই। তারপর হযরতের খেদমতে হাজির হই।

হযরত খবর পেয়ে বললেন, না তাকে এই অবস্থাতেই আসতে বলো। অগত্যা ফাত্তু ওই অবস্থায় হযরতের খেদমতে হাজির হলো। হযরত তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং খেলাফত দিয়ে দিলেন। এবার ফাত্তু কাঁদতে লাগল আর বলতে লাগল হযরত! আমি তো সাধারণ একজন মূর্খ মানুষ। আমি কিছুই জানি না। কুরআন শরীফও পড়তে জানি না। আপনি কিনা বলছেন, আমি তোমাকে খেলাফত দিলাম। আমি তো এর যোগ্য নই।

হযরত খাজা সাহেব (রহ.) বললেন, নেয়ামত প্রদান করা আল্লাহ তা'আলার কাজ। আল্লাহ তা'আলাই আমার অন্তরে এ বিষয়টি ঢেলে

দিয়েছেন। কাজেই আমি তাতে দ্বিমত করতে পারি না। আমি দেখতে পেলাম, পাত্র পরিষ্কার; তাই নেয়ামতটি পাত্রে রেখে দিলাম। সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহর। তিনিই আপন অনুগ্রহে তাকে রক্ষা করবেন।

ফাত্তু এবার খেলাফত লাভ করল। এবার সে ফলে-ফুলে সমৃদ্ধ হতে লাগল। এবার সে কুরআন শরীফ পড়তে শুরু করল। কিছুদিন অতিক্রম করতেই সে সাধু ফাতাহ আলী নামে খ্যাতি লাভ করল। বড়-বড় আলেমগণ পর্যন্ত তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করতে লাগলেন।

হযরত মুরশিদে আলম (রহ.) বলেন, আমি একবার হজ করতে গেলাম। তখন সাধু ফাতাহ আলীও মক্কায় ছিলেন। ওলামায়ে কেরামের এক মজমায় গিয়ে দেখতে পেলাম, আলেমগণ মাটিতে বিছানা বিছিয়ে শুয়ে রয়েছেন আর তাদেরই মাঝখানে সাধু ফাতাহ আলীর জন্য চৌকি পাতা হয়েছে। এই নেয়ামত এমন, যা ফাত্তুকে সাধু ফাতাহ আলীতে পরিণত করেছে।

প্রেমের জ্বালা ও জ্ঞানের নেশা হাসিলের উপায়

বন্ধুগণ! প্রেমের জ্বালা ও জ্ঞানের নেশা হাসিলের জন্য এমন অদম্য স্পৃহা ও খাঁটি আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। প্রেমের জ্বালা শেখাবার লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলা নবীগণকে পাঠিয়েছেন। আর জ্ঞানের নেশা সৃষ্টির জন্য কিতাব দান করেছেন। অর্থাৎ– কিতাবুল্লাহ আর রিজালুল্লাহ পাঠিয়েছেন। রিজালুল্লাহর মাধ্যমে প্রেমের জ্বালার সাধ পূরণ হবে। আর কিতাবুল্লাহর মাধ্যমে জ্ঞানের নেশার সাধ পূরণ হবে। অথবা এভাবে বুঝে নিন যে, প্রেমের জ্বালা মেটাতে সুন্নাতে রাসূল আর জ্ঞানের নেশা কাটাতে কুরআন শরীফ দিলেন।

মোটকথা যার এক হাতে কিতাবুল্লাহ অপর হাতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত থাকবে, যেন তার কাছে প্রেমের জ্বালা ও জ্ঞানের নেশা উভয়টি বিদ্যমান। এমন জীবনকেই সফল জীবন বলা হয়।

در کف جام شریعت در کف سندان عشق

ہر ہو سناکے نہ داند جام وسندان باختن

'এক হাতে শরীয়তের পেয়ালা এক হাতে প্রেমের হামান।

সকল উচ্চাভিলাষী জানে না পেয়ালা ও হামান নিয়ে খেলার ধরন।'

এটি আল্লাহ তা'আলার অসীম রহমত যে, কোনো-কোনো ব্যক্তিকে তিনি প্রেমের জ্বালা ও জ্ঞানের নেশা উভয়টি দান করেন।

একটি বিভ্রান্তির নিরসন

মনে রাখবেন, আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত সর্ব যুগেই এই সম্পর্কের ধারা চালু রেখেছেন। অনেকে বলে, এখন তো জুনাইদ-শিবলির মতো মানুষ দেখতে পাই না। তাহলে কার নিকট থেকে নেসবত (সম্পর্ক) হাসিল করব? জি, আপনি যদি জুনাইদ আর শিবলির তালাশেই থাকেন, তাহলে রাত-দিন হন্যে হয়ে তালাশ করেও তাদের খুঁজে পাবেন না। শেষমেশ আপনাকে শূন্য হাতেই ফিরে আসতে হবে। তবে যদি সত্যিকারার্থে অদম্য স্পৃহা নিয়ে নেসবত তালাশ করেন, তাহলে আজও আপনি এর সন্ধান লাভে ধন্য হবেন। নেসবত তার অলৌকিক জ্যোতি আজও আপনাকে দেখাবে। কারো চোখে যদি পট্টি বাঁধা থাকে আর সে বলে, আমি দেখতে পাই না, তাহলে সেই অপরাধ কার? আপনি আপনার চোখ থেকে অহংকার ও কুপ্রবৃত্তির পর্দা হটিয়ে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হয়ে কোনো আল্লাহওয়ালার সন্ধান করুন; তাহলে আপনি এ যুগেও নেসবতধারী (আল্লাহওয়ালা) ব্যক্তি পেয়ে যাবেন। কেননা, এর হেফাযতের ভার আল্লাহ নিজে গ্রহণ করেছেন।

অন্তরের আক্ষেপ

বন্ধুগণ! নেসবত কারো ঘরের দাসী নয়, কারো জমিদারিও নয়। এমনকি কারো মালিকানাধীন বস্তুও নয়। এই নেসবত ওপর থেকে আসে সামনে এগিয়ে নিতে। উপযুক্ত পাত্র মিললেই দিতে আর দেরি হয় না। সে যেকোনো সময় দিতে প্রস্তুত থাকে। আমরা আজ এদিক-ওদিক কেন ঘুরে বেড়াই? কেন পৃথিবীটা চষে বেড়াই? কেবল প্রেমের জ্বালা ও জ্ঞানের নেশার প্রার্থী খুঁজে ফিরি। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হলো, কোনো আগ্রহী প্রার্থীই দেখতে পাচ্ছি না।

حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا

بت کے بندے تو ملے اللہ کا بندہ نہ ملا

'মনের কথা বলব যাকে এমন কাউকে পাই না খুঁজে।

ভূতের গোলাম ভুরি-ভুরি খোদার গোলাম না পাই খুঁজে।'

বন্ধুগণ! কোনো উপযুক্ত বান্দা পাওয়া গেলে তখন নেসবত প্রদান না করার সাধ্য শায়খেরও থাকে না, বরং আল্লাহ তা'আলাই নেসবত প্রদানের যাবতীয় বাধা দূর করে এ পথ সুগম ও মসৃণ করে দেন। এর পরও যদি শায়খ নেসবত প্রদান না করেন, তাহলে তাকে আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

কেননা, আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا

'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের এই মর্মে আদেশ দান করেন, যেন তোমরা যথাযোগ্য ব্যক্তির নিকট আমানত পৌঁছে দাও।'[১]

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নেসবতের নূর দ্বারা উপকৃত করুন এবং রোজ হাশরে ক্ষমাপ্রাপ্ত গুনাহগারদের কাতারে শামিল করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

১. সূরা নিসা : আয়াত ৫৮

ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভাবনা

‘কুলকায়েনাতের প্রতি লক্ষ করা ও তাকে নিয়ে ভাবার দুটি দিক রয়েছে। একটি ইতিবাচক, অপরটি নেতিবাচক। এই ভিত্তির ওপর নির্ভর করে বলা যায়, মানুষের জীবন যাপনেরও দুটি দিক বা পদ্ধতি রয়েছে। ইতিবাচক জীবনপদ্ধতি ও নেতিবাচক জীবনপদ্ধতি। প্রতিটি মানুষের মাঝেই ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভাবনা রয়েছে। জীবন যাপনে নানা লেনদেনের ক্ষেত্রে কেউ ইতিবাচক মনোভাবের দরুন ইতিবাচক দিকেই লক্ষ রাখে। পক্ষান্তরে আরেকজন নেতিবাচক মনোভাবের দরুন নেতিবাচক দিকেই নজর দিয়ে থাকে। পার্থক্য এতুটুক যে, ইতিবাচক মনোভাব পোষণকারী ব্যক্তি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে এর সুফল ভোগ করে। আর নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ব্যক্তিকে নেতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে চরম খেসারত দিতে হয়।’

ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভাবনা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى -

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

জীবন যাপনের দুটি পদ্ধতি

কুলকায়েনাতের প্রতি লক্ষ করা ও তাকে নিয়ে ভাবার দুটি দিক রয়েছে। একটি ইতিবাচক, অপরটি নেতিবাচক। এই ভিত্তির ওপর নির্ভর করে বলা যায়, মানুষের জীবন যাপনেরও দুটি দিক বা পদ্ধতি রয়েছে। ইতিবাচক জীবনপদ্ধতি ও নেতিবাচক জীবনপদ্ধতি। প্রতিটি মানুষের মাঝেই ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভাবনা রয়েছে। জীবন যাপনে নানা লেনদেনের ক্ষেত্রে কেউ ইতিবাচক মনোভাবের দরুন ইতিবাচক দিকেই লক্ষ রাখে। পক্ষান্তরে আরেকজন নেতিবাচক মনোভাবের দরুন নেতিবাচক দিকেই নজর দিয়ে থাকে। পার্থক্য এতুটুক যে, ইতিবাচক মনোভাব পোষণকারী ব্যক্তি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে এর সুফল ভোগ করে। আর নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ব্যক্তিকে নেতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে চরম খেসারত দিতে হয়।

এক ইংরেজী লেখকের উক্তি হলো :

The life is ten percent how to make it, and minty percent how to take it

অর্থাৎ– মানুষ তার জীবনের ১০% কেবল চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে গঠন করে। অবশিষ্ট ৯০% সে সমাজ ও পরিবেশ থেকে গ্রহণ করে। এখন প্রশ্ন হলো, মানুষ সমাজ ও পরিবেশ থেকে ৯০ ভাগ কীভাবে গ্রহণ করে? এটা সম্পূর্ণরূপে তার মনোভাবের ওপর নির্ভর করে। সে চাইলে ইতিবাচক

মনোভাবের মাধ্যমে বিভিন্ন লেনদেনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে উপকৃত হতে পারে অথবা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির দরুন ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে।

একটি সংশয়ের নিরসন

এখন কারো মনে যদি প্রশ্ন জাগে, ইতিবাচক মনোভাব যেমন আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি, নেতিবাচক মনোভাবও তো আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন; তাহলে মানুষের দোষ কোথায়? এর জবাব হলো, লোকটি মূলত জ্ঞানের স্বল্পতার দরুন সৃষ্টির ব্যবস্থাপনার স্বভাবগত নিয়মাবলি সম্পর্কে অনবগত। যেন সে এমন প্রশ্নই করেছে যে, আল্লাহ তা'আলা দিন তৈরি করেছেন। দিনের বেশ উপকারিতা রয়েছে। কেননা, দিনের বেলা অনেক কাজ সম্পাদন করা যায়; তাহলে রাত সৃষ্টি করার কী প্রয়োজন ছিল? কারণ, এতে তো ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে মানবজীবনের অর্ধেকই নষ্ট হয়ে যায়। রাত সৃষ্টি না হলে তো আর মানবজীবনের এতগুলো সময় বিনষ্ট হতো না। এমন ব্যক্তি যেন এ প্রশ্নই করছে যে, আল্লাহ তা'আলা ছুরির মধ্যে ফল কাটার যোগ্যতা দান করেছেন; এটা তো উপকারী, কিন্তু মানুষের গর্দান কাটার যোগ্যতা কেন দেওয়া হলো? ছুরিকে এই যোগ্যতা প্রদান না করলে তো আর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হতো না। এক্ষেত্রে আরবি একটি প্রবাদ মাথায় রাখতে হবে–

تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا

'যেকোনো বস্তুকে তার বিপরীত বস্তু দ্বারা চেনা যায়।'

যেমন– রাতের কারণে দিন চেনা যায়। যদি রাতের অস্তিত্ব না থাকত, কেবল দিন আর দিনই থাকত, তাহলে কেউ বলত না, এখন দিন। ভালোবাসার পরিচয় ঘৃণার কারণে। ঈমানের পরিচয় কুফরির কারণে। কুফরির অস্তিত্ব না থাকলে সকল মানুষই ঈমানদার ও নেককার হয়ে যেত। ফলে নবীগণকে পৃথিবীতে প্রেরণের কোনো প্রয়োজনই হতো না। নবীগণের বিপরীত হলো শয়তান। তাহলে বলা যায়, ঈমান ও ইসলামের বিজয়ের সংরক্ষক হলেন নবীগণ। আর কুফরির সংরক্ষক হলো শয়তান। আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত ইরশাদ করেন 'আমি প্রতিটি জিনিস জোড়ায়-জোড়ায় তৈরি করেছি। আর বাস্তবতাও হলো, প্রতিটি জিনিস জোড়ায়-জোড়ায় হওয়া সৃষ্টির ব্যবস্থাপনার মূলনীতি।

আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি

এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করেই আজ বিজ্ঞান গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। এই মূলনীতি যেন আধুনিক বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। কম্পিউটার – যা বর্তমান যুগের নতুন ও অতি উপকারী আবিষ্কার – এর সব Function (কাজ) দুটি Bits এর ওপর নির্ভরশীল। শূন্য আর এক। এটিও তো একটি জোড়া। বরং আধুনিক কালের বিজ্ঞানীরা শত-শত বছরের গবেষণা এবং হাজার-হাজার অভিজ্ঞতার আলোকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, Matter (মূল ধাতু) একটি বস্তু। তারও একটি জোড়া থাকতে হবে। তারা এ জোড়ার নাম দিয়েছে Anti Matter. এখন তারা উক্ত Anti Matter এর অনুসন্ধানে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

বস্তু অপেক্ষা রূহ শ্রেষ্ঠ

রূহের মোকাবেলায় বস্তুর কী মূল্য আছে? বস্তুর খামির মাটি হতে আর রূহের খামির আকাশেরও উপরে অবস্থিত রূহজগত থেকে। আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত ইরশাদ করেন :

وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ

'আর আমি তাতে রূহ ফুঁকে দিয়েছি।'[১]

বস্তুর জন্য কোনো একটি স্থান আবশ্যক। কিন্তু রূহের জন্য কোনো স্থানের প্রয়োজন নেই। কোনো জিনিসের সাথে সংঘর্ষের ফলে বস্তুর গতি থেমে যায়। অথচ রূহ আকাশকেও ছাড়িয়ে চলে যায়। বস্তুকে উপরের দিকে নিক্ষেপের ফলে Gravity (মধ্যাকর্ষণের) কারণে নিচের দিকে ফিরে আসে। কিন্তু রূহ যখন আল্লাহ তা'আলার আরশের দিকে উড়ে যায়, তখন কয়েক হাজার বছরের উচ্চতাকেও অতিক্রম করে চলে যায়। বস্তুবাদের অশ্বারোহীদের মেরাজ (আকাশভ্রমণ) হলো, তারা শত-শত বছর সাধনা ও গবেষণা করে চন্দ্র, বৃহস্পতি ও মঙ্গলগ্রহ পর্যন্ত পৌঁছেছে অতি কষ্টে। অথচ আধ্যাত্মিকতার শীর্ষ অশ্বারোহী মানবকুলের সেরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেরাজ হলো, তিনি মহান প্রভুর এতই কাছাকাছি পৌঁছেছেন, যেমন পাশাপাশি অবস্থানে তির ও কামান থাকে। ছায়াপথ আর সুরাইয়্যা নবীজির পায়ের ধূলির সমান।

---

১. সূরা ছোয়াদ : আয়াত ৭২

نازاں جس پہ حسن ہے وہ حسن رسول ہے

یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے

'যে সৌন্দর্য নিয়ে গর্ব করা সে তো মোর নবীজির

এসব ছায়াপথ তো তাঁর পদধূলি সমমানের।'

বস্তুবাদ হলো, মানুষ কোটি-কোটি ডলার ব্যয় করে চাঁদে গিয়ে পৌঁছেছে। আর আধ্যাত্মিকতা হলো, বিশ্বনবীর আঙুলের ইশারায় চাঁদ দিখণ্ডিত হয়। বস্তুজগতের পোপ বলেন Water maintain its surface, পানি ভূ-পৃষ্ঠকে নিয়ন্ত্রণ করে স্থির রাখে। অথচ আধ্যাত্মিকার ময়দানে হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠির একটিমাত্র আঘাত বিদ্রোহী তুফানগতির ঢেউকেও এক পাশে গুটিয়ে রেখে ১২টি রাস্তা বানিয়ে দেয়।

ভাবনার দুটি দিক

চিন্তা-ভাবনার দুটি দিক নিয়ে আলোচনা চলছিল। ইতিবাচক ভাবনা অন্তরে খুশি ও আনন্দ সৃষ্টি করে। আর নেতিবাচক ভাবনা কষ্টের কারণ হয়। উদাহরণস্বরূপ বলি, দুজন কবি বাগানে প্রবেশ করলেন। তাদের একজন ছিলেন প্রফুল্ল আর অপর জন ছিলেন বিষণ্ন। একটি ফুটন্ত ফুলের ওপর তাদের উভয়ের দৃষ্টি পড়ল। কবিরা বেশ অনুভূশীল হন এবং Nature (স্বভাব) কে নিয়ে তারা Study (অধ্যয়ন) করেন। দুজনেই ফুলটি নিয়ে আপন-আপন অভিব্যক্তি প্রকাশ করলেন। বিষণ্ন ব্যক্তি ফুটন্ত ফুলটি দেখে বললেন, এই মজলুম ফুলটিকে কেউ আহত করে দিয়েছে। দেখুন, এরও বক্ষ আমার মতো বিদারিত! এক ব্যক্তির ভাষায়–

آ ملے ہیں سینہ چاکان چمن سے سینہ چاک

'বক্ষ বিদারিত ব্যক্তি বক্ষ বিদারিত ফুলের সাথে এসে একত্রিত হয়েছে।'

দ্বিতীয় কবি বললেন, এই ফুলটিও আমার মতো আনন্দিত এবং হাসছে। দেখুন-না এ কীভাবে ফুটে রয়েছে!

এক বক্তা বলেন :

یہ سن کر کلی نے تبسم کیا

'কথাটি শুনে ফুলকলিটি হেসে উঠল।'

ভেবে দেখুন, একই ফুল; অথচ দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন হওয়ায় অভিব্যক্তিও ভিন্ন হয়েছে।

কোনো এক জেলখানার দুজন কয়েদি জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। একজনের দৃষ্টি কাদার ওপর আর অপরজনের দৃষ্টি ফুলের ওপর গিয়ে পড়ল। যার দৃষ্টি কাদার ওপর পড়ল, সে ভাবতে লাগল, বাইরে তো চতুর্দিকে কাদা আর কাদা। আর যার দৃষ্টি ফুলের ওপর গিয়ে পড়ল, সে ভাবল, জেলখানার বাইরে চতুর্দিকে কেবল ফুল আর ফুল। আরে! অনেকে অভিযোগ করে বলে, ফুলের সাথে কাঁটাও থাকে। আমি কৃতজ্ঞতার সাথে বলি, কাঁটার সাথে ফুলও থাকে।

টেবিলের ওপর আধা গ্লাস পানি রাখা আছে। দুজন ব্যক্তি গ্লাসটা দেখল। একজন বলল, গ্লাসটার অর্ধেক খালি। অপরজন বলল, আলহামদুলিল্লাহ গ্লাসটার অর্ধেক ভরা।

প্রমাণিত হলো, ভাবনার দুটি দিক রয়েছে। ইতিবাচক ভাবনা কঠিন পেরেশানিকেও সহজ করে দেয়। আর নেতিবাচক ভাবনা সাধারণ পেরেশানিকেও কঠিনতর করে তোলে। এ কারণে মানুষ দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ইতিবাচক মনোভাবের অধিকারী ব্যক্তি নানাবিধ পরিস্থিতির মোকাবেলা করে সামনে এগিয়ে যায় আর নেতিবাচক মনোভাবধারী ব্যক্তি যেন অবস্থাদির মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং মানবেতর জীবন যাপন করে। Some people Drive The Situation and som are drive by situation (কিছুলোক আছে এমন, যারা অবস্থাকে পরিচালনা করে আর কিছু লোক এমন যারা অবস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়।)

মতামতের ভিন্নতা

অনেক সময় মানুষের মাঝে মতামতগত ভিন্নতাও দেখা যায়। আমরা তো মতামতগত পার্থক্যকে শত্রুতা মনে করি। অথচ আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি মানুষকেই ভিন্ন-ভিন্ন মন ও মস্তিষ্ক দান করেছেন। ফলে প্রত্যেকের মনোভাব ও চিন্তাচেতনা ভিন্ন হয়। প্রত্যেকেই আপন-আপন ভঙ্গিতে ভাবে ও বলে। মতামতগত পার্থক্য কেবল স্বভাবজাত বিষয়ই নয়, আল্লাহপ্রদত্ত একটি নেয়ামতও বটে। কারণ, যখন বিভিন্ন মতামত সৃষ্টি হবে, তখন লেনদেনের কতগুলো নকশাও তার সামনে এসে দাঁড়াবে। ফলে সে যেকোনো ভালো সমাধান নির্বাচন করতে সক্ষম হবে। পরামর্শ করা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের একটি স্বতন্ত্র সুন্নাত। আর মতামতের ভিন্নতাই হলো এর প্রাণ। পরামর্শের ক্ষেত্রে অনেকগুলো মেধা একত্র হয়। প্রতিটি মেধা-ই ভিন্ন আঙ্গিকে বিষয়টিকে অনুধাবন করে পরামর্শ প্রদান করে। ফলে লেনদেনের অনেক গোপন দিকও জনসম্মুখে বেরিয়ে আসে।

প্লানিংয়ের ক্ষেত্রে উক্ত দিককে Alternatives নামে অভিহিত করা হয়। ইঞ্জিনিয়ার ও ম্যানেজাররা যখন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পরামর্শ করতে বসেন, তখন তারা বিষয়টির ধরন ও প্রাসঙ্গিক অবস্থাদি মাথায় রেখেই পরামর্শ করেন। কাজেই যত বেশি মেধা একত্র হবে, তত বেশি সমাধানও ভিন্ন-ভিন্ন রূপরেখা সামনে উপস্থিত হবে। যেমন– মনে করুন, দশজন ব্যক্তি পরামর্শ করতে বসল। প্রত্যেকে ভিন্ন-ভিন্ন মতামত ব্যক্ত করল, তখন এগুলোর মধ্য থেকে তিন-চারটি ভালো মতামত বাছাই করা হয়। তারপর এই মতামতগুলোর আনুষঙ্গিক অবস্থাদি সামনে রেখে একটিকে অপরটির সাথে তুলনা করা হয়। তারপর সর্বশ্রেষ্ঠ মতামতটি নির্বাচন করা হয়। যার মনোলোভা ফলাফল বেরিয়ে আসে।

মোটকথা, মতামতের ভিন্নতা উপকারী বিষয়।

মতামতগত ভিন্নতার কতিপয় দৃষ্টান্ত

এক ভাই বলল, এখনই ঘর তৈরি করতে হবে। অন্য ভাই বলল, দুই মাস অপেক্ষা করে তৈরি করব। এটা হলো মতামতের ভিন্নতা। তবে একে শত্রুতায় পরিণত করা নিছক বোকামি। কারণ, প্রত্যেকের ভাবনায় পার্থক্য থাকায় উভয়েই নিজ-নিজ মতামত ব্যক্ত করেছে। একজনের দৃষ্টিতে ঘর নির্মাণ করা সহজ মনে হয়েছে, পক্ষান্তরে অপর জন তার দৃষ্টিভঙ্গিতে কঠিন মনে করেছে।

স্ত্রী মেয়েকে এক জায়গায় বিবাহ দিতে চায় আর স্বামী অন্য জায়গায়। আত্মীয়দের মাঝে আত্মীয়তা করতে চায়। প্রায়শই দেখা যায়, এ বিষয়টি নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হয়, যা সংসারে তিক্ততার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অথচ বিষয়টি কেবল মতামতের ভিন্নতা। যদি তারা ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে একে অপরকে বোঝানোর চেষ্টা করে, তাহলে বিষয়টি অতি সহজেই সমাধা হতে পারে এবং যে মতামতটি সর্বশ্রেষ্ঠ, সেই মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

জীবনযাত্রার সর্বশ্রেষ্ঠ নীতিমালা

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়ে ঝগড়া-বিবাদ পর্যন্ত হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে উভয়ে যদি সত্যাশ্রয়ী হয় এবং ঈমানদারির সাথে একটু ভাবে যে, তাদের মধ্যে কে সত্য ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাহলে নিঃসন্দেহে একজনই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে—দুইজন নয়। তখন যে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সে হিম্মত করে নীরবতা অবলম্বন করবে এবং অপরজনের তিক্ত ও বিস্বাদ আচরণ ধৈর্য ও সহ্যের সাথে মেনে নিবে। কোনো প্রকার প্রতি উত্তর করবে না। তখন সে অন্যের ধৈর্য-সহ্যের প্রতি লক্ষ করে দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যাবে এবং বিবাদ সামনে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ থাকবে না। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পুনরায় দুজনে দুধ-চিনিতে পরিণত হবে। কাজেই স্বামীকে স্ত্রীর মাঝে পূর্ব থেকেই এমন মনোভাব তৈরি করতে হবে যে, কখনো এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে উভয়ে চিন্তাভাবনা করে দেখবে, কারটা সঠিক আর কারটা ভুল।

বউ-শাশুড়ি বিবাদের সর্বোত্তম সমাধান

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বিবাদ সাধারণত বউ-শাশুড়ির কারণেই সৃষ্টি হয়। এ জাতীয় ঝগড়া-বিবাদের ভালো সামাধান রয়েছে। এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে বউ-শাশুড়িকেন্দ্রিক বিবাদ সৃষ্টি হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। পদ্ধতিটি হলো, স্বামী-স্ত্রী প্রথম থেকেই সমঝোতা করে নিবে। স্বামী তার স্ত্রীর মাতাপিতার খেদমত করবে, তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ রাখবে এবং স্ত্রী তার স্বামীর মাতাপিতার খেদমত করবে এবং তাদের প্রয়োজন পূরণে সদা প্রস্তুত থাকবে। অর্থ্যাৎ— দুজনই আপন-আপন শশুর-শাশুড়ির খেদমত ও সহযোগিতার জন্য সদা প্রস্তুত থাকবে। এ ছাড়া একটি হাদীছের বিষয়বস্তুও ঠিক এমনি যে, বিয়ের আগে পিতা একজন, মাতা একজন আর বিয়ের পর পিতা দুজন, মাতাও দুজন। অর্থাৎ— শশুর শাশুড়ীর অধিকার আপন পিতামাতারই মতো।

আমার নিজের একটি ঘটনা

আমার কাছে এক মহিলা এল। মনে হচ্ছিল, বেশ শিক্ষিত। সম্ভবত এম.এ. পাশ করেছে। পর্দার আড়াল থেকে কথা বলল। সে তার শাশুড়ির নামে অনেক বদনাম ও অভিযোগ করল যে, কথায়-কথায় ভর্ৎসনা করে।

মোটকথা, মহিলা খুব কান্নাকাটি করল এবং শাশুড়ির নামে অনেক অভিযোগ করল। প্রায় আধা ঘণ্টা যাবত অভিযোগ করতে থাকল। আবার এ-ও বলল যে, আমার স্বামী খুবই ভালো মানুষ। অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করেন।

মহিলার স্বামীর একটি কারখানা আছে। বেশ স্বচ্ছল পরিবার। গাড়ি-বাড়ি সবই আছে। শুধু শাশুড়ির কারণেই অশান্তি, পেরেশানি ভোগ করছে। সে যখন তার স্বামীর বেশ সুনাম করল এবং তার ব্যাপারে কোনো অভিযোগ নেই, তখন আমি তাকে একটি প্রশ্ন করলাম, আপনার কাছে স্বামী ও তার সংসার কি ভালো লাগছে? বলল, জি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই পরিবারে তোমার বিবাহ কীভাবে হয়েছে? সে বলল, আমার শাশুড়ি আমাদের বাসায় এসে আমাকে দেখে পছন্দ করেছেন এবং তিনিই ছেলেকে বিবাহ করান।

এবার আমি বললাম, তাহলে তিনি তো তোমার ওপর বিরাট অনুগ্রহ করেছেন। তোমাকে তিনি এমন একটি পরিবারে নিয়ে এলেন, যেখানে তুমি ভালো স্বামী পেয়েছ। তার এই অবদান ও অনুগ্রহের জন্য তোমার উচিত আজীবন তার কৃতজ্ঞ থাকা। তারপরও অভিযোগ কেন? আমি বললাম, এত বড় অবদানের তুলনায় তোমার অভিযোগগুলো কেমন? সে বলল, হুজুর! আপনি আমার সকল সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। এই অবদানের তুলনায় এসব অভিযোগ সত্যিই বেমানান।

এক ইঞ্জিনিয়ার ও তার পুত্রের চিন্তা

প্রত্যেকের চিন্তা-ভাবনার ভঙ্গি ভিন্ন হয়। এক ইঞ্জিনিয়ারের একটিমাত্র পুত্র ছিল। একদিন তিনি ঘরে বসে ইমারতের নকশা তৈরি করছিলেন। পাশেই বসা ছিল তার একমাত্র শিশুপুত্র। জিনিস-পত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করায় তার কাজে খুব ব্যাঘাত হচ্ছিল। তিনি বাচ্চাটাকে দূরে সরাতে চাইলে সে জিদ ধরল। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ছিলেন নম্রচিত্তের অধিকারী মানুষ। শিশুটাকে মারধর করে কিংবা কঠোরতা করে দূরে সরাতেও পছন্দ করছেন না। বাচ্চাটাকে কোনো কাজে মগ্ন করার চমৎকার একটা বুদ্ধি তার মাথায় এল। তার কাছে পত্রিকার একটা বড় পৃষ্ঠা ছিল, যাতে বিশ্বমানচিত্র আঁকা ছিল।

তিনি কাগজটাকে কয়েক টুকরা করে বাচ্চার হাতে দিয়ে বললেন, তুমি এই মানচিত্রটা সুন্দর করে মিলিয়ে দিতে পারলে তোমাকে ১০ টাকা পুরস্কার দেব। তিনি ভাবলেন, এখন তো সে অন্তত দু-তিন ঘণ্টা এই কাজে ব্যস্ত থাকবে। দশ টাকা পুরস্কারের কথা শুনে ছেলেটা বেশ পুলকিত হলো। সে

পত্রিকার টুকরাগুলো নিয়ে অন্য কামরায় চলে গেল। এ দিকে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব প্রশান্ত চিত্তে কাজে লেগে গেলেন। আনুমানিক ১৫ মিনিট পর মানচিত্রটা সুন্দর করে মিলিয়ে নিয়ে এল। পিতা খুব অবাক হলেন যে, নকশাটা মিলানো তো বেশ কঠিন কাজ ছিল! পুত্র কীভাবে তা মিলিয়ে দিল? পুত্র মুচকি হেসে পত্রিকাটা উল্টে দিল। অপর পিঠে এক মহিলার ছবি ছিল। ছেলেটা মহিলার ছবিটা অনুসরণ করে টুকরাগুলো মিলিয়ে দিল। ফলে মানচিত্র এমনিতেই ঠিক হয়ে গেল।

ভেবে দেখুন, কাজটা পিতার দৃষ্টিভঙ্গিতে বেশ কঠিন ছিল। অথচ পুত্রের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ফলে তা একেবারেই সহজ হয়ে গেল।

কারী সাহেবগণের খেদমতে কয়েকটি সংস্কারমূলক পরামর্শ

একজন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তো সুকৌশলে বাচ্চাকে ভিন্ন কাজে লাগিয়ে দিলেন; বাচ্চার প্রতি কোনো ধরনের কঠোরতা করলেন না। অথচ আমাদের কারী সাহেবগণ বাচ্চাদের খুব মারপিট করেন। তারা বাচ্চাদের প্রতি জুলুম করেন। কেয়ামত দিবসে তারা এ ব্যাপারে প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন। প্রহারকারী জালেম আর প্রহৃত শিশুটি মজলুম। কেয়ামত দিবসে উভয়কে জালেম ও মজলুম হিসেবে পেশ করা হবে। শরীয়তে এভাবে প্রহার করার আদৌ কোনো অনুমতি নেই। আমি বড়-বড় ওলামা মুফতিয়ানে কেরামের কাছ থেকে বিষয়টি তাহকীক করেছি।

তবে শরীয়তের বক্তব্য হলো, কোনো কারণে শিশুকে শাস্তি দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়লে মধ্যম ধরনের তিনটা চড় দেওয়া যেতে পারে। তিনের বেশি নয়। তাও আবার চেহারা ব্যতীত অন্য কোনো অঙ্গে। কারণ, চেহারায় প্রহার করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অথচ আমরা সামান্য ভুলের কারণে লাঠিপেটা শুরু করি। মাথায় লাগল, নাকি নাকে লাগল সেদিকে মোটেও ভ্রূক্ষেপ করি না। হে আল্লাহর বান্দা! সে তো একটা শিশু। আপনারা কি ভুল করেন না? যদি এই কারী সাহেবের কাছ থেকে ওই পারাটি শোনা হয়, তাহলে তিনিও ১০টা ভুল করবেন।

বাচ্চাটা তো ভুলই করেছে – চুরি তো আর করেনি বা এমন কোনো অপরাধ তো করেনি, যে তাকে এ পরিমাণ শাস্তি দিতে হবে। এভাবে শিশুর জীবন গঠনের পরিবর্তে নষ্ট হয়। দীন ও দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কারী সাহেব তো ভাবছেন, তিনি ভালো কাজ করছেন এবং

কাজটি অশেষ ছাওয়াবের; অথচ এটা গুনাহের কাজ। আখেরাতে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে। যারা বাচ্চাদের পেটায়, তারা মূলত ব্যক্তিগত ক্ষোভের কারণেই পেটায়। সে যেন নিজের ব্যর্থতা ও অপারগতা স্বীকার করে নিয়েই পেটায় যে, আমি এই বাচ্চাকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছি, ভালোভাবে শেখাতে অক্ষম হয়েছি। তবে তাদের একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, বাচ্চাদের হাড়-গোড় ভেঙ্গে দেওয়ার অনুমতি শরীয়ত আদৌ কখনো দেয়নি।

বন্ধুগণ! বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো, তাদেরকে ধীরে-ধীরে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে পড়ালেখার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে হবে। শিশুদের আত্মা নিস্পাপ। ভালো-ভালো কথা খুব দ্রুত তাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে। আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে পড়ালেখা করতে থাকে। একেই বলে মনোভাব তৈরি করা। শিশুদের মনোভাব তৈরি করাও একটি স্বতন্ত্র কাজ। এতে শিশুদের মেধার বিকাশ ঘটে এবং পরিণাম বেশ ভালো হয়। কিন্তু কথায়-কথায় ধমক দেওয়া, যেকোনো সাধারণ ভুলে শাস্তি দেওয়া নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। এভাবে শিশুরা ধীরে-ধীরে মারধর ও ধমকে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং পড়ালেখা থেকে মন ফিরিয়ে নেয়। কারণ, সে শিক্ষকের মারধর ও ধমককে বাধ্যতামূলক মনে করে নিয়েছে।

এ ধরনের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির আরেকটা বড় ক্ষতি হলো, শিশুদের অন্তরে শিক্ষকের ভক্তি-শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে যায়; বরং শিক্ষকের প্রতি তাদের শত্রুতা, ঘৃণা ও আতঙ্কভাব তৈরি হয়। এ বিষয়গুলো ধীরে-ধীরে মজবুত হয়ে একদিন শিশুটাকে বিদ্রোহী বানিয়ে দেয়। পরিণত বয়সে উপনীত হয়ে সে মসজিদ, মাদরাসা ও মৌলভী সাহেবদের ঘৃণা করে। তারপর নেক আমলশূন্য হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।

এবার দেখুন তো, কত বড় দুঃখজনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। এই সবকিছুর দায়ভার মসজিদের কারী সাহেব ও মাদরাসার শিক্ষককেই বহন করতে হবে। ভুল-ভ্রান্তি একটা স্বভাবগত ব্যাপার। নবীগণ থেকে কি কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি সংগঠিত হয়নি? অথচ তাঁরা হলেন মানবতার সর্বশীর্ষে। এর কারণ হলো, ভুল-ভ্রান্তি তো আদম (আ.)-এর খামিরের মধ্যেই বিদ্যমান, যা কল্যাণজনক জিনিস। তবে শর্ত হলো, তাকে সংগত উপায়ে সংশোধন করে দিতে হবে। ভুল-ভ্রান্তির ব্যাপারে এমন মনোভাবই হলো ইতিবাচক।

পক্ষান্তরে ভুলভ্রান্তির জন্য রেগে লাল, পীতবর্ণ হয়ে শাস্তি প্রদান করা নেতিবাচক মনোভাব। শাস্তি যদি একান্ত দিতেই হয়, ব্যথ্যা ও আঘাতমূলক

শাস্তির পরিবর্তে ক্লান্তিবোধক শাস্তি প্রদান করতে হবে। যেমন– অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা। দুহাত উপরের দিকে তুলে রাখা। এক পা ওপর দিকে তুলে রাখা। হাতে সামান্য ওজনের কোনো কিছু তুলে দিয়ে উভয় বাহুকে সমান্তরাল করে রাখা ইত্যাদি। এর আরো একটি পদ্ধতি হলো, ভুল-ভ্রান্তির দরুন শাস্তি না দিয়ে ভালো পড়াশোনা করলে তাকে পুরস্কার প্রদান করা, যাতে অন্য শিশুরাও আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে সবক মুখস্থ করে। প্রসঙ্গত আরেকটি কথা বলে রাখি। সেটি হলো, কোনো-কোনো মাদরাসায় শিক্ষকরা ছাত্রদের সাথে কথা বলতে একেবারেই অসতর্ক থাকেন। বিনা কারণেই কোনো কোনো বাচ্চাকে শয়তান, খবিশ, শূকর, বদমাশ ইত্যাদি নামে ডাকে। এমনকি আরো মন্দ নামেও ডাকে। আবার কোনো-কোনো বাচ্চাকে তাদের আসল নাম বিকৃত করে ডাকে। অথচ তার পদমর্যাদা ও অবস্থান হিসেবে এটা একেবারেই বেমানান। তাছাড়াও আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ

'তোমরা পরস্পরকে মন্দ উপাধি দ্বারা ডেকো না।'[১]

কাজেই তাদেরকে মনে রাখতে হবে, যে শিশুদের আজ আমরা এভাবে শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করছি, অদূর ভবিষ্যতে তারাও ওস্তাদ হবে এবং তাদের ছাত্রদের সাথে কথা বলতে গিয়ে এমন নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকেই আপন করে নিবে। তখন অপরাধ কার হবে? আল্লাহর মেহমানদের সাথে এরূপ আচরণ করে নিজের আখেরাতকে নষ্ট করবে না।

বাস্তব জীবনে মনোভাবের প্রভাব

সারা পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এইমর্মে একটি জরিপ চালিয়েছে যে, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্ররা কেমন মনোভাবধারী হয়। কয়েকভাবে Analyze (পর্যবেক্ষণ) করা হয়েছে এবং বিভিন্ন দিক নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে সকলের মাঝে একটি বিষয় Common পাওয়া গেছে যে, প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্ররা ইতিবাচক মনোভাবের অধিকারী হয়। একারণে তাদের মাঝে Confidence (প্রশান্তি-স্থিরতা)ও বেশি ছিল। বাস্তবতা হলো, মনোভাব যদি Positive (ইতিবাচক) হয়, তাহলে মানুষের দেহের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ঠিকভাবে কাজ করে। কেননা, মানুষের মনোভাব Internal

---

১. সূরা হুজুরাত : আয়াত ১১

System (অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা)কে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের মনোভাব যদি Negative (নেতিবাচক) হয়, তাহলে অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাও ভুল পথে পরিচালিত হয়। কারণ, মানুষের মস্তিষ্ক দেহটাকে পরিচালনার ক্ষেত্রে Head Controller (প্রধান নিয়ন্ত্রক)-এর ভূমিকা পালন করে।

মানবমস্তিষ্ক অত্যন্ত প্যাঁচানো (Nervous System)। এর মাধ্যমে দেহের অন্যান্য শৃঙ্খলাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আর এসব শৃঙ্খলা অত্যন্ত অনুভূতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল, যার দরুন মনোভাবের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক অতি সহজেই Internal Systerm (অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা)কে প্রভাবিত করে। শুধু মনোভাব পরিবর্তনের ফলে অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা একেবারেই বদলে যায়। উদাহরণস্বরূপ যদি একটা বিড়ালকে কামরা থেকে হটানোর ইচ্ছা হয় এবং দরজাও খোলা থাকে, তাহলে সহজেই বিড়ালটা বেরিয়ে যাবে। আর যদি দরজা বন্ধ করে দিয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন, তাহলে সে অস্থির হয়ে ছোটাছুটি করবে এবং আক্রমণ করে বসবে। কেন? কারণ, অবস্থার প্রেক্ষিতে তার মনোভাব পাল্টে গেছে। নতুন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য সে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছে এবং লড়াইয়ের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে গেছে। যে বিড়ালটা সাধারণ কোনো শব্দ বা নড়াচড়ার দরুন ভয়ে পালিয়ে যেত এখন শুধু মনোভাব পাল্টে যাওয়ায় নিজের তুলনায় হাজার-হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী মানুষের সাথে মোকাবেলা করতে প্রস্তুত হয়ে গেছে।

বর্তমানে ছাত্ররা পরীক্ষার জন্য কেন প্রস্তুতি গ্রহণ করে না? অথচ হাতে সময় আছে, শরীর সুস্থ, মেধা ভালো। তারপরও পড়তে মনে চায় না। মন চায় না কেন? কারণ, মনোভাব নেতিবাচক হয়ে গেছে। ফলে তারা মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে পারে না। এভাবে অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার অবনতির ফলে মানুষের মধ্যকার Will power (ইচ্ছাশক্তি) অবশিষ্ট থাকে না। এটা আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় নয়।

এক হাদীছের বিষয়বস্তু এমন যে, আল্লাহ উঁচু হিম্মতের অধিকারী ব্যক্তিকে পছন্দ করেন। উঁচু হিম্মতধারী ব্যক্তিরাই জীবনে সফল হয়। কারণ, আল্লাহর সাহায্য তাদের সঙ্গী হয়ে যায়। আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন, যে নিজে নিজের সাহায্য করে। এতে প্রমাণিত হলো, জীবনে সাফল্যের জন্য এবং সৎ উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি অপরিহার্য। উচ্চমানের এসব গুণ অর্জন করতে ইতিবাচক মনোভাব একান্ত জরুরি। নেতিবাচক মনোভাব নিয়ে এই গুণাবলির সমন্বয় সাধন দুরূহ ব্যাপার।

এক মুষ্ঠিযোদ্ধার দৃষ্টান্ত

মেক টাইসন পৃথিবীবিখ্যাত একজন মুষ্ঠিযোদ্ধা ছিলেন। কোনো এক মামলায় জড়িয়ে পড়ায় কারারুদ্ধ ছিলেন। জেলখানায় নিয়মিতভাবে প্র্যাক্টিস করার সুযোগ পাননি। তারপরও তিনি কোনো-না-কোনো উপায়ে প্র্যাক্টিস চালু রাখলেন এবং অবস্থান ঠিক রাখলেন। এ সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তার নাম রাখা হয় আব্দুল আযীয। তিনি যখন কারামুক্ত হয়ে এলেন, তখন তদানীন্তন কালের চ্যাম্পিয়ন মুষ্ঠিযোদ্ধা তাকে চ্যালেঞ্জ করলেন। তিনি তা গ্রহণ করলেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই পত্রিকায় উভয়ের সাক্ষাৎকার ছাপা হলো। বিদেশ সফরকালে আমি তাদের সাক্ষাৎকারগুলো পড়েছি। প্রতিপক্ষ মুষ্ঠিযোদ্ধা দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দিল যে, আমি তার নাক উড়িয়ে দেব, বাহু ভেঙে দেব এবং তাকে এত অধিক পরিমাণে প্রহার করব যে, ষষ্ঠ দিনের দুধের কথা স্মরণ হবে। আর তারা যখন মেক টাইসন (আব্দুল আযীয)-এর সাক্ষাৎ কার নিল, তিনি কেবল একটি কথা-ই বললেন, 'ও তো একটা পেপে'। তিনি কেবল একটি উত্তরই দিলেন এবং নিজের প্রস্তুতিকে চিন্তামুক্ত রাখলেন। বাস্তবেই দেখা গেল, টাইসন তার প্রতিপক্ষকে দু-তিন মিনিটেই ধরাশায়ী করে দিলেন।

হযরত দাউদ (আ.)-এর হৃদয়গ্রাহী ঘটনা

বাইবেলে একটি ঘটনা আছে, যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ কুরআন শরীফেও উল্লেখিত হয়েছে। হযরত দাউদ (আ.) ও হযরত তালুত (আ.) তৎকালীন বাদশাহ জালুতের সাথে যুদ্ধ করতে গেলেন। জালুত বিশাল দেহধারী ও প্রচুর শক্তিশালী ছিল। তার মুখাবয়ব এমন ছিল যে, দেখামাত্রই ভীতি সঞ্চারিত হতো। তালুত বার্ধক্যপীড়িত ছিলেন আর হযরত দাউদ (আ.) ছিলেন তরুণ। উভয়ে যখন জালুতকে দেখলেন, তখন হযরত তালুত বললেন, একে হত্যা করা দুঃসাধ্য। কারণ, এ অনেক বড়। আমরা এর সঙ্গে পেরে উঠব না। হযরত দাউদ (আ.) বললেন, একে হত্যা করা খুবই সহজ হবে। কেননা, এ অনেক বড়। ফলে আমার টার্গেট মিস হবে না। বাস্তবেও এমনই হলো। হযরত দাউদ (আ.) পাথর দ্বারা জালুতের কপালে আঘাত করলেন এবং তাকে হত্যা করলেন। তাহলে বোঝা গেল, কেউ দৃঢ় মনোবল নিয়ে কাজ করলে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন।

ইতিবাচক মনোভাবেই রয়েছে হিতকামনা

সকলেরই মনোভাব ইতিবাচক হওয়া চাই। এতে নিজের ও অন্যের উপকার নিহিত রয়েছে। কেননা, ইতিবাচক মনোভাবের মাঝেই রয়েছে হিতকামনা।

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ

'দীন হলো হিতকামনা।'[১]

ঈমানদার ব্যক্তি নিজের হিতকামনার পাশাপাশি অন্যদেরও হিতকামী। অন্যদের কল্যাণ কামনা ঈমানের অপরিহার্য অংশ। ঈমানদার ব্যক্তি অন্যের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকে। অকল্যাণ কামনা করা ঈমানের দুর্বলতার লক্ষণ। অকল্যাণকামী ঈমানকে লাঞ্ছিত করে। একব্যক্তি হযরত ঈসা (আ.)কে গালি দিল। উত্তরে তিনি তার জন্য দোআ করলেন। বললেন :

كُلُّ اِنَاءٍ يَتَرَشَّحُ بِمَافِيْهِ

'যে পাত্রে যা থাকে, তা থেকে তা-ই নির্গত হয়।'

তার মধ্যে যা ছিল, তা-ই সে বের করেছে। আর আমার মধ্যে যা ছিল, আমি তা বের করেছি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ইরশাদ করেন :

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ﴿٣٤﴾

' ভালো আর মন্দ কোনোদিনও সমান হতে পারে না। মন্দের মোকাবেলা ভালো দ্বারা করো। মন্দের বদলা যদি ভালো দ্বারা প্রদান করা হয়, তাহলে শত্রুও বন্ধুতে পরিণত হয়।'[২]

উদ্দেশ্য নির্ধারণে ইতিবাচক মনোভাবের ভূমিকা

ইতিবাচক মনোভাব পোষণকারী লোকেরা পৃথিবীতে কিছু করে যেতে পারে। যিকিরকারী ব্যক্তিরা সদা ইতিবাচক মনোভাবের অধিকারী হয়ে থাকেন। আপনিও অন্তরে দৃঢ় সংকল্প করুন, পৃথিবীতে কিছু করে যেতে হবে। দৃঢ় সংকল্পের জন্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হবে, আমাকে এই স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। উদ্দেশ্য নিরূপণ করার দরুন কাজের বিশাল ময়দান হাতে

---

১. ছহীহ মুসলিম : হাদীছ নং ৮২

২. সূরা হামীম : আয়াত ৩৪

আসে। সামনে কোনো উদ্দেশ্য না থাকলে জীবনে সফলতা দুরূহ ব্যাপার। এভাবে চললে তো দুনিয়াতে যেমন এসেছিলে, তেমনই ফিরে যাবে। তবে মনে রাখবে, উদ্দেশ্য নির্ধারণে ইতিবাচক মনোভাব ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি হলো মৌলিক। শত নেতিবাচক মনোভাব নিয়ে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করলে লাভের বদলে লোকসানই হবে। ইতিবাচক মনোভাব ও Will Power (ইচ্ছাশক্তি)র মাধ্যমে অসম্ভব কাজও সম্ভব হয়ে যায়।

এক ইউরোপিয়ান লেখকের চিত্তাকর্ষক উপমা

ইটালির এক ডাক্তার অনেক পরিশ্রমী ছিলেন। তিনি আরবি জানতেন। তিনি আরব বিশ্বের বিভিন্ন পণ্ডিতদের বইগুলো ইটালি ভাষায় অনুবাদ করেছেন। এতে তার সময় ব্যয় হয়েছে মাত্র দুবছর। তারপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তারগণ তার ক্যান্সার হয়েছে বলে চূড়ান্ত করলেন এবং এও বলে দিয়েছেন যে, বড়জোর দুবছর জীবিত থাকবেন। দুবছর পর তার মৃত্যু অনিবার্য। এবার তিনি বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করতে লাগলেন। তার মনে এই বাসনা জাগল, হায়! যদি আমি আরবের অন্যান্য পণ্ডিতদের বইগুলোও নিজের ভাষায় অনুবাদ করে নিতাম! তাহলে তো বেশ উপকার হবে।

তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, কাজটি করতেই হবে। তিনি বিভিন্ন লাইব্রেরী থেকে ডাক্তারি বিষয়ের আরব ডাক্তারদের বহু বই সংগ্রহ করলেন। তারপর যখন এগুলো যাচাই-বাছাই করে গুরুত্বপূর্ণ কিতাবগুলো পৃথক করলেন। বাছাইকৃত বইগুলোর সংখ্যা দাঁড়ালো ৮০ তে। এবার তিনি এগুলোর অনুবাদ করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। অথচ তিনি ঘাতকব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা হলো, তিনি তার মাথার ওপর মৃত্যুকে ঘুরপাক খেতে দেখতে পাচ্ছিলেন। এতদ্‌সত্তেও তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আঞ্জাম দিতে পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং তিনি অনুবাদের কাজ আরম্ভও করে দিলেন। প্রতিদিনই সময়স্বল্পতার অনুভূতি তাকে কুরে-কুরে খাচ্ছিল। তারপরও তিনি আপন কাজে মত্ত রইলেন।

আপনি শুনে অবাক হবেন, তিনি পূর্ণ দু-বছর সময়ে ৮০টি বইয়ের অনুবাদ সমাপ্ত করে ফেললেন। বর্তমানে তাকে পৃথিবীর সেরা অনুবাদক গণ্য করা হয় এবং গিনেস বুকে (বিখ্যাত তথ্যভাণ্ডার) তার নাম আজও লেখা রয়েছে। এই সম্মাননা তিনি একারণে লাভ করেছেন যে, তার পিছনে ইতিবাচক মনোভাব কাজ করছিল। সে ভাবল, চলে তো যেতেই হবে; তাহলে দুটি বছর অযথা নষ্ট করব কেন? অবসর না থেকে ব্যস্ত থাকা-ই

শ্রেয়। এক্ষেত্রে তার মাথায় আরেকটি উদ্দেশ্যও কাজ করছিল যে, আরব পণ্ডিতদের এই গুরুত্বপূর্ণ বইগুলো যদি অনূদিত হয়, তাহলে জ্ঞানের একটি বিরাট অংশ ইটালি ভাষায় এসে পড়বে। তার দৃঢ় মনোবল এই অসাধ্য কাজকেও সম্ভব করে দিল।

মৃত্যুর লক্ষণ অনুভব করলে ডাক্তারের কর্তব্য

ইউরোপীয় দেশগুলোতে ডাক্তারগণ মুমূর্ষু রোগীদের মাঝে এভাবে সময়ের অনুভূতি সৃষ্টি করে দেন। অথচ আমাদের Third World (তৃতীয় বিশ্ব) Death Expected (মুমূর্ষু ব্যক্তি)কে আদৌ বলা হয় না, এত দিনের মধ্যে সে মারা যাবে। বরং বিষয়টি তার থেকে গোপন রাখা হয়। এটা উচিৎ নয়। ইউরোপে তো পরিষ্কার ভাষায় বলে দেওয়া হয়, যেন রোগী মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে সক্ষম হয়। কারো সাথে কোনো লেনদেন থাকলে তা সম্পন্ন করে নিতে পারে, পরিবারকে উপদেশ দিতে পারে। এখানেও ডাক্তারদের বলে দেওয়া উচিৎ, যেন সে তাওবা করে ঈমানি হালতে মৃত্যুবরণ করতে পারে। কারণ, একজন মুমিনের বিশ্বাস হলো, পৃথিবী অস্থায়ী নিবাস। একদিন এখান থেকে বিদায় নিতেই হবে। কাজেই বলে দিলে সে অসিয়ত, লেনদেন ইত্যাদি গুছিয়ে নিবে। এতেই বেশি উপকার। এ কারণেই হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, মৃত্যুর সময় কোনো ভালো নেককার ব্যক্তি কাছে থাকা চাই, যেন সে তাকে যিকির-আযকার ইত্যাদির প্রতি উৎসাহ দিতে পারে। তাছাড়াও বয়স যত কম হবে, ততই হিসাব-নিকাশ সহজ ও কম হবে। এ কারণেই হাদীছ শরীফে কোথাও এমন কথা নেই যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়স বৃদ্ধির জন্য দোআ করেছেন। হ্যাঁ; ইল্‌ম বৃদ্ধি, সুস্থতা ইত্যাদির জন্য দোআ করেছেন। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির দোআ করেননি। হয়ত জীবনে দু-একবার বয়সে বরকতের জন্য দোআ করেছেন। হযরত খাজা বায়েযিদ বোস্তামি (রহ.)-এর নিকট কারো মৃত্যুসংবাদ এলে বলতেন :

اچھا ہوا چھوٹ گیا

'ভালো হয়েছে মুক্ত হয়ে গেছে!'

কারণ, দুনিয়া হলো ঈমানদারের জন্য জেলখানা। জেলখানা থেকে মুক্তি লাভ করা আনন্দের বিষয় – চিন্তার বিষয় নয়। যে ব্যক্তি দুনিয়ার জেলখানা থেকে মুক্তি লাভ করে নিজ আসল বাড়ি জান্নাতে পৌঁছে গেল, সে সত্যিই মুক্তি পেল!

দৃঢ় মনোভাব আল্লাহর সাহায্যের মেরুদণ্ড

তবে এই জেলখানা থেকে মুক্তির জন্য দৃঢ় মনোবল রাখতে হবে। দৃঢ় মনোবলের অধিকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন। দৃঢ় মনোভাব পোষণকারীর সাথে সদা আল্লাহর সাহায্য থাকে। বরং আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই দৃঢ় মনোভাবধারী মুমিন বান্দার সাথে থাকেন। যে নিজের সাহায্য করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সাহায্য করেন। মানুষ যখন দৃঢ় মনোবল প্রকাশ করে, তখন বদর প্রান্তরের গুটিকয়েক নিরস্ত্র মানুষও অস্ত্রসজ্জিত বাহিনীকে ধরাশায়ী করে দেয়। হাজার মণ ওজনের একটা দরজা একটামাত্র তিরের একাংশ দ্বারা উপড়ে যায়। তাকবীরের ধ্বনিতে রোম ও পারস্যসম্রাটের সুউচ্চ দুর্গও ভূপাতিত হয়। মর্দে মুজাহিদ যখন আল্লাহর সাহায্য সাথে নিয়ে অগ্রসর হয়, তখন সাগর, মহাসাগর ও পাহাড়সম ঢেউকেও রাস্তা তৈরি করে দিতে হয়। আমার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিপাহীদের জন্য হিংস্র প্রাণীদেরও বন ছেড়ে দিতে হয়েছে। হযরত সুরাহবীল (রাযি.) নামে ছিপছিপে গড়নের এক সাহাবী ছিলেন। কোনো এক যুদ্ধে একটা দুর্গ বেশ কয়েকদিন যাবৎ বিজয় হচ্ছিল না। একদিন এই মর্দে মুজাহিদের ঈমানি স্পৃহা টগবগ করে উঠল। তিনি ঘোড়া হাঁকিয়ে দুর্গটার কাছে গিয়ে সজোরে তিনবার তাকবীর ধ্বনি দিলেন। মুহূর্তেই দুর্গটা ভূপাতিত হয়ে গেল।

এটি ছিল দৃঢ় মনোবল, আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক ও ঈমানি শক্তির কারিশমা, যদ্দরুন মজবুত প্রাসাদ ও অপ্রতিরোধ্য দুর্গ পর্যন্ত মুজাহিদের তাকবীর ধ্বনির সামনে টিকে থাকতে পারেনি। হ্যাঁ; এমন পরিস্থিতি সৃষ্টির পূর্বশর্ত হলো বান্দার ঈমানি শক্তির পাশাপাশি দৃঢ় মনোবল, সদিচ্ছা এবং কঠোর সাধনাও থাকতে হবে।

জীবনের সুযোগ ও সালেকদের কর্তব্য

সালেকের কর্তব্য হলো, দৃঢ় মনোবল নিয়ে কোমর বেঁধে লেগে যাওয়া। তার সামনে তো রয়েছে তার মূল উদ্দেশ্য প্রকৃত প্রেমাস্পদ। প্রকৃত প্রেমাস্পদ যখন সামনে থাকে, তখন জীবন বাজি রেখে হলেও তার কদম পর্যন্ত পৌঁছা যায়। এক্ষেত্রে অলসতা ও কালক্ষেপণের যুক্তিসংগত কোনো কারণই থাকতে পারে না। যেখানে দুনিয়ার ধ্বংসশীল, অস্থায়ী প্রেমাস্পদের কদমে জীবন বিসর্জন দিতে দেখা যায়, সেখানে প্রকৃত প্রেমাস্পদ সকল রূপ

ও সৌন্দর্যের অধিপতি ও স্রষ্টার প্রেম-ভালোবাসা কেমন হওয়া উচিৎ? জীবনের সীমিত সুযোগের মূল্যায়ন করতে হবে। যেমন– সাঁতার দিয়ে কেউ যখন নদী পাড়ি দেয়, কূলের নিকটবর্তী হলে ক্লান্ত হওয়া সত্ত্বেও সজোরে হাত-পা মারতে থাকে। কারণ, সে ভাবতে থাকে, কূল অতি নিকটেই। ঠিক তেমনি সালেকদের উচিৎ, জীবননদীর কূল তথা মৃত্যুকে নিকটবর্তী মনে করে জলদি-জলদি ইবাদত-বন্দেগি, যিকির-আযকার করে আপন প্রেমাস্পদকে সন্তুষ্ট করে নেওয়া। যেন মৃত্যুকালে এই আহ্বান এসে যায়–

يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَىِٕنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾

হে প্রশান্ত চিত্ত! তুমি তোমার রবের কাছে ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষজনক হয়ে।"[১]

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

১. সূরা ফাজ্‌র : আয়াত ২৭, ২৮

সুফিয়ায়ে কেরামের দৃষ্টিতে জিহাদ

'বর্তমান যুগে কিছুলোক তাসাওউফের ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করে, এরা জায়নামাযে বসে থাকে, তাসবীহ্ পাঠ করা শেখায়, আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার বুলি আওড়ায়; অথচ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে না। আমি তাসাওউফের অতীত ইতিহাস অধ্যয়ন করে জানার চেষ্টা করেছি জিহাদে সুফিয়ায়ে কেরামের কোনো অবদান ছিল কি-না? বিশ্বাস করুন, এমন-এমন বিষয় সামনে এসেছে যে, আমি অবাক হয়েছি এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, যে বলবে, আল্লাহওয়ালাগণ জিহাদ করেন না, সে হয় মূর্খ, নাহয় মূর্খের ভান ধরেছে।'

সুফিয়ায়ে কেরামের দৃষ্টিতে জিহাদ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সুলূক কাকে বলে?

সুলূক পথকে বলে। আর সে পথের পথিককে বলে সালেক। তার মানে সালেক হলেন আল্লাহর ওই বান্দা, যিনি আল্লাহর পথে চলছেন, যার লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাক্ষাৎ। সালেকগণ মহান আল্লাহর সত্তাকেই তাঁদের আশা-ভরসার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে। এ পথে চলতে গিয়ে তারা কিছু বাধার সম্মুখীন হন। সবচেয়ে বড় বাধা হলো অলসতা। খাজা মুহাম্মাদ মাসুম (রহ.) বলতেন, সালেকের জন্য গন্তব্যে উপনীত হতে অলসতা ব্যতীত আর কোনো বাধা নেই।

জীবনের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি

যে সালেকের অন্তরে একথা বদ্ধমূল হয় যে, আমি আমাকে পরিবর্তন করব, নিজেকে আল্লাহ তা'আলার রঙে রঙিন করব, আল্লাহর ভালোবাসা দ্বারা প্রাণ ভরব, তাঁর জন্য যিকির ও অযিফার এমন পথ নির্ধারণ করা রয়েছে, যে পথ ধরে সে আপন গন্তব্যে গিয়ে পৌঁছবে। হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দি বুখারী (রহ.) প্রায়শই বলতেন, আমি আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের দরবারে এমন একটি তরীকা প্রার্থনা করেছি, যা গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। সেই পথে লক্ষ-লক্ষ মানুষ চলেছে। তাদের দিন পরিবর্তন হয়েছে, রাত পরিবর্তন হয়েছে, সকাল পরিবর্তন হয়েছে, সন্ধ্যা বদলেছে।

মোটকথা, তাদের জীবনে একটি বিপ্লব সাধিত হয়েছে। বর্তমান কালের কোনো সালেক যদি মনে করে, আমি এতদিন যাবত বায়'আত হলাম; অথচ নিজের মধ্যে কোনো বিশেষ অবস্থা বা পরিবর্তন অনুভব হয়নি, তাহলে বুঝতে হবে, সে ওষুধ সেবন করছে না। অথবা ওষুধ সেবন করছে বটে; কিন্তু পথ্যগুলো বেছে চলছে না। পৃথিবীর সেরা ডাক্তারের হাতে ব্যবস্থাপত্র লিখিয়ে নিয়ে পকেটে রেখে দিলে কোনোদিন আরোগ্য লাভ হবে না। সে যদি ডাক্তারের কাছে গিয়ে অভিযোগ করে, উপকার হয়নি, তখন তিনি বলবেন, সেটা পকেটে রেখে দেওয়ার পরিবর্তে পেটে ঢালার প্রয়োজন ছিল।

এটি এমন কোনো ব্যবস্থাপত্র নয়, যা কেবল আমরা ও আপনারাই সর্বপ্রথম ব্যবহার করছি। বরং উম্মতের কোটি-কোটি মানুষ এটি ব্যবহার করেছে। তাদের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। কাজেই আমাদেরও উচিৎ যিকির-অযিফাগুলো যথানিয়মে পালন করা, যাতে আমাদের অন্তরেও আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার আগুন প্রজ্বলিত হয়। তারপর দেখতে পাবেন, আল্লাহ রব্বুল আলামীন এই পৃথিবীতে কিরূপ মারেফাত নসিব করেন। আমাদের হিম্মত ও আগ্রহ কম ঠিক; কিন্তু তাই বলে কি আশাও থাকবে না? আশা তো থাকতে হবে।

অন্তরের বাঁধন কীভাবে খোলে?

ইমামে রব্বানী হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানি (রহ.) বলেন, মনের অস্থিরতার অপর নাম তাসাউফ। অস্থিরতা না থাকলে তাসাউফ রইল না। যে ব্যক্তি তার অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসার উষ্ণতা অনুভব করে না, তাকে বুঝে নিতে হবে, এখনও পর্যন্ত আমি তরীকত হাসিল করতে পারিনি। আল্লাহওয়ালাদের সাথে সম্পর্ক থাকবে; অথচ অন্তরে ভালোবাসার স্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলিত হবে না, তা হতে পারে না। আল্লাহওয়ালাগণ এমন কিছু যিকির-অযিফা নির্ধারণ করেছেন যে, যেকোনো মানুষ সেলসেলায় প্রবেশ করে মুরাকাবা শুরু করে দিলে আল্লাহ তার অন্তরের বাঁধন খুলে দেন।

আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সংক্ষিপ্ত পথ

মাশায়েখগণ আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাতের সংক্ষিপ্ত পথ অবলম্বন করেছেন। আর তাহলো অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা ঢুকিয়ে দেওয়া। অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা প্রবেশ করলে তা মানুষের চলার পথ মসৃণ করে দেয়।

عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے
عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم
عقل کو تنقید سے فرصت نہیں
عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ

বিবেক বড় চালাক তাই বেশ বানিয়ে নেয়,
প্রেম বেচারা জ্ঞানী, সাধক, পণ্ডিত কোনোটিই নয়।
সমালোচনা হতে মুক্তির সুযোগ বিবেকের নাই।
প্রেমের ওপর আমলের ভিত্তি স্থাপন করো তাই।

মাশায়েখগণ প্রেমের পাখায় ভর করে এমনভাবে ওড়ান, আল্লাহর ভালোবাসার আগ্রহ অন্তরে এতটাই ভরে দেন যে, মানুষ দুনিয়ার সব কিছু অতিক্রম করে এক আল্লাহর সাথে গিয়ে মিলিত হয়। দুনিয়ার এই সম্পদ ও বস্তুসামগ্রীর ভালোবাসা তুচ্ছ ব্যাপার। আল্লাহওয়ালাদের পথের সামনে এগুলো মাকড়সার জালের মতো দুর্বল হয়ে যায়। কারণ, অন্তরে যদি আগ্রহ থাকে আর সেই আগ্রহ নিয়ে মানুষ পা বাড়ায়, তখন এ ধরনের সব বাধা-বিপত্তি দূরীভূত হয়ে যায়। নিয়মের কথাও তা-ই যে, গন্তব্যে পৌঁছার আগ্রহ নিয়ে কেউ যাত্রা শুরু করলে সামনে বিশাল মরুভূমি দেখে সে পিছপা হবে না। বরং মরুভূমি পাড়ি দিয়ে সে গন্তব্যে পৌঁছে যাবে।

আল্লাহওয়ালাদের দুনিয়াবিমুখতা

আল্লাহর ভালোবাসার কারণে আল্লাহওয়ালাদের নিকট দুনিয়ার সব কিছুই তুচ্ছ মনে হয়। সে সব কিছু থেকে বিমুখ হয়ে এক আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়। বিশ্বাস করুন, দুনিয়ার সম্পদশালীরা পরস্পরে যখন গৌরব করে, তখন আল্লাহওয়ালাদের দৃষ্টিতে বিষয়টি এতই তুচ্ছ মনে হয়, যেমন কোনো মেথর তার কাছে অধিক ময়লার ঝুড়ি থাকায় গৌরব করে। উদাহরণস্বরূপ কোনো সুইপার যদি তার কাছে ময়লার ঝুড়ি তিনটি আছে বলে অন্য সুইপারের সাথে গর্ব করে আর দ্বিতীয়জন যদি বলে, আমার কাছে তো চারটা আছে, তাহলে আমাদের কাছে বিষয়টা কতখানি আশ্চর্যের মনে হবে যে, এটা কি কোনো গর্বের বিষয় হলো?

ঠিক তেমনি যাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা ঘর করে নিয়েছে, তাদের দৃষ্টিতে দুনিয়ার সম্পদ নিয়ে গর্বকারীদের অবস্থান সুইপারের তুলনায় বেশি নয়। হযরত মির্জা মাযহার জানেজানাঁ শহীদ (রহ.) আমাদের সেলসেলায়ে আলিয়ায়ে নকশবন্দিয়ার একজন বুযুর্গ ছিলেন। তৎকালীন বাদশাহ একদিন তাঁকে বললেন, আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি যে, আপনি এত মানুষকে সংশোধন করেছেন। আমার রাজ্যের অমুক এলাকার গভর্নর হিসেবে আপনাকে দায়িত্ব দিতে মনে চায়। কিন্তু তিনি বিস্ময়কর জবাব দিলেন। বললেন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা সমগ্র দুনিয়াকে 'সামান্য' বলে অভিহিত করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ

'আপনি বলে দিন, দুনিয়ার সামগ্রী হলো সামান্য।'[১]

আল্লাহ তা'আলা সমগ্র দুনিয়াকে 'সামান্য' বললেন। তুমি তার সামান্য অংশ লাভ করেছ। এখন তুমিও যদি আমাকে সামান্য অংশ দাও, তাহলে এত সামান্য পরিমাণ বস্তু গ্রহণ করতে আমার লজ্জা বোধ হয়। কাজেই আমি অপারগ। আমি তোমার এই উপঢৌকন গ্রহণ করতে পারলাম না।

আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসায় বিলীন হওয়ার স্তর

বন্ধুগণ! আমরা আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা ও মারেফাতের স্বাদ অনুভব করলে তো আফসোস করতাম যে, এর মোকাবেলায় দুনিয়ার সামগ্রীকে আমরা কেন প্রাধান্য দেই। আল্লাহ তা'আলার যিকিরে বিলীন হওয়ার সৌভাগ্য যার হয়ে যায়, তার অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা এতই বদ্ধমূল হয় যে, দুনিয়ার সামগ্রী তার কাছে তুচ্ছ মনে হয়। বিশ্বাস করুন, আল্লাহওয়ালাদের দৃষ্টিতে ফিতনা সৃষ্টিকারী চুলের বেণীও গাধার লেজ হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা যাকে বিলীন হওয়ার স্তর দান করেন, সে দুনিয়ার সুন্দরী নারীদের প্রতি থুতু ফেলতেও পছন্দ করে না। আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা অন্তরে বদ্ধমূল হলে বক্ষ জ্যোতির্ময় হয়ে যায়। দিলে প্রেমের আগুন জ্বলে, যা মানুষকে দুনিয়া থেকে বিমুখ করে দেয়। মাশায়েখে কেরাম বলেন, الْفَانِيْ لَا يُرَدُّ (যা একবার বিলীন হয়, তা পুনরায় ফিরে আসে না) অর্থাৎ– যে একবার আল্লাহ তা'আলার সত্তায় বিলীন হওয়ার স্তরে পৌঁছে যায়,

১. সূরা নিসা : আয়াত ৭৭

তারপর সে এপথ থেকে আর ফিরে আসে না। মাশায়েখগণ এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, যদি কেউ বালেগ হয়, সে কি পুনরায় নাবালেগ হতে পারে? অথবা ফল পাকলে কি তা পুনরায় কাঁচা হতে পারে? এ যেমন হতে পারে না, তেমনি فَنَا فِيْ اللّٰهِ (আল্লাহ তা'আলার সত্তায় বিলীন হওয়া)র স্তরে পৌঁছে যাওয়ার পর সেই মানুষটি দুনিয়ার ভালোবাসায় পুনরায় ফিরে আসতে পারে না। কারণ, তার অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা এমন প্রবল হয়েছে যে, সে তাঁর নামে নিজের জান, মাল বরং সবকিছু উৎসর্গ করে দেয়।

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর ভালোবাসার পরিমাণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে খোদাপ্রেমের এমন আগ্রহ ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁদের যখন আল্লাহর নামে খরচ করার নির্দেশ দেওয়া হতো, তখন তারা সমুদয় মালামাল এনে নবীজির কমদ মোবারকে লুটিয়ে দিতেন। তাবুক যুদ্ধের সময় যখন মাল উৎসর্গের সুযোগ এল, তখন হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযি.) সবকিছু গুটিয়ে এনে নবীজির পদতলে রেখে দিলেন। এমনকি দেওয়ালের ওপর হাত বুলিয়ে দেখেছেন, কোথাও একটা সুঁই রয়ে যায়নি তো। নবীজি জিজ্ঞেস করলেন, পেছনে কী রেখে এসেছ? বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি। নিজের গায়ের পোশাকটি পর্যন্ত দিয়ে দিলেন। তার পরিবর্তে চটের তৈরী পোশাক পরিধান করলেন।

হযরত শাইখুল হাদীছ (রহ.) বলতেন, যে মজলিসে তিনি সমুদয় মাল উৎসর্গ করেছিলেন, সেই মজলিসেই তিনি চটের পোশাক পরিধান করে বসা ছিলেন। ইত্যবসরে হযরত জিবরীল (আ.) আগমন করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখে বললেন, জিবরীল! আজ আপনি কোন পোশাক পরিধান করে এসেছেন? আপনি চটের পোশাক কেন পরেছেন? জিবরীল (আ.) আরজ করলেন, হে আল্লাহর নবী! আজ আবুবকরের এই আমলে আল্লাহ তা'আলা এতই খুশি হয়েছেন যে, আকাশের সকল ফেরেশতাকে আদেশ করেছেন, তোমরাও আবুবকরের মতো চটের পোশাক পরিধান করো। এ ছাড়াও আল্লাহ হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর নিকট সালাম পাঠিয়েছেন।[১]

---

১. তিরিমিযি : হাদীছ নং ৩৬৭৫

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ কতখানি মূল্যায়ন করেন। আমরা আসলেই মূল্যায়ন করতে জানি না। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ

'আর তারা আল্লাহকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করেনি।'[১]

প্রেমিকদের রাতসমূহ

সালাফে সালেহীনদের জীবনীতে লিখা আছে, তারা এমন অধীর আগ্রহ নিয়ে রাতের অন্ধকারের অপেক্ষা করতেন, যেমন কোনো বর তার দুলহানের সাথে মিলিত হতে রাতের অপেক্ষা করে। এই অপেক্ষা কেন হতো? এজন্য যে, আমরা আল্লাহর সাথে বসে প্রেমালাপ করব। তারা আল্লাহর ভালোবাসায় ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতেন। এমন চেহারা ইদানীং খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়। যারা রাতের শেষ ভাগে উঠে আল্লাহর ভালোবাসায় ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদে, তাদের অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা এতই গভীর হবে যে, আল্লাহর স্মরণ ব্যতীত অন্য কোনো জিনিসে তাদের শান্তি ও তৃপ্তি আসবে না। বর্তমানে তরীকতের সালেকদের অবস্থা হলো, রাতে ওঠা তো দূরের কথা তাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, মুরাকাবা করেন কি? উত্তর আসে, সময় পাই না। তাহাজ্জুদ পড়েন কি? উত্তর দেয়, অলসতা এসে পড়ে।

মনে রাখবেন, আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা হাসিলের জন্য তাহাজ্জুদের সময় ওঠার অভ্যাস গড়ে তোলা অপরিহার্য বিষয়। আর নফল পড়ে মুরাকাবা করা। মুরাকাবায় বসার সময় কখনো-কখনো এই কবিতাটি পড়বে। এই কবিতা দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে আমার অনেক উপকার হয়েছে। মুরাকাবায় বসার সময় যদি কেউ এক-দুবার এই কবিতাটি পড়ে নেয়, তাহলে বেশ মজা অনুভব হয়। কবি কী দারুণ কথা বলেছেন :

مجھے اپنی پستی کی شرم ہے تیری رفعتوں کا خیال ہے
مگر اپنے دل کو میں کیا کروں پھر بھی شوق وصال ہے

'নিজের নীচুতার লজ্জা তোমার উচ্চতার কথা মোর স্মরণ আছে,
আপন মনকে কী করে বোঝাই তবু সেই মিলনের আশা করছ।'

---

১. সূরা আনআম : আয়াত ৯১

আল্লাহপ্রেমের কল্যাণ

বন্ধুগণ! রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহ তা'আলার সামনে নিজের প্রার্থনার কপাল নত করায় অজস্র কল্যাণ রয়েছে। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, হাশরের দিন হিসাব-নিকাশ শুরু হওয়ার আগেই একদল লোক জান্নাতের দরজায় গিয়ে পৌঁছবে। সেখানে গিয়ে জান্নাতের প্রহরী রিদওয়ানকে বলবে, জান্নাতের দরজা খুলে দাও! আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করতে দাও। রিদওয়ান অবাক হয়ে বলবে, হে আল্লাহ! এখনো তো হিসাব-নিকাশ কিছুই হয়নি। অথচ এরা জান্নাতে যেতে চায়। আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত বলবেন, রিদওয়ান! এরা আমার ওই সকল বান্দা, যারা দুনিয়াতে আমার প্রেমে উন্মাদ ছিল। এরা সদা আমার জন্য অস্থির হয়ে থাকত। রাতের বেলা আমার সাথে প্রেমালাপ করত। তাদের পাঁজর বিছানা থেকে আলাদা থাকত। পৃথিবীর চাকচিক্য তাদেরকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করতে পারেনি। এরা সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবল আমার প্রত্যাশী ছিল। তারা আমাকে পাওয়ার আশা করত। আমিও তাদের পাওয়ার আশা করতাম। আজ তারা এখানে এসেছে, জান্নাতের দরজা খুলে দাও। তাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাও।

তাসাউফের ওপর আরোপিত প্রশ্নের জবাব

বর্তমান যুগে কিছুলোক তাসাওউফের ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করে, এরা জায়নামাযে বসে থাকে, তাসবীহ পাঠ করা শেখায়, আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার বুলি আওড়ায়; অথচ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে না। আমি তাসাওউফের অতীত ইতিহাস অধ্যয়ন করে জানার চেষ্টা করেছি জিহাদে সুফিয়ায়ে কেরামের কোনো অবদান ছিল কি-না? বিশ্বাস করুন, এমন-এমন বিষয় সামনে এসেছে যে, আমি অবাক হয়েছি এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, যে বলবে, আল্লাহওয়ালাগণ জিহাদ করেন না, সে হয় মূর্খ, নাহয় মূর্খের ভান ধরেছে।

মোটকথা, এমন ব্যক্তির ইসলামি ইতিহাস সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। কাজেই কেউ যদি বলে, সুফীয়ায়ে কেরাম জিহাদ করেন না, তাহলে আপনি তার জবাব দিন যে, হ্যাঁ; শান্তির সময় তারা নফ্সের সাথে জিহাদ করে আর দীন ইসলামের জন্য যখন প্রাণ উৎসর্গের সময় আসে, তখন তাদের হাতে তাসবীহ থাকে না; বরং তরবারি থাকে। তখন তারা জায়নামাযের পিঠে থাকেন না; ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করেন। তারা তো পূর্ব

থেকেই রাত্রিজাগরণ ও ক্ষুধার্ত-পিপাসার্ত থাকতে অভ্যস্ত। ফলে তাদের জন্য আল্লাহর রাস্তায় জীবন উৎসর্গ করতে কোনো প্রকার বেগ পেতে হয় না। আল্লাহর শপথ! আল্লাহর নামে যদি কেউ তাদের শূলিতে চড়ায়, তাহলে তারা শূলিকে চুম্বন করে তাতে চড়ে যায়। আর ভাববাচ্যে বলতে থাকে :

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

'জীবন দিলাম সেও ছিল তাঁরই দেওয়া

হক আদায় হলো না এটাই বাস্তব সত্য কথা।

তাতারি ফেতনা কারা নস্যাত করেছে?

সাতশত হিজরিতে ইল্‌মে কালামের সুশীতল বাতাস যখন মুসলমানদের বুক একদম শীতল করে দিল, সে সময় দেখা দিল তাতারি ফেতনা। তাতারি সম্রাট হালাকুখান মুসলমানদের হাত থেকে ইসলামি সম্রাজ্য ছিনিয়ে নিল। সর্বত্র তারা মুসলমানদের তাদের প্রজা বানিয়ে নিল। তারা ছিল বেদীন। প্রায় গোটা ইসলামি বিশ্বকে তারা জয় করে নিয়েছিল। মুসলমানরা গোলামে পরিণত হলো। ক্ষমতার মসনদ আর শাহী সিংহাসন কুফরি শক্তির হাতে চলে গেল। তাদের শাসন ও আইন চলত। মুসলমানরা প্রজা হয়ে জীবন যাপন করছিল। তখন তরবারি দিয়ে মোকাবেলা করার মতো সুযোগ মুসলমানদের ছিল না। তাদের মধ্যে এতটাই ক্লান্তি এসে পড়েছিল যে, তাতারিরা যখন একমাত্র ইসলামি সম্রাজ্য আব্বাসি খেলাফতের চেরাগ জালালুদ্দীন খাওয়ারিযম শাহের রাজ্য দখল করে নিল, তখন একটি প্রবাদ তৈরি হলো :

اِذَا قِيْلَ لَكَ اِنَّ التَّتَارَ اِنْهَزَمُوْا فَلَا تُصَدِّقْ

'তাতারিরা পরাজিত হয়েছে একথা কেউ বললে তুমি তা বিশ্বাস করো না।'

তখন কারা মুসলমানদের এই ডুবন্ত নৌকাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন? তাঁরা সুফী-মাশায়েখগণই ছিলেন। তখন কোথায়ও মাওলানা রুমী বসে মসনবী রচনা করেছেন এবং মানুষের অন্তরকে উত্তপ্ত করেছেন, কোথাও মাওলানা দরবন্দী (রহ.) তাতারি শাহজাদাদের অন্তরের প্রতি তাওয়াজ্জুহ দিচ্ছিলেন, তাদের বক্ষে দেশের প্রতি গভীর দৃষ্টি প্রদান করে তাদের মনোঃজগতকে

সম্পূর্ণ পাল্টে দিলেন। এমনকি ত্রিশ বছর পর তাতারি শাহজাদাদের একব্যক্তি কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। তারপর পালাক্রমে অন্যান্য শাহজাদারাও মুসলমান হয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত ক্ষমতার মসনদ ও শাহী সিংহাসন–যেটি মুসলমানদের হাতছাড়া হয়েছিল–পুনরায় মুসলমানদের হস্তগত হলো। এগুলো কাদের বরকতে হয়েছিল? এ কোন তরবারির আঘাত ছিল? ব্যহ্যিক তরবারি তো ছিল না; বরং অন্তর ও দৃষ্টির তরবারি দ্বারা ঘায়েল করেছিলেন, যা তাদের বুক ভেদ করে হৃদয়গুলোকে বদলে দিয়েছিল। ফলে একটি সময় এমন এল যে, এই তাতারিরা-ই বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিজয়নিশান উড্ডীন করেছে এবং রাজত্ব পুনরায় মুসলমানদের হাতে এসেছে। এসবই সুফীদের অবদান ছিল। ইকবাল লিখেছেন :

ہے عیاں آج بھی یورش تاتار کے افسانے سے
پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے

ইতিহাসে তাতারিদের আক্রমণ দিবালোকের মতো পরিষ্কার
মন্দির থেকেই কাবার মিলে গেল পাহারাদার।

এসকল সূফী-মাশায়েখই মন্দির থেকে মূর্তিপুজারিদের এবং ঘোর অমানিশা থেকে এসকল ফেতনাবাজ লোকদের বের করে তাদের অন্তর উত্তপ্ত করে তাওহীদবাদীতে পরিণত করলেন এবং ইসলামি ঝাণ্ডা তাদের হাতেই রক্ষা করলেন।

শাখয় আহমাদ শরীফ (রহ.) ও তাঁর মুরীদদের জিহাদ

আফ্রিকার সুবিশাল মরুভূমিতে একটি খানকা ছিল। ওই খানকায় শায়খ আহমাদ শরীফ (রহ.) নামক একজন বুযুর্গ ছিলেন। ইটালিরা যখন আফ্রিকায় আক্রমণ করল, তখন তিনি তার মুরীদদের একত্রিত করে বললেন, এখন ইসলামের জন্য জীবন দেওয়ার সময়। কাজেই শত্রুর বিরুদ্ধে সিসাঢালা প্রাচীর হয়ে যাও। সুতরাং তার মুরীদগণ ইটালিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বাহ্যত তারা সহায়-সম্বলহীন ছিলেন। কিন্তু তাঁদের অন্তরে তাওয়াক্কুল ও খোদাপ্রেমের মহামূল্যবান সম্পদ ছিল। যদ্দরুন তারা ১৫ বছর পর্যন্ত আতালুবি যোদ্ধাদের নাকানি-চুবানি খাইয়ে ছেড়েছে। আজ অবধি মানুষ তাদের তিরস্কার করে যে, তারাবলিস যুদ্ধে সানোসিয়া খানকার নিরস্ত্র লোকেরা তোমাদেরকে কেমন নাজেহাল করল!

আমীর আব্দুল কাদের (রহ.)-এর জিহাদ

আলজেরিয়া এলাকায় আমীর আব্দুল কাদের নামক তরীকতের একজন শায়খ ছিলেন। ১৮৩২ ইং সনে ফ্রান্স যখন আলজেরিয়ার ওপর আক্রমণ করল, তিনি তখন তার মুরীদদের নিয়ে দুশমনের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত তারা ফরাসি সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যান এবং তাদের শান্তিতে বসতে দেননি।

রাশিয়ায় সুফী-মাশায়েখগণের জিহাদ

ইমাম মানসুর (রহ.) ছিলেন প্রথম নকশবন্দি শায়খ, যিনি সর্বপ্রথম রুশসেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সূচনা করেন। ১৭৮৫ সালে তাঁর মুরীদরা সূনযা নদীর ব্রীজের ওপর রুশসেনাদের একটি খণ্ডদলকে ঘেরাও করে ধ্বংস করে দেয়। রুশসম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় কেথরীনের সৈন্যরা ইতোপূর্বে কখনো এমন শোচনীয় পরাজয়ের সম্মুখীন হয়নি। ছয় বছর বিরামহীন গতিতে যুদ্ধ এবং মুজাহিদের সম্বলহীনতার দরুন ইমাম মানসুর কারাবন্দী হলেন। দু-বছর পর তিনি ইন্তেকাল করলেন। তারপর ত্রিশ বছর যাবৎ গেরিলা যুদ্ধ অব্যাহত ছিল।

শায়খ মুহাম্মাদ আফেন্দী (রহ.) দ্বিতীয় নকশবন্দি শায়খ ছিলেন, যিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার যুদ্ধের সূচনা করেন। তিনি ইমাম শামিল (রহ.)-এর পীর ছিলেন। এই যুদ্ধ ৩৫ বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ইমাম শামিল (রহ.) যদিও পরাজয় বরণ করেছেন, তবুও বীরত্বের উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা মানুষের অন্তরে যুগ-যুগ ধরে লালিত হয়েছে। ইমাম শামিল (রহ.)-এর পরাজয়ের পর কাদেরিয়া সেলসেলার একজন শায়খ উত্তর কফকাজ এলাকায় রুশদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেন।

১৮৬০ সালের প্রথম দিকে রুশ সৈন্যরা তাদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের অপারেশন চালায়। তারপরও ১৮৭৭ সালে নকশবন্দি ও কাদেরি সূফীগণ একযোগে দাগেস্তানে রুশদের বিরুদ্ধে পতাকাযুদ্ধ করেছেন। কমিউনিষ্ট বিপ্লব ও কাফকাজের গৃহযুদ্ধকে রুশশাসন থেকে মুক্ত করার সুবর্ণ সুযোগ মনে করে ইমাম নাজমুদ্দীন (রহ.) ও শায়খ আযদান জাজী (রহ.) প্রথমে রুশ সাদা সৈন্য ও পরবর্তিতে রুশ লাল সৈন্যদের বাধা প্রদান শুরু করেন। বলশেভিকদের জন্য এই বিদ্রোহ ভয়াবহ রূপ ধারন করল। ইমাম নাজমুদ্দীন

(রহ.) ১৯২৫ সাল পর্যন্ত জিহাদ অব্যাহত রাখেন। অবশেষে তিনি বন্দী হন এবং তাকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝোলানো হয়। তার পরাজয়ের পর উত্তর কাফকাজের মুসলমানরা দীর্ঘ দিন যাবৎ সরকারি ছত্রছায়ায় হত্যা ও নির্যাতনের শিকার হন। ১৯২৮ সালে নকশবন্দি ও কাদেরি শায়েখগণ পুনরায় রুশ সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং ১৯৪০ সাল অবধি তাদের কার্যক্রম চালু রাখেন। তার আগে উজবেকিস্তানের শাসনাধীন ফরগানায় নকশবন্দি সুফীগণ রুশ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা দেন। তবে তারা সফল হননি। তাদের নেতা ছিলেন ঈসা মালালি নকশবন্দি (রহ.)।

রুশ বিপ্লবের এক বছর পর ১৯১৮ সালে ফারগানায় আরেকটি জিহাদি আন্দোলন শুরু হয়, যাকে সামাজিক আন্দোলন বলে অভিহিত করা হয়। জুনায়েদ খান নকশবন্দি (রহ.)-এর নেতাদের অন্যতম ছিলেন। ১৯২৮ সালে লাল সৈন্যদের দীর্ঘ কার্যক্রমের পর এই আন্দোলন তাদের নিয়ন্ত্রণে আসে। সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হলো ১২ ও ১৩ শতাব্দিতে সুফী-মাশায়েখগণ ফারাখতাঈ ও মোঙ্গল কাফেরদের সাথে উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ করেন। ১৮ ও ১৯ শতাব্দিতে তারা রুশসম্রাটদের সাথে মারাত্মক সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯২০ সালে তারা সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও জিহাদ করেন।

এত কিছুর পরও যদি কেউ বলে, মাশায়েখগণ জিহাদ করেন না, তাহলে তাকে মূর্খ না বলে আর কী বলব?

ناطقہ سر بگریباں ہے تو اسے کیا کہئے

'বাকশক্তি রুদ্ধ হয়ে গেছে; তাকে আর কী বলব?'

সাইয়্যিদ জামালুদ্দীন আফগানির জিহাদ

আফগানিস্তানে যখন জিহাদের প্রয়োজন দেখা দিল, তখন জামালুদ্দীন আফগানি শত্রুদের বিরুদ্ধে অগ্রগামী বাহিনীর প্রধানের ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি তরীকতের একজন শায়খ ছিলেন।

উপমহাদেশে জিহাদে সুফিয়ায়ে কেরামের অবদান

উপমহাদেশে যখন আকবরের দীনে এলাহির ঝড় উঠল, এই ঝড় ঠেকাতে সেলসেলায়ে আলিয়ায়ে নকশবন্দিয়ার ইমাম হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানি (রহ.)উঠে দাঁড়ালেন, যিনি বড় সৈন্যপ্রধান, যেমন শায়েখ ফরীদ ও জানেজানাঁর অন্তরের প্রতি তাওয়াজ্জুহ দিলেন এবং সেই ঝড় দুনিয়া থেকে

এমনভাবে নির্মূল করে দিলেন যে, সকল বিদ'আত ও সামাজিক কুপ্রথার জানাযা হয়ে গেল, যেন তিনি রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا এর মতো ইসলামি বিধিবিধানকে পুনরায় উজ্জীবীত করেছেন। এ মুহূর্তে আমি শামেলির ময়দানের চিত্রটি যেন দেখতে পাচ্ছি। হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী, সাইয়্যিদ জামেন শহীদ (রহ.) ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। এরা তো সুফী ছিলেন।

এ ছাড়াও কখনো শাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান (রহ.)কে মাল্টার জেলখানায় জিঞ্জিরাবদ্ধ অবস্থায় দেখতে পাই। আবার কখনো সাইয়্যিদ আহমাদ শহীদ (রহ.) এবং শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)কে বালাকোটের বালিকণাগুলোকে রক্তে রঞ্জিত করতে দেখতে পাই। জিহাদের জন্য তারা জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন। হাসানুল বান্না–যিনি আল-ইখওয়ান-এর ভিত্তি স্থাপন করেছেন–সেলসেলায়ে সাজেলিয়ার একজন বুযুর্গ ছিলেন। সেলসেলায়ে আলিয়ায়ে নকশবন্দিয়ার শায়খ হযরত মির্জা মাযহার জানে জানাঁ শহীদ (রহ.) তার মুরীদদের মাঝে জিহাদের এমন স্পৃহা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন যে, এক মহিলা তার দুই পুত্রকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল–

بولی اماں محمد علی کی جاں بیٹا خلافت پہ دے دو

'মুহাম্মাদ আলীর মা বললেন, খেলাফতের তরে জীবন করো বিলীন।'

এবার বলুন, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জাওহার ও মাওলানা শওকত আলী (রহ.)-এর অন্তরে জিহাদের তামান্না ভরে দিয়েছিলেন? তরীকতের একজন শায়খ, যিনি নিজেও এক জালিমের হাতে শাহাদাতের অমিয় সুধাপান করেছেন, তার কবরের ওপর আজও এই কবিতাগুলো লেখা আছে–

بہ لوح تربت من یافتند از غیب تحریرے
کہ ایں مقتول را جز بے گناہی نیست تقصیرے

'আমার কবরের ওপর অদৃশ্য জগত থেকে এ লেখা পাওয়া গেছে যে,
এ নিহতের নিষ্প্রাণ হওয়া ব্যতীত আর কোনো অপরাধই নেই।'

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জাওহার (রহ.) মুসলমানদেরকে ইংরেজদের আগ্রাসী থাবা থেকে মুক্ত করার জন্য লন্ডনে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, যেন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে মুসলমানদের মনোবাঞ্ছার কথা ইংরেজদের পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এরই মধ্যে তাকে কারাবন্দী করা হলো। তাঁর ওপর নানা ধরনের নির্যাতন চলতে লাগল। এমনকি যখন তারা তাকে প্রাণনাশের হুমকি দিল, তখন তিনি

اَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

'জালিম শাহীর সম্মুখে হক কথা বলা উত্তম জিহাদ।'[১]

এর বাস্তব চিত্র যেন কাফেরদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন :

تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لئے ہے
پر غیب میں سامان بقا میرے لئے ہے
پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو
خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لئے ہے
اللہ کی راستے کی جو موت ائے مسیحا
اکسیر یہی ایک دوا میرے لئے ہے
توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہ دے
یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے

'তোমরা তো ভেবেছ নিশ্চিত আমার পতন,
অদৃশ্য জগত ভরে রয়েছে আমার রক্ষার সামান।
হুসাইন ইবনে আলী (রহ.)-এর মিলেছিল যে পয়গাম,
পুলকিত আমি ভাগ্যে জোটায় মোর সেই পয়গাম।
আল্লাহর রাস্তার যে মৃত্যু হে খ্রিষ্টান,
সে তো মহৌষধ বাঁচাতে আমার জীবন।
তাওহীদ তো হলো হাশর মাঠে বলবেন মহান খোদা,
উভয় জাহানের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল এই বান্দা মোর সদা।'

আল্লাহওয়ালাগণ শাহাদাতের তামান্নায় উন্মাদ হয়ে আল্লাহ তা'আলার নামে জীবনের বাজি লাগানোকে সৌভাগ্য মনে করেন।

আল্লাহর ভালোবাসা কীভাবে সৃষ্টি হয়

আমার প্রিয় বন্ধুগণ! এই মাশায়েখগণ যিকির এবং শায়খের সাথে গভীর সম্পর্কের মাধ্যমে অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন। তাই

---

১. মিশকাত : হাদীছ নং ১১৯০

আজও এ সকল যিকির-অজিফা এবং শায়খের সাথে গভীর সম্পর্ককে মহামূল্যবান সম্পদ জ্ঞান করো। কিছুদিন এ নিয়ম মোতাবেক কাটিয়ে দেখো, মানুষের অন্তরে আল্লাহর মহব্বত কীভাবে সৃষ্টি হয়।

دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو
عجب چیز ہے لذت اشنائی

'দুই জাহান থেকে দিলকে করে দেয় পর,
বন্ধুত্ব অতি আজব জিনিস বড়ই মজার!'

এগুলো বিবেকের কথা নয় বরং প্রেমের কথা। আল্লামা ইকবাল বলেন :

نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی
اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی
پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل
عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی
عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل
عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی
بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق
عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی

'প্রেমিক বুলবুল তোমার খাদেম এখনও কাঁদে,
আপন বক্ষে এখন আরও একটু জায়গা দাও তারে।
পরিণামদর্শী হলো বিবেক তখন পোক্ত অতি,
প্রেম পরিণামদর্শী হলে এখনও সে রয়েছে কচি।
দূতকে ডেকে বলছে প্রেম আমলের পদক্ষেপ হালকা অতি,
বিবেক এখনও বার্তার অর্থ বুঝতেই পারেনি।
নমরূদের আগুনে প্রেম, নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে,
বিবেক এখনও খেল-তামাশার মজায় ডুবে রয়েছে।'

বিবেক শুধু চেয়ে থাকে আর প্রেম সামনে পা বাড়িয়ে অগ্রসর হয়।

عشق کی دیوانگی طے کر گئی کتنے مقام

عقل جس منزل پہ تھی اب تک اسی منزل پہ ہے

'প্রেমের উন্মাদনা কতগুলো স্তর পেরিয়ে চলে গেল,

বিবেক যেথায় ছিল এখনও সেথায়ই পড়ে রইল।'

কতই-না আশ্চর্যের ব্যাপার যে, আজ অতি সাধারণ-সাধারণ বিষয়গুলো অন্তরায় হয়ে আছে। কেউ কুদৃষ্টির কারণে পেছনে পড়ে রয়েছে আবার কেউ অফিসিয়াল কাজের দরুন এগুতে পারছে না। কেউ আবার পারিবারিক কোনো কারণে পিছিয়ে আছে। কেউ আবার অলসতার দরুন পেছনে পড়ে আছে। কত সাধারণ বিষয়গুলো অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। এমন চেহারা খুব কমই আছে, যারা সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবল আল্লাহ তা'আলার প্রার্থী হবে। আমার পীর ও মুরশিদ চমৎকার কবিতা আবৃত্তি করতেন–

حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا

بت کے بندے تو ملے اللہ کا بندہ نہ ملا

'মনের কথা বলব যারে পাইনি এমন কাউকে খুঁজে,

প্রতিমার বান্দা পেয়েছি বটে; আল্লাহর বান্দা পাইনি খুঁজে।'

বাস্তবিক পক্ষেই বর্তমানে এমন লোক খুব কমই আছে, যারা নফ্সকে পদদলিত করে আল্লাহর পথে এগিয়ে যাবে এবং অন্তরে দীপ্ত শপথ নিবে যে, আমরা আল্লাহ তা'আলার জন্য যেকোনো জিনিস উৎসর্গ করতে সদা প্রস্তুত।

আল্লাহ তা'আলার দিদারের অবস্থা

জান্নাতে জান্নাতিরা এমন হুর পাবেন যে, কোনো হুর যদি তার আঁচল আসমান থেকে নিচে ফেলে, তাহলে তার আঁচলের জ্যোতিতে সূর্যের আলো ম্লান হয়ে যাবে। যদি কোনো নোনা পানিতে সামান্য থুতু নিক্ষেপ করে, তাহলে তা মিষ্টি হয়ে যাবে। যদি কোনো মৃতের সাথে কথা বলে, তাহলে সে জিন্দা হয়ে যাবে। এমন পোশাক তারা পরিধান করবে, যাতে সত্তর হাজার রং চমকাতে থাকবে। এসব কিছু দর্শনে জান্নাতি ব্যক্তি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়বে। জান্নাতে প্রবেশ করে হুরদের রূপ-লাবণ্য দেখে অবাক হয়ে পাঁচশত বছর এক নাগাড়ে তাকিয়ে থাকবে। এত দীর্ঘ সময় অতিক্রম করেছে তা আদৌ টের পাবে না। তারপর এমন একটি সময় আসবে, আল্লাহ জান্নাতিদের বলবেন,

হে জান্নাতবাসী! আমি তোমাদের সাথে একটি ওয়াদা করেছিলাম। এখন সেই ওয়াদা পূরণের সময় এসেছে। জান্নাতিরা অবাক হবেন, জান্নাত পেলাম, সব কাজ নিজের মর্জিমাফিক হচ্ছে; তারপরও আবার কোন জিনিসটি রয়ে গেল? তারপর বলা হবে, আমি তোমাদেরকে আমার দিদারের ওয়াদা করেছিলাম। সুতরাং জান্নাতে আদ্‌নে এর জন্য যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন করা হবে।

জান্নাতিদের জন্য বাজার বসানো হবে। বাজারে গিয়ে জান্নাতি ব্যক্তি যে আকৃতি পছন্দ করবে, তাকে সেই আকৃতি দান করা হবে। রেশমি কাপড়ের তৈরী নামী-দামী চমৎকার পোশাক হবে। তারা নিজেকে সাজিয়ে-গুছিয়ে আল্লাহ তা'আলার দিদার করতে যাবে। সেখানে গিয়ে সর্বপ্রথম হযরত দাউদ (আ.) সুমধুর কণ্ঠে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে শোনাবেন। তারপর স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে শোনাবেন। তারপর আপন দিদার দান করে ধন্য করবেন। সেই দিদার কেমন হবে? আল্লাহর দিদার সন্দেহাতীত ও অতুলনীয়। আল্লাহই ভালো জানেন তাঁর দিদারের অবস্থা কিরূপ হবে। এতটুকু বলতে পারি যে, হে সৌন্দর্যের স্রষ্টা, তখন তোমার সৌন্দর্য জানি কেমন দেখাবে! আল্লাহ তা'আলা যখন দিদার করবেন, তখন নূরের বৃষ্টি বর্ষিত হবে। জান্নাতিদের চেহারায় সেই বৃষ্টির ফোঁটা পড়বে। এতে তাদের রূপ-লাবণ্য এতই বৃদ্ধি পাবে যে, জান্নাতে ফিরে আসার পর হুররা তাদের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে অপলক নেত্রে পাঁচশত বছর পর্যন্ত তাদের চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকবে। জি; খাদেম তো খাদেমই আর মালিক তো মালিকই। হুরদের সৌন্দর্য যদি এত বেশি হয়, তাহলে জান্নাতিদের চেহারা কম সুন্দর হলে কি তা ন্যায়সঙ্গত হবে? কখনই না। দিদারে এলাহীর পর জান্নাতিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে।

আল্লাহকেই স্বীয় আশা-ভরসার পাত্র বানিয়ে নাও

আল্লাহ রব্বুল ইয্‌যাত এই নকশবান্দি ইজতেমার বরকতে, এই মহান মর্যাদার বরকতে, হযরত মুরশিদে আলম (রহ.)-এর বরকতে এবং খোলাফায়ে কেরামের বরকতে আমাদেরকে তার খাঁটি ভালোবাসা দান করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

اللہ وہ دل دے کہ تیری عشق کا گھر ہو
دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو

دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اسکا
محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو

'এমন অন্তর দাও গো খোদা যেন হয় তোমার প্রেমের ঘর
সদা যেন থাকে তার প্রতি তোমার রহমতের নজর।
তোমার প্রেমে এমন যেন হয় মোর অন্তর,
কিয়ামতের বিকট ধ্বনিতেও যেন থাকে বেখবর।'

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

পূর্বসূরীদের কতগুলো শিক্ষণীয় ঘটনা

‘একদা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহি (রহ.) হাদীছ পড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ বৃষ্টি এসে পড়ল। ছাত্ররা আপন-আপন কিতাব গুটিয়ে নিয়ে কামরায় দৌড়ে চলে গেল। হযরত (রহ.) রুমাল বিছিয়ে ছাত্রদের জুতাগুলো তাতে উঠিয়ে নিয়ে পুটুলি বেঁধে মাথায় করে কামরায় নিয়ে এলেন। ছাত্ররা দেখে তো চিৎকার করতে লাগল এবং বলতে লাগল, হযরত! আমরা নিজেরাই তো জুতাগুলো আনতে পারতাম। হযরত (রহ.) জবাব দিলেন, তোমরা সারাদিন قَالَ اللهُ এবং قَالَ الرَّسُوْلُ পড়। রশীদ আহমাদ তোমাদের জুতা বহন করবে না তো কী করবে?’

পূর্বসূরীদের কতগুলো শিক্ষণীয় ঘটনা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٦٩﴾

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

দুটি মহান নেয়ামত

উম্মতে মোহাম্মাদিয়াকে আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত দুটি মহান নেয়ামত দান করেছেন। একটি হলো কালামুল্লাহ, অপরটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। একটি পূর্ণাঙ্গ ইল্ম (জ্ঞান), অপরটি পূর্ণাঙ্গ আমল। নবীজি خُلُقٍ عَظِيْمٍ (মহান চরিত্র)-এর অধিকারী ছিলেন। সাইয়্যিদা আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)কে জিজ্ঞেস করা হলো, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র কেমন ছিল বলুন। তিনি বললেন :

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنَ

'তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন।'[১]

অর্থাৎ– কেউ যদি দেহের আকারে কুরআন দেখতে চায়, তাহলে সে যেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে নেয়। শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা কারী তাইয়্যিব সাহেব (রহ.) বলতেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন হলো কুরআন শরীফের আমলি তাফসীর। আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণসংক্রান্ত আয়াতগুলো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আকাইদ আর বিধিবিধানসংক্রান্ত আয়াতগুলো তাঁর আমল। দয়া ও অনুগ্রহসংক্রান্ত আয়াতগুলো নবীজির জামাল (সৌন্দর্য) আর ধমক ও গোস্বাসংক্রান্ত আয়াতগুলো তাঁর জালাল (তেজোদীপ্ততা)।

---

১. মুসনাদে আহমাদ : হাদীছ নং ২৩৪৬০

তাওয়াজ্জুহসংক্রান্ত আয়াতগুলো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফানা (আল্লাহর সত্তায় বিলীন হওয়া) আর আল্লাহর দিকে দাওয়াতসংক্রান্ত আয়াতগুলো তাঁর বাকা (অস্তিত্ব)। গাইরুল্লাহর নফী (অনস্তিত্ব) সংক্রান্ত আয়াতগুলো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খালওয়াত (নির্জনতা,একাকিত্ব) আর সত্যের প্রমাণসংক্রান্ত আয়াতগুলো তাঁর জালওয়াত (সভা-সমাবেশ)।

মোটকথা যেমনিভাবে পবিত্র কুরআনের ইল্‌মি (জ্ঞানগত) বিরলতার কোনো সীমারেখা নেই, তদ্রূপ নবীজির আমলি (আমলগত) বিরলতারও কোনো সীমারেখা নেই। আল্লাহু আকবার কাবীরা!

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

সাহাবাগণ নবীজির গুণাবলির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কারণ, শিক্ষকের গুণাবলি ও দক্ষতা সদা ছাত্রের মাধ্যমেই প্রতিভাত হয়। প্রত্যেক সাহাবী নবুওতের জ্বলন্ত প্রমাণ। নবীজির পৃথিবী থেকে তিরোধানকালে প্রায় এক লাখ চব্বিশ হাজার সাহাবী পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিলেন। পৃথিবীতে সর্বমোট এ পরিমাণ নবী-রাসূলগণ অতিবাহিত হয়েছেন। বদরী সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন। রাসূলগণের সংখ্যাও ছিল ৩১৩ জন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে নবীজির বিশিষ্ট খলীফা ছিলেন চারজন। এদিকে নবীগণের মধ্যে কিতাবধারী ছিলেন কেবল চারজন। বোঝা গেল, নবীজি এই ধরা পৃষ্ঠ থেকে বিদায়কালে সোয়া লক্ষ নবীগণের গুণাবলি সোয়া লক্ষ সাহাবায়ে কেরামের মাঝে স্থানান্তর করে দিয়েছেন। এ কারণেই প্রতিজন সাহাবী কোনো-না-কোনো নবীর গুণাবলির অধিকারী হয়েছেন। নবীজি বলেছেন :

أَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ

'আমার সাহাবীগণ আকাশের নক্ষত্রসদৃশ; তোমরা তাদের যে কারো অনুসরণ করলে হেদায়াত পেয়ে যাবে।'[১]

তিনি আরও বলেন :

اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُوْلٌ

'সাহাবীগণ প্রত্যেকে ন্যায়পরায়ণ ছিলেন।'

---

১. জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহ : হাদীছ নং ৮৯৮

এরা হলেন সেসব লোক, যাদের আপাদমস্তকের যাবতীয় লক্ষণাদি তাওরাত ও ইনজীল কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। দুনিয়াতে থাকতেই আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে জান্নাতের শুভসংবাদ দান করেছেন। এই ঘোষণা এমনিতেই দেওয়া হয়নি; বরং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে আপন সন্তুষ্টির সনদ প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوٰى

'এরা ওই সকল লোক, আল্লাহ যাদের অন্তরগুলোকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করেছেন।'[১]

প্রশ্ন কী ছিল? তাকওয়ার ছিল। তারপর আল্লাহ নিজেই ফলাফল ঘোষণা করেছেন :

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا

'তারা-ই হলো খাঁটি মুমিন।'[২]

সাহাবায়ে কেরামের ফিকহসংক্রান্ত বিরোধ আমাদের জন্য রহমত

এখন প্রশ্ন দেখা দেয়, একই শিক্ষক যখন তার শীর্ষদের ট্রেনিং করান, তাদের আমলগুলো তো একই ধরনের হওয়া উচিৎ ছিল। সাহাবায়ে কেরামের শিক্ষকও তো কেবল একজন ছিলেন। তাদের আমলে পার্থক্য কেন? এর মূল রহস্য হলো, আল্লাহ তা'আলা তাদের এই মতবিরোধের লাভ আমাদের দান করেছেন। যেন আমরা আমাদের অবস্থাসাপেক্ষে তাঁদের যে কারো অনুসরণ করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ নবীজি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার সম্ভাব্য চারটি পদ্ধতি রয়েছে।

১. মাওলার প্রেমে পাগল হয়ে যা কিছু আছে সব আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবে। এমন পরিস্থিতি হলে সে হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর পদাঙ্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

---

১. সূরা হুজুরাত : আয়াত ৩

২. সূরা আনফাল : আয়াত ৪

২. আর যদি কখনো এমন পরিস্থিতি হয় যে, সে দীন ও দুনিয়া উভয়টির মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখবে। অর্থাৎ– অর্ধেক মাল আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবে আর বাকি অর্ধেক পরিবার-পরিজনের জন্য রেখে দিবে। এমনসব লোকদের জন্য হযরত ওমর (রাযি.)-এর পদাঙ্ক বিদ্যমান।

৩. তৃতীয় পদ্ধতি হলো, কোনো-কোনো সময় আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এত অঢেল সম্পদের মালিক বানিয়ে দেন যে, সে যতই খরচ করুক-না কেন, তার মালে কোনো ব্যবধান পরিলক্ষিত হয় না। হযরত ওসমান (রাযি.)-এর জীবনে তাদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।

৪. চতুর্থ পদ্ধতি হলো, কখনও অভাব ও দরিদ্রতা মানুষকে এমনভাবে ঘিরে ধরে যে, সে আল্লাহর পথে ব্যয় করার মতো কিছুই পায় না, তাহলে সায়্যিদুনা হযরত আলী (রাযি.)-এর জীবন তার জন্য আলোর মিনার। কারণ, জীবনে কখনো তার ওপর যাকাত ফরজ হয়নি এবং তিনি কোনো সঞ্চয়ই করেননি। এবার মানুষ যে অবস্থায়ই থাকুক-না কেন, এই চারটি পদ্ধতির কোনো একটি অবলম্বনের ক্ষেত্রে তার জন্য সাহাবায়ে কেরামের জীবনে রয়েছে উত্তম নমুনা। সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন অবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা উম্মতের জন্য ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

খুলাফায়ে রাশেদীনের মর্যাদাগত বিন্যাস

যারা খুলাফায়ে রাশেদীন হয়েছেন, তাঁরা তাদের মর্যাদাগত বিন্যাস হিসেবেই হয়েছেন। সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবার (রাযি.) হলেন সর্বপ্রথম খলীফা এবং তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। মনে রাখবেন, সূর্য উদিত হলে তার কিরণ সর্বপ্রথম সে ভবনের ওপর পড়ে যে ভবনটি অধিক উঁচু। ঠিক তেমনি নবুওতের সূর্য উদিত হওয়ার পর তার রশ্মি সর্বপ্রথম সেই মহান ব্যক্তিত্বের ওপর গিয়ে পড়ল, যিনি এই উম্মতের সর্বোচ্চ ব্যক্তি। নবীজির সাথে আত্মীয়তার দিকটিকে যদি মাপকাঠি সাব্যস্ত করা হয়, তবুও খুলাফায়ে রাশেদীনের বিন্যাস সহজেই বোঝা সম্ভব। সামাজিক প্রচলন ও শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি মোতাবেক শ্বশুরের মর্যাদা জামাতা অপেক্ষা বেশি। কারণ, শ্বশুর হলেন পিতাতুল্য আর জামাই পুত্রতুল্য।

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) ইসলামেও সবার আগে প্রবেশ করেছেন এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্বশুর হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। তাই তিনি প্রথম খলীফা নিযুক্ত হয়েছেন। সায়্যিদুনা ওসমান

গনী এবং সায়্যিদুনা আলী (রাযি.) দুজনেই জামাতা ছিলেন। তবে হযরত ওসমান গনী (রাযি.)-এর বিবাহে নবীজির দুই কন্যা ছিল। এ কারণে তাকে জিন্নুরাইন বলা হয়। ফলে তিনি তৃতীয় খলীফা নিযুক্ত হয়েছেন। আর হযরত আলী চতুর্থ খলীফা নিযুক্ত হয়েছেন।

খুলাফায়ে রাশেদীনের মুখের বুলি

হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযি.)-এর মুখের বুলি ছিল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। অর্থাৎ– বেশির ভাগ সময় তার জবান থেকে এই শব্দগুলো উচ্চারিত হতো। তার কারণ ছিল, তিনি আল্লাহ তা'আলার সত্তায় এত বেশী ডুবে থাকতেন যে, গাইরুল্লাহর প্রতি তাঁর দৃষ্টি কখনই যেত না। হযরত ওমর (রাযি.)-এর বুলি ছিল 'আল্লাহু আকবার'। মনে হচ্ছে, যেন গাইরুল্লহার প্রতি কখনো তাঁর দৃষ্টি গেলেও দৃষ্টি থাকত গবেষণামূলক। তাই তিনি বুঝে নিতেন, এগুলো কিছুই নয়। মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী সত্তা একমাত্র আল্লাহ। হযরত ওসমান (রাযি.)-এর বুলি ছিল 'আল হামদুলিল্লাহ', যেন আল্লাহ তা'আলার প্রতি সদা তাঁর পূর্ণ দৃষ্টি থাকত। তবে মাঝেমধ্যে গাইরুল্লাহর প্রতি দৃষ্টি পড়লে তাদের ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতিই দৃষ্টি পড়ত। তখন তিনি ভাবতেন, মাখলুকের মধ্যে বহু দোষ রয়েছে। দোষমুক্ত সত্তা একমাত্র একজনই। তাই মনের অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে আসত আলহামদুলিল্লাহ।

সায়্যিদুনা হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুর মুখের বুলি ছিল 'সুবহানাল্লাহ'। কারণ, তিনি আল্লাহ তা'আলার সত্তায় পুরোপুরি ডুবে থাকতেন। তবে কখনো যদি মাখলুকের প্রতি তার দৃষ্টি পড়ত, তাহলে তাদের গুণাবলির ওপর পড়ত। তাই অনিচ্ছাকৃতভাবেই 'সুবহানাল্লাহ' বলে উঠতেন। অর্থাৎ– হে পূর্ণতার অধিকারী! তুমি কত মহত্ত্বের অধিকারী যে, তুমি মাখলুকের মধ্যেও এমন গুণাবলি সৃষ্টি করেছ।

সাহাবায়ে কেরামের সর্বোৎকৃষ্ট দুটি গুণ

সাহাবায়ে কেরামের মাঝে দুটি বিষয় বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হতো। একটি হলো, তাঁরা নবীপ্রেমের সর্বশীর্ষে ছিলেন। দ্বিতীয়টি হলো, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের প্রান্তসীমায় অবস্থিত ছিলেন।

সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবার (রাযি.)-এর নবীপ্রেম

সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবার (রাযি.) যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হিজরতের উদ্দেশ্যে রওনা করলেন, তখন সিদ্দীকে আকবার (রাযি.)-এর পরিবারের সকল সদস্য নবীজির খেদমতে মশগুল হয়ে গেলেন। ভেবে দেখুন, আবুবকর (রাযি.) নিজে সাথে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছেন। স্ত্রীকে বলে দিলেন, আমাদের জন্য খাবার রান্না করে দিবে। ছেলেকে বলে দিলেন, কুরাইশ নেতৃবর্গের সব কথাবার্তা রাতের বেলা আমাদের জানিয়ে দেবে। গোলামকে বলে দিলেন, বকরি চরানোর বাহানায় আমাদের দুধ দিয়ে আসবে। মেয়ে আসমা (রাযি.)কে বলে দিলেন, তোমার আম্মু খাবার তৈরি করলে তুমি তা আমাদেরকে পৌছিয়ে দেবে।

হযরত আসমা বিনতে আবুবকর (রাযি.) খাবার পৌছাতে লাগলেন। একদিন হযরত আসমা (রাযি.) খাবার নিয়ে হাজির হলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কপালে ক্ষতের চিহ্ন দেখতে পেলেন। চেহারা মলিন। জিজ্ঞাস করলেন, কী হয়েছে আসমা? আসমা বললেন, গত কাল খাবার দিয়ে ফিরে যাওয়ার পথে আবুজাহ্লের সাথে সাক্ষাৎ হলো। সে বলতে লাগল, আবুবকরের মেয়ে! তুমি তো অবশ্যই জানবে তোমার পিতা কোথায়। আর তোমার পিতা যেখানে থাকবেন, সেখানে মুসলমানদের নবীও থাকবেন। বলো, তুমি কি তাদের খবর জান? আমি বললাম জানি। পুনরায় জিজ্ঞেস করল, তোমাদের নবী কোথায় তা-ও কি জান? আমি বললাম, জানি। সত্য কথা যখন বলে দিলাম, আবুজাহল আমাকে ধরে বলল, তাহলে বলো, তারা কোথায় আছে? না বললে মারব কিন্তু। আমি বললাম বলব না।

আমি আমার কথায় অটল থাকলাম। হঠাৎ সে সজোরে আমার চেহারায় একটা চড় বসিয়ে দিল, যদ্দরুন আমার দাঁত থেকে রক্ত বেরিয়ে এল। আমি নিচে পাথরের ওপর পড়ে গেলাম। কপাল চিরে রক্ত বের হলো। সে আমাকে বহু মারপিট করল। কিন্তু আমি তার মারপিট সহ্য করেছি। শেষমেষ আমি তাকে বলেছি, আবুজাহল! আমার জীবনটাকে তোমার হাতে তুলে দিলাম। যত খুশি মারতে পার; কিন্তু মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনই তোমার হাওলা করব না।

হযরত আসমার বিবরণ শুনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ অশ্রুসজল হলো। নবীজি তখন একটি ঐতিহাসিক বাক্য উচ্চারণ

করলেন, 'আবুবকর! আমি পৃথিবীর সবার অনুগ্রহের প্রতিদান পরিশোধ করেছি; কিন্তু তোমার অনুগ্রহের প্রতিদান আল্লাহ্ দান করবেন।'[১]

তাঁরা ছাওর পর্বতের গুহা থেকে সামনে অগ্রসর হলেন। পথে নবীজির ক্ষুধা পেল। খাবারের কোনো ব্যবস্থা নেই। কারণ, ছাওর পর্বতের গুহা পর্যন্ত তো খাবার আসত। সামনে অগ্রসর হওয়ার পর আর কোনো ব্যবস্থা নেই। একজায়গায় একমহিলার কাছে ছাগল ছিল, যা দুধ দিত না। হযরত আবুবকর (রাযি.) মহিলার কাছে গিয়ে বললেন, আমি কি এর দুধ দোহন করতে পারি? মহিলা বলল, বকরি তো দুধ দেয় না। তিনি বললেন, তুমি অনুমতি দিয়ে দাও। সে অনুমতি প্রদান করল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জিযার কারণে বকরির স্তনে দুধ এসে পড়ল। সায়্যিদুনা আবুবকর (রাযি.) দুধ দোহন করে নবীজির খেদমতে হাজির হলেন। নবীজি দুধ পান করলেন। আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) তখন একটি ঐতিহাসিক বাক্য উচ্চারণ করলেন, 'তিনি এত পান করলেন যে, আমি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম'।

সুবহানাল্লাহ! বললেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত পরিমাণ পান করলেন যে, আমার অন্তর সন্তুষ্ট হয়ে গেল। বলেননি, এত পরিমাণ পান করেছেন যে, তার অন্তর সন্তুষ্ট হয়ে গেল। এগুলো প্রেম ও আসক্তির কথা।

একদা সিদ্দীকে আকবার (রাযি.) নবীজির খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর নবী! আমি আমার পিতা আবুকুহাফা ঈমান গ্রহণ করায় এতটা আনন্দিত হইনি, যতটা হযরত আব্বাসের ঈমান গ্রহণ করায় হয়েছি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কেন? আরজ করলেন, আবু কুহাফা যদিও আমার পিতা; তাঁর ঈমান গ্রহণে আমার আনন্দ লেগেছে। কিন্তু হযরত আব্বাস (রাযি.) আপনার চাচা হওয়ায় তাঁর ঈমান গ্রহণে আপনি আনন্দিত হয়েছেন। আমার কাছে নিজের আনন্দের তুলনায় আপনার আনন্দ অধিক প্রিয়। এজন্যই নবীজি ইরশাদ করেছেন :

مَا صَبَّ اللّٰهُ فِيْ صَدْرِيْ اِلَّا وَقَدْ صَبَبْتُهٗ فِيْ صَدْرِ اَبِيْ بَكْرٍ

'আল্লাহ তা'আলা আমার বক্ষে যা কিছু ঢেলে দিয়েছেন, আমি তা আবুবকরের বক্ষে ঢেলে দিয়েছি।'[২]

পূর্ণ আনুগত্যের ফলে এটি সম্ভব হয়েছে। এর দুটি দলিল রয়েছে।

---

১. ছহীহ বোখারি : হাদীছ নং ৩৯০৫

২. কাশফুল খাফা ১/৩১৯

সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবার (রাযি.)-এর নবীর আনুগত্য

১. সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবার (রাযি.) সুন্নাতের পূর্ণ অনুসারী ছিলেন। এমনকি তাঁর আপাদমস্তক, পোশাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা, চালচলনসহ সব কিছুতেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাদৃশ্য ছিল। এ কারণেই যখন হযরত আবুবকর (রাযি.) হিজরতের সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মদীনায় পৌঁছলেন, তখন সেখানকার লোকেরা দুজনের মধ্যে কে আল্লাহর রাসূল চিনতে অসুবিধা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ! কেমন পরিপূর্ণ আনুগত্য ছিল যে, কে অনুসরণীয় আর কে অনুসারী তা বুঝতে লোকদের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে!

২. নবীজির ওপর প্রথমবার যখন ওহী নাযিল হলো, তখন তিনি ঘরে তাশরীফ এনে হযরত খাদিজা (রাযি.)কে বললেন, আমার ভয় হচ্ছে, নাজানি কখন শেষ হয়ে যাই। তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন এবং নবীজির তিনটি গুণের কথা উল্লেখ করলেন :

إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ

'আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, দুঃস্থ ও অসহায়দের সাহায্য করেন এবং দুর্যোগগ্রস্তদের সহযোগিতা করেন।'[১]

তারপর বললেন, আল্লাহ আপনাকে কখনো ধ্বংস করবেন না। হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর ইন্তেকালের পর একব্যক্তি তাঁর গোলামকে বলল, তুমি আবুবকর সম্পর্কে তোমার ব্যক্তিগত অভিমত ব্যক্ত করো। সে হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর ওই তিনটি গুণের কথা-ই উল্লেখ করল, যে গুণগুলোর কথা নবীজি সম্পর্কে হযরত খাদিজা (রাযি.) বলেছিলেন।

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.)-এর নবীপ্রেম

হযরত ওমর (রাযি.)-এর খেলাফত আমলে হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাযি.)-এর মাসিক ভাতা আপন পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর তুলনায় বেশি ধার্য করলেন। অথচ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর জ্ঞান ও মর্যাদায় বড় ছিলেন। একদিন পুত্র তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আব্বাজান! এর কারণ কী? বললেন, হযরত যায়েদ ও তাঁর পুত্র উসামার সাথে আল্লাহর নবীর

১. ছহীহ বোখারি : হাদীছ নং ৩

ঘনিষ্ঠতা তুমি ও তোমার পিতার তুলনায় বেশি ছিল। তাই আমি তার মাসিক ভাতা বেশি ধার্য করেছি।

সাহাবায়ে কেরামের ইজতিহাদ (গবেষণা)

সমষ্টিগতভাবে সাহাবায়ে কেরাম তাকওয়া ও ঈমানের সর্বোচ্চ চূড়ায় আসীন ছিলেন। তথাপি যারা জ্ঞান, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতায় অতুলনীয় ছিলেন, কুরআন হাদীছ থেকে মাসায়িল উদ্ভাবন করার দায়িত্ব তাঁদেরই ঘাড়ে ছিল। সুতরাং চার খলীফা, সাইয়্যিদা আয়েশা (রাযি.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত জায়েদ ইবনে ছাবিত, হযরত উম্মে সালামা, হযরত তালহা, হযরত জুবায়ের, হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, হযরত আনাস ইবনে মালেক, হযরত আবু সাঈদ খুদরি, হযরত আবু হুরায়রা, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস, হযরত সালমান ফারসি, হযরত যাবের ইবনে আব্দুল্লাহ, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন, হযরত উবাদা ইবনে ছামিত, হযরত মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান, হযরত মু'আয ইবনে জাবাল, হযরত উবাই ইবনে কা'ব, হযরত আবু মূসা আশ'আরি, হযরত আবুবাকরাহ সাকাফি (রাযি.) এঁরা সবাই ইজতিহাদ (উদ্ভাবন) করতেন। এই ব্যক্তিবর্গের মতামতের ভিত্তিতে ফাতাওয়া দেওয়া হতো। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বায় এ জাতীয় বহু ফাতাওয়া বর্ণিত আছে।

তাবেয়ীগণের যুগ

তাবেয়ীগণের যুগও ভালো যুগ ছিল। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোরালোভাবে বলেছেন :

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

'সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ হলো আমার যুগ। তারপর যারা তাদের সাথে মিলিত। তারপর যারা তাদের সাথে মিলিত।'[১]

তাবেয়ীগণ নবীজিকে না দেখলেও তাঁরা এমন ব্যক্তিবর্গকে অবশ্যই দেখেছেন, যাঁরা নবীজিকে দেখেছেন। এঁরা তাঁদের কাছে দীন শিখেছেন। তাঁদের কাছে নবীজির বার্তা শুনেছেন। সাহাবায়ে কেরাম নবীজির

---

১. ছহীহ বোখারি : হাদীছ নং ২৪৫৮

কথাবার্তাগুলোকে এমনভাবে উপস্থাপন করতেন যে, তাবেয়ীগণ এমন অনুভব করতেন, যেন তারা আপন চোখে নবীজিকে দেখতে পাচ্ছেন। হাদীছ শরীফে আছে :

طُوْبٰى لِمَنْ رَاٰنِىْ وطُوْبٰى لِمَنْ رَاٰى مَنْ رَاٰنِىْ

'সুসংবাদ তার জন্য, যে আমাকে দেখেছে। তারও জন্য, যে তাদের দেখেছে, যে আমাকে দেখেছে।'[১]

মদীনার বিখ্যাত সাত ফকীহ্

তাবেয়ীগণের মধ্যে যারা মুজতাহিদ (উদ্ভাবক,গবেষক) ছিলেন, তাদের মধ্যে মদীনার সাতজন ফকীহ বিখ্যাত ছিলেন। ১. আবুবকর ইবনে হারিছ, ২. সুলাইমান ইবনে ইয়াসার ৩. খারেজা ইবনে যায়েদ ৪. কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ, ৫. সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব ৬. আব্দুল্লাহ ইবনে উতবা, ৭. সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.)।

চার ইমামের অবদান

তার পরও আল্লাহ তাঁর এমন কিছু বান্দা সৃষ্টি করেছেন, যারা কুরআন ও হাদীছের ধারক-বাহক বলে গণ্য হয়েছেন। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ৮০ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন। ইমাম মালেক (রহ.) ৯৫ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ১৫০ হিজরি সনে জন্ম লাভ করেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ১৬৬ হিজরিতে জন্ম লাভ করেন। এই চারজন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চাঁদ-সুরুজ ছিলেন। তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বহু কাজ সম্পাদন করেছেন। তাঁরা কুরআন ও হাদীছ অধ্যয়ন করে লক্ষ-লক্ষ মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন। কুরআন-হাদীছকে উম্মতের জন্য সুস্বাদু পায়েসতুল্য করে দিয়েছেন, যেন পরবর্তী কালের লোকেরা অতি সহজেই তদনুযায়ী আমল করতে পারে। এই উম্মতের জন্য রয়েছে তাদের বিরাট অবদান।

সাহাবীদের যুগে ইমাম আবু হানীফার তাকলীদ (অনুসরণ)

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ১১৫ হিজরি থেকে ফাতাওয়া প্রদানের কাজ শুরু করেছেন। ১২০ হিজরিতে আপন ওস্তাদের স্থলাভিষিক্ত হন। তখন

---

১. আল-মুসতাদরাক : হাদীছ নং ৭০৯৫

থেকেই তাঁর অনুসারী ও ভক্তবৃন্দের সংখ্যা বাড়তে লাগল। ইরশাদুস্‌সারী কিতাবের গ্রন্থকার লিখেছেন, হযরত তারিক ইবনে শিহাব বাজালি (রাযি.) ১২৩ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেছেন। এই বর্ণনা মোতাবেক বলা যায়, ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর তাকলীদ (অনুসরণ) সাহাবীদের যুগ থেকেই শুরু হয়েছিল।

মুহাদ্দিছ ও ফকীহগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য

তারপর মুহাদ্দিছগণের একটি দল তৈরি হলো, যাঁরা হাদীছগুলোকে একত্রিত করেছেন। তাঁদের দৃষ্টান্ত হলো মেডিকেল ষ্টোরকিপারদের মতো, যাদের কাছে ওষুধ পড়ে থাকে। মুহাদ্দিছগণের নিকট ঠিক এমনই হাদীছের ভান্ডার থাকে। ফকীহগণ হলেন ডাক্তারসদৃশ। যেমনিভাবে ডাক্তারগণই ওষুধ দিতে পারেন, তেমনি ফকীহগণই মাসআলা বর্ণনা করতে পারেন। ইমাম তিরমিযি (রহ.) কিতাবুল জানায়িয পর্বে লিখেছেন–

اَلْفُقَهَاءُ اَعْلَمُ بِمَعَانِي الْاَحَادِيْثِ

ফকীহগণই হাদীছের অর্থ ভালো জানেন।'

বুখারি শরীফের রাবীদের মধ্যে থেকে একজন হলেন সুলায়মান ইবনে মিহরান। একদিন তিনি ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর নিকট একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি মাসআলাটি বলে দিলেন। সুলায়মান ইবনে মিহরান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মাসআলাটি আপনি কোথা থেকে জানলেন? ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বললেন, হযরত! আপনার কাছ থেকেই আমি এই হাদীছটি শুনেছি। তিনি বললেন, আপনার মাতাপিতা যখনও এক বিছানায় শয়ন করেনি, তখন থেকেই হাদীছটি আমার জানা ছিল। কিন্তু আপনি বলার পর এইমাত্র আমি হাদীছটির সঠিক অর্থ অনুধাবন করেছি। তারপর তিনি বললেন :

نَحْنُ الصَّيَادِلَةُ وَاَنْتُمُ الْاَطِبَّاءُ

'আমরা হলাম মেডিকেল ষ্টোরকিপার আর আপনারা হলেন ডাক্তার।'

আমরা তো যাচাই-বাছাই করে হাদীছগুলো একত্রিত করে রেখেছি। তবে কোন হাদীছটি কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা আপনারাই ভালো জানেন।

ইমাম আজম (রহ.) ও মুহাদ্দিছগণের ক্রমধারা

বড়ই আশ্চর্যের বিষয় হলো, মুহাদ্দিছগণের সনদের ধারা ইমাম আবু হানীফা (রহ.) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছয়। তার কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি–

১. ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ, ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন (মুহাদ্দিছ), ইমাম বুখারি (রহ.)।

২. ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ, ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন, ইমাম মুসলিম (রহ.)।

৩. ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ, ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন (মুহাদ্দিছ), ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাসায়ী।

৪. ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ, ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন (মুহাদ্দিছ), আবু ইয়ালা মুছেলি (মুসনাদ গ্রন্থকার)।

৫.ইমাম আবু হানীফা, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারাক (মুহাদ্দিছ), ইয়াহইয়া ইবনে আকছাম, মুহাদ্দিছ ইমাম তিরমিযি, ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.)।

৬. ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)।

৭. ইমাম আবু হানীফা, শায়েখ মিস'আর ইবনে কুদাম মুহাদ্দিছ, ইমাম বুখারি, ইমাম ইবনে খুযায়মা, হাকেম, ইমাম বায়হাকি (রহ.)।

৮. ইমাম আবু হানীফা, শায়েখ মিস'আর ইবনে কুদাম মুহাদ্দিছ, ইমাম বুখারি, ইমাম ইবনে খুযায়মা ও ইমাম দারাকুতনি (রহ.)।

৯. ইমাম আবু হানীফা, শায়েখ মক্কী ইবনে ইবরাহীম মুহাদ্দিছ, শায়েখ আবু আওয়ানা তাবরানি।

১০. ইমাম আবু হানীফা, শায়েখ মক্কী ইবনে ইবরাহীম মুহাদ্দিছ, শায়েখ আবু আওয়ানা ইবনে 'আদি।

১১. ইমাম আবু হানীফা, শায়েখ ফজল ইবনে রুকাইন, ইমাম দারেমি (রহ.)।

১২. ইমাম আবু হানীফা, শায়েখ ফজল ইবনে রুকাইন মুহাদ্দিছ, ইমাম যাহাবি (রহ.)।

১৩. ইমাম আবু হানীফা, শায়েখ ফজল ইবনে রুকাইন মুহাদ্দিছ, শায়েখ ইসহাক (রহ.)

ইমাম আবু হানীফাকর্তৃক খলীফা মানসুরকে নিরুত্তর করা

আল্লাহ ইমাম আবু হানীফা (রহ.)কে এমন গুণ দান করেছেন যে, এমন পূর্ণতা ও গুণের অধিকারী ব্যক্তি এই উম্মতের মাঝে খুব কমই অতিক্রম করেছেন। একদা সমকালীন বাদশাহ ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাবী, ইমাম ছাওরি এবং অন্য একজন ফকীহর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করলেন। তার ইচ্ছা ছিল, চারজনের কোনো একজনকে প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগ দান করা। কিন্তু কেউ তা গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না। ফলে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করল। রাস্তায় কোনো এক জায়গায় পৌঁছে চতুর্থ ফকীহ এমনভাবে একধারে সরে গেলেন, যেন তাঁর পেশাব-পায়খানার বেগ হয়েছে। পুলিশ অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু তিনি যে গেলেন একেবারেই চলে গেলেন। এটা ছিল তাঁর কৌশল। অপর তিনজন রয়ে গেলেন।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বললেন, আমি কি অনুমান করে দেখব, কী হতে পারে? সবাই বললেন, দেখুন। ভেবেচিন্তে তিনি বললেন, আমি সেখানে গিয়ে এমন কথা বলব যে, খলীফা মানসুরের কাছে তার কোনো উত্তরই থাকবে না; ফলে আমি মুক্তি পেয়ে যাব। ইমাম শা'বীও কোনো কৌশল অবলম্বন করে মুক্ত হয়ে যাবেন। তবে সুফিয়ান ছাওরি ফেঁসে যাবেন।

শেষ পর্যন্ত এমনই হলো। তিনজনকে যখন দরবারে হাজির করা হলো, ইমাম শা'বী খানিক অগ্রসর হয়ে খলীফা মানসুরকে বলতে লাগলেন, খলীফা সাহেব! আপনি কেমন আছেন? আপনার বিবি-বাচ্চা কেমন আছে? আপনার প্রাসাদ কেমন আছে? আপনার আস্তাবলের অবস্থা কেমন? আপনার ঘোড়াগুলোর অবস্থা কেমন? আপনার গাধাগুলো কেমন আছে? খলীফা মানসুর অবাক হলেন যে, আমি যাকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করতে চাই, সে আমাকে ভরমজলিসে আমার ঘোড়া-গাধার খবর জিজ্ঞেস করছে! মনে-মনে ভাবলেন, এই লোক প্রধান বিচারপতির মতো এমন গুরুত্বপূর্ণ পদের যোগ্য নয়। সুতরাং তিনি ইমাম শা'বীকে বললেন, আমি আপনাকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দিতে পারি না। এভাবে তিনি বেঁচে গেলেন।

এবার ইমাম আবু হানীফার পালা। খলীফা এবার ইমাম আবু হানীফার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, আবু হানীফা! আমি আগামী দিন থেকে আপনাকে প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগ দান করলাম। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) একটু সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন, আমি প্রধান বিচারপতি হওয়ার যোগ্য নই। খলীফা বললেন, না-না; আপনিই এর যোগ্য। ইমাম আবু

হানীফা (রহ.) বললেন, মাননীয় খলীফা! এখানে দুটি বিষয় আছে। আমি যা বলেছি, তা হয় সঠিক, নয়ত ভুল। যদি ভুল হয়, তাহলে মিথ্যাবাদী কখনো প্রধান বিচারক হতে পারে না। আর সঠিক হলে তো আমি বলেই দিয়েছি যে, আমি প্রধান বিচারকের উপযুক্ত নই। এবার খলীফা বিচলিত হয়ে গেলেন। যদি বলেন, আবু হানীফা! তুমি মিথ্যা বলেছ, তাহলে আবু হানীফা (রহ.) মুক্ত হয়ে যান; আর যদি বলেন, ঠিক বলেছ, তাহলেও আবু হানীফা (রহ.) রেহাই পেয়ে যান। এভাবে ইমাম আজম আবু হানীফা (রহ.) যুগের বাদশাহকে ভরমজলিসে নিরুত্তর করে দিলেন।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মকদ্দমা বোঝার ঘটনা

একবার স্বামী-স্ত্রী নির্জনে সময় কাটাচ্ছিল। স্বামী কথা বলতে আগ্রহী; অথচ স্ত্রীর মনটা খারাপ। একপর্যায়ে স্বামী রাগান্বিত হয়ে স্ত্রীকে বলল, আল্লাহর কসম! তুমি যতক্ষণ-না কথা বলবে, ততক্ষণ আমি তোমার সাথে কোনো কথা বলব না। উত্তরে স্ত্রীও কসম খেল, তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত কথা না বলবে, আমিও ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো কথা বলব না। এবার দুজনে চুপ হয়ে গেল। এভাবে রাত কেটে গেল।

সকালে উঠে মস্তিষ্ক ঠান্ডা হলে দুজনই ভাবতে লাগল, সমাধান একটা হওয়া দরকার। তারা সুফিয়ান ছাওরি (রহ.)-এর নিকট গেল। তাঁকে পুরো ঘটনা শুনিয়ে জিজ্ঞেস করল, এখন সমাধান কী? তিনি বললেন, দুজনের মধ্যে যে প্রথমে কথা বলবে, তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

তখনকার যুগে কেউ শপথ ভঙ্গ করলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হতো না। কারণ, সে সমাজে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলত। এ কারণে উভয়ের মনোবাসনা ছিল যে, কারুরই কসম ভঙ্গ না হোক। দুজনেই পেরেশান। স্বামী ভাবল, ইমাম আবু হানীফা (রহ.)কে জিজ্ঞেস করা দরকার। সুতরাং সে তাঁর দরবারে গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? বলল, হযরত! আমি আমার স্ত্রীকে ডাকছিলাম। কিন্তু সে কোনো কথা বলছিল না, আমার কথা মানছিল না। তাই আমি গোস্বায় বলে দিয়েছি, আল্লাহর কসম! তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সাথে কথা না বলবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমিও তোমার সাথে কথা বলব না। সে তো পূর্ব থেকেই ঝগড়া করতে প্রস্তুত ছিল; তাই সেও বলে উঠল, আমিও ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার সাথে কথা বলব না, যতক্ষণ-না তুমি আমার সাথে কথা বলবে। এখন তো আমরা ফেঁসে গেছি।

হযরত বললেন, যাও; তুমি গিয়ে তার সাথে কথা বলো। সে তো তোমার স্ত্রী। স্বামী খুশিমনে হাসতে-হাসতে ঘরে ফিরে স্ত্রীকে বলতে লাগল, কী খবর? মন-মেজাজ ভালো আছে তো? স্ত্রী বলল, বেশ! তোমার শপথ ভেঙে গেছে। স্বামী বলল, না; আমার শপথ ভাঙেনি। স্ত্রী বলল, কীভাবে? সে বলল, আমি ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর নিকট জিজ্ঞেস করে এসেছি।

সে যুগে মানুষের মাঝে জ্ঞান আহরণের আগ্রহ তীব্র ছিল। স্ত্রী বলল, ঠিক আছে, আমি এক্ষুনি গিয়ে মাসআলা জিজ্ঞেস করব। স্বামী-স্ত্রী দুজনে প্রথমে ইমাম সুফিয়ান ছাওরি (রহ.)-এর নিকট গেল এবং তাঁকে ঘটনাটি অবগত করল। তিনি বললেন, ইমাম আবু হানীফা তো দেখছি, হারামকে হালাল বানিয়ে দিচ্ছেন! চলো; আমিও তোমাদের সাথে যাব। তিনি এমন মাসআলা কীভাবে দিলেন?

সবাই যখন ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর নিকট পৌঁছল। সুফিয়ান ছাওরি (রহ.) জিজ্ঞেস করলেন, আবু হানীফা! আপনি কীভাবে হারামকে হালাল বানিয়ে দিলেন? ইমাম আবু হানীফা (রহ.) মুচকি হেসে বললেন, হযরত! আমি তো হারামকে হালাল করিনি; বরং হালালকেই হালাল বলেছি। আপনি তাদের কাছে শুনুন, তারা কী বলতে চায়। সুফিয়ান ছাওরি (রহ.) তাদের নিকট জিজ্ঞেস করলেন। এবার ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বললেন, হযরত! প্রথমে স্বামী বলেছে, তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত কথা না বলবে, আমিও বলব না। তখন স্ত্রীও কসম করল। আপনি দেখুন তো, সে কসম খেতে গিয়ে কার সঙ্গে কথা বলল? এতেই স্বামীর কসম পূর্ণ হয়ে গেছে। বাকি রইল স্ত্রীর কসম। এ কারণে আমি স্বামীকে বলেছি, যাও তুমি তার সাথে গিয়ে কথা বলো; তাহলে তার কসমও পূর্ণ হয়ে যাবে। তোমরা দুজনে স্বামী-স্ত্রী হয়ে জীবন যাপন করো। সুফিয়ান ছাওরি (রহ.) তাঁর সূক্ষ্মদর্শিতা ও মামলা বোঝার যোগ্যতা দেখে যারপরনাই বিস্মিত হলেন।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর জ্ঞানগত পূর্ণতা

একব্যক্তি ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর কাছে এসে বিস্ময়কর একটি প্রশ্ন করল। কিছু মানুষ তো উল্টা-পাল্টা প্রশ্ন করেই থাকে। সবখানেই এমন উদ্ভট প্রশ্নকারী কিছু লোক থাকে। বিদ্বান ব্যক্তিরা প্রশ্ন করলে তো কোনো সমস্যা হয় না। যেমন– ইবনে আবী শায়বা ১২৫টি মাসআলা উল্লেখ করে দাবি করেছেন, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এ মাসাআলাগুলোতে হাদীছের

বিরোধিতা করেছেন। আমাদের হানাফী ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, জনাব! আপনি বুঝতে পারেননি, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কুরআন ও হাদীছ সামনে রেখে তার সারনির্যাস কীভাবে বের করেছেন। ত্রুটি মূলত আপনার জ্ঞানের। কারণ, আপনি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন।

যাহোক একব্যক্তি এসে বলল, আপনি ওই ব্যক্তির ব্যাপারে কী বলেন, যে, ১. নাদেখা বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করে, ২. ইহুদি-নাসারাদের কথা সমর্থন করে, ৩. আল্লাহর রহমত থেকে দূরে পালিয়ে যায়, ৪. মৃত প্রাণী আহার করে, ৫. আল্লাহ যার দিকে আহ্বান করেছেন, তার কোনো পরোয়া করে না, ৬. আল্লাহ তা'আলা যে জিনিসের ভয় দেখিয়েছেন, তাকে ভয় পায় না এবং ৭. ফেতনাকে পছন্দ করে?

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বললেন, লোকটি মুমিন।

প্রশ্নকারী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, তা কীভাবে?

তিনি বললেন, দেখো, তুমি প্রথমে বলেছ, না দেখা বিষয়ের সাক্ষ্য দেয়। একজন মুমিন বান্দা তো তার মহান প্রভুকে না দেখেই সাক্ষ্য প্রদান করে।

তোমার দ্বিতীয় কথাটি ছিল, ইহুদি-নাসারাদের কথা সমর্থন করে। পবিত্র কুরআনে আছে-

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصَارٰى عَلٰى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ

'ইহুদিরা বলে, নাসারারা কোনো নির্ভরযোগ্য জিনিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় আর নাসারারা বলে, ইহুদিরা নির্ভরযোগ্য কিছুর ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।'[১]

একজন মুমিন এই উভয়ের কথা-ই সমর্থন করে।

সে বলল, এটাও ঠিক আছে।

তিনি বললেন, তৃতীয় কথাটি ছিল, আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যায়। বৃষ্টি দেখে তো সকলেই পালায়, যেন কাপড় না ভিজে।

সে বলল, এটাও ঠিক আছে।

চতুর্থ কথাটি ছিল, মৃত প্রাণী আহার করে। মরা মাছ তো সবাই মজা করে খায়।

সে বলল ঠিক আছে।

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ১১৩

পঞ্চম কথাটি ছিল, আল্লাহ যেদিকে আহ্বান করেছেন, সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। সেটি হলো জান্নাত। কেননা, আল্লাহ তার দিকে আহ্বান করেছেন। وَ اللّٰهُ يَدۡعُوۡۤا اِلٰی دَارِ السَّلٰمِ (আর আল্লাহ শান্তিনিবাসের (জান্নাতের) দিকে আহ্বান করেন)। আল্লাহর দিদার ও তাঁর সন্তুষ্টি তার এতই কাম্য যে, সে প্রকৃত প্রেমাস্পদ থেকে জান্নাতের দিকে দৃষ্টি ফেরাতেও পছন্দ করে না।

ষষ্ঠ কথাটি বলেছ, আল্লাহ তা'আলা যার ভয় দেখিয়েছেন, তাকে ভয় পায় না। সেটা হলো জাহান্নাম। প্রেমাস্পদের অসন্তুষ্টির প্রতি তার এতই মনোযোগ যে, সে জাহান্নামে জ্বলার কোনো ভয়ই করে না।

সপ্তম কথাটি হলো, সে ফেতনাকে ভালোবাসে। পবিত্র কুরআনে সন্তানসন্ততিকে ফেতনা বলা হয়েছে। আল্লাহ বলছেন :

اِنَّمَاۤ اَمۡوَالُکُمۡ وَاَوۡلَادُکُمۡ فِتۡنَۃٌ

'তোমাদের মালামাল ও সন্তানসন্ততি তো ফেতনা।'[১]

অথচ স্বভাবগতভাবে সবাই সন্তানসন্ততিকে ভালোবাসে।

কাজেই লোকটি মুমিন।

উত্তর শুনে প্রশ্নকারী অবাক হয়ে গেল।

বিরল প্রশ্নের বিস্ময়কর উত্তর

আরেক ব্যক্তি আবু হানীফা (রহ.)-এর কাছে এসে বলল, আমি শুনেছি, আপনি যেকোনো প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন। তিনি বললেন, তুমিও প্রশ্ন করো। সে বলল, বলুন, পায়খানা মিষ্টি, নাকি নোনা? তিনি বললেন, মিষ্টি। সে বলল, আপনার কাছে এর কী প্রমাণ আছে? তিনি বললেন, মাছি কখনো নোনা জিনিসের ওপর বসে না। বরং সব সময় মিষ্টি জিনিসের ওপর বসে।

ইমাম মালেক (রহ.)-এর নবীপ্রেম

আল্লাহ ইমাম মালেক (রহ.)কে নবীপ্রেমে পূর্ণতা দান করেছিলেন। তিনি পবিত্র মদীনায় জুতা পরিধান করে কখনো হাঁটতেন না। এমনকি ঘোড়ায়ও সাওয়ার হতেন না। তিনি বলতেন, মালেকের জন্য বিষয়টি মোটেও শোভনীয় নয় যে, সে তার ঘোড়ার খুর দ্বারা ওই জায়গাটি মাড়াবে, যেখানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাঁটাচলা করতেন। তিনি যখন হাঁটতেন,

---

১. সূরা তাগাবুন : আয়াত ১৫

একেবারে রাস্তার কিনারা ঘেঁষে হাঁটতেন, যেন কখনো প্রেমাস্পদের পবিত্র কদমের জায়গায় তাঁর কদম না পড়ে। মালেক যেন কখনো বে-আদবিতে লিপ্ত না হয়। আজীবন মদীনায় কাটিয়েছেন। তারপরও মাত্র একবার হজ করেছেন। কেন? যেন প্রেমাস্পদের নগরীর বাইরে মৃত্যু না হয়।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর অবস্থান

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)কে আল্লাহ কেমন উঁচু মর্যাদা দান করেছেন? একবার তিনি সাধারণ কাপড় পরিহিত ছিলেন। এই অবস্থায় চুল কাটানোর জন্য নাপিতের কাছে গেলেন। নাপিত দূর থেকে দেখে ভাবল, এর চুল কেটে আর কত পাব। তাই সে দূর থেকেই বলে দিল, আমার সময় নেই। হযরত (রহ.) ব্যাপারটা বুঝে ফেললেন। গোলামকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কিছু স্বর্ণমুদ্রা আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ; আছে। বললেন, থলেসহ মুদ্রাগুলো নাপিতকে দিয়ে দাও। নাপিতকে বললেন, আমি তোমার হাতে চুল কাটাব না। বাইরে এসে একটি ঐতিহাসিক কবিতা আবৃত্তি করলেন :

عَلَيَّ ثِيَابٌ لَوْ يُبَاعُ جَمِيْعُهَا - بِفَلْسٍ لَكَانَ الْفَلْسُ مِنْهُنَّ اَكْثَرَا

فِيْهِنَّ نَفْسٌ لَوْ تُقَاسُ بِبَعْضِهَا - نُفُوْسُ الْوَرٰي كَانَتْ اَجَلَّ وَاَكْبَرَ

আমার পরিধানে এমন পোশাক রয়েছে, যদি এগুলোকে পয়সার বিনিময়ে বিক্রয় করা হয়, তাহলে এক দেরহামও কাপড়ের মূল্যের চেয়ে বেশি হয়ে যাবে। তবে এমন পোশাকের ভেতরে এমন একটি প্রাণ রয়েছে, এ মুহূর্তে গোটা পৃথিবী খুঁজেও এমন প্রাণ দেখতে পাবে না।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের দৃঢ়তা

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ধৈর্য ও দৃঢ়তার পাহাড় ছিলেন। কুরআন সৃষ্ট হওয়ার মাসআলাকে কেন্দ্র করে তাঁকে যে পরিমাণ বেত্রাঘাত করা হয়েছিল তা যদি কোনো হাতিকে করা হতো, তাহলে সে-ও ছটফট করত। অথচ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মুখে শুধু যিকিরের ধ্বনি ছিল। কষ্টের দরুন উহ! আহ! শব্দও করেননি ।

হালাল রিযিকের নূর

কারী তায়্যেব (রহ.) বলেন, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর ছাত্র ছিলেন। একবার ইমাম শাফেয়ি (রহ.) ইমাম

আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) -এর কাছে চিঠি লিখলেন, অনেক দিন হয়ে গেল, আপনার সাথে দেখা হচ্ছে না। আপনার সাক্ষাতের জন্য আমার মনটা ছটফট করছে। আপনি একটু এলে ভালো হতো। ইমাম শাফেয়ি (রহ.) মিশরে থাকতেন। সেজন্য ওই অঞ্চলে শাফেয়ি মাযহাবের অনুসারী বেশি। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ওস্তাদের চিঠি পেয়ে সফরের প্রস্তুতি নিয়ে দিন-তারিখ ঠিক করে ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর কাছে চিঠি পাঠিয়ে দিলেন, আমি অমুক দিন মিশরে আপনার সাথে মিলিত হব ইনশাআল্লাহ। ইমাম শাফেয়ি (রহ.) তাঁর মেয়েদের বললেন, একজন বড় আলেম আসছেন; তাঁর জন্য ভালো খাবারের আয়োজন করতে হবে। মেয়েরা ভালো মানের খাবার তৈরি করে ঘরে রেখে দিল। তাহাজ্জুদের জন্য জায়নামায আর উজুর জন্য পানির পাত্রও রাখা হলো। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) এসে খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লেন। ভোরবেলা উঠে ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে গেলেন। মেয়েরা কামরা পরিষ্কার করতে এসে দেখল, দু-তিনজনের জন্য রাখা খাবার শেষ হয়ে গেছে আর জায়নামায ও অজুর পানি পূর্বের মতো পড়ে আছে।

দেখে তারা অবাক হলো। কারণ, তারা তাঁর অনেক প্রশংসা শুনেছিল। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, তিনি একজন পেটুক– তাহাজ্জুদও পড়ল না আবার ভোরবেলা বিনা উজুতে মসজিদে চলে গেল। সকালবেলা ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ঘরে ফিরলে মেয়েরা তাঁকে বিস্তারিত জানাল। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলকে বিষয়টি জানালেন যে, আমার মেয়েরা তো এমন-এমন কথা জিগ্যেস করছে।

তিনি বললেন, হযরত! প্রথম লোকমাটি খাওয়ার পরই বক্ষে নূর দেখতে পেলাম। তারপর প্রতিটি লোকমার দরুন আমার বক্ষের নূর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আমি ভাবলাম, জীবনে আর কখনো এমন হালাল ও পবিত্র রিযিক ভাগ্যে জুটবে কিনা কে জানে; কাজেই এই খাবারগুলোকে নিজের দেহের অংশে পরিণত না করার কী যুক্তি আছে? তাই খুব পেট ভরে খেলাম। তারপর বিছানায় শুয়ে পড়লাম। তখন আমার বক্ষে এতই নূর ছিল যে, আমি কুরআনের আয়াত ও নবীজির হাদীছসমূহে চিন্তা করতে লাগলাম। এভাবেই সকাল হয়ে গেল। মাঝে তাহাজ্জুদ পড়ার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু আবার ভাবলাম, ইল্‌মের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা হাজার রাকাত নফল নামায অপেক্ষা বেশি মর্যাদাপূর্ণ।

একারণেই আমি ইল্‌মি চিন্তায়ই রত ছিলাম। ভোরবেলা আপনি যখন এলেন, তখন আমি ফজর পড়তে চলে গেলাম। আমার অজু ভাঙেওনি, অজু করার কোনো প্রয়োজনও দেখা দেয়নি; এজন্য আমি এশার অজু দ্বারা ফজরের নামায আদায় করেছি।

ফিকহে হানাফীর গৌরব

মুসলিম জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলা চার প্রকার ফিক্‌হ দান করেছেন। তার মধ্য থেকে ফিক্‌হে হানাফি এমন যে, মুসলিম বিশ্বে আইন হিসেবে প্রণীত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। ওসমানি খেলাফত আমলে রাষ্ট্রীয় আইন ফিক্‌হে হানাফি মোতাবেক প্রণীত ছিল। পাক ভারত উপমহাদেশে মোগল সম্রাটদের যুগে রাষ্ট্রীয়ভাবে ফিক্‌হে হানাফি চালু ছিল। এই গৌরব কেবল ফিক্‌হে হানাফিরই রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ! বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন, পাকিস্তান, হিন্দুস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, তুরস্ক, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, আজারবাইজান, কাজাকিস্তান, শিকরিস্তান, তাতারিস্তান, রাশিয়া, ইরাক ও শামে বেশির ভাগ মানুষ ফিক্‌হে হানাফির অনুসারী। চিন্তা করে দেখুন, আধা বিশ্বের চেয়ে বেশি অঞ্চল।

মুসলিম জাতির দুর্বলতার মৌলিক কারণ

চার প্রকার ফিক্‌হের ইমামগণ ইল্‌মের এমন খেদমত আঞ্জম দিয়েছেন যে, গোটা বিশ্বজগৎ তাঁদের ইল্‌ম দ্বারা উপকৃত হচ্ছিল। এক-একজন আলেমের দরসে হাজার-হাজার ছাত্র। কিন্তু দুনিয়াদার লোকেরা যখন দেখল, এই ওলামায়ে কেরামের অনেক ইজ্জত-সম্মান করা হয়, রাজা-বাদশারা পর্যন্ত আদবের সাথে হাত জোড় করে তাঁদের সামনে হাজির হয়, তখন দুনিয়াদাররাও বিভিন্ন কিতাব-পত্র পড়তে আরম্ভ করল। কিতাব পড়ে-পড়ে তারা দরবারি মোল্লায় পরিণত হলো। এসকল দরবারি আলেমগণ পরস্পর বিতর্ক শুরু করে দিল। দলিল-প্রমাণ পেশ করতে লাগল। এভাবে দিন-দিন বেশির ভাগ ওলামায়ে কেরাম আপসে তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়ল। ফলে এমন একটি সময় এসে পড়ল যে, সাধারণ জনগণ ওলামায়ে কেরামের কথায় খুব বেশি মনযোগ দিত না। এভাবেই মুসলিম উম্মাহর ঐক্যে বিভেদ দেখা দিতে লাগল।

তাতারি ফেতনায় মুসলমানদের ক্ষয়ক্ষতি

এমন ফেতনা ও বিশৃঙ্খলার সময় কাফেররা মুসলমানদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে বসল। সাতশত হিজরিতে তাতারি ফেতনার সূচনা হয়, যা মুসলমানদের রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়েছিল। বাগদাদে এক দিনে আড়াই লাখ মুসলমানকে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। নর্দমায় মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল। ইমাম আওযায়ি (রহ.) তাঁর কিতাবে লিখেছেন, তাতারিরা বাগদাদ দখল করে মুসলমানদের কিতাব-পত্র দিয়ে দজলা নদীতে পুল তৈরি করেছিল। ইংরেজরাও স্পেন বিজয় করার পর মুসলমানদের কিতাব-পত্র নষ্ট করতে শুরু করল। আপনি শুনে অবাক হবেন, মুসলমানদের কিতাবের ভান্ডার এত বিশাল ছিল যে, এগুলো নষ্ট করতেও তাদের চল্লিশ বছর সময় লেগেছে। এটি কেবল ইসলামেরই গৌরব যে, যে পরিমাণ কিতাব এই ধর্মে লিখা হয়েছে, অন্য কোনো ধর্মে এত লেখা হয়নি। সংকলন ও রচনাকে আল্লাহ তা'আলা এ ধর্মের বৈশিষ্ট বানিয়ে দিয়েছেন।

- শামসুল আইম্মা ইমাম সারাখসি (রহ.) কূপের মধ্যে নজরবন্দী অবস্থায় ছিলেন। কূপের পাড়ে একজন ছাত্র বসে আছে আর তিনি তাঁর দ্বারা ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)-এর বিখ্যাত কিতাব 'মাবসুত'-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখাচ্ছিলেন। এই গ্রন্থটি ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। ওলামায়ে কেরাম আজ সেই ব্যাখ্যা গ্রন্থটি পড়ে থাকেন।
- ইমাম হাসান ইবনে মান্দার মৃত্যুর সময় তাঁর স্বহস্তে লিখা হাদীছের কিতাবভর্তি ৪০টি সিন্দুক রেখে গেছেন।
- হাফেয আবুল কাসিম সুলায়মান ইবনে আহমাদ তাবরানি তিনটি 'মু'জাম' রচনা করেছেন। হাদীছ অন্বেষণ করতে ৩৩ বছর যাবৎ দেশ-বিদেশে সফর করেছেন। এক হাজার মাশায়েখের নিকট থেকে হাদীছ শিক্ষা লাভ করেছেন।
- আবু হাতেম রাযি বর্ণনা করেছেন, তিনি ইল্‌মে হাদীছ শিক্ষার জন্য নয় হাজার মাইল পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেছেন।
- ইবনে মুক্‌রি একটি গ্রন্থ 'ইবনে ফুজালা' সংগ্রহের জন্য ৮৪০ মাইল পথ পাড়ি দিয়েছিলেন।
- হাফেয আবু আব্দুল্লাহ ইস্পাহানি (রহ.) হাদীছ অধ্যয়নের জন্য ১২০টি এলাকায় সফর করেছেন।
- শায়খ ইবনুল জাওযি (রহ.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেছেন, আমি আমার আঙুল দিয়ে দু-হাজার খণ্ড গ্রন্থ রচনা করেছি। তাঁর অসিয়ত মোতাবেক তাঁর কলমের কাঁটছাঁট করা অংশ দ্বারা মৃত্যুপরবর্তী গোসলের পানি গরম করা হয়।

- আরবি সাহিত্যের ইমাম ছা'লাব বর্ণনা করেছেন, একটানা পঞ্চাশ বছর ধরে ইবরাহীম হারবিকে সাহিত্যের প্রতিটি মজলিসে বিদ্যমান পেয়েছি।
- ইমাম রাযি বলেন :

وَ اللهِ اِنِّیْ اَتَاَسَّفُ فِیْ الْفَوَاتِ عَنِ الْاِشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ فِیْ وَقْتِ الْاَ كْلِ فَاِنَّ الْوَقْتَ وَالزَّمَانَ عَزِيْزٌ

'আল্লাহর শপথ! আহারের সময় ইল্মি ব্যস্ততা ছুটে যাওয়ায় আমার আক্ষেপ হয়। কেননা, সময় আমার অতি প্রিয় বস্তু।'

- ইমাম গায্যালি (রহ.) আবুনাছ্র ইসমাঈল-এর কাছ থেকে যেসব নোট লিখেছিলেন, সেগুলো লুট হয়ে গেল। তিনি দস্যুনেতার কাছে সেগুলো ফেরৎ চাইলেন। সে হেসে বলল, তুমি ছাই শিখেছ। একটা কাগজ হারিয়ে গেল আর তুমি অন্ধ হয়ে গেলে! সে পাণ্ডুলিপিগুলো তাকে ফেরৎ দিল। তিনি লাগাতার তিন বছর মুখস্থ করে সেগুলোর হাফেয হয়ে গেলেন।
- কুরতুবি থেকে বর্ণিত আছে, ইমাম শাতেবি (রহ.) যখন কাসীদায়ে শাতিবিয়্যাহ রচনা করেন, তখন সেটি নিয়ে বাইতুল্লাহ শরীফে বার হাজার তাওয়াফ করেছেন। দোআর স্থলে পৌঁছে এই দোআটি পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ الْعَظِيْمِ اِنْفَعْ بِهَا كُلَّ مَنْ قَرَئَهَا

'হে জমিনের স্রষ্টা! দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত! এই ঘরের মালিক। যে এই কিতাবটি পাঠ করবে, তাকে তুমি উপকৃত করো।'

- মহিলারাও জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদান রাখতে পিছিয়ে থাকেনি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের শিক্ষার জন্য একটি দিন ধার্য করে নিয়েছিলেন। শিফা আদাবিয়্যাহকে উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রাযি.)কে লেখা শিখানোর জন্য নিযুক্ত করেছেন। পূর্বসূরীদের মধ্য থেকে কাজী ঈসা তাঁর মেয়েদের রোজ আসরের পর কিতাব পড়াতেন। এভাবে অনেক মহিলা মুহাদ্দিছ হয়ে গেছে। কারীমা মারুযিয়্যাহ ও সায়্যিদা নাফীসা বিনতে মুহাম্মাদ বিখ্যাত ছিলেন। হাফিয ইবনে আসাকির বাল্যকালে ৮০জন মহিলার কাছে হাদীছ অধ্যয়ন করেছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানে হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর অবদানের কথা কারো অজানা নয়।
- মাশায়েখগণ দীন জিন্দা করার লক্ষ্যে বহু ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

তাতারি ফেতনার প্রতিরোধ

তাতারি ফেতনা চলাকালে যখন মুসলমানদের রাজত্ব ও সিংহাসন ছিনিয়ে নেওয়া হলো, তখন খানকাগুলোতে বসে-বসে আল্লাহ-আল্লাহ শিক্ষা দানকারী মাশায়েখগণ দেখলেন, এ মুহূর্তে ওলামায়ে কেরামের সাহায্য প্রয়োজন রয়েছে। ফলে তাঁরা কাফেরদের মোকাবেলায় বেরিয়ে পড়লেন। সে সময় ইমামগণের মধ্য থেকে ইমাম যায়লাই (রহ.), ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) ও তার ছাত্র ইবনুল কায়্যিম এবং তাকী উদ্দীন সুবুকি (রহ.) জীবিত ছিলেন। তথাপি আল্লাহ তা'আলা মাশায়েখগণের মাধ্যমে কাজ নিয়েছেন। সেই নাজুক পরিস্থিতিতে খাজা ফরীদ উদ্দীন আত্তার (রহ.) তাঁর কিতাব তাযকিরাতুল আওলিয়ার মাধ্যমে মুসলমানদের অন্তর আলোকিত করছিলেন। মাওলানা রুমী মছনবী শরীফ রচনা করে গাফেল অন্তরগুলোকে জাগ্রত করেছেন এবং খোদাপ্রেমে উত্তপ্ত করেছেন।

কোনো কোনো মাশায়েখ তাতারি শাহজাদাদের অন্তরের ওপর মেহনত করতে শুরু করলেন, যাদের মধ্যে হযরত খাজা আহমাদ দরবন্দি (রহ.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাতারি শাহজাদাগণ যখন দরবন্দে পৌঁছলেন, মুসলমানরা সবাই শহর ছেড়ে চলে গেলেন। শাহজাদারা জিজ্ঞেস করলেন, শহরে কোনো মুসলমান তো আর বাকি নেই? সিপাহীরা বলল একটি মসজিদে দুজন লোক বসে রয়েছে। বলতে লাগল, বন্দী করে নিয়ে আসো। খাজা আহমাদ দরবন্দীও তাঁর শিষ্যকে হাতে বেড়ি লাগিয়ে হাজির করা হলো। শাহজাদা বলল, আপনারা কি জানেন না, আমরা এখানে প্রবেশ করছি। সবাই চলে গেল; আপনারা কেন গেলেন না?

তারা বললেন, আমরা তো আল্লাহর ঘরে বসা ছিলাম; কেন বেরিয়ে যাব? বলল, আপনারা কি জানেন না, আজ আপনারা আমাদের অধীনে রয়েছেন? তারা বললেন, আল্লাহ চাইলে আমাদেরকে মুক্ত করে দিতে পারেন। শাহজাদা বলল, কীভাবে? তারা সজোরে আল্লাহ বলে উঠলেন। আল্লাহ শব্দ উচ্চারণ করতে-করতেই শিকল ভেঙে মাটিতে পড়ে গেল। তাতারি শাহজাদার অন্তরে ভীতি সঞ্চারিত হলো। বলতে লাগল, আমি আপনাদের মাফ করে দিলাম। হযরত (রহ.)কে মুক্ত করে দেওয়া হলো। পরবর্তী কালে মাঝেমধ্যে শাহজাদা হযরতের সঙ্গে দেখা করতে আসত। হযরত তার অন্তরের প্রতি তাওয়াজ্জুহ দিতে লাগলেন। ৩০ বছর পর এমন একটি সময় এল যে, শাহজাদা বাদশাহ হয়ে গেল এবং হযরতের সুহবতের বরকতে মুসলমান হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা পুনরায় মুসলমানদের হাতে রাজত্ব ফিরিয়ে দিলেন।

আল্লামা ইকবাল বলেছেন :

ہے عیاں آج بھی یورش تاتار کے افسانے سے

پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے

'ইতিহাসে তাতারিদের আক্রমণ দিবালোকের মতো পরিষ্কার
মন্দির থেকে কাবার মিলে গেল পাহারাদার।'

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানি (রহ.)-এর অবদান

সম্রাট আকবরের আমলে আবুল ফজল ও ফয়জির মতো দরবারি মোল্লারা সম্মানসূচক সেজদা জায়েয হওয়ার ফাতাওয়া দিল। 'দীনে এলাহী'র নামে বাদশার প্রবৃত্তির অনুসরণ চলছিল। সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের পরিবর্তে বিদ'আতের ঘোর অমানিশা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। তখন মুজাদ্দিদে আলফেছানি (রহ.) শির্ক ও বিদ'আতের মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে দাওয়াতের ময়দানে নেমে এলেন। দু-বছর যাবৎ গোয়ালিয়ার দুর্গে জিঞ্জিরাবদ্ধ অবস্থায় কারানির্যাতন ভোগ করেছেন। কিন্তু দীন জিন্দা করার জন্য ফারুকি ধমনি উদ্বেলিত হতে লাগল। একপর্যায়ে তাঁর সোহবতের বরকতে শেখ ফরীদ ও জানেজানাঁর মতো জেনারেলগণ দীনি রঙে রঙিন হয়ে গেলেন। তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলে বাদশাহ আকবরের মন-মানসিকতা ঠিক হতে লাগল। ফলে বাদশাহ আকবর শরীয়তবিরোধী কর্মকাণ্ড বন্ধ করবে বলে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হলো। আলহামদুলিল্লাহ! বাদশাহ আকবরের দীনে এলাহীর সব আয়োজন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা মুজাদ্দিদে আলফেছানির মাধ্যমে শির্ক ও বিদ'আতের মূলোৎপাটন করে দিলেন এবং পরিত্যক্ত সুন্নাতগুলো পুনরায় জিন্দা করে দিলেন। এ কারণেই সম্রাট জাহাঙ্গিরের জীবনে দীনি রং সৃষ্টি হলো। পরিশেষে আওরঙ্গজেব ও আলমগিরের মতো মুত্তাকী বাদশাহ শাহী মসনদের উত্তরাধিকারী হলো।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলবি (রহ.)-এর অবদান

পাক ভারত উপমহাদেশে দীন প্রচারে অনেক কাজ হয়েছে। পবিত্র কুরআনের অনুবাদ করা হয়েছে। তাফসীর রচনা করা হয়েছে। শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) তাফসীরের মূলনীতি বিষয়ে আল-ফাওজুল কাবীর রচনা করেছেন। তাঁর পুত্র শাহ আব্দুল কাদের পবিত্র কুরআনের উর্দু ভাষায় এলহামি অনুবাদ করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ একটি আয়াত পেশ করছি :

لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ

অন্যান্য মুফাসসিরগণ এর অনুবাদ করেছেন, 'তারা তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে'। শাহ্ আব্দুল কাদের (রহ.) এর অনুবাদ করেছেন, 'তারা তাদের লজ্জাস্থানকে নিয়ন্ত্রণ করে'। এবার উভয়টির পার্থক্য দেখুন। লজ্জাস্থান হেফাজত করা আর নিয়ন্ত্রণ করা এক নয়। কারণ, যখন উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তখন হেফাজত করা শব্দটি সঠিক অর্থ প্রদান করে না। বরং এ ক্ষেত্রে উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ করা শব্দটি যথাযথ অর্থ প্রদান করে।

অন্য আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে :

اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ

অন্যান্য মুফাসসিরগণ অনুবাদ করেছেন 'অথবা তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের স্পর্শ কর'। এই শব্দটি খানিক কঠিন। শাহ্ আব্দুল কাদের (রহ.) অনুবাদ করেছেন 'অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা কর'। এত সহজ শব্দে অনুবাদ করেছেন যে, এমনিতেই বিষয়টি বুঝে এসে গেছে।

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.)-এর বংশে ইল্‌মের প্রতি কৌতূহল

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.)-এর প্রিয় পুত্র শাহ আব্দুল আযীয (রহ.) উর্দু ভাষায় পবিত্র কুরআনের তাফসীর রচনা করেছেন। একবার তিনি অধ্যয়নকালে পানি চাইলেন। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) জানতে পেরে বললেন, আফসোস! আজ আমার বংশ থেকে ইল্‌ম বিদায় নিল। কারণ, আমার পুত্র অধ্যয়নকালে পানি চেয়েছে। স্ত্রী বললেন, হযরত! ধৈর্য ধরুন। তিনি পানির পরিবর্তে সিরকা মিশিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। শাহ্ আব্দুল আযীয (রহ.) অধ্যয়নে এতই মশগুল ছিলেন যে, পিপাসার তীব্রতার দরুন খুবই অস্থির ছিলেন। ফলে সিরকাগুলো পান করে ফেললেন। তিনি বুঝতেই পারেননি, পানি পান করেছেন, নাকি সিরকা। স্ত্রী যখন বললেন, তার অবস্থা তো এমন, তখন তিনি বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! আমার বংশে এখনও ইল্‌ম বাকি আছে।

এ কারণেই আল্লাহ এদের বাতেনি নেয়ামত দান করেছেন। ইল্‌ম ও আদবের কারণে আল্লাহ তা'আলা শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.)কে এমন শান দান করেছেন যে, মিম্বরে দাঁড়িয়ে মোগল বংশের শাহজাদাদের বলছেন, হে

মোগল বংশের লোকেরা! আল্লাহ তা'আলা ওয়ালী উল্লাহর বক্ষে এমন একটি মুক্তা গচ্ছিত রেখেছেন, তোমাদের রাজ ভান্ডারে এত মূল্যবান মুক্তা থাকলে দেখাতে পার। তোমরা সারা পৃথিবীর সকল ধনভান্ডার একত্রিত করে ফেলো; তবু সেই মুক্তাটি আমাকে দেখাতে পারবে না।

শাহ আব্দুল আযীয (রহ.)ও সুযোগ্য উত্তরসূরী তৈরি করেছেন। যেমন– শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) ও সায়্যিদ আহমাদ শহীদ (রহ.)। আজও বালাকোট তাদের মর্যাদার সাক্ষ্য বহন করছে।

উপমহাদেশে ইংরেজদের নিপীড়ন

১৮৫৭ সনে ইংরেজরা হিন্দুস্তান দখল করে মুসলমানদের রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়ে তাদের অবস্থান দৃঢ় করতে করারোপ করল। বড়-বড় ধনীদের জায়গা-জমি জবর দখল করে নিল। সাথে-সাথে মুসলমানদের সম্পদ ও সম্মান থেকে বঞ্চিত করে দিল। জাগতিক সকল উপকরণ কব্জা করে নিল, যাতে তাদের দুর্বল করা যায়। জুলুম ও নির্যাতনের সীমা ছাড়িয়ে গেল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফাঁসির রায় প্রদান করত। কোনো মুসলমানের আঙুলে জখম দেখলে বলত, মনে হয় তুমি কোনো ইংরেজকে মারধর করেছ। এই অজুহাতেই তার জন্য ফাঁসির রায় দেওয়া হতো। ইংরেজরা দুশমন হিসেবে বড়ই চতুর। তারা দেখল, মাল-সম্পদ তো আমরা নিয়ে নিয়েছি; কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের ঈমানি চেতনা শেষ না করা যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ঐক্য অটুট থাকবে। কাজেই এই চেতনা খতম করতে হলে মাদরাসাগুলো ধ্বংস করা অপরিহার্য। তৎকালীন যুগে মাদরাসাগুলো ওয়াক্‌ফের সম্পত্তির মাধ্যমে পরিচালিত হতো। তাই ইংরেজরা দ্বিতীয় কৌশল অবলম্বন করল, মাদরাসার সম্পত্তিগুলোকে সরকারি মালিকানায় স্থানান্তর করল। অর্থনৈতিকভাবে যখন তারা কোণঠাসা করে ফেলল, তার ফলে চার হাজার মাদরাসা বন্ধ হয়ে গেল। হুমকি-ধমকির কৌশল সফল হলো এবং লোকজন ভয় পেয়ে গেল।

উপমহাদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র

সেসময় ভারতে তিনটি কেন্দ্র ছিল। দিল্লীতে 'অলী ইলাহী' নামক কুরআন-হাদীছের একটি কেন্দ্র ছিল। লাখনৌতে ফিক্‌হ ও উসুলে ফিক্‌হের একটি কেন্দ্র ছিল। খায়রাবাদে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তৃতীয় আরেকটি মারকায ছিল। ইংরেজরা এই তিনটি কেন্দ্রের ওপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে নিল।

দেওবন্দে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা

আল্লাহ তা'আলা তাঁর এক বান্দা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবি (রহ.)-এর অন্তরে এমন ভাবনার উদ্রেক করে দিলেন যে, সম্পদ মুসলমানদের হাতছাড়া হয়েছে, তবে পাওয়ার আশা আছে। ক্ষমতা বেহাত হয়েছে, তবে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু দীন হাতছাড়া হয়ে গেলে আর মিলবে না। তাই ইংরেজদের জুলুম-নির্যাতন রোধের একমাত্র উপায় মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা। তাহলে কেন একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হবে না, যা সম্পূর্ণরূপে ইংরেজদের দৃষ্টির আড়ালে থাকবে এবং নীরবে কাজ চলতে থাকবে? কাসিম নানুতবি (রহ.)-এর শশুরালয় ছিল দেওবন্দে। তাই তিনি সেখানে গিয়ে ছাত্তা মসজিদে ডালিম গাছের তলে নীরবে কাজ শুরু করে দিলেন। একজন শিক্ষক একজন ছাত্র। শিক্ষকের নাম মোল্লা মাহমূদ আর ছাত্রের নাম মাহমূদুল হাসান। দুজনেরই নাম মাহমূদ। হযরত শাহ আব্দুল গনী মুজাদ্দেদি (রহ.)-এর ছাত্র মাওলানা মামলুক আলী (রহ.) পূর্ণাঙ্গ শিক্ষক উপাধি লাভ করেছেন। কারণ, তিনি সকলকে পড়িয়েছেন। মাওলানা শাহ রফীউদ্দীন নকশবন্দি (রহ.) প্রথম মুহতামিম ছিলেন।

দারুল উলূম দেওবন্দের ভিত্তিপ্রস্তর

একদা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবি (রহ.) স্বপ্নযোগে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত লাভ করলেন। স্বপ্নে নবীজি তাঁকে দারুল উলূমের ভবনের পূর্ণ সীমানা নির্ধারণ করে দিলেন। এ কারণেই দারুল উলূম দেওবন্দের তারানায় (সঙ্গীত) এমন কিছু শব্দ রয়েছে–

یہ علم و ہنر کا گہوارا تاریخ کا وہ شہ پارہ ہے

ہر پھول یہاں اک شعلہ ہے ہر سرو یہاں مینارہ ہے

خود ساقی کوثر نے رکھی میخانہ کی بنیاد یہاں

تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں

کہسار یہاں دب جاتے ہیں طوفان یہاں رک جاتے ہیں

اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں

یہ علم و ہنر کا گہوارا تاریخ کا وہ شہ پارہ ہے

ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے ہر سرو یہاں مینارہ ہے

এটা জ্ঞান ও গুণের দোলনা ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য অংশ

এখানকার প্রতিটি ফুল এক-একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। প্রতিটি গাছ যেন উঁচু চূড়া।

স্বয়ং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

এখানে শরাব পানের ভিত্তিস্থাপন করেছেন।

এখানকার হিসাব-নিকাশের রেজিষ্টারগুলো ইতিহাস সংকলন করে।

পর্বত এখানে পরাজিত হয়, তুফান এখানে থেমে যায়।

এই দরবেশি মহলের সামনে রাজপ্রাসাদগুলো অবনত হয়।

এটি জ্ঞান ও গুণের দোলনা, ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য বিষয়।

এখানকার প্রতিটি ফুল এক-একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, প্রতিটি গাছ যেন উঁচু চূড়া।

সুতরাং দারুল উলূম দেওবন্দের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময় হলে হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবি (রহ.) ঘোষণা দিলেন, আজ দারুল উলূমের ভিত্তিপ্রস্তর এমন একজন ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে স্থাপন করাব, যিনি কবীরা গুনাহ তো দূরের কথা গুনাহের ইচ্ছাও কখনো করেননি। ফলে তিনি হযরত শাহ হুসাইন আহমাদ (রহ.)কে – যিনি মিয়া আসগর হুসাইন (রহ.)-এর মামা ছিলেন – ডেকে বললেন, হযরত! আসুন, দারুল উলূমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করুন।

হযরত শাহ হুসাইন আহমাদ (রহ.)-এর আত্মবিলীনতা

হযরত শাহ হুসাইন আহমাদ (রহ.)-এর অন্তরে আল্লাহ তা'আলা বিলীনতার এমন আলো দান করেছেন যে, তিনি সদা আল্লাহর যিকিরে রত থাকতেন। 'আল্লাহবান্দা' নামে তাঁর এক জামাতা ছিল। দু-বছর পর্যন্ত তিনি তাঁর কাছেই ছিলেন। তিনি যখন সামনে দিয়ে অতিক্রম করতেন, হযরত শাহ হুসাইন আহমাদ (রহ.) বলতেন, আরে মিয়া! তুমি কে? তিনি জবাব দিতেন, হযরত! আমি আপনার জামাতা আল্লাহবান্দা। তিনি তখন বলতেন, আরে মিয়া! সকলেই তো আল্লাহর বান্দা। দু-বছরেও জামাতার নাম মুখস্থ হয়নি। যিকিরে তিনি এতই বিলীন হয়ে যেতেন যে, অন্তরে কেবল আল্লাহ তা'আলার

নামই গেঁথে ছিল। এমন অসাধারণ ব্যক্তিত্বই দারুল উলূম দেওবন্দের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।

একটি চমৎকার স্বপ্ন

হযরত মাওলানা শাহ রফীউদ্দীন (রহ.) দারুল উলূম দেওবন্দের দ্বিতীয় মুহতামিম নিযুক্ত হয়েছেন। একদা তিনি দারুল উলূমে তাশরীফ আনলেন। এক ছাত্র এসে বলল, হযরত! আপনার বাবুর্চিখানায় এমন খাবার রান্না হয় যে, একটু দেখুন এর দ্বারা অজু করাও জায়েয। মুহতামিম সাহেবের সামনে একজন ছাত্র এসে এ ধরনের কথা বলা যেনতেন ব্যাপার নয়। হযরত শাহ রফী উদ্দীন (রহ.) ছেলেটার আপাদমস্তক ভালো করে দেখলেন এবং বললেন, ছেলেটা আমাদের মাদরাসার ছাত্র নয় – বহিরাগত কোনো ছেলে। ওস্তাদ বললেন, হযরত! একটু যাচাই করে দেখি তাহলে। রেজিষ্টার খুলে দেখলেন, তার নাম লেখা আছে। বাবুর্চিকে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলল, নিয়মিত এবং সময়মতো এসে খানা খায়। আরেকটু বেশি তদন্ত করার পর জানা গেল, সে বাজারে কাজ করে এবং খাবারের সময় হলে মাদরাসায় এসে খাবার খায়।

ওস্তাদজি অবাক হয়ে বললেন, মুহতামিম সাহেব! আমরা তো ছেলেদের পড়ালেখা করাই; কিন্তু তারপরও ছেলেটাকে চিনতে পারিনি। আপনার সাথে তো ওদের দেখা-ই হয় না; আপনি কীভাবে চিনতে পারলেন? মাওলানা রফীউদ্দীন (রহ.) বললেন, আমি দারুল উলূমের মুহতামিম হওয়ার পর একদিন স্বপ্নে দেখলাম, এখানে একটি কূপ আছে আর নবীজি সেখান থেকে বালতি ভরে-ভরে পানি উঠাচ্ছিলেন। দারুল উলূমের ছাত্ররা এক-এক করে আসছিল আর নবীজি তাদের পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। আমি সেদিনকার স্বপ্নে এ ছেলেটাকে দেখিনি। ফলে আমি বুঝে ফেলেছি, এ আমাদের মাদরাসার ছাত্র নয়।

দারুল উলূম দেওবন্দের সামগ্রিকতা

সুদীর্ঘ ন-বছর পর্যন্ত ইংরেজরা পাক-ভারত উপমহাদেশে সুদৃঢ় অবস্থানে ছিল। তারা যখন নিশ্চিত হলো, এবার তাদের অবস্থান সুদৃঢ় হয়েছে, তখন তারা ধর্মীয় স্বাধীনতার ঘোষণা দিল। ফলে দারুল উলূম দেওবন্দ ইংরেজ আয়ত্তাধীন মুসলমানদের প্রাচীন তিনটি কেন্দ্রের সমন্বয়কারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল।

হযরত শাইখুল হিন্‌দ (রহ.)-এর ওপর জ্ঞান-বিজ্ঞানের বর্ষণ

শাইখুল হিন্‌দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহ.) হযরত থানবি (রহ.)-এর ওস্তাদ ছিলেন। হযরত থানবি (রহ.) বলেন, যখন আমি হযরত (রহ.)-এর নিকট দাওরায়ে হাদীছ পড়তাম, ছাত্ররা রাতে তাকরার করত। আমি তাদেরকে তাকরার করাতাম। একদিন একজায়গায় এসে আমরা সবাই আটকে গেলাম। ছাত্ররা আমাকে বলল, হযরতের কাছে আপনিই জিজ্ঞেস করবেন। তখন শীতকাল ছিল। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে তাফসীরে জালালইন শরীফ বুকে জড়িয়ে নিয়ে মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করলাম। হযরত (রহ.)-এর অভ্যাস ছিল, ফজর পড়ামাত্রই ইবাদতখানায় (একটি বিশেষ কামরা) চলে যেতেন এবং ইশরাক পর্যন্ত যিকির করতেন। নামায পড়েই হযরত (রহ.) ভিতরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং দরজা বন্ধ করে দিলেন। এদিকে আমি জালালাইন শরীফ বুকে জড়িয়ে রেখে শীতে থরথর করে কাঁপছিলাম। হযরত (রহ.) তো ভিতরে যিকির করছিলেন আর আমি বাইরে থেকে তৃপ্তি অনুভব করছিলাম।

ইশরাকের পর হযরত (রহ.) দরজা খুলে যখন বেরিয়ে এলেন, আমি দেখতে পেলাম, তাঁর কপাল ও ঘাড়ে ঘামের ফোঁটা। তাঁর জামায়ও ঘামের চিহ্ন ছিল। মনে হচ্ছিল, যেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর এমন জর্‌ব লাগিয়েছেন যে, ঘামে ভিজে গেছেন। আমাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, আশরাফ আলী! কেন দাঁড়িয়ে আছ? আমি বললাম, হযরত! কিতাবের একটি বিষয় বুঝতে পারিনি। হযরত (রহ.) সেখানে দাঁড়িয়েই তাকরীর (আলোচনা) শুরু করে দিলেন। অবস্থা ছিল দারুণ আশ্চর্যজনক যে, আমি শব্দ ও অর্থ কোনোটিই বুঝতে পারলাম না। অর্থাৎ– শব্দ ও অর্থ সবই অপরিচিত। তাকরীর শেষে বললেন, বুঝে এসেছে?

আমি বললাম, হযরত! আমার তো বুঝে আসেনি। আরেকটু সহজভাবে বলুন, যেন আমি বুঝতে পারি। হযরত (রহ.) পুনরায় তাকরীর শুরু করে দিলেন। এবারের শব্দগুলো পরিচিত মনে হলেও অর্থগুলো ছিল অপরিচিত। হযরত জিজ্ঞেস করলেন, আশরাফ আলী! বুঝতে পেরেছ? আমি বললাম, হযরত বুঝে আসেনি। বললেন, এখন তোমার বুঝে আসবে না। অন্য কোনো সময় জিজ্ঞেস করে নিয়ো। হযরত থানবি (রহ.) বলেন, যিকিরের দরুন তাঁর ওপর জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন প্রবল বর্ষণ হতো যে, ওই সময়ের তাকরীর বোঝা যেত না।

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবি (রহ.)-এর প্রতি অগাধ ভালোবাসা

দারুল উলূম দেওবন্দের সকল আকাবিরের প্রতি আমার যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকলেও হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবি (রহ.)-এর প্রতি আমার ভালোবাসা ও আকর্ষণ একটু বেশিই ছিল। তাঁর প্রতি আমার আল্লাহপ্রদত্ত ভালোবাসা ঠিক তেমন বেশি, যেমন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর সাথে। ইমাম চতুষ্টয়ের মাঝে ইমাম আবু হানীফার সাথে, মাশায়েখগণের মাঝে হযরত নকশবন্দি বুখারি (রহ.)-এর সাথে ছিল। এমনকি তাঁর নাম এলে আমি এতটাই আপ্লুত হয়ে পড়ি, যা ভাষায় বোঝাতে পারব না। এ মুহূর্তে আমি আল্লাহর ঘর মসজিদে অজুসহ মিম্বরে বসা আছি। যদি কসম করে বলি, আমি আমার পিতার চেয়ে হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবি (রহ.)কে অধিক ভালোবাসি, তবু আমার কসম ভঙ্গ হবে না।

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবি (রহ.)-এর নবীপ্রেম

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবি (রহ.) জ্ঞানের চাঁদ-সুরুজতুল্য ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সীমাহীন নবীপ্রেম দান করেছিলেন। একবার ইংরেজরা তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করল। হযরত তিন দিন ঘরে ছিলেন। তিন দিন পর বাইরে চলে এলেন। কারণ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিন যাবৎ গুহায় আত্মগোপনে ছিলেন। কাজেই তিন দিনের বেশি আত্মগোপনে থাকা আমার পছন্দ নয়, যেন কাসেম নানুতবি সুন্নাতবিরোধী কোনো কাজে জড়িয়ে না পড়ে।

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহি (রহ.)-এর খেলাফত লাভের ঘটনা

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহি (রহ.) হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি (রহ.)-এর খেদমতে হাজির হয়ে বলতে লাগলেন, হযরত! যিকির-অযিফা পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। হযরত বললেন, ঠিক আছে, আপনার এসব করতে হবে না। তবে কথা হলো আপনি তিন দিন তিন রাত এখানে (খানকায়) অবস্থান করুন। বললেন, হযরত ঠিক আছে, অবস্থান করব; তবে আমাকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগাতে পারবেন না। আমার মন

চাইলে উঠব, না চাইলে উঠব না। হযরত হাজী সাহেব (রহ.) বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। এক শাগরিদকে ডেকে বললেন, রশীদ আহমাদের চৌকিটা আমার চৌকির পাশে এনে দাও।

গভীর রাতে হাজী সাহেব (রহ.) উঠলেন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর যিকির শুরু করলেন। হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) বললেন, আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমার কাছে এত মজা অনুভব হলো যে, আমিও উঠে তাহাজ্জুদ পড়ে পাশে বসে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর যিকির করতে লাগলাম। তিন দিনের জন্য থাকতে বলেছিলেন। কিন্তু আমি ত্রিশ দিন অবস্থান করলাম। সেখান থেকে বিদায় নেওয়ার সময় হযরত হাজী সাহেব (রহ.) আমাকে খেলাফত প্রদান করলেন।

নবাব সাহেবের সংশোধন

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহি (রহ.)-এর নিকট এক নবাব সাহেব এলেন। সেসময় হযরতের খেদমতে শাইখুল হাদীছ যাকারিয়া (রহ.)-এর পিতা হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া ছাহেব (রহ.) বসা ছিলেন। তিনি হযরতের অন্যতম খলীফা ছিলেন। সদা হযরতের খেদমতে নিয়োজিত থাকতেন। তিনি নবাব সাহেবের জন্য খানকার অতিরিক্ত কার্পেট, গালিচা বিছিয়ে দিলেন। হযরত (রহ.) জানতে পেরে বললেন, ইয়াহইয়া ছাহেব! কার্পেট-গালিচা কোথায়? নবাব সাহেব সামনেই বসা ছিলেন। মাওলানা ইয়াহইয়া ছাহেব বললেন, হযরত! আমি সেগুলো নবাব সাহেবের জন্য বিছিয়ে দিয়েছি। বললেন নবাব সাহেবের কি কার্পেট-গালিচার আকাল পড়েছে?

নবাব সাহেবের অর্ধেক সংশোধন এতেই হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর দস্তরখানা বিছানো হলো। নবাব সাহেবও এলেন। হযরত (রহ.)ও বসলেন। মাহমুদুল হাসান (যিনি পরবর্তী কালে শায়খুল হিন্দ হয়েছেন)ও এসেছেন। নবাব সাহেব দস্তরখানে একছাত্রকে দেখে বেশ অবাক হলেন। হযরত তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, নবাব সাহেব! ছাত্রের সাথে বসতে ভালো না লাগলে আপনি কোথাও আলাদা বসে খেয়ে নিন; মাহমুদুল হাসান তো আমার জীবন-মরণের সাথী।

মাওলানা রশীদ আহমাদ (রহ.)-এর বিনয়

একদা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহি (রহ.) হাদীছ পড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ বৃষ্টি নামল। ছাত্ররা আপন-আপন কিতাব গুটিয়ে নিয়ে কামরায় দৌড়ে চলে গেল।

হযরত (রহ.) রুমাল বিছিয়ে ছাত্রদের জুতাগুলো তাতে উঠিয়ে নিয়ে পুটুলি বেঁধে মাথায় করে কামরায় নিয়ে এলেন। ছাত্ররা দেখে তো চিৎকার করতে লাগল এবং বলতে লাগল, হযরত! আমরা নিজেরাই তো জুতাগুলো আনতে পারতাম। হযরত (রহ.) জবাব দিলেন, তোমরা সারাদিন قَالَ اللهُ এবং قَالَ الرَّسُوْلُ পড়। রশীদ আহমাদ তোমাদের জুতা বহন করবেনা তো কী করবে?

মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরি (রহ.)-এর অতুলনীয় স্মৃতিশক্তি

হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মিরি (রহ.) মিশর গেলেন। সেখানে কুতুবখানায় নুরুল ইজাহ্ নামক একখানা কিতাব দেখতে পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, নিয়ে যেতে পারি কি? কারণ, এ কিতাবটি আমাদের সংগ্রহে নেই। তারা বলল, আমরা দিতে পারব না। অগত্যা হযরত (রহ.) একবার ভালো করে দেখে নিলেন। ফিরে এসে তা মুখস্থ থেকে লিখিয়ে নিলেন। পরে মূল কপির সাথে মিলিয়ে দেখা গেল, আসল ও নকল কপিতে কোনো পার্থক্য নেই। তাঁর লেখা সেই কিতাব মাদরাসায় ছাত্ররা আজও অধ্যয়ন করে।

কতিপয় হিন্দু যুবক হযরত (রহ.)কে দেখেই মুসলমান হয়ে গেছে। কেউ তাদের জিজ্ঞেস করল, তোমরা তাঁকে দেখেই মুসলমান হয়ে গেছ? তারা বলল, হ্যাঁ; এই চেহারা কোনো মিথ্যাবাদীর হতে পারে না। আল্লাহু আকবার!

হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.)-এর অসাধারণ ধীশক্তি

হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.)-এর এমন প্রখর স্মৃতিশক্তি ছিল যে, একবার কতগুলো কিতাব রোদে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাইরে বের করালেন। একটি কিতাবে উঁইপোকা লেগেছিল। ছাত্র এসে বলল, হযরত! এ কিতাবটিতে উঁইপোকা লেগেছে। হযরত বললেন, উঁইপোকা যে পাতাগুলো খেয়ে ফেলেছে, তুমি তা লিখে সংযুক্ত করে দাও। সে বলল, হযরত আমি কিতাবটি গত বছর পড়েছি; আমার তো মুখস্থ নেই। হযরত বললেন, গত বছর পড়ে ভুলে গেছ! তারপর হযরত নিজের মুখস্থ থেকে ওই পৃষ্ঠাগুলো লিখিয়ে সংযোগ করে দিলেন।

হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া (রহ.)-এর স্মরণশক্তির প্রখরতা

হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া (রহ.)-এর মুতানাব্বী মুখস্থ ছিল। দেওয়ানে হামাসা মুখস্থ ছিল। মুসাল্লাম তাসবীহে গণনা করে দুশতবার পড়েছেন। একব্যক্তি এসে বলল, হযরত! আমার নিকট কাসীদায়ে বুরদাহ আছে; তবে

তার তিন-চারটি পৃষ্ঠা নষ্ট হয়ে গেছে। হযরত বললেন, ঠিক আছে; লিখে নাও। তিনি তাকে তিন-চার পৃষ্ঠা মুখস্থ লিখিয়ে দিলেন।

সুবহানাল্লাহ! আমাদের আকাবিরদের আল্লাহ উন্মুক্ত বক্ষ দান করেছিলেন।

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ

'আল্লাহ যার হেদায়েতের ফয়সালা করেন, তার বুকটাকে তিনি ইসলামের জন্য খুলে দেন।'[১]

তাদের বক্ষ এমনই উন্মুক্ত ছিল যে, মনে হতো, তাদের সামনে কিতাব খোলা রয়েছে। অথচ আমাদের অবস্থা হলো, আমরা সকালে পড়লে সন্ধ্যায় ভুলে যাই, সন্ধ্যায় পড়লে সকালে ভুলে যাই।

সাইয়্যিদ আতাউল্লাহ শাহ বুখারি (রহ.)-এর উপস্থিত জবাব

বক্তব্য ও আলোচনার ময়দানে সাইয়্যিদ আতাউল্লাহ শাহ বুখারি (রহ.) ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিলেন। তাঁর আলোচনা শুনে হিন্দুরা পর্যন্ত মুসলমান হয়ে যেত। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এমন প্রজ্ঞা দান করেছিলেন যে, উপস্থিত জবাব প্রদানে বেশ পটু ছিলেন। একবার একব্যক্তি এসে বলল, হযরত! আপনি তো ইংরেজদের Show (তামাশা) দেখান। তিনি বললেন, ভাই! আমি ইংরেজদের Show দেখাই না; বরং Shoe (জুতা) দেখাই।

একবার একব্যক্তি হযরত বুখারি (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাত করে বলল, হযরত! জীবন কীভাবে কাটল? তিনি বললেন, অর্ধেক রেলে আর অর্ধেক জেলে। একবার সাইয়্যিদ আবুল আ'লা মওদুদী সাহেবের সাথে শাহজি (রহ.)-এর সাক্ষাত হলে মওদুদী সাহেব বলতে লাগলেন, শাহ সাহেব! আপনার দলের তো বক্তৃতার গুরুতর ডায়রিয়া হয়েছে। শাহজি (রহ.) জবাব দিলেন, যেমন আপনার দলের লিখনির ডায়রিয়া।

কোনো এক জলসায় হিন্দু-মুসলমান সবাই উপস্থিত ছিল। শাহজি (রহ.) চাইলেন, হিন্দু ও মুসলমানদের কিছু প্রশ্ন করবেন। তিনি হিসাবসংক্রান্ত ছোট একটি প্রশ্ন করলেন। হিন্দুরা জবাব দিল; কিন্তু মুসলমানরা জবাব দিতে পারল না। তখন শাহজি (রহ.) বললেন, বাহ্ মুসলমানগণ! তোমরা দেখছি,

---

১. সূরা আনআম : আয়াত ১২৫

এখানেও বেহিসাব আর আল্লাহ পরকালেও তোমাদের সাথে বেহিসাবওয়ালা আচরণ করবেন। মাশাআল্লাহ!

একব্যক্তি প্রশ্ন করল, শাহজি! মৃতরা কি শুনতে পায়? শাহজি (রহ.) বললেন, আমাদের জীবিতরাই শুনতে পায় না, মৃতদের কথা আর কী বলব? একবার তিনি আলীগড় গেলেন। কিছু ছাত্র এমন পরিকল্পনা করল যে, তাঁকে আলোচনা করতে দেবে না। শাহজি মঞ্চে আসামাত্রই ছাত্ররা হট্টগোল শুরু করে দিল। হযরত শাহজি (রহ.) বললেন, ভাই! এত দূর পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি, অন্তত একটি কথা শোনো। অনুমতি হলে কুরআন শরীফের এক রুকু পরিমাণ তেলাওয়াত করব।

এবার ছাত্রদের মাঝে মতানৈক্য দেখা দিল। কেউ বলল, হ্যাঁ; তেলাওয়াতে আর অসুবিধা কী? কেউ বলল, না তেলাওয়াতও শুনব না। একপর্যায়ে তেলাওয়াত সমর্থকরা বিজয়ী হলো। তারা বলল, হ্যাঁ; আপনি এক রুকু তেলাওয়াত করে শুনিয়ে দিন। শাহজি (রহ.) এক রুকু তেলাওয়াত করে শোনালেন। তারপর বললেন, প্রিয় ছাত্ররা! অনুমতি হলে অনুবাদটুকু বলে দিতাম। তেলাওয়াতের ফলে ছাত্ররা এতটাই প্রভাবিত হলো যে, তারা সকলেই চুপচাপ ছিল। এভাবে শাহজি (রহ.) প্রায় দু-ঘণ্টা আলোচনা পেশ করলেন।

দারুল উলূম দেওবন্দের সামগ্রিকতার কারণ

আমাদের আকাবিরগণ আলোচনার ময়দানে, লিখনীর ময়দানে, বীরত্বের ময়দানে, পাঠদানের ময়দানে এমন-এমন কৃতিত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন যে, মানুষ অবাক হয়ে যেত। কেন এমন হলো? কারণ, দারুল উলূমের ভিত্তি তাওয়াক্কুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। উসূলে হাশতেগানা (আট মূলনীতি) আজও পড়ে দেখতে পারেন। তাতে লেখা আছে, দারুল উলূমের জন্য স্থায়ী কোনো আয়ের মাধ্যম গ্রহণ করা যাবে না। অথচ আমরা সর্বদা এই চেষ্টা করতে থাকি এবং দোআ করতে থাকি, যেন আমাদের মাদরাসার স্থায়ী কোনো আয়ের ব্যবস্থা হয়ে যায়।

মাওলানা কাসেম নানুতবি (রহ.)-এর আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল

ভাওয়ালপুরের এক নবাব সাহেব মাদরাসা নির্মাণ করলেন। তিনি স্থানীয় ওলামায়ে কেরামকে ডেকে বললেন, আমি তো ভবন তৈরি করে দিয়েছি; কিন্তু

আবাদ কীভাবে হবে? ওলামায়ে কেরাম তাঁকে বললেন, আমরা আপনাকে এমন এক ব্যক্তিত্বের কথা বলব, যাকে আনতে পারলে মাদরাসা চলবে। তিনি বললেন, মুক্তা আপনারা তালাশ করুন; আমি মূল্য পরিশোধ করব। নবাব সাহেবের অর্থের বেশ গৌরব ছিল। সুতরাং ভবন নির্মাণ সমাপ্ত হলে তিনি ওলামায়ে কেরামকে বললেন, কোন মুক্তাটি তালাশ করেছেন? তারা বললেন, কাসেম নানুতবিকে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হযরতের বেতন কত দিতে হবে? তারা বললেন, এই চার-পাঁচ রুপি।

সে যুগে বেতন এমনই হতো। বলতে লাগলেন, হযরতকে আমার পক্ষ থেকে মাসিক একশত রুপির সংবাদ দিন। এবার পাঁচ রুপির পরিবর্তে যখন একশত রুপি মিলবে, তখন কত পার্থক্য হবে? সুতরাং ওলামায়ে কেরাম খুশি হয়ে বললেন, এবার তো হযরত অবশ্যই আসবেন।

তাঁরা দেওবন্দ গিয়ে হযরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। হযরত (রহ.) তাঁদের আদর আপ্যায়ন করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কেন এসেছেন? তারা বললেন, হযরত! একটি নতুন মাদরাসা নির্মিত হয়েছে। আপনি সেখানে তাশরীফ আনুন। নবাব সাহেব আপনার জন্য মাসিক বেতন একশত রুপি ধার্য করেছেন।

হযরত বললেন, ব্যাপার হলো, আমার মাসিক বেতন পাঁচ রুপি। এর মধ্যে তিন রুপি আমার পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের কাজে আর অবশিষ্ট দুই রুপি গরিব, এতিম ও মিসকিনদের পেছনে ব্যয় করি। যদি সেখানে যাই আর আমার বেতন একশত রুপি হয়ে যায়, তখন আমার মাসিক ব্যয় তো তিন রুপিই থাকবে। অবশিষ্ট সাতানব্বই রুপি গরিবদের মাঝে বিলি করতে সারা দিন আমাকে তাদের খুঁজে ফিরতে হবে। আমি পড়ানোর সুযোগ পাব না। কাজেই আমি সেখানে যাব না। এমন দলিল পেশ করলেন যে, ওলামায়ে কেরামের মুখ বন্ধ হয়ে গেল। একেই বলে দুনিয়াত্যাগ। আল্লাহু আকবার কাবীরা!

মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.)-এর ব্যতিক্রমধর্মী ক্ষমাপ্রার্থনা

মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.) ছাত্র যামানায় যখন দাওরায়ে হাদীছ সমাপ্ত করলেন, তখন মুহতামিম সাহেব জলসার আয়োজন করলেন। উদ্দেশ্য ছিল ফারেগীন ছাত্রদের পাগড়ি প্রদান করা। হযরত থানবি (রহ.) সাথে পাঁচ-সাতজন ছাত্রকে নিয়ে হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.)-এর কাছে

গেলেন। গিয়ে বললেন, হযরত আমরা শুনেছি, মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের পাগড়ি প্রদানের ব্যবস্থা করছে। হযরত (রহ.) বললেন, হ্যাঁ। বললেন, দস্তারবন্দি (পাগড়ি প্রদান) না হলে ভালো হয়। কারণ, এমন পরিস্থিতি যেন না হয় যে, মানুষ অভিযোগ করে বসে, এসন অযোগ্য ছাত্রদের পাগড়ি দেওয়া হয়েছে; যেন মাদরাসার দুর্নাম না হয়।

হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.) উত্তেজিত হয়ে বললেন, স্নেহাস্পদ! তোমরা তোমাদের ওস্তাদের মাঝে অবস্থান করছ; তাই নিজেদের তেমন একটা অনুভব করতে পারছ না। আমরা যখন থাকব না, তখন তো তোমরাই তোমরা হবে।

শাহ্ আব্দুল কাদের রায়পুরি (রহ.)-এর ইল্‌মি চেতনা

হযরত আব্দুল কাদের (রহ.) রায়পুর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। দারুল উলূম এসে মুহতামিম সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, হযরত! আমি ইল্‌ম হাসিল করতে চাই। হযরত বললেন, থাকার ব্যবস্থা হবে। তবে দারুল উলূমের পক্ষ থেকে খাবারের ব্যবস্থা হবে না। আরজ করলেন, হযরত! আমি রাজী আছি। হযরত তাকে ভর্তি করে নিলেন। শাহ সাহেব (রহ.) বলেন, ভর্তি হয়ে আমি রাতের বেলা অলিগলি ঘুরে বেড়াতাম। বিভিন্ন গলি থেকে ফলমূলের খোসা ইত্যাদি কুড়িয়ে এনে ধুয়ে খেয়ে নিতাম। আব্দুল কাদের (রহ.) সারা বছর এভাবে খোসা খেয়ে দিন কাটালেন এবং ইল্‌ম হাসিল করতে লাগলেন।

হযরত (রহ.) বলতেন. আমি একটা মটকা বানিয়ে রেখেছিলাম। আত্মীয়-স্বজনের চিঠি-পত্র এলে মটকায় রেখে দিতাম। পরীক্ষা শেষ হলে মটকার চিঠিগুলো বের করে পড়তাম। বাড়িতে ফিরে গিয়ে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ করতাম এবং চিঠির কৃতজ্ঞতা আদায় করতাম। অথবা তাদের ব্যাপারে ভালো মন্তব্য করতাম। এতে তারা বেশ খুশি হতো এবং ভাবত, এখনো আমাদের চিঠির কথা মনে আছে। অথচ সারা বছর আত্মীয়-স্বজনের চিঠি পড়তামই না, যাতে আমার পড়ালেখায় কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়।

হযরত শাহ্ আব্দুল কাদের রায়পুরি (রহ.)-এর লাজুকতা

হযরত রায়পুরি (রহ.) এতই লজ্জাশীল ছিলেন যে, কখনো আপন বোনের চেহারার দিকেও তাকিয়ে দেখেননি। একসময় এমন হলো যে, তিনি

চেহারা দেখেও আপন বোনকে চিনতে পারতেন না। কথা বলে আওয়াজের মাধ্যমে পরিচয় পেতেন। কোনো অপরিচিত মহিলার সাথে বসা থাকলে বোনকে শনাক্ত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না। তাঁর দৃষ্টিতে বোনের চেহারার দিকে তাকানো নির্লজ্জতা মনে হতো। এমন লাজুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি।

পুরাতন কম্বলে পনেরো বছর পার

হযরত শাহ আব্দুল কাদের (রহ.) বলেন, একবার আমি কোথাও যাওয়ার পথে একব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, একটা কম্বল বাইরে ফেলে দিচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কম্বলটা বাইরে ফেলে দিচ্ছেন কেন? বললেন, পুরাতন হওয়ায় ফেলে দিচ্ছি। আমি বললাম, আমি কি তাহলে এটা নিতে পারি? বললেন, হ্যাঁ; তুমি নিয়ে নাও। আমি কম্বলটা তুলে এনে ধুয়ে ফেললাম। শীতকালে গায়ে দিতাম আর গরম কালে বিছানা হিসেবে ব্যবহার করতাম। নামাযের সময় জায়নামাযের কাজে লাগাতাম। এভাবে এই কম্বল দিয়ে পনেরো বছর কাটিয়েছি। আল্লাহু আকবার।

মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.)-এর আদব

আমাদের আকাবিরগণ ইল্‌মের পাশাপাশি আদবের প্রতিও বেশ গুরুত্ব প্রদান করতেন। হযরত থানবি (রহ.) বলতেন, আমি সর্বদা চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতাম।

১. আমার লাঠির যে মাথাটা মাটিতে লাগত, তা কখনো কাবার দিকে ফিরিয়ে রাখিনি।

২. আমি রিযিকের প্রতি এতটা সম্মান প্রদর্শন করতাম যে, খাটের ওপর বসলে সর্বদা পায়ের দিকে বসতাম এবং মাথার দিকে খাবার রাখতাম এভাবে বসে খাবার খেতাম।

৩. তৃতীয় বিষয় হলো, যে হাতে পবিত্রতা অর্জন করতাম, সেই হাতে কখনো টাকা পয়সা ধরতাম না। কারণ, এটি আল্লাহপ্রদত্ত রিযিক।

৪. চতুর্থ বিষয়টি হলো, যেখানে আমার কিতাব-পত্র রাখা থাকত, সেখানে কখনো আমার ব্যবহৃত কাপড়-চোপড় দীনি কিতাবাদির ওপর ঝুলিয়ে রাখিনি।

আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মিরি (রহ.)-এর উত্থান কীভাবে হলো?

একবার মুফতী কেফায়াতুল্লাহ্ সাহেব (রহ.) ছাত্রদের জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলো তো, আনোয়ার শাহ্ কাশ্মিরি (রহ.) এত প্রসিদ্ধি কীভাবে অর্জন করলেন? কেউ বলল, তিনি ভালো মুফাস্‌সির ছিলেন। কেউ বলল, ভালো মুহাদ্দিছ ছিলেন, ভালো কবি ছিলেন, মানতেক (যুক্তিবিদ্যা) ভালো জানতেন। তিনি বললেন, না; এসব কিছুই না। একব্যক্তি সরাসরি তাঁকে এমন প্রশ্ন করলে উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আমার দুটি অভ্যাস ছিল। আমি সব সময় অজুসহ অধ্যয়ন করতাম আর কখনো টীকা পড়ার প্রয়োজন হলে কিতাব না ঘুরিয়ে নিজে ঘুরে গিয়ে দেখতাম। জীবনে কখনো হাদীছের কিতাবকে নিজের অনুগামী বানাইনি।

ওস্তাদের সম্মান প্রদর্শন ওলামায়ে দেওবন্দের বৈশিষ্ট্য

হযরত শাইখুল হিন্‌দ (রহ.) যখন আরবে যেতে লাগলেন, তখন হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি (রহ.) খবর পেয়ে হযরত (রহ.)-এর নিকট গেলেন। ছাত্রদের বলে এলেন, আমি আমার ওস্তাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে যাচ্ছি। হতে পারে, জীবনে কখনো তাঁর সাথে বে-আদবি হয়েছে। হযরত (রহ.) পা ঝুলিয়ে দিয়ে খাটে বসা ছিলেন। হযরত কাশ্মিরি (রহ.) এসে পায়ের নিকট বসে পড়লেন এবং হযরতের পা মোবারক জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। হযরত শাইখুল হিন্‌দ (রহ.) কাঁদতে সুযোগ দিলেন। বেশ কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করার পর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে তাঁকে বললেন, কোনো অসুবিধা নেই। আজ আমরা তোমাদের সামনে রয়েছি বিধায় তোমরা নিজেদের অনুভব করতে পারছ না। এখন আমি চলে যাচ্ছি। আমি অনুভব করছি, আল্লাহ তোমার মধ্যে অনেক গুণ রেখে দিয়েছেন। আমাদের অনুপস্থিতির কারণে কোনো ঘাটতি অনুভব হবে না বলে আশা করি।

মোটকথা, তাকে সান্ত্বনা দিয়ে ফেরৎ পাঠালেন। এবার হযরত (রহ.)-এর স্মরণ হলো, উহ! আমার ছাত্র তো আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে গেছে। আমি সফরে যাচ্ছি; অথচ আমি তো আমার ওস্তাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিনি। ভাবতে লাগলেন, আমি কোথায় যাব? হযরত কাসেম নানুতবি (রহ.)-এর কথা মনে পড়ল। তিনি তাঁর বাড়িতে চলে গেলেন। হযরত (রহ.) তো ইন্তেকাল করেছেন। তিনি গিয়ে দরজার কড়া নাড়লেন। আম্মাজি পর্দার আড়াল থেকে জিজ্ঞেস করলেন, কে? বললেন, আপনার

রূহানি সন্তান মাহমুদুল হাসান। তারপর বললেন আম্মাজি! আমার হযরতের কোনো জুতা ঘরে থাকলে একটু পাঠিয়ে দিন। আম্মাজি এক জোড়া জুতা পাঠিয়ে দিলেন। হযরত শাইখুল হিন্‌দ (রহ.) ওস্তাদের জুতাজোড়া মাথার ওপর রেখে দীর্ঘক্ষণ কাঁদতে থাকলেন আর বললেন, আজ আমার ওস্তাদ জীবিত থাকলে তাঁর কদম মোবারককে আমার মাথার মুকুট বানিয়ে নিতাম। সুবহানাল্লাহ!

আতাউল্লাহ্ শাহ বুখারি (রহ.)-এর অতি মূল্যবান একটি বাণী

সাইয়্যিদ আতাউল্লাহ্ শাহ বুখারি (রহ.)-এর কথা মনে পড়ে গেল। তিনি আকাবিরে দেওবন্দ সম্পর্কে বলতেন, মুরুব্বী শ্রেণীর লোকদের কাফেলা একজন-একজন করে চলে যাচ্ছিলেন। তাদের মধ্য থেকে কয়েকটি পবিত্র আত্মা পিছনে রয়ে গেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের এ যুগে সৃষ্টি করেছেন, যেন পরবর্তী লোকেরা তাঁদের নমুনা সম্পর্কে অবগত হতে পারে।

ভাবনার বিষয়

সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম! আমাদের আকাবিরগণ যেসব কিতাব পড়েছেন, বর্তমান যুগের ছাত্ররাও সেই কিতাবগুলোই পড়ে। সেই বুখারি শরীফ, সেই মুসলিম শরীফ, সেই তিরমিযি শরীফ, সেই আবু দাউদ শরীফ, একই তাফসীরে জালালাইন শরীফ। অথচ বর্তমান যুগের একজন ছাত্রও কাসেম নানুতবি হতে পারে না কেন? আশরাফ আলী থানবি কেন হয় না? আল্লামা কাশ্মিরি কেন হয় না? কিতাব তো একই। পার্থক্য কেবল ছাত্রের, তার আগ্রহের আর আদব-কায়দার। যে কারণে ওই সকল গুণ অর্জিত হয় না। অথচ ওই শব্দগুলোই পড়ে; তবু প্রজ্ঞা অর্জিত হয় না।

আজ আমাদের উচিৎ সেই তাকওয়া, সেই ইল্‌ম ও স্বীয় আকাবিরদের স্বভাব-চরিত্রগুলো নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করা, যাতে ওই সকল গুণ আল্লাহ আমাদের মধ্যেও পয়দা করে দেন। আজ আমরা তৃপ্তিভরে তাদের কথা শুনি আর বলি,

أُولٰئِكَ آبَائِيْ فَجِئْنِيْ بِمِثْلِهِمْ   إِذَا جَمَعَتْنَا يَا جَرِيْرُ الْمَجَامِعُ

'এঁরা হলেন আমার পূর্বপুরুষ হে জারির! সভা-সমাবেশগুলো যখন আমাদের জমায়েত করে, সম্ভব হলে তাদের মতো মর্যাদাবান লোকদের তুমি হাজির করো।'

কথা তো শতভাগ সত্য; কিন্তু কোনো শ্রোতা একথাও তো বলে ফেলতে পারে যে, জনাব!

لَئِنْ فَخَرْتَ بِآبَاءَ ذُوْ نَسَبٍ   لَقَدْ صَدَقْتَ وَلٰكِنْ بِئْسَ مَا وَلَدُوْا

'কৌলিন্যের অধিকারী পূর্বপুরুষদের নিয়ে হয় যদি তোমার গর্ব করা সত্যবাদী হলেও তুমি মন্দ তাদের সন্তানেরা।'

তারা আমাদের পূর্বসূরী ছিলেন আর আমরা তাদের রূহানী সন্তান। অথচ আমাদের ইল্ম ও আমলে পার্থক্য রয়েছে। কথাবার্তা আর চালচলনে পার্থক্য আছে। আমাদের বহিরাঙ্গন ও নির্জনতার ব্যবধান রয়েছে। সুন্নাতের পূর্ণ আনুগত্য নেই। কেবল ধোঁকাবাজি করে বেড়াই। নির্জনে আমাদের ব্যক্তিত্ব এক ধরনের আর জনসম্মুখে ভিন্ন ধরনের। বিবেককে জিজ্ঞেস করলে বলে দেয়, এটা দ্বিমুখিতা। এক মুখ মানুষকে দেখানোর জন্য, অপর চেহারা যা তোমার প্রতিপালক জানেন। আমাদের এই দ্বিমুখী মনোভাবের সমাপ্তি কবে ঘটবে? এ থেকে কবে আমরা পরিত্রাণ পাব? নিজেদের মধ্যে এসব গুণের সমাহার ঘটানোর চেষ্টা কবে করব?

এখন তো এমন যুগ এসেছে যে, যারা হালাল সম্পদ দ্বারা পেট ভরত না, আজ তাদের সন্তানরা হারাম মাল দিয়ে উদর পূর্ণ করে। যারা চাটাইয়ের ওপর বসে রাত কাটিয়ে দিতেন, আজ তাদের সন্তানরা নরম বিছানায় রাত যাপনে অভ্যস্ত। যারা এত বেশি পড়ালেখা করতেন যে, তাদের মাসিক খাদ্যখরচের তুলনায় তেলখরচ বেশি ছিল। আজ তাদের সন্তানরা কিতাব পড়ার পরিবর্তে পত্রিকা পড়ার নেশায় বিভোর। দৈনিক পত্রিকা পড়ার সুযোগ হলেও হাদীছের কিতাব পড়ার সুযোগ হয়ে ওঠে না। অবস্থা যদি এ-ই হয়, তাহলে বলুন, আমরা তাদের মিশন নিয়ে কীভাবে সামনে অগ্রসর হব?

আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ যে, আজও সেই দলের কিছু ব্যক্তি বিদ্যমান রয়েছেন, যারা ইল্‌মের অধিকারী ও যিকিরগুজার। আল্লাহ তা'আলা সজাগ করে দিয়েছেন এমন গুটিকয়েক লোক ইল্ম ও যিকিরের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। অন্যথায় সামগ্রিকভাবে আমাদের অবস্থা দিন-দিন অধঃপতনের দিকে যাচ্ছে। তাই আজ আমাদেরকে সজাগ হতে হবে। দীনের দুর্গ গড়ে তুলতে হবে। যেমন দারুল উলূম দেওবন্দ ইল্‌মের দুর্গ হিসেবে গড়ে উঠেছিল।

কেমন দারুল উলূম ছিল? দরিদ্রদের নির্মিত প্রতিষ্ঠান ছিল, যার সামনে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত কেঁপে উঠত। আজ আমরা তাঁদের রূহানী সন্তান, তাঁদের

অনুগ্রহধন্য, তাদের ঝরনা হতে পরিতৃপ্ত। আমাদের মসজিদ-মাদরাসাগুলো যেন তাদের ছেলেমেয়ে। এসব এমনি-এমনি হয়ে যাবে না। বরং এর জন্য কঠোর সাধনা করতে হবে। কিতাব পড়ার সময় হলে ইল্‌ম আহরণে গভীরভাবে মনোনিবেশ করতে হবে। অবসর সময় এলে

فَاِذَا فَرَغۡتَ فَانۡصَبۡ ۙ﴿۷﴾ وَ اِلٰی رَبِّکَ فَارۡغَبۡ ﴿۸﴾

'যখনই তুমি সময় পাবে, তখনই আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন হবে।'[১]

এর বাস্তব নমুনা হিসেবে জায়নামাযে বসে থাকব। সভা-সমাবেশগুলো একই ধরনের হবে। ইশরাক পর্যন্ত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর যিকির করতে থাকব। রাতভর কান্নাকাটি করে চোখের পানি ঝরাব। প্রভুর দরবারে সাহায্যের আঁচল বাড়িয়ে দেব। তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি রহমত নাযিল করবেন। আমাদেরকে জাহেরি ও বাতেনি ইল্‌মের পূর্ণাঙ্গ ধারক-বাহক এবং আমলওয়ালা আলিম হিসেবে গণ্য করবেন।

সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম! নিজেদের জাহিরকে সুন্নাতে নববী আর বাতেনকে মারেফাতে এলাহী দ্বারা সজ্জিত করুন। কুফরিশক্তি আমার মস্তক চূর্ণ করলে যেন ইল্‌মে নববী দেখতে পায় আর অন্তর চূর্ণ করলে যেন নবীপ্রেম দৃষ্টিগোচর হয়। আমাদের আপাদমস্তক নবীর সুন্নাত দ্বারা সুসজ্জিত দেখা যায়।

চতুর্দিকে সুন্নাতে নববীর নূর দেখা গেলে সকল আঁধার লেজ গুটিয়ে পালাবে। তারপর সামনে কদম বাড়ালে প্রতি কদমে আল্লাহ তা'আলা বরকত দান করবেন। চতুর্দিক থেকে বিজয়ের দ্বার খুলতে থাকবে। পৃথিবীবাসীর অন্তরে এমন ভীতি সঞ্চার করে দিবেন, কুফরিশক্তি আপন-আপন প্রাসাদে বসেও কাঁপতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের আমাদের পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার এবং ইল্‌ম ও যিকিরের উভয় পাল্লার মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখার তাওফীক দান করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

---

১. সূরা ইনশিরাহ : আয়াত ৭, ৮

ইসলামে নারীর মর্যাদা

‘পৃথিবীর ইতিহাস অধ্যয়ন করলে যে বিষয়টি দিবালোকের মতো স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়, তা হলো, দুর্বল শ্রেণীর অধিকার পূরণে সর্বকালেই বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা করা হয়েছে। তথাপি ইসলাম ভারসাম্য বজায় রেখে এবং মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে নারীর অধিকার যতখানি স্পষ্ট ও নিশ্চিত করেছে, তা অবগত হয়ে প্রতিটি মানুষ খুশিতে বাগবাগ হয়ে যায়। আজকের শিরোনাম সেই সংক্ষিপ্ত বিষয়েরই বিবরণ।’

ইসলামে নারীর মর্যাদা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۹۷﴾

وَقَالَ تَعَالٰى ـ وَ مِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۲۱﴾

وَقَالَ تَعَالٰى ـ وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۪ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

পৃথিবীর ইতিহাস অধ্যয়ন করলে যে বিষয়টি দিবালোকের মতো স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়, তা হলো, দুর্বল শ্রেণীর অধিকার পূরণে সর্বকালেই বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা করা হয়েছে। তথাপি ইসলাম ভারসাম্য বজায় রেখে এবং মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে নারীর অধিকার যতখানি স্পষ্ট ও নিশ্চিত করেছে, তা অবগত হয়ে প্রতিটি মানুষ খুশিতে বাগবাগ হয়ে যায়। আজকের শিরোনাম সেই সংক্ষিপ্ত বিষয়েরই বিবরণ।

জাহিলি যুগে নারীর অধিকারহরণ

ইসলামের পূর্বে আরব বিশ্বে নারীর অধিকার এতটাই পদদলিত করা হয়েছে যে, মানুষ ঘরে কন্যাশিশুর জন্মকেই সহ্য করতে পারত না। নিষ্পাপ শিশুদের জীবিত দাফন করা হতো। নারীর অধিকার এতখানিই হরণ করা হয়েছিল যে, কেউ মারা গেলে অন্যান্য সম্পত্তির মতো তার স্ত্রীরাও বড় পুত্রের স্ত্রীরূপে গণ্য হতো। স্ত্রীদের পায়ের জুতাতুল্য জ্ঞান করা হতো। স্ত্রীর কোনো বৈধ কথা আমলে নেওয়াকে পৌরুষবিরোধী মনে করা হতো।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন ও আনন্দ সংবাদ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ায় তাশরীফ এনে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিলেন, হে লোকসকল! নারী তোমার কন্যা হলে সে তোমার সম্মান। বোন হলে তোমার ইজ্জত। স্ত্রী হলে তোমার জীবনসঙ্গিনী। আর মা হলে তার পদতলে তোমার জান্নাত। এ-ও বলেছেন যে, যার দুটি কন্যা রয়েছে এবং সে তাদের ভালোভাবে লালনপালন করে, শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করে উপযুক্ত পাত্রে বিবাহ দেয়, তাহলে সে হাতের দুটি আঙুলের মতো কাছাকাছি অবস্থানে জান্নাতে আমার কাছে থাকবে।[১]

কন্যাসন্তানের জন্মের দরুন যেন জান্নাতের দরজা খুলে যাওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এই সুসংবাদও প্রদান করা হয়েছে যে,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا

যে কেউ নেক আমল করবে,

مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى

পুরুষ হোক কিংবা নারী

وَهُوَ مُؤْمِنٌ

এমতাবস্থায় যে সে ঈমানদার

فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

অবশ্যই-অবশ্যই আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব।'[২]

অর্থাৎ– ইবাদত-বন্দেগী করে একজন পুরুষ যেমন আল্লাহ তা'আলার অলী হতে পারে, নারীরাও নেক আমল ও ইবাদত-বন্দেগী করে বেলায়াতের নূর হাসিল করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যও অলী হওয়ার পথ খোলা রেখেছেন।

মোটকথা, ইসলাম নারীকে এমন সম্মান ও মর্যাদা দান করেছে যে, পৃথিবীর অন্য কেউ তা দিতে পারেনি।

---

১. ছহীহ মুসলিম : হাদীছ নং ২৬৩১

২. সূরা নাহ্ল : আয়াত ৯৭

ইসলামবিদ্বেষী শক্তিগুলোর প্রোপাগাণ্ডা

ইদানীং ইসলামবিদ্বেষী শক্তিগুলো অভিনব পন্থায় প্রোপাগান্ডা চালাতে শুরু করেছে, যার ফলে তারা মুসলিম রমণীদের একথা বোঝাতে চেষ্টা করছে যে, ইসলাম নারীদের ওপর বহু কড়াকড়ি চাপিয়ে দিয়েছে। এতে আমাদের মুসলিম সমাজের কতিপয় শিক্ষিত নারী বিভ্রান্তির শিকার হয় যে, হয়তো ইসলাম আমাদেরকে আমাদের ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত করেছে। অথচ ব্যাপারটি আদৌ এমন নয়।

ইসলামের পর্দার বিধান

দেখুন, সর্বপ্রথম একথা বলা হয় যে, ইসলাম নারীকে পর্দায় থাকতে নির্দেশ দিয়েছে। অথচ অমুসলিম সমাজে নারীরা বেপর্দা চলাফেরা করে। একথাটি বোঝা অতি সহজ ব্যাপার যে, নারী পর্দায় থাকলে নারী ও পুরুষ উভয়েরই উপকার রয়েছে। আসুন, তাহলে ইউরোপে বেপর্দার ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়ে একটু ভাবা যাক।

সুইডেনে বেপর্দার দুটি ক্ষতিকর প্রভাব

সুইডেন হলো বৃটেনের একেবারেই কাছাকাছি ইউরোপিয়ান একটি ধনী রাষ্ট্র । আমাদের দেশগুলোর বাজেট হয় ঘাটতির আর তাদের বাজেট হয় আয় ও লাভের। আমরা ভাবি, টাকার আমদানি কোথা থেকে হবে আর তারা চিন্তা করে, অর্থ কোথায় লাগাবে। এতই ধনী রাষ্ট্র যে, গোটা দেশের মানুষ কাজকর্ম সব ছেড়ে দিয়ে যদি শুধু বসে-বসে খায় আর বিলাসিতা করে, তবু তারা তাদের সঞ্চিত ধনভান্ডার শেষ করতে ছয় বছর সময় লাগবে। কেউ চাকরি না পেলে সরকারকে অবগত করলে মাসিক ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা বেকার ভাতা প্রদান করা হয়। কারো যদি বসতবাড়ি না থাকে, সরকার তার জন্য বাড়ির ব্যবস্থা করে দেয়। অসুস্থ হলে মৃত্যু পর্যন্ত তার চিকিৎসা বাবৎ লাখ টাকা লাগুক বা কোটি টাকা লাগুক রাষ্ট্র যাবতীয় খরচাদির দায়িত্ব বহন করে।

তাদের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা তো হয়েই গেল। বাকি রইল অন্যান্য মানবিক চাহিদা। ওই দেশে সেগুলো পূরণের এতই অবাধ সুযোগ যে, তাকে Sex free country (উন্মুক্ত যৌনাচারের দেশ) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। জীব-জানোয়ারের মতো নারী-পুরুষ একে অপরের সাথে যখন, যেখানে ইচ্ছা মিলিত হতে কোনো বাধা নেই।

এখন ভাববার বিষয় হলো, যাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান নিয়ে কোনো ভাবনা নেই, স্বাধীনভাবে যৌনচাহিদা পূরণের অবাধ সুযোগ, তাদের তো আর কোনো চিন্তা-ই থাকার কথা নয়। তারপরও দুটি বিষয় অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। প্রথম বিষয়টি হলো, তাদের সমাজে শত করা ৭০ ভাগ বিবাহ ভেঙে যায়। অর্থাৎ– ১০০টির মধ্যে ৭০টির অধিক ঘরেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় বিষয়টা হলো, সেই দেশে আত্মহত্যাকারীর হার অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিক। সেই দেশের মতো অন্য দেশে এত বেশি মানুষ আত্মহত্যা করে না। নির্লজ্জতা আর পর্দাহীনতার দরুন অন্তরে প্রশান্তি থাকে না। নারী-পুরুষ সবাই আরো ভালো, আরো শ্রেষ্ঠ, আরো উন্নত, আরো পছন্দের সন্ধানে মত্ত। ফলে শান্তির জীবন কারোই ভাগ্যে জোটে না। যেই সমাজব্যবস্থায় ৭০ ভাগেরও বেশি নারীর বিবাহ ভেঙে যায়, সেখানে আনন্দ আছে কার? তাই আজ তারা মানসিক অশান্তির জীবন যাপন করছে।

পর্দা পালনের মনোলোভা সুফলসমূহ

ইসলাম আমাদেরকে পর্দা পালনের যে নির্দেশ দিয়েছে, তার সুফল ও কল্যাণ আমাদেরই জন্য। আমাদের সমাজব্যবস্থায় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের ঘাটতি থাকলেও ০.৭ ভাগও বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে না। এমন সুখময় জীবন আমরা কেন যাপন করছি? আনন্দ-ফুর্তিতে ভরা জীবন কেন অতিবাহিত করছি? কারণ, আমাদের এই সমাজে সামান্য হলেও ইসলামি বিধান মেনে চলার রীতি রয়েছে, যার সুফল আমরাই ভোগ করছি।

ইউরোপে বেপর্দা নারীর অপমানকর অবস্থা

আমাদের মুসলিম সমাজের নারীরা যেন মনে না করে, অমুসলিম সমাজে পর্দা না থাকায় তারা স্বাধীন। ব্যাপারটি কখনই এমন নয়। আমি ইউরোপের একটা কারখানায় দেখেছি, চারটা ছেলে চটের বস্তা ভরে-ভরে কোমরের ওপর চাপিয়ে মালামাল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করছে। সাথে দুটা মেয়েও কোমরে বস্তা বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি কারখানার ম্যানেজার সাহেবকে বললাম, এটা কেমন Non Sence (অমানবিক) কাজ? মেয়েদের এমন কাজ দিয়েছেন! সে বলল, হ্যাঁ কাজ না করলে কোথা থেকে খাবে? তাহলে নারীদের কি স্বাধীনতা মিলল যে, তারাও কোমরের ওপর ভর করে কলকারখানায় কুলির মতো কাজ করছে? এরই নাম কি স্বাধীনতা?

দেখুন, পাকিস্তানে NLC এর বড়-বড় ট্রেলারগুলো করাচি থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত চলাচল করে। ইউরোপে এ ধরনের বড়-বড় ট্রেলারগুলো মেয়েরাও চালিয়ে থাকে। ড্রাইভাররা যেভাবে পথে কোথাও রাত হয়ে গেলে চা-পানি পান করে আবাসিক হোটেলে থাকে, ঠিক তেমনি মেয়েরাও আবাসিক হোটেলে গিয়ে ঘুমায়। এতে কি নারীর সম্মান হলো, নাকি অপমান? আপনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিন।

নারীরা ঘরের রানী

ইসলাম কখনই নারীর ওপর উপার্জন করা ফরজ করেনি। মেয়ে অবস্থায় পিতার কর্তব্য রোজগার করে তাকে খাওয়ানো। বোন হলে ভাইয়ের দায়িত্ব তাকে উপার্জন করে খাওয়ানো। স্ত্রী হলে স্বামীর কর্তব্য উপার্জন করে তাকে খাওয়ানো। মা হলে সন্তানদের দায়িত্ব উপার্জন করে এনে মাকে খাওয়ানো। মোটকথা, ইসলাম নারীকে জীবনে কখনও উপার্জন করার দায়িত্ব প্রদান করেনি। বরং তার নিকটতম মাহরাম পুরুষদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে যে, তোমরা উপার্জন করে এনে তাকে দিবে। আর সে ঘরের রানী হয়ে থাকবে। বাচ্চাদের লালনপালন করবে। পরিবারের অভ্যন্তরীণ জীবনের যাবতীয় বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ করবে। এবার বলুন তো, কোন সমাজ নারীকে সহজ জীবন দান করেছে? ইসলাম, নাকি ইউরোপ?

নারীর সাথে ইসলামে এত নম্রতা কেন?

আপনি একটু ভাবলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, ইসলাম দুর্বল শ্রেণীর প্রতি নম্র আচরণ করেছে। কারণ, পুরুষকে শারিরিক শক্তি প্রদান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে নারীকে শারিরিকভাবে নাজুক ও দুর্বল করা হয়েছে। তাই নারীর দেহের গঠন ও শক্তি অনুপাতে তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পুরুষকেও তার দেহ ও শক্তি অনুপাতে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

পাকিস্তানে এক অভিনব প্রোপাগাণ্ডা

পাকিস্তানেও প্রোপাগাণ্ডা চলছে, ইসলামে নারীকে 'অর্ধমানুষ' গণ্য করা হয়। অর্থাৎ– নারীর দিয়ত (রক্তপণ) অর্ধেক। নারীদের সাক্ষ্য অর্ধেক। প্রশ্নটা এমন যে, বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও ভার্সিটিতে মেয়েরা একে অপরকে জিজ্ঞেস করে। আমি এ ব্যাপারে কিঞ্চিত আলোকপাত করছি। যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করে, তাহলে একে 'ইচ্ছাকৃত হত্যা' বলে। আর কেউ

অনিচ্ছায় নিহত হলে তাকে 'ভুলবশত হত্যা' বলে। 'ইচ্ছাকৃত হত্যা' হলে দিয়ত পরিশোধ করতে হয়। আর যদি 'ভুলবশত হত্যা' হয়, তাহলেও দিয়ত দিতে হবে। অর্থাৎ- স্বামী যদি নিহত হয়, তাহলে স্ত্রী তার দিয়ত পায়। স্ত্রী নিহত হলে স্বামী তার দিয়ত পায়।

দিয়ত সম্পর্কে শরীয়তের বিধান

শরীয়তের বিধান হলো, স্বামী নিহত হলে স্ত্রীকে পূর্ণ দিয়ত পরিশোধ করা হবে। আর স্ত্রী নিহত হলে স্বামীকে তার অর্ধেক দিয়ত পরিশোধ করা হবে। এক্ষেত্রে তো পুরুষদের কান্নাকাটি করা দরকার ছিল যে, তাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। আমরা মারা গেলে নারীরা পূর্ণ দিয়ত পায় আর নারীরা নিহত হলে আমরা তার অর্ধেক পাই। যেখানে পুরষদের কান্নাকাটি করার কথা, সেখানে উল্টা নারীদের ভুল বোঝানো হচ্ছে যে, নারীদের দিয়ত (রক্তপণ) অর্ধেক। হে আল্লাহর বান্দী! নারীদের দিয়ত অর্ধেক হলে সেই টাকা কে পায়? তা তো স্বামী পায়। যেখানে প্রাপক পুরুষ, সেখানে আল্লাহ অর্ধেক করে দিয়েছেন আর যেখানে প্রাপক নারী, সেখানে পুরুষের দ্বিগুণ দেওয়া হয়েছে। এ যেন নারীর প্রতি Favour (সহানুভূতি) দেখানো হয়েছে।

নারীর সাক্ষ্য অর্ধেক হওয়ার রহস্য

এমনিভাবে সাক্ষ্যর বেলায় বলে, নারীর সাক্ষ্য অর্ধেক। আপনি দেখে থাকবেন, কাউকে চোখের সামনে নিহত হতে দেখেও মানুষ সাক্ষী হতে চায় না। কারণ কী? কারণ, পাছে আবার কোন বিপদে পড়ি? কে সাক্ষ্য দিতে যাবে? আদালত প্রাঙ্গণে কে ঘুরে বেড়াবে? আবার হত্যাকারীর সাথে শত্রুতা সৃষ্টি কে করবে? এমন তো সচরাচরই দেখা যায় যে, মানুষ আদালত প্রাঙ্গণেই সাক্ষীদের হত্যা করছে। তাদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু সবই হুমকির সম্মুখীন হয়। মূলত সাক্ষ্য দেওয়া একটা বোঝা। এ কারণে অনেকেই এ বোঝা বহন করতে অসম্মতি প্রকাশ করে। দেখেও চুপ থাকে। কাউকে কিছু বলে না। যেখানে পুরুষের সাক্ষ্যর ব্যাপার, সেখানে নির্দেশ করা হয়েছে, তোমাদের সাক্ষ্য পূর্ণ সাক্ষ্য বলে গণ্য হবে। তোমাদের মাথায় পূর্ণ বোঝা রাখা হবে। আর মহিলার সাক্ষ্যর বেলায় বলা হয়েছে, আমি পুরোটা বোঝা তোমাদের একজনের মাথায় চাপাব না; বরং তোমরা দুজন নারী অর্ধেক-

অর্ধেক করে বহন করো, যাতে তোমাদের সাথে কেউ শক্রতা করলে তা কেবল এক বংশের সাথে নয় বরং দুটি বংশের সাথে হবে। তোমাদের ওপর যে বোঝা আসবে, তা হবে অর্ধেক।

এখানে বরং নারীর প্রতি নম্রতা দেখানো হয়েছে। আর যদি নারীকে বলে দেওয়া হতো, তোমাদেরকে পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে। তাহলে তারাই কেঁদে মরত, এত বড় দায়িত্ব আমাদের মাথায় চাপানো হলো! আল্লাহ তা'আলা নারীদের সাথে নম্র আচরণ করেছেন যে, সাক্ষ্য দেওয়ার সময় ও বোঝা বহনের সময় বললেন, তোমরা দুটি বংশ মিলে বোঝাটা বহন করো, যাতে নারীরা বেশি নিরাপত্তা লাভ করে। তাদের জান, মাল, ইজ্জত, আব্রু সব নিরাপদ হয়ে যায়।

যদি এই দুটি বিষয়ের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করা হয়, তাহলে একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, আল্লাহ নারীদের সাথে নম্র আচরণ করেছেন।

চমৎকার প্রশ্ন

একদা একমহিলা নবীজির খেদমতে এসে আরজ করল, হে আল্লাহর নবী! পুরুষরা তো নেক কাজে আমাদের তুলনায় অনেক এগিয়ে গেছে। নবীজি বললেন, তা কীভাবে? মহিলা বললেন, তারা আপনার সাথে জিহাদে শরীক থাকে। রাতভর জাগ্রত থেকে সীমানা পাহারা দেয় আর আমরা ঘরে শিশুদের লালনপালনে ব্যস্ত থাকি। তাদের রান্না করে খাওয়াই। তাদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি লক্ষ রাখি। তাদের জান, মাল, ইজ্জত, আব্রুর হেফাজত করি। আমরা তো পুরুষদের মতো জিহাদে অংশ গ্রহণ করি না। শত্রুর সামনে রাতভর সীমান্ত পাহারা দেই না। তারা নেকীতে আমাদের ছাড়িয়ে গেছে। তারা মসজিদে গিয়ে জামাতে নামায পড়ে; অথচ আমরা ঘরে নামায আদায় করি। আমরা জামাতের ছাওয়াব থেকেও বঞ্চিত হয়ে গেছি।

উত্তরে নবীজি বললেন, মহিলা চমৎকার প্রশ্ন করেছে!

উত্তরও চমৎকার!

আল্লাহর নবী বললেন, যে নারী নিজঘরে বাচ্চার জন্য রাত জাগরণ করে, আল্লাহ তাকে রাতভর সীমানা পাহারায় নিয়োজিত মুজাহিদদের সমপরিমাণ নেকী দান করবেন। ঘরের নরম বিছানায় বসিয়ে আল্লাহ তা'আলা নারীকে

জিহাদের ছাওয়াব দান করলেন। তিনি আরো বললেন, যে নারী তার ঘরে নামায পড়ে নেয়, আল্লাহ তাকে মসজিদে গিয়ে জামাতে তাকবীরে উলাসহ নামায আদায়কারী পুরুষের সমান নেকী দান করেন।[১]

নারীর জীবনের বিভিন্ন ধাপ

আসুন, এবার নারীজীবনের বিভিন্ন ধাপের ছাওয়াবের কথা বলে দিচ্ছি, যাতে স্পষ্ট হয়ে যায় ইসলাম নারীর সাথে কতটা নম্র ব্যবহার করেছে।

মেয়ের জন্ম

শরীয়তের বিধান মেয়ে শিশু জন্ম হলে আল্লাহ তা'আলা রহমতের দরজা খুলে দেন। দুটি মেয়ে সন্তান হলে তা পিতার জন্য রহমত স্বরূপ। কেননা তাদের পিতা জান্নাতে নবীজির এত কাছে অবস্থান করবে যেমন হাতের দুটি আঙ্গুল পাশাপাশি অবস্থানে থাকে।[২]

কুমারী মেয়ের মৃত্যু

হাদীছে আছে, যখন কোনো কুমারী মেয়ে মাতাপিতার ঘরে অবস্থানকালে মারা যায়, কেয়ামত দিবসে আল্লাহ তাকে শহীদদের কাতারে দাঁড় করাবেন। কারণ, সে কুমারী ছিল। মাতাপিতার ঘরে থাকত। নিজের ইজ্জত, আবরুর হেফাজত করত। এখনও সে স্বামীর ঘর দেখেনি। অন্য মানুষের মতো দাম্পত্যজীবনের সুখ-শান্তি তার ভাগ্যে জোটেনি। সে যেহেতু বঞ্চিত হয়েছে, তাই আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তাকে আখেরাতে শহীদের মর্যাদা দান করেছেন। দুনিয়াতে তাকে শহীদ বলা হবে না। তবে কেয়ামত দিবসে তাকে শহীদদের কাতারে দাঁড় করানো হবে।[৩]

বিবাহিতা নারীর ছাওয়াব বৃদ্ধি

আরেকটু সামনে পা বাড়ান। যদি এই মেয়েটির বিবাহ হয়ে যায় এবং সে যদি স্বামীর আনুগত্য করে এবং পাশাপাশি আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি করে, তাহলে ফকীহগণ লিখেছেন, কুমারী মেয়ে এক নামায পড়লে এক নামাযের ছাওয়াব পায় আর বিবাহিতা নারীকে এক নামাযের বিনিময়ে ২১ নামাযের

---

১. সহীহ ইবনে খুযাইমা

২. তিরমিযি : হাদীছ নং ১৯১৩

৩. ছহীহ মুসলিম : হাদীছ নং ২৬৩১

ছাওয়াব দেওয়া হয়। কারণ, তার ওপর এখন দুটি দায়িত্ব এসে পড়েছে। একটি স্বামীর খেদমত, অপরটি আল্লাহর ইবাদত। ফলে তার ওপর এখন দুটি বোঝা চেপে বসেছে। যখন সে স্বামীর খেদমতের পাশাপাশি আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি করবে, তখন আল্লাহ তার ইবাদতের বিনিময় বাড়িয়ে দেবেন। দেখলেন তো, নারী এক নামায পড়েও ২১ নামাযের ছাওয়াব পায়।

আল্লাহ তা'আলার সুপারিশ

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে নারীদের ব্যাপারে পুরুষদেরকে সুপারিশ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে :

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

'তোমরা নারীদের সাথে সদাচরণ করো।'[১]

দেখুন! আজ কারো পক্ষে তার বোন সুপারিশ করে, কারো পক্ষে তার খালা সুপারিশ করে। আবার কারও পক্ষে তার মা সুপারিশ করে, কারো পক্ষে তার ফুফু সুপারিশ করে, আত্মীয়-স্বজনেরা করে। অথচ মহান আল্লাহ নিজে নারীদের পক্ষে পবিত্র কুরআনে সুপারিশ করেছেন :

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

'হে পুরুষেরা! তোমরা নারীদের সাথে ভালোভাবে এবং ন্যায়সঙ্গত উপায়ে জীবন যাপন করো।'

গর্ভ সঞ্চারের দরুন গুনাহ মাফ

এ মহিলা যদি আপন স্বামীর সাথে ভালোভাবে জীবন যাপন করতে-করতে গর্ভ অনুভব করে, তাহলে হাদীছ শরীফের ভাষ্য মোতাবেক যে মুহূর্তে তার গর্ভ সঞ্চার হয়, সেই মুহূর্তেই আল্লাহ তা'আলা তার বিগত জীবনের গুনাহগুলো মাফ করে দেন। কারণ, তাকে এখন থেকে নিয়ে বেশ কিছু দিন অসুস্থ অবস্থায় কাটাতে হবে। কারণ, গর্ভকালীন সময়টা অসুস্থতার সময়। এ কারণে আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করলেন যে, গর্ভ সঞ্চার হওয়ামাত্রই তার বিগত জীবনের গুনাহগুলো মাফ করে দিলেন।

---

১. সূরা নিসা : আয়াত ১৯

গর্ভকালীন আহ্! ধ্বনির বিনিময়

যদি সে বাচ্চা গর্ভে নিয়ে চলাফেরা করে, ঘরের কাজ-কর্ম সম্পাদন করে এবং ক্লান্তির দরুন মুখ থেকে উহ্! আহ্! ধ্বনি প্রকাশ পায়, হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের বলেন, আমার অমুক বান্দী বড় একটা বোঝা বহন করে বেড়াচ্ছে আর কষ্টের দরুন উহ্! আহ্! শব্দ করছে; তোমরা এর পরিবর্তে তার আমলনামায় সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার বলার ছাওয়াব লিখে দাও।

প্রসববেদনার জন্য বিনিময়

এসব হাদীস নয় ২/১৪০

বাচ্চা প্রসবের সময় নিকবর্তী হলে মহিলা ব্যথা অনুভব করে। হাদীছে পাকে এসেছে, প্রতিবার ব্যথা অনুভবের দরুন আল্লাহ তা'আলা আরব বংশীয় একটা গোলাম আযাদ করার ছাওয়াব দান করেন, অন্যান্য হাদীছের ভাস্য মোতাবেক কেউ যদি একটি গোলাম আযাদ করে আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন।

এবার দেখুন, নারীর প্রতি কেমন নম্র আচরণ করা হয়েছে যে, প্রতিবার ব্যথার দরুন আরব বংশীয় গোলাম আযাদের ছাওয়াব লিখে দেওয়া হয়েছে!

প্রসবকালে মারা গেলে শহীদের মর্যাদা!

কোনো মহিলা যদি বাচ্চা প্রসবকালে মারা যায়, তাহলে হাদীছে আছে, এই মহিলা শহীদ হয়ে যায়। কেয়ামত দিবসে তাকে শহীদদের কাতারে দাঁড় করানো হবে।[১]

বাচ্চা প্রসবের দরুন গুনাহ মাফ

যদি সুস্থভাবে বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করে মা ও শিশু উভয়ে সুস্থ থাকে, তাহলে হাদীছ শরীফের বর্ণনা মোতাবেক আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতাকে আদেশ করেন, যে এসে উক্ত মহিলাকে বলে, মা! তুমি তোমার মায়ের গর্ভ থেকে জন্মকালে গুনাহ থেকে যেমন পবিত্র ছিলে, আল্লাহ আজ তোমাকে তেমনি পবিত্র করে দিয়েছেন। দেখলেন! সে যদিও বাচ্চার জন্য বহু কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করেছে, আল্লাহ তাকে কত বড় বিনিময় দান করলেন যে, সদ্যোজাত বাচ্চার মতো তার বিগত জীবনের গুনাহগুলো মাফ করে দিলেন।

---

১. বাদায়ে সানায়ে ৪/৪৩৭

শিশুকে সর্বপ্রথম 'আল্লাহ' শব্দ শেখানোর বিনিময়

আচ্ছা এবার যদি মহিলা তার বাচ্চাকে ভালোভাবে লালনপালন করে এবং তাকে সবার আগে 'আল্লাহ' শব্দ শেখায়, তাহলে হাদীছে পাকের ভাষ্যমতে যে শিশুর মুখ থেকে সর্বপ্রথম আল্লাহ শব্দ উচ্চারিত হয়, আল্লাহ তা'আলা তার মাতাপিতার অতীত জীবনের সকল গুনাহ মাফ করে দেন। কাজটি কতই-না সহজ যে, যখন বাচ্চাকে উঠাবে তো আল্লাহ-আল্লাহ শব্দ বলবে। আজ আমাদের বউ-বেটীরা বাচ্চাদের সামনে 'মাম্মি' শব্দ বলে। 'পাপা' বলে। আরো বেশি আধুনিকা হলে বলে Twinkle twinkle little star. তাদের জানাই নেই, যদি আমরা বাচ্চার সামনে সর্বপ্রথম 'আল্লাহ' শব্দটি উচ্চারণ করি, তাহলে আল্লাহ আমাদের অতীত জীবনের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

শিশুকে কুরআন তেলাওয়াত শেখানোর ফজীলত

যদি মহিলা তার বাচ্চাকে কুরআন শিখতে পাঠায় আর বাচ্চা কুরআন তেলাওয়াত শিখে নেয়, যে মুহূর্তে বাচ্চার কুরআন তেলাওয়াত শিখা সম্পন্ন হয়, ওই মুহূর্তেই আল্লাহ শিশুটির মা-বাবার গুনাহ মাফ করে দেন।

শিশুকে কুরআন হেফয করানোর ফজীলত

যদি ছেলেমেয়েকে কুরআন হেফয করতে পাঠায় এবং তারা হাফেয-হাফেযা হয়ে যায়, তাহলে হাদীছ শরীফের বর্ণনা মোতাবেক আল্লাহ কেয়ামত দিবসে তাদের মা-বাবাকে নূরের এমন তাজ পরিধান করাবেন যে, তার আলো সূর্যের আলো অপেক্ষা অধিক হবে। বরং সূর্য যদি কোনো ঘরে এসে পড়ে, তার এত আলো হবে না, যতটা জ্যোতি হবে নূরের তৈরী এই মুকুটটির। লোকেরা অবাক হবে, তারা জিজ্ঞেস করবে, এরা কারা? তাদের বলা হবে, এরা নবীও নন শহীদও নন; বরং এরা হলেন সেই সৌভাগ্যবান মাতাপিতা, যারা তাদের ছেলেমেয়েকে কুরআন শরীফ হেফয করিয়েছেন। তাই আজ আল্লাহ তা'আলা নূরের তৈরী মুকুট তাদের মাথায় পরিধান করিয়ে দিয়েছেন।[১]

দেখলেন তো! নারীদের প্রতিটি কদমেই ছাওয়াব হয়!

---

১. সুনানে তিরমিযী : হাদীছ নং ৩০৬১

সাংসারিক কাজের বিনিময়

মহিলা যদি সাংসারিক কাজ-কর্ম করে, তাহলে তাকে এসব কাজ-কর্মের দরুন ছাওয়াব দান করা হয়। যেমন– কোনো মহিলা এমন আছে যে, ঘরের Dusting (পরিছন্নতা)র কাজ করে না, নিজের কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করে না। ঘরের রান্না-বান্না করে না। এই কাজগুলো তো সব মহিলারা-ই করে থাকে। এসব কাজের জন্যও মহিলাদের ছাওয়াব প্রদান করা হয়। এক হাদীছে আছে, যে মহিলা তার স্বামীর ঘরের কোনো জিনিস অগোছালো পড়ে থাকতে দেখে গুছিয়ে রাখে, আল্লাহ্ তাকে একটি নেকী দান করেন এবং তার একটি গুনাহ মাফ করে দেন এবং জান্নাতে মর্যাদার একটি স্তর উঁচু করে দেন।

দেখলেন তো, মহিলারা প্রতিদিন ঘরে কী পরিমাণ আসবাবপত্র গুছিয়ে পরিপাটি করে! শুধু রান্নার সামগ্রীগুলো হিসাব করলে তো আমার ধারণা মোতাবেক তারা কমপক্ষে পঞ্চাশটি জিনিস গুছিয়ে রাখে।

সাংসারিক কাজ-কর্মের ছাওয়াব না পাওয়ার মূল কারণ

কোন নিয়তে কাজ করতে হবে এ বিষয়টি মহিলারা জানেই না। বর্তমানে মহিলারা কী নিয়তে ঘর পরিষ্কার করে? না করলে মানুষ কী বলবে? মানুষ বলবে, অমুক মহিলা নোংরা। মহিলা যখন এ নিয়তে ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে, তখন তার একবিন্দুও নেকী হয় না। কারণ, সে মানুষকে দেখানোর নিয়তে কাজ করেছে।

নিয়ত বিশুদ্ধকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

নিয়ত ঠিক করা একটি স্বতন্ত্র বিষয়। বর্তমানে নারীদেরকে নিয়ত বিশুদ্ধ করার সবক শিখানো হয় না যে, তারা কী নিয়তে পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করবে। মনে রাখবেন, নিয়ত শুদ্ধ হলে ছাওয়াব পাবেন। নিয়ত শুদ্ধ না হলে ছাওয়াব পাবেন না। আমি বিষয়টি উদাহরণের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করছি।

নিয়ত বিশুদ্ধ করা যেহেতু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাই একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার করে দেওয়া হচ্ছে। ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, কেউ যদি ঘর নির্মাণ করে এবং তাতে জানালা লাগায় এ উদ্দেশ্যে যে, ঘরে আলো-বাতাস আসবে, তাহলে লোকটি আলো-বাতাস পাবে বটে; তবে

কোনো ছাওয়াব পাবে না। পক্ষান্তরে অন্যজন ঘর তৈরি করে এবং তাতে জানালা লাগায় এ নিয়তে যে, ঘরে আযানের আওয়াজ আসবে, ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, এই ব্যক্তি ছাওয়াব তো পাবেই; আলো-বাতাসও বিনা খরচে লাভ করবে।

আরও একটি উদাহরণ নিন। একমহিলা ঘরে খাবার রান্না করছে। রান্না করতে গিয়ে যদি তরকারিতে এক কোষ পানি অতিরিক্ত ঢেলে দেয়, ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, যদি প্রয়োজনপরিমাণ পানি ঢালার পর আরও এক কোষ পানি এই নিয়তে ঢেলে দেয় যে, যদি কোনো মেহমান এসে পড়ে বা কোনো প্রতিবেশীকে খানা দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে মহিলার আমলনামায় মেহমানের জন্য খাবার রান্নার ছাওয়াব লেখা হবে।

এবার বলুন, কোন মহিলা এমন আছে, যে এই ছাওয়াব নিতে সক্ষম নয়? সবাই এই ছাওয়াব নিতে সক্ষম। কেবল দীনি জ্ঞান না থাকায় এসব ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। এ কারণেই নবীজি ইরশাদ করেছেন :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَّ مُسْلِمَةٍ

‘দীনি ইল্‌ম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর ও নারীর ওপর ফরজ।’[১]

তাহলে মহিলাদের জন্যও দীনি ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরজ। অথচ এই বেচারীরা দীন থেকে এতটাই বঞ্চিত থাকে যে, তারা গোসলের ফরজও জানে না। অন্যান্য মাসআলারও সঠিক বুঝ, জ্ঞান থাকে না।

কোন নিয়তে ঘর পরিষ্কার করবে?

সাধারণত মহিলারা এই নিয়তে ঘর পরিষ্কার করে যে, মানুষ দেখলে কী বলবে? এরা বোকা! না আল্লাহর বান্দী! এই নিয়তে ঘর পরিষ্কার করবে না; বরং নিয়ত করবে, আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন,

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ۝

‘নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারী ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অবলম্বনকারী ব্যক্তিদের ভালোবাসেন।’[২]

---

১. ইবনে মাজা : হাদীছ নং ২২০

২. সূরা বাকারা : আয়াত নং ২২২

কী অর্থ? তাওবা করলে অন্তর পরিষ্কার হয় আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে বহিরাগত অঙ্গসমূহ পরিষ্কার হয়। অর্থাৎ– যে ব্যক্তি বহিরাগত অঙ্গসমূহ পরিষ্কার করে, আল্লাহ তা'আলা তার ওপর সন্তুষ্ট থাকেন। এমনিভাবে যে অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করে, আল্লাহ তারও ওপর সন্তুষ্ট থাকেন। তাই মহিলাদের উচিৎ, ঘরদোর ঝাড়-পরিষ্কারের সময় এই নিয়ত করা যে, আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন।

শরীয়তের ঘোষণা হলো :

اَلطُّهُوْرُ نِصْفُ الْاِيْمَانِ

'পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।'[১]

তাহলে আপনি অন্তরে নিয়ত করে নিবেন, আমি এজন্য ঘর পরিষ্কার করছি যে, নবীজি ইরশাদ করেছেন, পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক এবং আল্লাহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিদের ভালোবাসেন। আপনি এই নিয়তে ঘর পরিষ্কার রাখবেন, ফার্নিচারগুলো চকচকে করে রাখবেন, কাপড়গুলো ধুয়ে রাখবেন, তাহলে আপনার প্রতিটি কাজেই ছাওয়াব হতে থাকবে। কারণ, আপনার নিয়ত বিশুদ্ধ। কেননা, আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই সব কিছু করছেন।

বিয়ের পর মা-বাবার সঙ্গে সাক্ষাতের ফজীলত

এমন কোনো মেয়ে আছে কি, যে বিয়ের পর মা-বাবার সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসে না? সব মেয়েই আসে। তবে নিয়ত কী থাকে? শুধু এতটুকু যে, মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, যে মেয়ে বিয়ের পর মা-বাবার সঙ্গে সাক্ষাত করার নিয়তে স্বামীর অনুমতিক্রমে আসে এবং অন্তরে এই নিয়ত পোষণ করে যে, উক্ত আমল দ্বারা আল্লাহ সন্তুষ্ট হন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিটি কদমে ১০০টি নেকী দান করেন এবং ১০০টি গুনাহ মাফ করেন এবং জান্নাতে ১০০টি মর্যাদার স্তর উঁচু করে দেন।

হাদীছে পাকে এসেছে, যদি সে মাতাপিতার নিকট আসে এবং ভক্তি ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাদের চেহারার দিকে তাকায়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রতিবারের দৃষ্টির বিনিময়ে একটি হজ কিংবা ওমরার ছাওয়াব দান করবেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেউ যদি ভক্তি ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে তার মাতাপিতার চেহার দিকে বারবার তাকায়?

---

১. আল-মু'জামুল কাবীর : হাদীছ নং ৩৩৪৬

নবীজি বললেন, যতবার তাকাবে, ততটি হজ বা ওমরার ছাওয়াব তার আমলনামায় লেখা হবে।[১]

শিশুদের সঠিক দীক্ষা না হওয়ার মূল কারণ

আজ মহিলারা মা তো হয়ে যায়; কিন্তু তারা জানে না, সন্তানকে কীভাবে শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করতে হয়। এ বেচারী নিজেই তো কোনো শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেনি; তাহলে সে কীভাবে তার বাচ্চাকে শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করবে? বর্তমান পরিবেশে আমাদের শিশুরা সঠিক শিক্ষা-দীক্ষা না পাওয়ার মূল কারণ এটা। একটি সময় এমন ছিল যে, মায়েরা তাদের শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা করত। আজ আমি আপনাদের একটি ঘটনা শুনিয়ে দিচ্ছি, যার ফলে আপনি ভালোভাবেই অনুমান করতে পারবেন পূর্বেকার নেককার নারীরা তাদের শিশুদের কীভাবে শিক্ষা দীক্ষা প্রদান করতেন।

খাজা কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কাকি (রহ.)-এর শিশুকালের ঘটনা

হযরত খাজা কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কাকি (রহ.) নামে দিল্লিতে এক বুযুর্গ ছিলেন। তাকে মোগল সম্রাটদের পীর মনে করা হতো। আমি তাঁর মাজার দেখেছি। কুতুবমিনারের অতি নিকটেই অবস্থিত। তার নামেই কুতুবমিনার নির্মিত হয়েছে। নাম ছিল কুতুব উদ্দীন। সাথে 'কাকি' শব্দটিও বলা হয়। কারণ, কাকি হলো হিন্দী ভাষার শব্দ। এর অর্থ রুটি। তাঁর পূর্ণ নাম ছিল কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কাকি।

তাঁর শিশুকালের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে। তিনি যখন মাদরাসায় যাওয়া-আসা শুরু করলেন, তখন তার মাতাপিতা ভাবলেন, আমরা আমাদের বাচ্চার ভালো শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা কেন করব না? সর্বপ্রথম বাচ্চাটির অন্তরে একথা বদ্ধমূল করতে হবে যে, সর্ববিষয়ে আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। অর্থাৎ– তাকে তাওহীদ শেখাবেন, যেন সে সদা সব কিছু আল্লাহর নিকট চায়। যেন তার অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভরসা সৃষ্টি হয় এবং তার দৃষ্টি মাখলুকের পরিবর্তে খালেকের ওপর নিবদ্ধ হয়।

তার মা বললেন, আচ্ছা; আমি একটি কৌশল অবলম্বন করব, যেন বাচ্চার অন্তর আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়। পরদিন যখন তিনি মাদরাসা থেকে এলেন, মা আগেই খাবার রান্না করে বিছানার তলে লুকিয়ে রেখেছেন। বাচ্চা

---

১. শু'আবুল ঈমান : হাদীছ নং ৭৪৭২

বলল, আম্মু আমার ক্ষুধা পেয়েছে; আমাকে খাবার দিন। তিনি বললেন, বেটা! খাবার আল্লাহর নিকট চাও; তিনিই দিবেন। বাচ্চা বলল, আম্মু! আল্লাহর নিকট কীভাবে চাইব? বললেন, বেটা! মুসল্লাটি বিছাও এবং তাতে বসে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করো; তাহলে তিনি খাবার পাঠিয়ে দিবেন।

সে ছোট্ট বাচ্চাটি তখন মুসল্লা বিছাল আর তার ওপর বসে আপন নিষ্পাপ কচি দুটি হাত তুলে দোআ করতে থাকল, হে আল্লাহ! আমি ক্ষুধার্ত। আমি সবে মাদরাসা থেকে এসেছি। হে আল্লাহ! আমার ক্ষুধা পেয়েছে, তুমি আমাকে খাবার দাও। হে আল্লাহ! আমার ক্ষুধা লেগেছে; আমাকে খাবার দাও। বাচ্চা তার নিষ্পাপ কচি মুখে দোআ করছে আর মা শিখিয়ে দিচ্ছেন।

বাচ্চা যখন দোআ শেষ করল, মা বললেন, বেটা! তালাশ করে দেখো, আল্লাহ কোথাও-না কোথাও-তোমার খাবার রেখে দিয়েছেন। সুতরাং বাচ্চা তালাশ করে বিছানার নিচে রুটি পেয়ে গেল। বাচ্চা খুশি মনে খেয়ে ফেলল।

তারপর নিয়মিতই এভাবে চলতে লাগল। মা নিজেই রুটি বানিয়ে কখনো আলমারিতে, আবার কখনো বিছানার নিচে লুকিয়ে রাখতেন। বাচ্চা এসে মুসল্লা বিছিয়ে তার ওপর বসে নিষ্পাপ হাতদুটি তুলে দোআ করত, হে আল্লাহ! আমার ক্ষুধা লেগেছে; আমাকে রুটি দিন। দোআর পর খোঁজাখুঁজি করলে সে রুটি পেয়ে যেত।

মায়ের মন বেশ আনন্দিত হচ্ছিল যে, আমার বাচ্চার অন্তর আল্লাহ তা'আলার দিকে ধাবিত হচ্ছে। একবার মা কোনো কাজে এক আত্মীয়ের বাড়ি গেলেন। সেখানে গিয়ে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে, একথা একেবারে ভুলেই গেলেন। যখন মনে পড়ল, তখন বলতে লাগলেন, হায়! বাচ্চা তো মাদরাসা থেকে চলে এসেছে, আমার বাচ্চার তো ক্ষুধা পেয়েছে; আমি তো আজ খাবার রান্না করে রাখিনি। জানি না আজ কী ঘটে?

তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে। মনে খুব দুশ্চিন্তা। দ্রুতগতিতে পা বাড়াচ্ছেন। দোআ করছেন, হে আল্লাহ! আমি তো তোমার প্রতি আমার বাচ্চার বিশ্বাসকে দৃঢ় করার ইচ্ছা করেছি। আমার ভুল হয়ে গেছে, আমি ভুলে গেছি। তার জন্য খাবার রান্না করে রাখতে পারিনি। আমার ছেলে হয়ত এসে দোআ করছে। আয় আল্লাহ! তুমি আমার রহস্য ফাঁস করো না।

মা কাঁদতে-কাঁদতে ঘরের দিকে ফিরে আসছিলেন। ঘরে ফিরে দেখলেন, তার ছেলে বড্ড আরামে ঘুমাচ্ছে। তিনি ভাবলেন, ক্ষুধার্ত ছিল; তাই ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনি তাড়াহুড়া করে রুটি বানিয়ে একটা জায়গায় লুকিয়ে রাখলেন। ততক্ষণে বাচ্চা ঘুম থেকে জাগল। মা বললেন, বেটা! তোমার তো মনে হয় খুব ক্ষুধা লেগেছে। ছেলে বলল, আম্মু আমি মাদরাসা থেকে এসে মুসল্লা বিছিয়ে দোআ করেছি, হে আল্লাহ! আমার ক্ষুধা লেগেছে; তুমি আমাকে রুটি দাও। আজ আমার আম্মুও নেই; তুমি আমাকে ভালো রুটি দাও। তারপর আমি যখন এদিক-ওদিক তালাশ করলাম, বিছানার ওপর এমন খানা পেয়েছি যে, আম্মু এত মজা লেগেছে, যা আগে কোনোদিন লাগেনি।

দেখলেন তো, একটি সময় এমন ছিল যে, মায়েরা বাচ্চাদের একিন তৈরি করতেন।

ভাববার বিষয়

আজ কি এমন কোনো মা আছেন, যিনি তার বাচ্চার একিন তৈরি করেন? আছে কি কোনো মা, যিনি সকাল-সন্ধ্যা বাচ্চাকে খাওয়াতে গিয়ে উৎসাহ দিয়ে বলবেন, সদা সত্য কথা বলবে? এগুলোর প্রতি কারো লক্ষ্যই থাকে না। পিতা একটু উপদেশ দিলে মা বলেন বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে। অথচ শিশুবেলার বদ-অভ্যাস বৃদ্ধ বয়সেও দূর হয় না। শিক্ষা-দীক্ষার অভাবে সন্তানরা আজ বড় হলে বাপকে পাপের মতো ঘৃণা করে। একটি সময় এমন ছিল যে, মায়েরা ফজরের নামায পড়ে শিশুকে কোলে নিয়ে কখনো সূরা ইয়াসীন আবার কখনো সূরা ওয়াকিয়া ইত্যাদি তেলাওয়াত করতেন। তখন বাচ্চার অন্তরে নূর নাযিল হতো। আজ সেই মায়েরা কোথায়, যারা বাচ্চাদের কোলে নিয়ে কুরআন শরীফ পড়তেন? এখন তো সূর্য ওঠার পরও মা-বাচ্চা ঘুমিয়ে থাকে। সন্ধ্যা হলে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বুকের সাথে জড়িয়ে দুধ পান করায়। পাশাপাশি টিভির নাটক দেখতে থাকে। হে মা! তুমি যখন নাটকে পরপুরুষ দেখবে, গান শুনবে, অন্যায় কাজ করবে এবং বাচ্চাকে দুধ পান করাবে, তাহলে বলো, তোমার সন্তান কী করে জোনায়েদ বাগদাদি হবে। বলো, তোমার পুত্র কীভাবে আব্দুল কাদের জিলানি হবে?

এক মহিলা সাহাবীর কুরআনের সাথে সম্পর্ক

শুনুন, অন্তরের কান দিয়ে শুনুন। ইবাদত-বন্দেগি করে একজন পুরুষ যেমন আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক গড়তে পারে, ঠিক তেমনি একজন নারীও ইবাদত-বন্দেগির মাধ্যমে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে এবং আল্লাহর মারেফাত হাছিল করতে পারে। এক মহিলা সাহাবী চুলায় রুটি বানিয়ে মাথার ওপর রাখছেন। চলে যাওয়ার সময় বলতে লাগলেন, নাও বোন! আমার তো তিন পারা তেলাওয়াতও পূর্ণ হয়েছে, এদিকে রুটি বানানোর কাজও সমাপ্ত হয়েছে। তখন বোঝা গেছে, এই মহিলাগণের রুটি বানাতে যে সময়টুকু ব্যয় হতো, সেই সময়টুকুও তাদের মুখে কুরআন শরীফের তেলাওয়াত চালু থাকত। এমনকি এতটুকু সময়ের মধ্যে তারা তিন-তিন পারা কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করে নিতেন।

হযরত ফাতেমা (রাযি.)-এর ইবাদতের প্রতি আগ্রহ

একটি সময় এমন ছিল, যখন মহিলারা দিনভর ঘরের বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকতেন আর রাতটা জায়নামাযে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিতেন। হযরত ফাতেমাতুয্যাহরা (রাযি.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি শীতের দীর্ঘ রাতে ঈশার নামায আদায় করে দু'রাকাত নফল নামাযের নিয়ত করলেন। এতই আনন্দ ও মজা অনুভব করছিলেন যে, তেলাওয়াত করতেই থাকলেন। সালাম ফিরিয়ে দেখলেন, ফজরের সময় অতি নিকটবর্তী। তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন আর দোআ করতে লাগলেন, হে আল্লাহ! তোমার রাতগুলো কত ছোট যে, দু-রাকাত নামাযেই রাত হয়ে গেল।

কিছু নারী এমনও ছিলেন, যারা রাত ছোট হওয়ার অভিযোগ করতেন। আজ আমাদের কিছু মা-বোন এমন রয়েছেন, যাদের ভাগ্যক্রমে বড়জোর পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার সুযোগ হয়।

চাশতের নামাযে রিযিকের বরকত

একটি সময় এমন ছিল, যখন স্বামীরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হতো আর তাদের স্ত্রীরা জায়নামাযে বসে চাশতের নামায আদায় করত। তাদের স্ত্রীরা হাত পেতে আল্লাহর দরবারে দোআ করত, হে আল্লাহ! আমার স্বামী হালাল রিযিকের সন্ধানে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন। তুমি তার রিযিকে বরকত দান করো। মহিলারা কান্নাকাটি করে আল্লাহর দরবারে দোআ করত আর আল্লাহ পুরুষদের কাজে বরকত দিতেন।

সারকথা

মুসলিম সমাজে নারীরা ঘরের রানীর মতো। ফলে ঘরের পরিবেশ নারীর দীনদারির ওপর নির্ভরশীল। মহিলারা ভালো স্বভাবের হলে শিশুদের দীনি রঙে রাঙিয়ে দিবেন। কাজেই মুসলিম নারী ও মেয়েদের দীনি শিক্ষা ও চারিত্রিক দীক্ষার প্রতি বিশেষভাবে মেহনত করার প্রয়োজন রয়েছে। এক বক্তা চমৎকার বলেছেন :

مرد پڑھا فرد پڑھا عورت پڑھی خاندان پڑھی

'পুরুষ শিক্ষিত তো ব্যক্তি শিক্ষিত। নারী শিক্ষিত তো জাতি শিক্ষিত।'

পশ্চিমা কোনো পণ্ডিত বলেছেন, 'তোমরা আমাকে শিক্ষিত মা দাও; আমি তোমাদের শিক্ষিত জাতি দেব।'

মুসলিম জাতির কর্তব্য হলো, মুসলিম মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দেওয়া, যাতে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর মায়ের কোল থেকেই দীনের ভালোবাসা ও সচ্চরিত্রের মতো মহাদৌলত হাসিল করতে পারে এবং পৃথিবীর দিক-দিগন্তে চাঁদ-সূর্যের মতো জ্যোতি ছড়িয়ে দিতে পারে।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

মাওলানা পীর যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী

তিনি একজন বিজ্ঞ আলেম, পীর, প্রকৌশলী ও লেখক। এছাড়াও তাঁর অসংখ্য পরিচিতি রয়েছে। দ্বীনি ও সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত পাকিস্তানের এই আলেম দেশ-বিদেশে নানা খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। শিক্ষা, সমাজ ও আধ্যাত্মিক লাইনে তাঁর অবদান বিশাল। তাঁর বক্তব্য ও লেখার ভাষা অত্যন্ত বাস্তবভিত্তিক। সহজেই সবাই বুঝতে পারেন। তাঁর বয়ানগুলোও লেখার মতোই সুবিন্যস্ত ও গতিময়। একজন পাঠক তাঁর লেখা ও বয়ানে নিজেকে খুঁজে পান। অভিজ্ঞতার আলোকে প্রত্যক্ষদর্শীর মতোই জীবনের বাস্তবতাগুলো তুলে ধরেন প্রবীণ এই আলেম।

মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী একজন বিশিষ্ট পীর। পাকিস্তান ও দক্ষিণ আফ্রিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে তিনি ইসলাহী কাজ আঞ্জাম দিচ্ছেন। পাকিস্তানের দারুল উলূম জঙ্গ ছাড়াও বিভিন্ন দ্বীনি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সঙ্গে জড়িত। জীবনের প্রথম পর্যায়ে তিনি বিভিন্ন জাগতিক ডিগ্রি ও যোগ্যতা অর্জন করেন। পরে দ্বীনি লাইনেও সাফল্যের শীর্ষ চূড়ায় পৌছেন। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও জড়িত তুখোড় মেধাবী এই আলেম।

মাওলানা নকশবন্দী অর্ধশতাধিক বিতাব রচনা করেছেন। ইতিমধ্যে ৩০ খণ্ডের বেশি তাঁর বয়ানসমগ্রও প্রকাশিত হয়েছে। নকশবন্দীর বই পড়ে অনেকেই দ্বীনের পথে এসেছেন। যেকোনো ধরনের পাটক তাঁর বই পড়ে আলোর দিশা পাবেনই।



দারুল উলূম লাইব্রেরী

[অভিজাত ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]

ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)

১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০